া-বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন

সম্পাদক

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ।

প্রথম ভাগ।

কলিকাতা।

৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট; বরাট প্রেসে

শ্রীকিশোরীমোহন সেন দ্বারা মুদ্রিত

এবং

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১২৯৬ সাল।

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥" বিষ্ণুশর্ম্মা। "Train up a child in the way he should go; when he is old he will not depart from it." Eng. Bible.—"The m is the best book, the most natural and efficient channel of commun tion." D. Stow.—"Too generally words have been communicated w. out ideas." D. Stow. "Be exact in your thoughts." Lord Reay.—"Th child is father of the man." Wordsworth.—"The subject which involv all other subjects, and therefore the subject in which education shoul culminate, is the Theory and Practice of Education." H. Spencer.—"Tr education is practicable only by a true philosopher." H. Spencer.—"A breaches of the laws of health are physical sins." H. Spencer.—"Wh is needed for the rooting out of vices is not legislation so much as educatio aided of course by example." *Hope.*—"It is the greatest curse of ignorance it knows not how ignorant it is." *Christian Life.* "অনন্ত শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ। যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রং॥ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। "—a sound mind in a sound body." Locke.

সূচীপত্র।

শিক্ষা-পরিচয়

প্রথম ভাগ

পুস্তকাকারে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। নগদ মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। কিন্তু যাঁহারা গ্রাহক হইয়া দ্বিতীয় ভাগের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা ১৲ এক টাকাতেই প্রথমভাগ পাইবেন; অর্থাৎ ২॥৵০ দুই টাকা দশ আনা পাঠাইলেই প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ শিক্ষা-পরিচয় পাইবেন। মূল্যাদি সমস্তই পুঁঠিয়া, রাজসাহী, এই ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

শিক্ষা-পরিচর।

১ম ভাগ। } বৈশাখ ১২৯৬ সাল। } ১ম সংখ্যা।

আত্ম-পরিচয়।

আপনা হইতে উপস্থিত হইয়া লোকের নিকট আত্ম-পরিচয় প্রদান করা কতকটা অপ্রীতিকর, সুতরাং রুচি-বিরুদ্ধ—রীতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু বর্ত্তমান সাময়িক-সাহিত্য দায়ে ঠেকিয়া এই বিশেষ রীতি উল্লঙ্ঘন করিতে বাধ্য। বিনা আহ্বানে ভদ্রলোকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াইত এক ঘোর বিড়ম্বনা; তাহার উপর "তুমি কে—কি জন্য ?" জিজ্ঞাসা করিলে যদি আগন্তুকের মুখে কথা না ফুটে—যদি সে আত্ম-পরিচয় বা আগমন প্রয়োজন না বলিতে পারে, তাহা হইলে তাহার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় এবং হাস্যকর হইয়া দাঁড়ায়, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন।

বর্ত্তমান বঙ্গ-সমাজেই "শিক্ষা-পরিচর" উপস্থিত কেন ? মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক, ইংরাজী, বাঙ্গালা, পত্র-পত্রিকা-পরিপ্লাবিত বঙ্গদেশে এ ক্ষুদ্রকায়, দীন-বেশ, অল্প-মূল্য পত্রিকার কি প্রয়োজন ? যে দেশে বঙ্কিম বাবুর মত পাকা মাঝি থাকিতে 'বঙ্গদর্শন' ডুবিল; যোগেন্দ্র বাবুর মত কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ রাখাল থাকিতে 'আর্য্য-দর্শন' খাইতে না পাইয়া মরিল; যে দেশে অক্ষয় বাবুর মত প্রবীণ চিকিৎসক থাকিতে 'নব-জীবনের' জীবনী শক্তি টলিতেছে; কালীপ্রসন্ন বাবুর মত তেজস্বী সহায় থাকিতে 'বান্ধব' সাঁতারে পড়িয়া একবার ভাসিতেছে, আবার ডুবিতেছে; জলন্ত সাহিত্যানুরাগে দগ্ধপ্রায় সেই বঙ্গভূমিতে এই উদ্যম-বিড়ম্বনা কেন ? যে দেশের সাহিত্য স্বদেশানুরাগে জন্মিয়া যৌবনে ব্যবসায়ে এবং বার্দ্ধক্যে প্রতারণায় পরিণত; যে দেশের সাহিত্য-প্রতিভা অগ্নি-সংযুক্ত তৃণরাশির ন্যায় ধক্ ধক্ করিয়া জলিয়া উঠিয়া আবার দেখিতে দেখিতে নির্ব্বাপিত; যে দেশের প্রতিভা-শালী ব্যক্তিগণ অল্পদিন মধ্যেই আপন আপন প্রতিভার সমাধির উপরে দাঁড়াইয়া কেহ গর্ব্বিত, কেহ চিন্তিত; সে দেশে আবার অসময়ে এ ক্ষুদ্র উদ্যম কেন ? যে দেশে সমালোচনায় শ্রদ্ধা

নাই, বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস নাই, ভাল মন্দ বিচার করিবার অবসর বা অভ্যাস নাই, নীরব থাকিলেও নিষ্কৃতি নাই,—না চাহিলেও আবর্জ্জনা-রাশি ভদ্রলোকদের বাড়ী পর্য্যন্ত যাচিয়া যায়; যে দেশে খাসের দোকানে লোকে লোকারণ্য, কিন্তু পুষ্টিকর মিষ্টান্নের দোকানে কেহ যায় না; সে দেশে ক্ষুদ্র প্রাণীর এ বিফল প্রয়াস কেন? যে দেশে দলাদলি গালাগলি এবং চুলাচুলিই সংবাদ পত্রের নিত্য কর্ম্ম; যে দেশে 'আর কেহ কিছু করে না, যাহা করি আমি'—মন্ত্রের সাধনাই পরম ধর্ম্ম; যে দেশে অনুদারতাই সাময়িক সাহিত্যের প্রধান মর্ম্ম; সে দেশে এ দুঃসময়ে আবার এ নূতন অবতার কেন?

প্রকৃত উত্তর দিয়া এতগুলি গুরুতর 'কেন' কে নিরস্ত করে কাহার সাধ্য? তবে একথা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা-লাভ বা সাহিত্য-ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এ ক্ষুদ্র উদ্যমের উদ্দেশ্য নহে। সমাজের একটি গুরুতর প্রয়োজন উপেক্ষিত হইতেছে দেখিয়া "পরিচয়" জন্ম গ্রহণ করিল; যদি কালে কোন যোগ্যতর ব্যক্তি স্বহস্তে এ গুরুভার গ্রহণ করেন, অথবা ভৃত্যের পরিচর্য্যা নিস্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়, তবে সে পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইতে কুণ্ঠিত হইবে না।

মনুষ্যের মধ্যে এমন একটি মহত্ত্বের বীজ নিহিত আছে, যাহার বলে সে সমস্ত জীব-জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই মহত্ত্বের বিকাশ কিরূপে হইবে? মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি যে পরিমাণে স্ফুরিত হয়, সেই পরিমাণে সে দেবতা; যে পরিমাণে ইহা নিমীলিত, সেই পরিমাণে সে পশু। এই মানব-ভাগ্য-পরিবর্ত্তনকারিণী মহাশক্তির স্ফুরণ কে করিবে? জল, রৌদ্র, ভূমি এবং কৃষকের যত্ন হইতে বঞ্চিত করিয়া শস্যকে রাখিয়া দেও, সহস্র বৎসরেও তাহার বীজোদ্ভাবিনী শক্তি বিনষ্ট না হইতে পারে; কিন্তু ইহাদিগের সাহায্য ব্যতীত তাহার বীজোদ্ভব—তাহার অঙ্কুরোদ্গম অসম্ভব। এই জল রৌদ্রপ্রভৃতি সমস্ত উপকরণের সমবায়কে আমরা এক কথায় কৃষি বলিয়া থাকি। মানবাত্মার মহত্ত্বকে বিকশিত করিতে, মানবের অন্তর্নিহিত মহাশক্তিকে উদ্ভাসিত করিতে, মানবের মনোবৃত্তি-নিচয়কে প্রস্ফুটিত করিতে যে সকল উপকরণের প্রয়োজন হয়, সে সকল উপকরণের সমবায়কে যদি এক কথায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়, তবে তাহা শিক্ষা।

কিন্তু কৃষির সঙ্গে শিক্ষার তুলনা সর্ব্বাঙ্গ-সঙ্গত হইতে পারে না। যে সকল অবস্থা অঙ্কুরোদ্গমের অনুকূল, তাহা হইতে পৃথক্ করিয়া শস্যকে অনায়াসে রাখা যাইতে পারে, কিন্তু আত্ম-শক্তি-বিকাশের অনুকূল অবস্থা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিয়া মানব প্রকৃতিকে কিছুতেই রাখা যাইতে পারে না। জন্মমাত্রই মানবের ইন্দ্রিয়-দ্বার-নিচয় উন্মুক্ত হয়; মরণকাল পর্য্যন্ত অতুল-ঐশ্বর্য্যশালিনী প্রকৃতিদেবীর বিবিধ সম্পদ এই সকল পথে প্রবেশ করিয়া মানবাত্মাকে পরিপুষ্ট করিতে থাকে। মরণ অর্থাৎ দেহ পরিত্যাগের পরেও—কিন্তু সেই অনন্ত-যাত্রার কথা এ ক্ষুদ্র লেখনীর বিষয় নহে।

কিন্তু ইহাই কি প্রকৃত শিক্ষা? কোথা

হইতে কি জানি কি উপায়ে হঠাৎ একটি বীজ আসিয়া পড়িয়াছিল, কি জানি কেমন করিয়া সে একটুকু জল পাইল, একটুকু রৌদ্র পাইল, আর অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল; তাই বলিয়া কি এই ব্যাপারকে কৃষি বলিব? যতক্ষণ তাহাতে কৃষকের যত্ন সংযোজিত না হইতেছে, ততক্ষণ এ ব্যাপার কৃষিপদের বাচ্য নহে। প্রকৃতি-দত্ত শিক্ষাও শিক্ষা বটে; কিন্তু যখন মানব আত্মোৎকর্ষ সাধনের দুর্দ্দমনীয় বাসনায় উত্তেজিত হইয়া জ্ঞানার্জ্জনে এবং জ্ঞানানুমোদিত কর্ত্তব্য-পালনে যত্ন সহকারে আভ্যন্তরিক কার্য্যকরী শক্তির প্রয়োগ করিতে থাকে, তখনই তাহার প্রকৃত শিক্ষার আরম্ভ হয়। এই শিক্ষার গুণে ভারত এক সময়ে উন্নত হইয়াছিল। যে শিক্ষার বলে আজ ইউরোপের অমিত তেজ, আমেরিকার অপার গর্ব্ব, তাহাও এই শিক্ষা।

যে দেশে শিক্ষার প্রচার যত অধিক, সে দেশ তত সভ্য, তত উন্নত। কিন্তু যে দেশে যতই শিক্ষা বিস্তার অধিক হউক না কেন, আমেরিকা ব্যতীত কোন দেশের লোকেই এ পর্য্যন্ত শিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য সুন্দররূপে বুঝিতে পারে নাই। সমস্ত সভ্য দেশেই যুদ্ধ-বিগ্রহ-সৈন্যরক্ষণ প্রভৃতি কার্য্যে যত অর্থ ব্যয় হয়, সাধারণের শিক্ষা ব্যাপারে তাহা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে কম অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে; কেবল আমেরিকাতেই ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রথা দৃষ্ট হয়। আমেরিকগণ যে শিক্ষার মর্ম্ম যথার্থরূপে বুঝিয়াছে, তদ্বিষয়ে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে? আমেরিকার সঙ্গে আমাদের অবস্থার তুলনা করিলে নৈরাশ্যে হৃদয় পূর্ণ হয়। একবার একজন বিদ্যালয়-পরিদর্শক স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজী-শিক্ষা অল্পব্যয়-সাধ্য হওয়া কদাচ উচিত নহে। পরন্তু কোন বিদ্যালয়ে তিনি জেদ করিয়া ছাত্র-বেতন বৃদ্ধি করেন;—যেন, যাহার উপকারিতা যত অধিক, তাহার মূল্যও সেই পরিমাণে অধিক হওয়া উচিত! যেন জলবায়ুকে এত সহজ-লভ্য করিয়া ঈশ্বর বড় নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচয় দিয়াছেন!

যাহা হউক বড় দেশের বড় কথার আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই, আমাদের এই অধঃপতিত দেশে গবর্ণমেন্টের কৃপায় প্রবর্ত্তিত হইয়া যে প্রণালী চলিতেছে, তাহাই চিন্তা করিয়া দেখা যাউক।

আজ কাল আমরা শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝি, তাহা ইংরাজ-প্রবর্ত্তিত;—মৌলবী সাহেব এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিস্মৃতি-হ্রদের অনেকটা নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। এই নব-প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-প্রণালী প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালী হইতে বাহিরে এবং ভিতরে সম্পূর্ণ পৃথক্। তখন ছিলেন নিমন্ত্রণজীবী অধ্যাপক, এখন হইয়াছেন বেতন-ভোগী শিক্ষক; তখন সকালে এবং বিকালে শিক্ষা-কার্য্য নির্ব্বাহ হইত, এখন তাহার ঠিক মাঝামাঝি সময়ে; তখন ছিল হাতের লেখা পুঁথি, এখন হইয়াছে ছাপার পুস্তক; তখন এক এক খান করিয়া পুঁথি পড়িতে হইত, একখান শেষ না হইলে অন্য খান হাতে লইবার অধিকার ছিল না; এখন এক সময়েই অনেক বিষয়ে অনেক গুলি পুস্তক পড়িতে

হয়; তখনকার আসন ছিল মাদুর, এখন হইয়াছে বেঞ্চ এবং চেয়ার; তখন শিক্ষা-স্থানের নাম ছিল টোল, এখন হইয়াছে স্কুল, কলেজ এবং পাঠশালা; এখন শিক্ষা-বিভাগের সিনেট্, সিণ্ডিকেট্, অধ্যক্ষ, পরিদর্শক, সম্পাদক প্রভৃতি অনেকেই শিক্ষা-কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন, তখন ইহাঁদের কেহই ছিলেন না। আমরা এই আধুনিক প্রণালীরই পক্ষপাতী, এবং ইহারই ক্রমোন্নতি দেখিয়া সুখী হইতে আশা করি।

কিন্তু যে সকল পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করিলাম, সে সকলই বাহিরের। এ সমস্ত পরিবর্ত্তনে কিছু যায় আসে না। এই বাহ্য-পরিবর্ত্তনের অন্তরালে, শিক্ষিত দেশ-বাসীর জীবনে, দৃষ্টির অতীত স্থান দিয়া সমাজের স্তরে স্তরে যে পরাক্রান্ত স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতেই আশা এবং তাহাতেই ভয়। সে সকল আশা এবং ভয় কি, তাহা অবধারণ করা নিতান্ত সহজ নহে, এবং সে সম্বন্ধে আলোচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্যও নহে। কিন্তু সংপ্রতি একটি ভয়ের কারণ সর্ব্বসাধারণই অনুভব করিতে-ছেন, এমন কি, গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পর্য্যন্ত তাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং আমরাও ইচ্ছা করিয়া যে দিকে চক্ষু নিমীলিত করিয়া রাখিতে পারি না।

আজকাল সাধারণের এবং গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস, বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জীবনে দুর্নীতির বড় পরাক্রম হইয়াছে। যাহাদের জীবনে জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ এবং যুক্তি তর্কের আস্বাদ যৌবন-সুলভ চঞ্চল প্রফুল্লতার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছে, তাহারা যে পুতুলের মত নিশ্চল থাকিবে, অথবা পশুর মত যথেচ্ছ-ব্যবহৃত হইবে, ইহা অসম্ভব এবং অস্পৃহণীয়। প্রকৃত মনুষ্যত্ব যাহাতে জন্মিবে, তাহাতে স্বাতন্ত্র্য স্ফূর্ত্তি পাইবেই পাইবে। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য যদি উচ্ছৃঙ্খলা এবং অবাধ্যতায় পরিণত হয়, যুক্তি-স্পৃহা এবং তার্কিকতার সঙ্গে যদি শ্রদ্ধা এবং বিনয়ের সম্মিলন না থাকে, মার্জ্জিত বুদ্ধি যদি দুর্নীতির সঙ্গে সখীত্ব স্থাপন করে, তাহা হইলে কেবল আক্ষেপের কথা নহে,—সর্ব্বনাশের কথা, দেশ রসাতলে যাইবার কথা। কিন্তু আমরা আশা করি, এবং স্বচক্ষে যাহা দেখিতে পাইতেছি তাহাতে বিশ্বাস হয়, বঙ্গদেশের ভাগ্যে এমন দুর্দ্দিন এখনও অনেক—অনেক দূরে। অবশ্যই অবাধ্য, উদ্ধত-স্বভাব, দুর্নীতি-পরায়ণ ছাত্রের দৃষ্টান্ত এদেশে দুর্লভ নহে,—কিন্তু কোন্ দেশে দুর্লভ? অপরিণত-বুদ্ধি বালকের কথায় দোষ কি,—কোন্ দেশে, কোন্ জাতিতে, কোন্ শ্রেণীর মধ্যে দুর্নীতির একেবারে অত্যন্তাভাব? দুই এক জন দোষ করে দেখিয়া সমস্ত ছাত্রমণ্ডলীকে দুর্নীতি-পরায়ণ বলিয়া অভিহিত করা কি অন্যায় নহে? যাহারা শিক্ষককে সন্তুষ্ট করিতে, অভি-ভাবককে সুখী করিতে, সহাধ্যায়ীর সঙ্গে সদ্ভাব বৃদ্ধি করিতে দিন রাত্রি যত্ন করিয়া থাকে; যাহাদের মধ্যে একজন একটি ভাল কায করিলে সকলে আনন্দিত হয়, এবং একজন একটি মন্দ কায করিলে তাহার জন্য সকলে দুঃখিত ও লজ্জিত হয়; সেই সকল সোণার চাঁদকে এইরূপে অবিশ্বাস ও

তিরস্কার করাই কি তাহাদের উপযুক্ত পুরস্কার?

তাই বলিয়া বালকদিগের চরিত্রে যে নৈতিক অভাব নাই, এমন কথা বলিতেছি না। শিক্ষক, অভিভাবক এবং গবর্ণমেণ্ট, সকলেই যাহা স্বীকার করিতেছেন, আমরা তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। কিন্তু এই দুর্নীতির মূল কোথায়, এবং ইহার জন্য দায়ী কে? বালক লেখা পড়া শিখিয়া উপার্জ্জনশালী হইবে, এই আশায় সকল পিতামাতাই সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠান; কিন্তু বালককে প্রকৃত মানুষ করিবার জন্য কয় জন পিতামাতা যত্ন করেন? শিক্ষক যত্ন করিয়া বালককে সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস শিক্ষা দিয়া থাকেন, কিন্তু বালকের নৈতিক চরিত্র উন্নত করিতে তিনি কতদূর যত্ন করেন?

গোপাল পিতামাতার বড় আদরের ছেলে। তাহার বয়স পাঁচ বৎসর হইয়াছে। পিতামাতা ভাবিতে লাগিলেন, "সংসারের কাযেই দিন যায়, ছেলেটিকে লইয়া দুই দণ্ড বসিয়া তাহাকে কিছু শিখাই, এমন অবসর নাই। মূর্খ হইলেইবা খাইবে কি করিয়া? আর সময় নষ্ট করা উচিত নহে, এখন ইহাকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া যাউক।" গোপালের সর্ব্বনাশের রাত্রি প্রভাত হইল, যথাকালে সে "শিশুশিক্ষা" হাতে লইয়া পিতার সঙ্গে হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে, মনের আনন্দে পাঠশালায় চলিল। পাঠশালার পণ্ডিত রাখাল বাবু গোপালকে পাইয়া খুসী হইলেন, কেননা, আজ হইতে তাঁহার পাঠশালার একটি ছাত্রসংখ্যা এবং দুই আনা মাসিক আয় বাড়িল। গোপালের পিতা বলিলেন, "ছেলেটি আপনাকে দিলাম, ইহাকে মানুষ করিয়া দিতে হইবে। ইহার বেতন মাসিক দুই আনা আমি যেমন করিয়া পারি দিব।" তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে ভারি জিতিলেন। মাসিক দুই আনা পয়সা দিয়া ছেলের মেহন্নত হইতে বাঁচিয়া গেলেন, আর চাই কি? রাখাল বাবুও প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আপনি কিছু মাত্র চিন্তা করিবেন না; ছেলেকে যখন আমার হাতে দিয়াছেন, তখন যাহাতে সে মানুষ হয় তাহাই করিব।" কিন্তু রাখাল বাবু যাহা বলিলেন, তাহার অর্থ তিনি নিজেই বুঝিলেন না। কি রূপে বুঝিবেন? তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়াতে তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। মা এবং বিধবা ভগিনী মাত্র পোষ্য ছিল; বিনাব্যয়ে একটি বিবাহের যোগাড় হওয়াতে তাহা না করা অন্যায় মনে করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার পোষ্যবর্গ এক্ষণে চারি পাঁচটি। উপার্জ্জন না হইলে উপায় নাই দেখিয়া প্রথম কিছু দিন জমিদার সরকারে উমেদারী করেন, কিন্তু তাহাতেও কিছু হয় না। অবশেষে এই পাঠশালার পণ্ডিত নিযুক্ত হন। এক বাড়িতে খান, আর ছাত্রদত্ত বেতনে মাসিক যে ৪।৫ টাকা পান, ইহাতেই দুঃখে কষ্টে বাড়ীর খরচ চলে। পাঠশালার কর্ত্তৃপক্ষ মনে করিলেন, রাখাল বাবুকে বড় সস্তা পাওয়া গেল; রাখাল বাবুও মনে করিলেন, কোন রূপে দিন চলিয়া গেলেই হইল।

গোপালের পিতা নিশ্চিন্ত হইয়া ছেলেকে

রাখিয়া চলিয়া গেলেন। দণ্ডেক পরে গোপাল দেখিল পণ্ডিত মহাশয় একটি ছেলেকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন; ছেলে উত্তর করিতে পারিল না, তখন পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। কিছু কালের মধ্যে গোপাল আরও ২। ৪ টি বালককে এই রূপে মার খাইতে দেখিল, দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল, তাহার মুখের হাসি লুকাইল। পাঠশালার ছুটি হইল, গোপাল বাড়িতে গেল; কিন্তু তাহার মনে আর সে প্রফুল্লতা নাই, মুখে আর সে হাসি নাই, দণ্ডের মধ্যে শত বিষয়ে শতবার প্রশ্ন করিয়া মাকে আর বিরক্ত করে না,—তাহার মনে সর্ব্বনাশিনী চিন্তা প্রবেশ করিয়াছে। পিতামাতা মনে করিতে লাগিলেন, পাঠশালার কি চমৎকারিণী শক্তি! ছেলে একদিন মাত্র পাঠশালায় যাইয়াই সুবোধ হইয়া গেল! কিছু দিন এইরূপে যায়। আর এক দিন গোপাল পাঠশালা হইতে বাড়ীতে যাইয়া, মা বলিয়া ডাকিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। মা আদর করিয়া ছেলেকে কোলে লইয়া দেখিলেন, তাহার কোমল শরীরে কয়েকটি প্রহারের দাগ ফুলিয়া উঠিয়াছে। মা চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন,—"বাপ! পণ্ডিত তোমার ভালর জন্যই মারিয়াছে, মার না খাইলে বিদ্যা হয় না।" বালক তর্ক করিতে জানে না; যাহা বুঝিতে পারে না, সুতরাং পরিশ্রম করিয়াও যাহা শিখিতে পারে না, তাহার জন্য সে কেন শিক্ষকের নিকট বেত্রাঘাত লাভ করিবে, এ যুক্তি তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে স্থান পাইল না। তাহার পরে কিরূপে তাহার শিক্ষার প্রতি অশ্রদ্ধা এবং শিক্ষকের প্রতি ঘৃণা জন্মিল; কিরূপে সে পিতামাতার অবাধ্য এবং পাড়ার উৎপাত হইয়া দাঁড়াইল; সংক্ষেপে, যাহার দেবতা হইবার কথা ছিল, সে কিরূপে পশু হইয়া উঠিল; এসকল কথার বিস্তৃত বর্ণনায় প্রয়োজন নাই। কেমনে বীজ বপন করা হয়, তাহাই আমরা দেখি; কেমনে গাছ জন্মিয়া ফল পুষ্প প্রসব করে, তাহা জানিবার জন্য যত্ন নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীতে বালকেরা যে ভাল হয়, ইহাই আমাদের জাতীয় গৌরব এবং সৌভাগ্যের কথা; তাহারা মন্দ হইলে তাহাদিগকে নিন্দা করিতে আমাদিগের কিছুমাত্র অধিকার নাই।

গোপালের যে এই সর্ব্বনাশ হইল, তাহার জন্য দায়ী কে? পিতামাতা সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সন্তানের শিক্ষা-বিষয়ে অনভিজ্ঞ বা উদাসীন। অনভিজ্ঞের দায়িত্ব না থাকিতে পারে, কিন্তু উদাসীন হইলে নিশ্চয়ই দায়ী। রাখাল বাবু বেত্রাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে যাহা গিলিয়াছেন, বেত্রাঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা উদ্গীরণ করিতেছেন; তিনি নিজেই শিক্ষা কি তাহা জানেন না, সুতরাং তাঁহাকেও দায়ী বলিতে দয়া হয়। তবে দায়ী কে? যাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছেন, প্রকৃতরূপে শিক্ষার মর্ম্ম বুঝিয়াছেন, তাঁহারাই কি দায়ী? যাঁহারা সহস্র সহস্র মুদ্রাব্যয় করিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কি এখন পাঁচ টাকা বেতনে পাঠশালার পণ্ডিত হইবেন?

যাহা অনুভব করি, তাহা বলিতে ভয়

হয়; নতুবা আমাদের বিশ্বাস, ভারতের শিক্ষিতেরাই ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। জ্ঞানের সঙ্গে কর্ত্তব্যের নিত্যানুপাত,—যাহার জ্ঞান যত অধিক, তাহার কর্ত্তব্যের পরিমাণ তত অধিক। যাঁহারা গ্রীসের ইতিহাস পড়িয়াছেন, যাঁহারা ইটালীর ইতিহাস পড়িয়াছেন, যাঁহারা ইংলণ্ডের অপূর্ব্ব শক্তিসঞ্চারী ইতিহাস পড়িয়াছেন, দেশের প্রতি শিক্ষিতগণের কর্ত্তব্য কিরূপ, তাহা কি তাঁহাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে? এমন মূর্খ কেহ নাই যে তাঁহাদিগকে পাঁচ টাকা বেতনে পাঠশালার পণ্ডিতের কায করিতে বলিবে; কিন্তু পাঁচ লক্ষ টাকায় যাহা হইতে পারে না, যে কায টাকার আয়ত্ত নহে, সে কায তাঁহারা না করিলে কে করিবে?

প্রাণের ভাই শিক্ষিত ভারতবাসী! ভারতের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত, তুমিও আর তোমার প্রাণের উৎসাহরাশিকে প্রাণের মধ্যে লুকাইয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিতে পার না। জ্ঞানের উজ্জ্বল কিরণে তোমার প্রশস্ত পথ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, আর বসিয়া থাকিও না, অগ্রসর হও। চরিত্রের অভেদ্য বর্ম্মে দেহাবৃত করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ কর, ঈশ্বর তোমার উদ্যমকে জয়যুক্ত করিবেন। মাতৃভূমির দুর্দ্দশা-দর্শনে তোমার হৃদয় যখন ব্যথিত হইয়াছে, তখন তাহার দুঃখ দূর না করিয়া তুমি স্থির থাকিতে পারিতেছ না? উদ্দেশ্যের গুরুত্ব আগে উপলব্ধি করিয়া লও, পরে "যতবাক্ কায়মানস" যোগী হইয়া উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হও,—যোগী না হইতে পারিলে সাধনে সিদ্ধি-লাভ হয় না, ইহা নিশ্চয় জানিও। এ অন্ধকার দেশে তুমিই জ্বলন্ত মশাল, এই পূতি-গন্ধময় বায়ুমণ্ডলে তুমিই সুবাস-কুসুম; এই আলোক এবং সুবাস চতুর্দ্দিকে বিকীরণ করিয়া বেড়াও। দেশের অগণ্য হিন্দু-মুসলমান অভিভাবক, শিক্ষক এবং বালক তোমার মুখ-পানে চাহিয়া রহিয়াছে, তুমি তাহাদিগকে জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি এবং কর্ত্তব্য শিক্ষা দিবে,—তুমি তাহাদিগকে অজ্ঞান, অলস, জড়ত্ব হইতে চেতনার পথে, সুখের পথে আনিবে। যাহা অর্থের অসাধ্য; তাহা তোমার সাধ্য। তুমি অসময়ে অনেক সুবীজ ছড়াইয়া নষ্ট করিতেছ; ক্ষেত্র কর্ষিত হয় নাই বলিয়া সে সকল বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে না। আগে সুবোধ কৃষক হও, আপাদ-মস্তক শরীর ঘামাইয়া ডেলা চূর্ণ কর, তাহার পরে যে বীজ বপন করিবে, তাহাই অঙ্কুরিত হইবে। এমন গুরুতর মহৎ কর্ত্তব্য তোমার সম্মুখে রহিয়াছে, এ অবস্থায় আমোদপ্রমোদ এবং বাচালতায় শক্তিক্ষয় করা কি তোমার উচিত? এ ক্ষুদ্র "পরিচয়" তোমারই ভৃত্য,—তোমারই আদেশ ঘরে ঘরে প্রচার করিতে, তোমারই পরামর্শ লইয়া অভিভাবক, শিক্ষক, এবং বালকের পরিচর্য্যা করিতে, ইহার জন্ম।

ইহাতে কি কি থাকিবে? শিক্ষার উদ্দেশ্য—মনুষ্যের সমগ্র শক্তির অবিরোধী উৎকর্ষ-সাধন। এই উদ্দেশ্য মনে করিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে যে কেহ যে কোন সরল, সরস, সংক্ষিপ্ত, অথচ সারবান্ প্রবন্ধ লিখিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। বর্ত্তমান

প্রণালীতে বিদ্যালয়ে নীতি-শিক্ষার যে বিশেষ অভাব সকলে অনুভব করিতেছেন, পরিচয় তাহাও বিস্মৃত হইবে না। বৈজ্ঞানিক আলোচনায় বালকের মনোবৃত্তি-বিকাশের বিশেষ সাহায্য হয়, অতএব সময়ে সময়ে সুন্দর সরল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও ইহাতে প্রকাশিত হইবে। শিক্ষাতে যেমন আত্মোন্নতি আছে, সেইরূপ স্বদেশ এবং স্বসমাজের নিকট গুরুতর দায়িত্বও আছে; সুতরাং দেশ এবং সমাজ সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা আমরা শিক্ষার বাহির বলিয়া মনে করি না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এ সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়ই অনুদারতা-দোষে দূষিত; আরও দুঃখের বিষয়, কেহ বা অনুদারতা দিয়াই পসার বাড়াইতে ব্যগ্র! ইহার কারণ, বাল্যাবধি এক দেশ দর্শন। যদি বাল্যকাল হইতে এসকল বিষয়ে অনুকূল এবং প্রতিকূল মতগুলি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কর্ণে প্রবেশ করে, তাহা হইলে এরূপ অনুদারতা কখনই থাকিতে পারে না। এজন্য আমরা ইচ্ছা করি, এরূপ প্রবন্ধও যেন সময়ে সময়ে পরিচয়ে স্থান পায়। কিন্তু এসম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ থাকিব, এবং প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের নাম প্রকাশ করিব। শিক্ষা-পরিচয়ে এসকল বিষয়ের অবতারণা দেখিয়া যদি কেহ আশ্চর্য্য বোধ করেন, শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আমাদের মত-দ্বৈধ আছে বুঝিয়া দুঃখিত হইব। আমরা মরিচ বেগুনের আশু-প্রসূ কৃষি করিতে বসি নাই, তাল নারিকেলের বীজবপনে আমাদের আকাঙ্ক্ষা। আর থাকিবে কি? মন্তব্য-স্তম্ভে অভিভাবক, শিক্ষক এবং বালকদিগের অভিপ্রায়, উপদেশ, পরামর্শ প্রভৃতি তাঁহাদের মনের কথা থাকিবে। প্রবন্ধগুলি পড়িলেই পাঠক বুঝিবেন, সকল গুলিই বালকদিগের জন্য নহে; শিক্ষক এবং অভিভাবকেরাও দুই একটি প্রবন্ধ পড়িয়া দেখেন আমরা এমন আকাঙ্ক্ষা করি। প্রাথমিক শিক্ষায় বালকের কর্ত্তৃত্ব বড় অধিক নহে, সে শিক্ষক এবং অভিভাবকের হাতের পুতুল মাত্র।

শিক্ষকের উপযোগিতা।

শিক্ষা-কার্য্য বড় গুরুতর ব্যাপার। যাহারা ভাল হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল, যাহারা মন্দ হইলে সমাজের অশেষ অকল্যাণ, তাহাদিগকে ভাল করিবার শক্তি শিক্ষকের হাতে, তাহাদিগকে মন্দ করিবার উপকরণ শিক্ষকের অনুপযোগিতায় বিদ্যমান। এরূপ দায়িত্ব পূর্ণ দুরূহ কার্য্যে বিনা উপযোগিতায় যাঁহারা প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগের সাহস প্রশংসা-যোগ্য হইলেও এজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে পারি না। আমরা সমাজের মঙ্গলানুরোধে অধিক সংখ্যকের স্বার্থ দেখিতে বাধ্য; সুতরাং

একজন অনুপযোগী শিক্ষকের জীবিকার অনুরোধে শত শত বালকের ভাবি জীবন বিষময় হইবে, ইহা কখন প্রার্থনীয় নহে। শিক্ষক মাত্রেরই নিজের উপযোগিতা এবং কর্ত্তব্য-বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা উচিত। সেই সকল উপযোগিতা কি, বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা তাহা একে একে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। যাঁহারা শিক্ষকতার পবিত্র ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগের নিকটে বিনীত নিবেদন, আমাদিগের আলোচনা অপূর্ণ হইলেও তাঁহারা যেন একবার বিষয়টির গুরুত্ব আত্ম-হৃদয়ে চিন্তাদ্বারা উপলব্ধি করেন।

১—স্বেচ্ছা-প্রবৃত্তি।

শিক্ষকের একটি প্রধান উপযোগিতা স্বেচ্ছা-প্রবৃত্তি। যিনি বালকদিগকে শিক্ষা দিবেন, তাঁহাকে ইচ্ছা পূর্ব্বক একার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যে কার্য্যে হৃদয়ের অনুরাগ নাই, কেবল অবস্থা ক্রমে দায়ে ঠেকিয়া, অথবা অন্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়া যে কার্য্য করিতে হয়, সে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। যে কোন বিভাগেই হউক, পদোচিত কর্ত্তব্যের সঙ্গে যখন কর্ম্মচারীর স্বার্থ মিলিয়া যায়, অথবা যখন পদোচিত কর্ত্তব্য এবং কর্ম্মচারীর স্বার্থ এক হয়, তখনই কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সুসম্পাদিত হইবার আশা করা যায়। যাহাতে স্বার্থ আছে, তাহাতে সহজেই অনুরাগ জন্মে; যাহাতে অনুরাগ জন্মে, সে কার্য্য সহজে সম্পাদিত হয়, তাহার উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হয়, ইহা প্রাত্যহিক প্রত্যক্ষের বিষয়। কৃষিকার্য্যে এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ে স্বয়ং কর্ত্তাব্যক্তি তত্ত্বাবধান না করিলে কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, লাভের পরিবর্ত্তে ক্ষতি হইতে থাকে, ইহা সকলেই জানেন। এরূপ হইবার কারণ কি? কারণ এই যে, কর্ত্তাব্যক্তি ব্যতীত অন্য কর্ম্মচারিদিগের তাহাতে স্বার্থ নাই, সুতরাং অনুরাগও হয় না। কর্ম্মচারিদিগের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা সচরাচর তেমন প্রবল নহে, সুতরাং মণিবের কার্য্যে তাঁহাদের তেমন অনুরাগ দেখা যায় না। অনুরাগ যাহা কিছু আছে, সে কেবল মাসিক বেতনের উপর। যে স্থলে কায না করিয়াও বেতনটি মাসে মাসে পাওয়া যায়, সে স্থলে এই প্রকৃতির লোকের কার্য্যানুরাগ জন্মিবার বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না।

যদি সাংসারিক বুদ্ধিতে স্বার্থের বিচার করা যায়, তাহা হইলে শিক্ষা-কার্য্যে—বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষা-কার্য্যে—শিক্ষকের অনুরাগ জন্মিবার বিশেষ কারণ পরিলক্ষিত হইবে না। মাষ্টার মহাশয়, পণ্ডিত মহাশয় এবং গুরু মহাশয়ের সম্মান প্রায় সর্ব্বত্রই সমান, তবে উনিশ বিশ মাত্র। সাধারণের মনে ইঁহাদিগের নামের সঙ্গে কেমন একটা নিরীহতা, কেমন একটা অসাংসারিকতা, কেমন একটা অকর্ম্মণ্যতা যেন জড়িত রহিয়াছে। ভাবটা বাক্যে ঠিক প্রকাশ হইতেছে না, কিন্তু একবার চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই ইহা অনুভব করিতে পারিবেন। অবশ্য উচ্চ পদের এবং মোটা বেতনের শিক্ষকদিগকে এ গণনার বাহিরে ধরা যাইতে পারে। বালক-

দিগের বুদ্ধি বৃত্তি মার্জ্জিত করিবার ভার যাঁহাদিগের হস্তে, তাঁহারা সাধারণের নিকট নির্ব্বোধ বলিয়া পরিচিত—বিধাতার এ কি বিড়ম্বনা! লেখকের একজন সহযোগী একদা বলিয়াছিলেন, ক্রমান্বয়ে বার বৎসর শিক্ষকের কার্য্য করিলে মানুষ গাধা হইয়া যায়; তিনি বার বৎসরের অধিক হইল শিক্ষকের কাযে আছেন, সুতরাং এখন তিনি গর্দ্দভ সংজ্ঞায় অসম্মত হইতে পারেন না। দীর্ঘকাল শিক্ষা কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার বটে! আর একজন ভদ্রলোক শিক্ষকের কার্য্য করিতেছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর একজন উকীল; জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে লিখিলেন, "আমি পুনঃ পুনঃ তোমাকে বলিলাম, অবিলম্বে ওকালতী পরীক্ষাটি দেও; কিন্তু তুমি তাহা শুনিলে না, ওকালতীর আগে মাষ্টারীতে লাগিলে। যদি আগেই মাষ্টারী করিয়া বুদ্ধিটির মাথা খাইলে, তবে কি সম্বল লইয়া ওকালতী করিবে?" অন্য একজন শিক্ষক এক সময়ে রেল-পথে এক স্থানে যাইতেছিলেন, গাড়ীতে একজন সহযাত্রী ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। ভদ্রলোকটি মাষ্টার বাবুর আলাপে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া তাঁহার কাযকর্ম্মের কথায় যখন জানিতে পারিলেন তিনি মাষ্টারী করেন, তখন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়! আপনি লেখাপড়া শিখিয়া মাষ্টারী করেন?" যেন মাষ্টারীটা মূর্খলোকেরই উপযুক্ত কায! আর অধিক দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন; শিক্ষক মাত্রেই অল্প বা অধিক পরিমাণে এ গুলি নিজ নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

সাধারণের মনে শিক্ষকদিগের প্রতি এরূপ ভাব হইবার কয়েকটি কারণও আছে। শিক্ষকেরা সর্ব্বদা বালকদিগের সংসর্গে থাকিয়া কালে অনেকটা বালকত্ব প্রাপ্ত হন, সংসর্গের দোষ সম্পূর্ণরূপে ছাড়াইতে পারেন না। বালকেরা সাংসারিকতা-শূন্য এবং গাম্ভীর্য্যহীন, এজন্য সাধারণে প্রায়ই তাহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। অনেক শিক্ষকের চরিত্রে বালকদিগের এ দুইটি দোষ অতি সহজেই সংক্রামিত হইয়া পড়ে, এজন্য সাধারণেও তাঁহাদিগকে ঠিক অবজ্ঞার চক্ষে না দেখুন, বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষেও দেখিতে পারেন না।

সাধারণের চক্ষে শিক্ষকের প্রতি অশ্রদ্ধার আর একটি কারণ, শিক্ষক শ্রেণীর দরিদ্রতা। জমিদার-বাড়ীতে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে যে চাকুরী করে, তাহার মনে যে স্ফূর্ত্তিটুকু আছে, পরিচ্ছদে যে চটক টুকু আছে, পনর টাকা বেতনের একজন শিক্ষকেরও সে টুকু নাই; কেন না, শিক্ষকের উপরি কিছুই নাই,—যদি কিছু উপরি থাকে, সে কেবল বালকের অভিসম্পাত এবং অভিভাবকের ধমক। বাহিরের ভড়ক সভ্যতার প্রধান সম্পত্তি; এ সম্পত্তি যাহার নাই, সে সাধারণের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না। কোন কোন শিক্ষক এ সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারিলেও অর্থাভাবে কাযে তাহা পরিণত করিতে পারেন না। অন্য ব্যবসায়িগণ যখন বাসা খরচ চালাইতে অক্ষম, তখনও বাহিরে প্রকাশ, খরচ পত্র বাদে মাসিক বিলক্ষণ দশটাকা থাকিতেছে। শিক্ষক মহাশয়ের ইচ্ছা

হইলেও সে পক্ষে কাঁটা, কারণ, তাঁহার জমা খরচের হিসাব সাধারণের নখাগ্রে।

যাঁহাদের অবস্থা এরূপ শোচনীয়, তাঁহারা যে, দায়ে না ঠেকিলে ইচ্ছা পূর্ব্বক শিক্ষকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা অসম্ভব। তবে যদি দেশের ধন-কুবেরগণ শিক্ষিত হইয়া শিক্ষাকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন, অথবা শিক্ষকদিগের আর্থিক অবস্থা উন্নত করিবার কোন বিশেষ উপায় উদ্ভাবিত হয়, তাহা হইলে এ দুর্দ্দশা দূর হইতে পারে। কিন্তু ইহা কি সম্ভব? চারিযুগে চারি মহাদেশের মধ্যে কোথাও কখন যাহা হয় নাই, বর্ত্তমান সময়ে তাহার আশা কি যুক্তি-সঙ্গত? আল্‌ফ্রেড বা পিটারের মত মহাত্মা সকল দেশের ভাগ্যে সকল সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন না। ভারতের মহর্ষিগণ সকলেই শিক্ষক ছিলেন, কাহারাও আশ্রম শিষ্য-শূন্য ছিল না, কিন্তু তাঁহারা সকলেই দরিদ্র; ষষ্টি সহস্র শিষ্য-সমেত মহামুনি দুর্ব্বাসা যে ভিক্ষা করিতেন, হিন্দুমাত্রেই এ কথা জানেন। আজও সেই মুনিদিগের স্থলাভিষিক্ত যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধ্যাপনা কার্য্যে জীবন যাপন করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই দরিদ্রতার জন্য প্রসিদ্ধ, ধনের জন্য কেহই প্রসিদ্ধ নহেন। রাজা, মহারাজা, রায় বাহাদুর, ধনী, বড় লোক পূর্ব্বকালেও ছিলেন, এখনও আছেন; বরং পূর্ব্বাপেক্ষা এইক্ষণে ইহাঁদিগের সংখ্যা অনেক অধিক; কিন্তু ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ কখন শিক্ষা কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, এ কথা তখনও শুনা যায় নাই, এখনও শুনিতে পাওয়া যায় না।

কেবল ভারত-বর্ষে নহে; পার্থিব উন্নতির আদর্শ-স্থল ইউরোপেও এই কথা। পিথাগোরাস্, সক্রেটিস্, প্লেটো, আরিষ্টোটল্ প্রভৃতি যে সকল মহাত্মা সর্ব্বপ্রথমে ইউরোপ-ক্ষেত্রে জ্ঞানের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই বিশেষ ধনী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন না। বলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব দশ সহস্র শিষ্যের অধ্যাপক ইর্নিরিয়স্, পারিস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অলঙ্কার ত্রিশ সহস্র শিষ্যের অধ্যাপক লম্বর্ডস্, অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অমূল্য রত্ন সহস্র সহস্র শিষ্যের অধ্যাপক এড্‌মণ্ড রিচ, ইঁহারা সকলেই দরিদ্র ছিলেন। কথিত আছে, রিচ্‌কে কোনও শিষ্য ইচ্ছা পূর্ব্বক কখনও যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দিলে তিনি "ভস্মেতে ভস্ম এবং ধূলিতে ধূলি" এই বলিয়া তাহা অতি অনাদরে জানালার কাছে ফেলিয়া রাখিতেন, কখন কখন আবার দুষ্ট বালকেরা উহা অলক্ষিত ভাবে লইয়া যাইত।

বাস্তবিক প্রকৃত জ্ঞানের আস্বাদ যাঁহারা উপভোগ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই মহাত্মার ন্যায় পার্থিব ধনে অনাস্থাবান্। যাঁহারা স্বর্গীয়, অমূল্য, অপার্থিব, অনন্তকালস্থায়ী জ্ঞান ধনে ধনী, তাঁহারা যে পৃথিবীর সোণারূপাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন, ইহা ত নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, আজ কাল আর তেমন উচ্চ আদর্শের শিক্ষক নাই। বর্ত্তমান সময়ে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ এই অমূল্য রত্নটি হারাইতে বসিয়াছে। এখন দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য

দশ রকম ব্যবসায়ের মত শিক্ষকতাও একটি ব্যবসায়; অর্থলাভই ইহার মূল উদ্দেশ্য!

বাস্তবিক এই আর্থিক অল্পতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিবার উপযুক্ত শক্তি যদি হৃদয়ে থাকে, তাহা হইলে শিক্ষকতায় অনুরাগ জন্মিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। সাধারণে শিক্ষককে তেমন শ্রদ্ধা না করুন, তাঁহাকে নির্দ্দোষ নিরীহ ভদ্র লোক বলিয়া অবশ্যই জানেন; মনুষ্যের পক্ষে ইহার অধিক সম্মানের কথা আর কি হইতে পারে? অন্য বিভাগে প্রবেশ করিলে পদে পদে পতনের সম্ভাবনা, প্রলোভনের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তবে নির্দ্দোষ নিরীহ ভাল মানুষ হইয়া থাকিতে হয়, কিন্তু শিক্ষা-কার্য্যে ভাল হইয়া থাকিবার পক্ষে সকলই অনুকূল, কিছুই প্রতিকূল নহে; এমন বিশুদ্ধ সুখের ব্যবসায় আর কি আছে? জ্ঞানের আদান প্রদানই শিক্ষকের ব্যবসায়; তিনি অতীত এবং বর্ত্তমান জ্ঞানিগণের নিকট হইতে জ্ঞান-ধন যত্নে গ্রহণ করিয়া নিজে ধনী হইতেছেন, আবার উপযুক্ত পাত্রে তাহা বিতরণ করিয়া দ্বিগুণ সুখ উপভোগ করিতেছেন; যে সৎসঙ্গ জগতে এত দুর্লভ, তাহা শিক্ষকের নিকটে সর্ব্বদা সুলভ,—পাপ-স্পর্শ-পরিশূন্য বালক এবং পাপ-রোগ-চিকিৎসক জ্ঞানী গ্রন্থকার, এ উভয়ই তাঁহার নিত্য-সহচর; শিক্ষক ব্যতীত এত সৌভাগ্য আর কাহার? যে দুঃস্থ সমাজের উদ্ধারের জন্য, যে নিদ্রিত জাতিকে জাগাইবার জন্য, যে পতিত জাতিকে উন্নত করিবার জন্য শক্তিশালী মহাত্মাগণ আকাশ ভেদিনী বক্তৃতা করিয়াও কিছু করিতে পারিতেছেন না, সেই দুরূহ ব্রত সাধনের ভার এই অর্থ-দরিদ্র শিক্ষকদিগের হাতে; ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয়ও অনুরাগ উদ্দীপিত হইবার উৎকৃষ্টতর সুযোগ আর কি হইতে পারে?

শিক্ষকগণ! আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন, এ সকল স্বার্থ শিক্ষা-কার্য্যে আপনাদের অনুরাগ জন্মাইবার পক্ষে প্রচুর কি না। যদি প্রচুর না হয়, তবে মিছাকষ্ট পান কেন? শিক্ষা-কার্য্য আপনাদের ধন-তৃষা পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে না, ধনের পথ অন্যত্র খুঁজিতে হইবে। আর যদি প্রচুর মনে করেন, তবে সিদ্ধিদাতা ঈশ্বরের নাম লইয়া মনে প্রাণে কর্ত্তব্য কার্য্যে লাগিয়া পড়ুন, আর বৃথা চিন্তায় সময় নষ্ট করিবার অবসর নাই। আপনাদের ব্রত বড় উচ্চ, বড় গুরুতর; ইহার স্বস্তিবাচনেই স্বার্থ-ত্যাগ, আত্মোৎসর্গ; ইহার ফল স্বদেশের, স্বজাতির দুর্গতি-নাশ। মনে যেন থাকে, আজ বঙ্গীয় বালক জগৎ সমক্ষে নাস্তিক, উচ্ছৃঙ্খল এবং দুর্নীত বলিয়া ভয়ানক অভিযোগে অভিযুক্ত। আমরা আশা করি, এরূপ ভয়ানক অভিযোগ প্রমাণীকৃত হইতে পারে, আমাদের মাতৃ-ভূমির এমন দুর্দ্দিন এখনও উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু বলা যায় কি? যদি প্রমাণ হইয়া যায়, তবে আপনাদিগের বড় গৌরবের কথা নহে। যাঁহাদের ছাত্রেরা নাস্তিক, উচ্ছৃঙ্খল এবং দুর্নীত, তাঁহাদের প্রতি কিরূপ গুরুদক্ষিণার ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহা আপনারাই কল্পনা করিয়া লইবেন। যিনি স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত না হন, তিনি কখনই এরূপ গুরুতর কার্য্যের উপযোগী হইতে পারেন না।

আমরা।

আমরা কে? এই যে আমাদের দেশে কোটী কোটী নরনারী, কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান, কেহ শিখ, কেহ জৈন, কেহ পারসী, কেহ খৃষ্টান—এই যে নানা জাতির নানা ধর্ম্মের, নানা ভাষার কোটী কোটী লোক; এ সকলই কি আমরা? কিম্বা "আমরা" এই কথাটী বলিলে কি কেবল বাঙ্গালীকেই বুঝায়, অথবা "আমরা" এই কথাটী বলিলে কেবল হিন্দুকেই বুঝায়, মুসলমানকে বুঝায় না?

আমরা কে? কথাটা খুব ছোট, কথাটা শুনিতে খুব সহজও বটে; কিন্তু এই সোজা একটী ছোট কথার অর্থের উপর সমুদায় ভারতবর্ষের ভাল মন্দ নির্ভর করিতেছে; আর পৃথিবীর বড় বড় দেশ,—ইউরোপ আমেরিকার লোকেরা, এই কথাটার আমরা কি অর্থ করিতেছি, তাই হা করিয়া দেখিতেছে।

বিন্দু বিন্দু করিয়া আকাশ হইতে যখন বৃষ্টি পড়ে, সেই বৃষ্টির ধারাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা খুব সোজা কথা, কিন্তু সেই বিন্দু বিন্দু জল রাশি রাশি মিলিয়া যখন পদ্মার তরঙ্গের মত, অথবা অগাধ সমুদ্রের মত আকার ধারণ করে, তখন আর তাহাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা পোষায় না;—বিন্দু বিন্দু জলের প্রবল বেগে গ্রাম নগর ভাসিয়া যায়।

এক একটী বালুকাকণা দেখিতে খুব ছোট, অতি সামান্য, অতি তুচ্ছ পদার্থ। পথিক তাহাকে গ্রাহ্য করে না, তুমি আমি তাহাকে পদতলে দলিত করি; কিন্তু কোটী কোটী বালুকাকণা রাশীকৃত হইয়া যখন গগনস্পর্শী হিমালয়ের উচ্চচূড়ার মত আকার ধরে, তখন আর তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে পারি না।

পৃথিবীর নিয়মই এই যে, যত পৃথক্ পৃথক্ থাকিবে ততই দুর্ব্বল, যত ঘনিষ্ঠতা বাড়িবে, ততই বলবান। গুচ্ছ গুচ্ছ দুর্ব্বাঘাস পাকাইয়া সেই দড়িতে মত্তহস্তীকে বাঁধিয়া রাখে। সুতরাং দলেই বল, একাকী থাকাই পৃথিবীতে দুর্ব্বলতার কারণ।

আমরা কি বিন্দু বিন্দু জল—কাহার সঙ্গে কাহারও সম্বন্ধ নাই? কিম্বা আমরা—সকলেই এক সঙ্গে মিলিয়া মহাসাগরের মত গম্ভীর, বলীয়ান, অগাধ অতলস্পর্শ হইতেছি; এই কথাটা আজ আমরা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিব।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে কেমন সদ্ভাব ছিল, তাহা এখনও অনেকের মনে আছে। এখন সে দিন, সে অবস্থা, সেই ভিন্নভাব, ক্রমেই দূর হইতেছে। দিনে দিনে লোকে লেখাপড়া শিখিতেছে—যদিও হিন্দু মুসলমান দুইটী ভিন্ন ভিন্ন জাতি, যদিও তাহাদের ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন, আচার ব্যবহার পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু এক সঙ্গে লেখাপড়া শিখিয়া, এক সঙ্গে কায কর্ম্ম করিয়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বন্ধুতা দিন দিন বাড়িতেছে। ধর্ম্মে তাহারা পৃথক, কিন্তু বন্ধুতায় তাহারা এক হইতেছে;

জাতি এবং বংশে তাহারা পৃথক্, কিন্তু শিক্ষায় তাহারা সমান পদবী লাভ করিতেছে। এই যে দুই জাতির বন্ধুতা, দুই জাতির মিলন, ইহার ফল বড়ই সুন্দর।

এক সময়ে এদেশে মুসলমান রাজা ছিল, হিন্দু প্রজা ছিল,—এখন সে দিন আর নাই। এখন রাজা প্রজা সমভাবে ইংরেজ রাজত্বে বাস করিতেছে; এখন হিন্দুর যে সুখ, যে দুঃখ, মুসলমানেরও তাই—কিছুই পৃথক্ নাই। বরং হিন্দুরা বিদ্যায় বুদ্ধিতে ধনে মানে অনেকে বড়, মুসলমানের মধ্যে অনেকেই লেখাপড়া জানে না,—দরিদ্র কৃষিব্যবসায়ী। এই অবস্থায় হিন্দু মুসলমান আর পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে চলিতে পারে না। হিন্দুর দুঃখে যদি মুসলমান দুঃখিত না হয়, কিম্বা মুসলমানের বিপদে যদি হিন্দু সাহায্য না করে, তবে আর অন্য উপায় নাই। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব দিন দিন বৃদ্ধি হওয়া সেই জন্য শুধু সুন্দর নয়—নিতান্ত আবশ্যক। পঞ্চাশ বৎসর আগে "আমরা" বলিলে যদি কেবল "হিন্দুকেই" বুঝাইত, এখন আর সে অর্থ থাকিতে পারে না। এখন "আমরা" এই কথাটী বলিলেই হিন্দু মুসলমান দুই জাতিকেই বুঝিতে হইবে।

যেমন হিন্দু মুসলমানের কথা বলিলাম, সকল জাতির সকল ধর্ম্মের সম্বন্ধেই সেই কথা খাটে। ধর্ম্মে—আমরা পৃথক্, জাতিতে আমরা ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারি, তার উপর আমাদের হাত নাই। আমি মুসলমানের ঘরে জন্মিয়াছি, তুমি না হয় হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আমি খুব মূর্খ, খুব গরীব, তুমি না হয় পরমেশ্বরের কৃপায় খুব পণ্ডিত, খুব ধনী। কিন্তু তুমি ও আমি যখন একদেশে বাস করিতেছি, এক রাজার প্রজা হইয়াছি, এক শাসনে শাসিত হইতেছি, তখন আর ভিন্ন ভাব কোথায়? তুমি বড়লোক, তুমি না হয় ১ম শ্রেণীর গাড়িতে চড়িয়া কলিকাতায় যাইতেছ, আমি গরীব, আমি না হয় নীচের শ্রেণীর গাড়িতে চড়িয়া কলিকাতায় যাইতেছি; কিন্তু ভাবিয়া দেখ, দুই জনেই যাইতেছি—এক স্থানে। আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। তুমি বড়লোক, তুমি না হয় সোণার পিঞ্জরে আছ, আমি বড় গরীব, আমি না হয় লোহার খাঁচায় পচিয়া মরিতেছি; কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়?—তুমিও বন্দী আমিও বন্দী। আমাদের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। যদি দুইজনেই সমান দুঃখের অংশভাগী, দুইজনেই যদি সমান কষ্টে থকিতে হইল, তবে আর পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়া আমি তোমাকে দেখিয়া হাসিতে পারি না, তুমিও আমার দুঃখ দেখিয়া তাচ্ছিল্য করিতে পার না। সেই জন্যই ত বলি আর সে দিন নাই, এখন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই না থাকিয়া ভাই ভাই একঠাঁই হওয়া খুব প্রয়োজন। "আমরা" এই কথাটার অর্থ আগে যাহাই কেন থাকুক না, এখন "আমরা" এই কথাটী বলিলে সকলকেই বুঝায়—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, পারসী, শিক, জৈন—সব আমরা। যে যে আমার সুখ দুঃখের সমান অংশভাগী, সে যে জাতিই হউক, সেই আমার আপনার জন।

বাঙ্গালা, বিহার, পঞ্জাব, রাজস্থান, বোম্বাই, মান্দ্রাজ দেখিতে গেলে অনেক

দূরদেশ; ইউরোপ হইলে এই সকল দেশ বিদেশ বলিয়া পরিগণিত হইত। ভারতবর্ষ যেমন বিস্তীর্ণ দেশ, তাহার প্রদেশগুলিও সেইরূপ দূরে দূরে অবস্থিত। এই দূরত্বের জন্য এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের লোকের সঙ্গে সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ করিতেও পারে না। এক ভাই চট্টগ্রামে আর এক ভাই পেশোয়ারে থাকিলে যেমন তাহারা নিতান্ত আত্মীয় হইলেও দেখা সাক্ষাৎ অভাবে অনেক পরিমাণে তফাৎ তফাৎ বোধ হয়, ঠিক সেইরূপ, যদিও আমরা ভাই ভাই, যদিও আমরা সমান সুখ দুঃখভাগী, তথাপি এত বেশী দূরে দূরে আমরা বাস করি যে, সহজে সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ হয় না, আমরা প্রকৃতপক্ষে আত্মীয় হইতে ইচ্ছা করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এক হইতে চেষ্টা করিলেও, এই দূরত্বের জন্য তাহা হইতে পারে না। এই অভাব এখন কতক পরিমাণে দূর হইতেছে। রেলগাড়ীর কল্যাণে এখন এক সপ্তাহের পথ এক দিনে যাওয়া যায়। ভারতবর্ষের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত ইচ্ছা করিলে, চেষ্টা করিলে, কতকটা সহজেই এখন বেড়াইয়া আসিতে পারা যায়। সুতরাং শিক্ষায় সকল জাতি সমান উন্নত হওয়ার, পর্য্যটনে সকল প্রদেশ সমান পরিদর্শন করার, এখন যেরূপ সুবিধা হইয়াছে, সেই পরিমাণে সকল প্রদেশের সকল জাতির মধ্যে একতার ভাব, বন্ধুতার ভাব বাড়িতেছে; এখন আর আমরা বলিলে কেবল বাঙ্গালীকে কিম্বা কেবল হিন্দুকে বুঝাইতে পারে না। আমরা বংশগত বা ধর্ম্মগত কিম্বা ভাষাগত এক মহাজাতি হইবার আশা করি না, তাহা হইবার সম্ভাবনা সুদূর ভবিষ্যতেও নাই। ইংলণ্ড কখনও ভারতবর্ষ হইবে না, ভারতও কখন ইংলণ্ড হইতে পারে না। তথাচ ইংলণ্ড ভারতে বন্ধুতা হইতে পারে, একতা হইতে পারে, রাজা প্রজা সম্বন্ধ হইতে পারে; ইহা যদি সম্ভব হয়, সমুদ্রবেষ্টিত সুদূর ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী ইংরাজ যদি ভিন্নভাষী, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্ন জাতীয় কোটী কোটী ভারতবাসীর রাজা ও প্রতিপালক হইতে পারেন, তবে কি দেশে থাকিয়া ভাই ভাই মিলিয়া এক রাজনৈতিক জাতি হইতে পারিব না? "আমরা" বলিতে এখন সেই মহান্ রাজনৈতিক জাতি বুঝিতে হইবে এবং যাহাতে আমরা প্রকৃত পক্ষে "আমরা" হইতে পারি, তাহাই বর্ত্তমান সময়ের রাজনৈতিক মহাব্রত!

ভাষা-বিবেক।

বর্ণ-পরিচয়।

দেবদাস। সুশীল! তুমি লেখাপড়া শিখিবে?

সুশীল। শিখিতে পারি, যদি আমায় মারেন।

দে।—আচ্ছা মারিব না। বল দেখি লেখাপড়া শিখিতে কি কি লাগে?

সু। কেন, কালি, কলম, কাগজ, বই, দোয়াত, পাঠশালা, গুরুমহাশয়,—এই সব লাগে।

দে। হাঁ তাই বটে। আচ্ছা, যে সকল জিনিসের নাম করিলে, সে সবগুলি চিন?

সু। চিনি বইকি। এই ত দোয়াত, কলম, কাগজ, বই, এসব এখানে আপনার কাছেই আছে।

দে। 'কলম' এই কথাটি কেমন করিয়া লিখিতে হয়, শিখিবে?

সু। হাঁ শিখিব, একবার দেখাইয়া দেন।

দে। বেশ মনোযোগ করিয়া দেখ। (শ্লেটের উপরে ঠিক ছাপার মত লিখিয়া) এই দেখ ক ল ম। বল দেখি ইহাতে কয়টা অক্ষর আছে?

সু। তা কেমন করিয়া বলিব? অক্ষর কাহাকে বলে?

দে। তা বটে। আচ্ছা বলিয়া দিতেছি, ভাল করিয়া বুঝিয়া মনে রাখ। 'কলম' এই কথাটার মধ্যে এই দেখ ক একটি অক্ষর, ল একটি অক্ষর, আর ম একটি অক্ষর; অর্থাৎ প্রথম অক্ষরটি ক, মধ্যের অক্ষরটি ল, আর শেষের অক্ষরটি ম। এখন বলিতে পার সবশুদ্ধ কয়টি অক্ষর আছে?

সু। দেখি। ক, ল, ম; এক, দুই, তিনটি অক্ষর আছে।

দে। হাঁ ঠিক বলিয়াছ। এখন বলিতে পার কোন্‌টি কি অক্ষর?

সু। তা আর কঠিন কি? সে কথা ত আপনিই বলিয়া দিয়াছেন—প্রথমটি ক, মধ্যেরটি ল, আর শেষেরটি ম।

দে। আচ্ছা মনে কর, ক অক্ষরটি যদি কলম ছাড়া আর একটা কথার মধ্যে থাকে, তাহা কি চিনিয়া লইতে পারিবে?

সু। তা কেমন করিয়া বলিব?

দে। আচ্ছা মনে কর, এই কলমটা দোয়াতের কাছে আছে; যদি এখান হইতে সরাইয়া তোমার একটা খেলনার সঙ্গে রাখিয়া দেই, তাহা হইলে কি চিনিতে পারিবে না?

সু। তা কে না পারে? যার চোখ আছে, সেই খেলনা হইতে কলমটা বাছিয়া লইতে পারে।

দে। অক্ষর সম্বন্ধেও তাই। একটা অক্ষর একবার ভাল করিয়া চিনিয়া লইতে পারিলে, সে অক্ষরটা যেখানেই থাকুক না কেন তুমি দেখিলেই চিনিবে।

সু। বটে! আচ্ছা আপনি আর একটা

কথা লিখুন দেখি, আমি এই অক্ষর তিনটা সে রকম করিয়া চিনিতে পারি কি না।

দে। (শ্লেটে ঠিক ছাপার মত 'কলস' শব্দটি লিখিয়া) বল দেখি ইহাতে তোমার জানা অক্ষর কিছু আছে কি না?

সু। এ সবই ত জানা, ক, ল,—ও বাবা! এটা ত জানি না! শেষের অক্ষর টা কি?

দে। শেষের অক্ষরটার নাম দন্ত্য স।

সু। ঁ—আমি এত বড়টা বলিতে পারি না।

দে। ভয় পাইতেছ কেন? একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেই বুঝিবে কঠিন কিছুই নয়। যাহা একবারের যত্নে চিরদিনের জন্য জনা যায়, তাহাতে কি ভয় পাইতে আছে?

সু। আবার বলুন তবে, চেষ্টা করিয়া দেখি।

দে। দন্ত্য স।

সু। দন্ত স।

দে। ঠিক হইল না, দন্ত্য স।

সু। দন্তীয় স।

দে। কতকটা হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও ঠিক হয় নাই। আচ্ছা, আমি ৫। ৭ বার বলিতেছি, তুমি বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিয়া যাও, দন্ত্য স, দন্ত্য স, দন্ত্য স, দন্ত্য স। এখন একবার চেষ্টা করিয়া দেখ দেখি?

সু। দন্ত্য স। হইল?

দে। বেশ, বেশ হইয়াছে। তুমি আগেই কঠিন বলিয়া এত ভয় পাইয়াছিলে কেন?

এখন একবার এই কথাটা পড় দেখি?

সু। আমি পড়িতে জানি না; কেমন করিয়া পড়িতে হয়?

দে। যেমন করিয়া 'কলম' পড়িয়াছ। অক্ষর গুলি যেমন দেখিবে, অমনি এক এক করিয়া মুখে বলিয়া গেলেই পড়া হইল।

সু। এরই নাম পড়া! আচ্ছা তা পড়িতেছি, কল দন্ত্য স।

দে। হইল না, আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। পড়িবার সময়ে দন্ত্য স এর 'দন্ত্য' কথাটা না বলিয়া কেবল 'স' বলিতে হইবে।

সু। আচ্ছা তা পারিব, কল (দন্ত্য) স।

দে। তাও হইল না।

সু। কেন, 'দন্ত্য' কথাটা কি মনে মনেও বলিতে হইবে না? কেবল কলস বলিলেই চলিবে? তবে মিছামিছি 'দন্ত্য' কথাটা দিয়া কায কি; কেবল স বলিলেই ত চলিতে পারিত?

দে। হাঁ, যদি আর কোন রকম স না থাকিত, তাহা হইলে কেবল স বলিলেই চলিতে পারিত; কিন্তু আরও দুইটি স আছে, তাহা হইতে পৃথক্ করিয়া চিনিবার জন্য 'দন্ত্য' কথাটা বলিতে হয়। মনে কর, তুমি সুশীল ঘোষ, আবার রায়দের বাড়ীতে এক সুশীল রায় আছে। তোমরা দুই জনে খেলা করিতেছ, এমন সময়ে গ্রামের আর একজন লোক 'সুশীল' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। এখন তোমাদের দুই জনের মধ্যে কে উত্তর করিবে? কিন্তু যদি সে সুশীল ঘোষ বলিয়া ডাকে, তাহা

হইলে তুমিই উত্তর করিবে, আবার সুশীল রায় বলিয়া ডাকিলে তোমার সঙ্গী উত্তর করিবে, তুমি চোপ করিয়া থাকিবে; কেন না, রায় বা ঘোষ বলিয়া উল্লেখ করিলে কোন্ সুশীলকে ডাকিতেছে, তাহার পরিচয় নামের সঙ্গেই রহিল। কিন্তু তোমার ঘরে যখন অন্য কোন সুশীল থাকে না, তখন তোমার মা কি তোমাকে 'সুশীল ঘোষ বলিয়া ডাকেন?

সু। তা কেন ডাকিবেন? তিনি সুশীল বলিয়া ডাকিলেই বুঝিতে পারি আমাকেই ডাকিতেছেন।

দে। সেইরূপ অন্য স হইতে পৃথক্ করিবার জন্যই এই 'স' টির 'দন্ত্য' বলিয়া পরিচয় দিতে হয়; কিন্তু পড়িয়া যাইবার সময়ে এরূপ পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই, কেবল স বলিলেই হয়।

সু। বাপরে! এই সব অক্ষরের মধ্যে এত কথা জানিবার আছে! আমি ত এত দিন ও গুলাকে কেবল হিজি বিজি কালির আঁচড়ই মনে করিতাম।

দে। লেখা পড়া যত অধিক শিখিবে, ততই দেখিতে পাইবে এই সকল আঁচড়ের মধ্যে কত বুঝিবার কথা আছে; আর তাহা বুঝিতে পারিলে কত সুখ হয়।

সু। বাস্তবিক এই কয়টি অক্ষর শিখিয়া আমার যেন একটুকু আমোদ বোধ হইতেছে। আজ আর নূতন কিছু শিখিব না; যাহা শিখিলাম, তাই মনে মনে ভাবি।

দে। আচ্ছা এখন আর শিখিবার কায নাই, একটুকু খেলা কর গিয়া। কিন্তু দেখিও, যাহা শিখিলে, তাহা যেন ভুলিয়া না যাও।

ছাত্রোপদেশ।

১—অভ্যাস।

গ্রীসদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পিথাগোরাস বলিয়াছেন, "যাহা তোমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহাই তুমি আরম্ভ কর, অভ্যাস ইহাকে অতি সুখপ্রদ করিয়া দিবে।" বাস্তবিক সকল কাযই অভ্যাস করিবার পূর্ব্বে বড় কঠিন থাকে, কিন্তু একবার অভ্যাস হইয়া গেলে তাহা আর তেমন কঠিন বোধ হয় না।

কিন্তু অনেক কাযেই প্রথম অবস্থায় অভ্যাস বড় কষ্টকর। খেলা ছাড়িয়া, আমোদ প্রমোদ ছাড়িয়া, দুষ্ট বালকের সঙ্গ ছাড়িয়া লেখাপড়া অভ্যাস করা যে কি কষ্টকর, তাহা বালকমাত্রেই অবগত আছে। বর্ণমালা শিখিবার সময়ে বালকের চক্ষের জল এবং মুখের বিরক্তি-ব্যঞ্জক মলিনতার আর কোনই অর্থ নাই, কেবল এই অনভ্যাসের

কাষ দেখিয়া মনে মনে ভয় ও কষ্ট বোধ। বালক শিশুশিক্ষা হাতে লইয়া যখন শিক্ষকের নিকট দাঁড়ায়, তখন ঠিক যেন বন্দীর ন্যায় তাহার মনের অবস্থা। সে সময়ে যদি সে পুস্তক রাখিয়া শ্রম-সাধ্য কিছু করিবার আদেশ পায়, তবে তাহার আর আনন্দের সীমা থাকে না, তাহার মুখের চেহারার আর প্রফুল্লতা ধরে না;—যেন সে ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছিল, হঠাৎ দৈবানুগ্রহে কয়েক মিনিটের জন্য বাঁচিয়া গেল!

কিন্তু অভ্যাসের কেমন গুণ দেখ, এই বালক অভ্যাসের প্রথমাবস্থার ভয় এবং কষ্ট অতিক্রম করিয়াছে। এখন সে বৃদ্ধ; তাহার এখন আর কিছুতেই রুচি নাই, কেবল মাত্র পুস্তক পাঠেই তাহার আনন্দ। পড়িতে পড়িতে বৃদ্ধের জ্ঞানের সঙ্গে, পুণ্যের সঙ্গে, সাধুতার সঙ্গে, ধর্ম্মের সঙ্গে এমন অনুরাগ জন্মিয়া গিয়াছে; মানবহিতৈষী পুণ্যাত্মা গ্রন্থকারদিগের সঙ্গে তাহার এমন আত্মীয়তা জন্মিয়া গিয়াছে যে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া সে থাকিতে পারে না। তুমি হয়ত মনে করিতেছ, বৃদ্ধ বুঝি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, দাশরথির পাঁচালী বা বঙ্কিম চন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী পড়িয়া আমোদ পাইয়াছে, তাই সে বই ছাড়িতে চাহিতেছে না। কিন্তু তা নয়,—হয়ত বৃদ্ধ এ সব বইয়ের নামই জানে না। সে যাহা পড়িতেছে, তাহাতে আমোদের কথা, হাসির কথা কিছুই নাই, অথচ তাহাতেই তাহার আনন্দ। দেখ অভ্যাসের কেমন গুণ। বাল্যকালে যে পুস্তক দেখিলেই ভয় পাইত, অভ্যাসের গুণে তাহার এমন হইয়াছে যে পুস্তক না পড়িলে সে থাকিতে পারে না; পড়া ছাড়িয়া স্নান, আহার এবং নিদ্রাতে যে সময়টুকু ব্যয় না করিলে চলে না, তাহাও তাহার নিকট যেন অপব্যয় বলিয়া বোধ হয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে বৃদ্ধদের মধ্যে গ্রন্থপাঠে এরূপ অনুরাগী লোক অতি অল্পই পাওয়া যায়। আমাদের দেশে যাহারা লিখা পড়া শিখে, তাহাদের উদ্দেশ্য চাকুরী করিয়া ধন উপার্জ্জন করা,—জ্ঞানের জন্য, মনুষ্যত্বের জন্য অতি অল্প লোকেই লেখা পড়া শিখিয়া থাকে। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, যাহারা কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছে, একটা চাকুরী পাইলেই তাহারা গ্রন্থপাঠ একেবারেই ছাড়িয়া দেয়, আফিসের কায কর্ম্ম সারিয়া যেটুকু অবসর পায়, তাহা তাস পাশা এবং আমোদ প্রমোদেই নষ্ট করে। কিন্তু ইউরোপের অনেক পণ্ডিতেরই অধ্যয়নে আশ্চর্য্য অনুরাগ দেখা যায়। কথিত আছে, ইটালী দেশীয় পেট্রার্ক নামক একজন পণ্ডিত অধ্যয়নে এত অনুরক্ত ছিলেন যে, পীড়া হইলেও তিনি পুস্তক পাঠ ছাড়িতেন না। একবার তাঁহার রোগ হইলে তাঁহার আত্মীয়েরা জোর করিয়া তাঁহাকে পুস্তক পাঠ হইতে নিবৃত্ত করেন। ইহাতে তাঁহার রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে থাকে; পরে যখন চিকিৎসায় আরাম হইল না, তখন তাঁহাকে পুস্তক দেওয়া হইল, এবং তিনি বিনা চিকিৎসায় কেবল পুস্তক পড়িয়াই স্বাস্থ্যলাভ করিলেন।

বাজিকরদিগের কাণ্ড কারখানা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। সার্কাস ন্যুমে যে সকল বাজিকর দল শীতকালে কলিকাতায় আসিয়া সাধারণ লোককে নানারূপ তামাসা দেখাইয়া মোহিত করে, তাহাদের তামাসা যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন, অভ্যাসের গুণে অতি কঠিন কাযও কেমন সহজ হইতে পারে।

অভ্যাসকে চারিটি অবস্থায় বিভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম, কষ্টকর অবস্থা। অনভ্যস্ত বিষয়ে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলে এই অবস্থা অনুভূত হয়। দ্বিতীয় সহজ অবস্থা। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলে সকল কাযই ক্রমে সহজ হইতে থাকে; তখন আর তেমন কষ্ট বোধ হয় না, বরং কার্য্যটিকে সম্পূর্ণ করিতে আরও ইচ্ছা হয়। তৃতীয় সুখকর অবস্থা। যখন কার্য্যটি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইয়া যায়, তখন প্রথমাবস্থার কষ্ট স্মরণ করিয়া মনে একরূপ সুখ অনুভূত হয়। চতুর্থ স্বাভাবিক অবস্থা। এই অবস্থায় অভ্যাসটি যেন আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে মিশিয়া যায়। তখন অভ্যস্ত কায করিতে করিতে কখন সুখ অনুভূত হয়, কখন হয় না; কিন্তু যদি একবার সে কায করিতে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে মনে অত্যন্ত কষ্ট হয়। পেট্রার্ক সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছি, তাহা এই চতুর্থাবস্থার কথা।

ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে, ভাল প্রকৃতি লাভ করিতে গেলে সমুদায় ভাল কায অভ্যাস করিতে হইবে। অভ্যাসের প্রথমাবস্থায় কষ্ট হইলেও ভীত বা দুঃখিত হওয়া নির্ব্বোধের কায; কেননা, অবশ্যই প্রথমে কষ্টকর হইলেও অচিরে তাহা সহজ ও সুখকর হইবে। প্রকাশ্য ভাবেই হউক আর গোপনেই হউক, মন্দ বিষয়ে অভ্যাস করিলে কালে উহা প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া তোমাকেও মন্দ করিয়া তুলিবে। অমৃতের সঙ্গে হলাহল মিশিলে সে অমৃতও প্রাণনাশক হয়।

মাতৃকা।

আমাদের দেশের গৃহিণী ও গৃহস্থগণ সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে শিশু-সন্তানের লালন পালন ও শিক্ষা কার্য্যে কিরূপ অবহেলা করেন, অশিক্ষিত এবং দুর্নীতি-পরায়ণ চাকর চাকরাণীর কু-শিক্ষা ও কু-দৃষ্টান্তে বালক বালিকার জীবনে কিরূপে সর্ব্বনাশের বীজ অঙ্কুরিত হয়, পাড়া প্রতিবাসী ইতর লোকের সংস্রবে কিরূপে তাহাদের প্রকৃতি দূষিত হইতে থাকে, এ সকল গুরুতর বিষয় এক একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের উপযোগী। কিন্তু পিতা মাতা, চাকর চাকরাণী, পাড়া প্রতিবাসীর বর্ত্তমান অবস্থায় এমন কি কোন উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে না, যাহাতে বাল্যাবধি সন্তানের হৃদয়ে

সন্নীতির বীজ উপ্ত হইতে পারে? এমন কি কোন পথ আবিষ্কৃত হইতে পারে না, যে পথে চলিলে ভারতের ভাবী আশা-স্থল বালক বালিকাগণ দুর্নীতির স্পর্শ হইতে, কু-শিক্ষার বাতাস হইতে দূরে থাকিতে পারে? এমন কি কোন দেবতাকে আহ্বান করিয়া আনয়ন করা যাইতে পারে না, যাঁহার ক্রোড়ে বালক বালিকাকে অর্পণ করিলে দুর্নীতি তাহাদিগকে দেখিয়া দূরে পলায়ন করিতে পারে,—যাঁহার বিদ্যমানতায় গৃহস্থের গৃহ স্বর্গের শোভা ধারণ করিতে পারে?

সভ্যতার একটি মহৎ গৌরব এই যে, আপাতত যাহা সমাজের নিকটে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়, যাহা আপাতত কোন কাযেই লাগে না, বরং সময়ে সময়ে যাহা উৎপাত বলিয়াই মনে হয়, সভ্যতার কৌশলে তাহা সুন্দর শোভা ধারণ করে; সমাজের অভাব দূর করিয়া সভ্যতার সাহায্য করে; এক সময়ে যাহা সমাজের নিকট উৎপাত বলিয়া বোধ হইয়াছিল, সভ্যতার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে তাহা সমাজের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। মনুষ্যের কেশ ও নখ, ইতর জন্তুর শৃঙ্গ, ক্ষুর, অস্থি ও মল মূত্র প্রভৃতি সমাজের কত কাযে লাগিয়া কত উপকার করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু আমরা যে গুরুতর অভাবের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, এ সকল আবর্জ্জনার সুপ্রয়োগে তাহা দূর হইবে না। আমাদিগের আলোচ্য বিষয় গৃহস্থের গৃহের একটি প্রধান অভাব, ইহা দূর করিতে হইলে দেবতার অনুগ্রহ চাই।

দেবতা কোথায় পাইব? হিন্দু-সন্তানকে নিরাপদ রাখিবার জন্য এক সময়ে হিন্দুর ঘরে ঘরে ষষ্ঠীদেবীর আসন ছিল; অপবিত্র কলির সংস্পর্শ-ভয়ে এখন সে লোক-হিতৈষিণী দেবী পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবে আর কাহাকে পাইব?

নিরাশ হইবার কারণ নাই। একটুকু সাধনা করিলে, চক্ষের চসমা যোড়া একবার খুলিয়া চাহিলে দেখিতে পাইবে, ষষ্ঠীদেবী পৃথিবী ছাড়িয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি নির্দ্দয় হন নাই, হিন্দুর ঘরে ঘরে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে এক একটি মূর্ত্তিমতী দেবী-প্রতিমা রাখিয়া দিয়াছেন। এ দেবী-প্রতিমা কে? কেন, হিন্দু-বিধবা!

যথার্থ বটে, হিন্দু-বিধবা প্রকৃতই দেবী। মনুষ্য-প্রকৃতি পশুত্ব ও দেবত্বর সমষ্টি; হিন্দু-বিধবা পশুত্ব হইতে পরিমুক্ত হইয়া অবিমিশ্র দেবত্বে অবস্থান করিতেছেন। অন্য জাতীয়া বিধবাগণ এ দেবত্বের নির্ম্মল সুখ অনুভব করিতে পারেন কিনা জানি না; কিন্তু অনুভব করিলেও ভোগ-লালসা তাঁহাদিগের পবিত্রতাকে পরাস্ত করে, পশুত্বের দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকাতে দেবত্বে অবস্থান করা তাঁহাদিগের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। সৌভাগ্য ক্রমে, হিন্দুদিগের দৈব-বিধান-বলে, হিন্দু-বিধবার নিকট পশুত্বের দ্বার একবার অবরুদ্ধ হইলে আর তাহা উন্মুক্ত হয় না, সুতরাং তিনি দেবত্বে অবস্থান করিতে বাধ্য। তবে কি হিন্দু-বিধবার পতন হয় না? পতন হয় না, এ কথা কেহ বলিতেছে না; পতন হয় বলিয়াই "শাপ-ভ্রষ্ট" কথাটার সৃষ্টি। কিন্তু

একজন দুইজন দেবতা শাপ-ভ্রষ্ট হইলেন বলিয়া কি স্বর্গ দেবতা-শূন্য, দেবতার নামেই কলঙ্ক? যদি, তাহাই হয়, তাহা হইলে মেকলে সাহেবের গালি খাইয়া তাঁহাকে একদেশ-দর্শী নিকৃষ্টচেতা বলিতে আমাদিগের কোন অধিকার নাই। বর্ত্তমানের প্রতি, সুখ-ভোগের প্রতি, আহার-পরিচ্ছদের প্রতি হিন্দু-বিধবার ভ্রূক্ষেপ নাই, তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা উন্নত ভবিষ্যতে স্থাপিত; অতএব বালক-বালিকার ভবিষ্যতের ভার হাতে লইতে তাঁহার মত এমন উপযুক্ত পাত্র আর কে?' ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ের কৌস্তুভ মণি, পবিত্রতা তাঁহার প্রাণের অন্ন-জল, স্বার্থ-শূন্যতা তাঁহার জীবনের আনন্দময় পরিচ্ছদ;—আমরা শিশু-সন্তানের আদর্শের জন্য আর কি চাই? শিশুকে যদি দেবতা করিতে চাও, তবে এই মানবরূপিণী ষষ্ঠীদেবীর শরণাপন্ন হও, আরাধনায় তাঁহাকে প্রসন্ন কর, এবং তাঁহার উপযুক্ত হস্তে সন্তানের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হও। হিন্দু-সন্তানের পরম সৌভাগ্য, তাই তাহাকে পুণ্য-পবিত্রতা শিক্ষা দিবার জন্য হিন্দু-সমাজে বিধবা রহিয়াছেন। হিন্দু যতই নিস্তেজ হউক, যতই দুর্ভাগ্য হউক, এবিষয়ে সে জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যশালী। আপনার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া নিঃস্বার্থভাবে সন্তানদিগকে নীতি ধর্ম্ম ও পবিত্রতা শিক্ষা দিবার জন্য এক শ্রেণী স্ত্রীলোক প্রস্তুত করিতে যাইয়া দেখুন, অতি সভ্য স্বাধীন জাতিও বুঝিবেন ইহা কেমন কঠিন ব্যাপার। আমাদিগের বিধবার ন্যায় একদল স্ত্রীলোক ইংরাজ-সন্তানকে শিক্ষা দিবার জন্য যদি বিলাতে বিদ্যমান থাকিতেন, তাহা হইলে আজ ইংরাজজাতি সুখ, সৌভাগ্য ও ক্ষমতাতে জগতে যেমন অদ্বিতীয়, নৈতিক সম্পদেও সেইরূপ অদ্বিতীয় হইতে পারিতেন। এরূপ উৎকৃষ্ট বৈধব্য-নিয়ম অন্য সমাজে বর্ত্তমান থাকিলে যাহাতে তাহা উন্নত হয়, যাহাতে তাহা সুফল প্রসব করে, যাহাতে তদ্দারা সমাজ উপকৃত হয়, তাহারই যত্ন হইত। কিন্তু আমাদের এ হতভাগ্য দেশে সকলই অদ্ভুত! আমরা ব্যবহার জানি না বলিয়া, মর্ম্ম বুঝি না বলিয়া এমন সুন্দর ও উপকারী নিয়মটাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিতে বসিয়াছি! আমরা নিজে পশুত্বের প্রাধান্য বশতঃ দেবতা হইতে পারি না বলিয়া, যে দেবতা হইয়াছে, তাহাকেও আমাদের দলে,—পশুত্বের দিকে আকর্ষণ করিতেছি, একি সংস্কার?

হিন্দু-বিধবা আমাদের জন্য খাটিয়া তাঁহার নিঃস্বার্থ জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে খাটাইতে জানি না বলিয়া যেমন উপকার পাওয়া উচিত, তাহা পাইতেছি না। প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি খাটিতে থাকেন, আর সমস্ত দিনের মধ্যে অবসর নাই, বিশ্রাম নাই। পাঁচ জন ভৃত্যের কায তিনি একাকিনী সুচারুরূপে করিতেছেন। তাঁহার কাযে আমরা যেমন সুখ পাই, ভৃত্যের কাযে তেমন সুখ পাই না; কেননা, ভৃত্য বিশ্রাম চায়, অবসর চায়, সুখ চায়, কিন্তু তিনি কিছুই চান না। ভৃত্য কায চুরি করে, কিন্তু তিনি তাহা জানেন না। তিনি ভ

আর বেতনের লোভে কায করেন না? তাঁহার কায নিঃস্বার্থ। যদি তাঁহার স্বার্থ বা সুখ কিছু থাকে, সে কেবল কাযেতেই।

কিন্তু তিনি যাহা করেন, তাহা ভৃত্য দ্বারাও চলিতে পারে। যাহা ভৃত্যের সাধ্যাতীত, যাহা অবসরাভাবে গৃহস্থেরও অনায়ত্ত, অথচ যাহা বিধবার অনায়াস-সাধ্য, আমাদের অজ্ঞতাবশতঃ উপযুক্ত বন্দোবস্ত না থাকাতে তাহা সর্ব্বদাই উপেক্ষিত হইয়া থাকে—শিশুর শিক্ষায় বিধবার যত্ন-নিয়োগ হইতে পায় না। তিনি যখন দুই হাতে দশখানি হাতের কায করিতেছেন, তখন চাকরাণী হয় ত একটি কায লইয়াই বসিয়া আছে, সে জানে, তাহার জন্য কোন কায অচল হইবে না। এ দিকে গৃহিণী কি করিতেছেন জানি না, কিন্তু ছেলেটি চাকরাণীর ছেলের সঙ্গে খেলিতেছে, দুই চারিটী অশ্লীল গালাগালিও শিখিতেছে, অথচ তাহা কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না। ছেলেটি যে কোন রকমে সুস্থির থাকিয়া সাংসারিক কাযের অথবা নাটক ও উপন্যাস পড়ার ব্যাঘাত না করিলেই হইল। সে যখন কাঁদিয়া উঠে, তখনই তাহার দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, নতুবা সুস্থির থাকিয়া যদি সে নরকের পথে চলে, তাহা হইলেও তাহার দিকে দৃষ্টি নাই।

এই অভাব, এই অনিষ্ট, দূর করিবার প্রকৃত উপায় কি? ইহার একমাত্র উপায়, প্রথম, শিশু-সন্তানের শিক্ষার ভার বিধবার হস্তে অর্পণ করা; দ্বিতীয়, এই গুরুতর কার্য্যের জন্য বিধবাকে প্রস্তুত করা। প্রথম কার্য্যটি কিছুই কঠিন নহে, গৃহস্থগণ কথাটার গুরুত্ব যদি একবার অনুগ্রহ করিয়া অনুভব করেন, তাহা হইলে অনায়াসেই আপন আপন ঘরে এ নিয়মটী প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন।

কিন্তু দ্বিতীয় কার্য্যটি অপেক্ষাকৃত কষ্ট-সাধ্য। রামায়ণ এবং মহাভারত হিন্দু-বিধবার চিরন্তন সম্পদ; ইহার সঙ্গে তিনি রাজস্থানের ইতিহাস এবং স্বর্ণলতার ন্যায় দুই একখানি উপন্যাসের যোগ করিতে পারেন। কিন্তু ইহাতে জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং নীতি সম্বন্ধে যদিও তিনি অনেক সাহায্য পাইবেন, তদ্দ্বারা শিশুদিগের শিক্ষা কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিতে পারিবেন না; অতএব তাঁহাকে এ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

আমাদিগের মাননীয়া ভূতপূর্ব্ব লাটপত্নী ভারত-রমণীকে চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেশের মহান উপকার করিয়াছেন। শুনিতেছি তাঁহার কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এ পর্য্যন্ত নাকি দশ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই মাতৃকা-শিক্ষা-কার্য্য দশ কোটী টাকাতেও সম্পাদিত হইতে পারিবে না। শুনিতেছি পণ্ডিতা রমাবাই হিন্দু বিধবার শিক্ষার জন্য একটি আশ্রম খুলিতেছেন, কিন্তু তাঁহার উদ্যোগেও আমাদের এ সম্বন্ধে কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই। (ক্রমশঃ।)

প্রাপ্তগ্রন্থ।

চাণক্য-শ্লোক।—পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য চারি আনা মাত্র।

বঙ্গদেশে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, এবং কাশীদাসের মহাভারতের পরেই, বোধ হয়, চাণক্য-শ্লোক সর্ব্বজন-পরিচিত। এক জন প্রগাঢ় চিন্তাশীল আর্য্য-পণ্ডিতের দীর্ঘ বহুদর্শনের ফল এমন সরল সংক্ষিপ্ত সংস্কৃতে, এমন সহজ ছন্দোবন্ধে গ্রথিত থাকাতেই লোকের নিকটে ইহার এত আদর। বালকের উপদেশ-শিক্ষার এমন সুন্দর উপায় বোধ হয় আর কোন ভাষায় নাই। পূর্ব্বে গুরু মহাশয়ের ছাত্রেরা এই শ্লোকগুলি বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ সহ মুখস্থ করিতেন; আক্ষেপের বিষয়, আজ-কাল উন্নত প্রণালীর ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই অমূল্য রত্নের অনাদর বাড়িতেছে, পাঠশালাতেও ইহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু আমরা এত দিন যে বটতলার চাণক্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, যাহার অশুদ্ধ পাঠের জন্য জ্বালাতন হইতে ছিলাম, কবিরত্ন মহাশয়ের চাণক্য তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। শ্লোকগুলি বাঙ্গালা অক্ষরে পরিশুদ্ধভাবে মুদ্রিত হইয়াছে, আবার প্রত্যেক শ্লোকের সঙ্গে সঙ্কলনকর্ত্তার নিজকৃত বিশুদ্ধ পদ্যানুবাদ রহিয়াছে, তদ্ব্যতীত কোন কোন শ্লোকের ভিন্ন ভিন্ন পাঠও নিম্নভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া চাণক্যের একটি জীবনীও ইহার সঙ্গে সংযোজিত হইয়াছে। শ্লোকগুলি পড়িয়া অভ্যাস করিবার যাঁহাদের অবসর নাই, তাঁহারা কেবল এই জীবনীটি পড়িলেই অনেক উপকার পাইবেন। পুস্তকখানি সঙ্কলন করিতে তারাকুমার বাবুকে যে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে বালকদিগকে বিশেষরূপে অনুরোধ করি।

পুরস্কারের প্রবন্ধ।

[প্রবন্ধ লেখকগণ অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিবেন না। এ বিষয়ে তাঁহাদের সততার উপরেই নির্ভর করা যাইতেছে।]

১। শিক্ষকের জন্য। মিথ্যা কথা বলাতে অপরাধ হয় কেন, ইহা একটী বালককে ভালরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

২। ছাত্রের জন্য। পিতৃমাতৃ-ভক্তি, এই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে হইবে।

প্রবন্ধ কেহ ফেরত পাইবেন না।

[প্রথম ভাগ।]　　জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬।　　[২য় সংখ্যা।

আদর্শ হিন্দু-বিধবা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর পুণ্য-নাম-পূত

শিক্ষা-পরিচর

শিক্ষাবিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ,।

সূচী।

কলিকাতা

৯২ নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট; বরাট প্রেসে

শ্রীকিশোরীমোহন সেন দ্বারা মুদ্রিত

এবং

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ ॥" বিষ্ণুশর্ম্মা। "Train up a child in the way he should go; and when he is old he will not depart from it." Eng. Bible.—"The master is the best book, the most natural and efficient channel of communication." D. Stow.—"Too generally words have been communicated without ideas." D. Stow. "Be exact in your thoughts." Lord Reay.—"The child is father of the man." Wordsworth.—"The subject which involves all other subjects, and therefore the subject in which education should culminate, is the Theory and Practice of Education." H. Spencer.—"True education is practicable only by a true philosopher." H. Spencer.—"All breaches of the laws of health are physical sins." H. Spencer.—"What is needed for the rooting out of vices is not legislation so much as education aided of course by example." *Hope.*—"It is the greatest curse of ignorance it knows not how ignorant it is." *Christian Life.* "অনন্ত শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ। যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রং ॥ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। "—a sound mind in a sound body." Locke.

গ্রাহকের জ্ঞাতব্য।

১। এই পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৸৵০ এক টাকা দশ আনা। পাঁচ বা ততোধিক গ্রাহক একত্রে লইলে প্রত্যেকের ১।৵০ এক টাকা ছয় আনা লাগিবে। মূল্য পরে লইবার নিয়ম নাই।

২। গ্রাহকগণ চিঠিপত্র, প্রশ্নোত্তর বা ২১, পাঠাইতে নিজ নামের সঙ্গে নিজ নিজ নম্বরের উল্লেখ করিবেন, এবং তিনি শিক্ষক বা ছাত্র হইলে তাহাও লিখিবেন।

৩। চিঠিপত্র, প্রবন্ধ ও মূল্যাদি সমস্তই সম্পাদকের নামে "পুঁঠিয়া, রাজসাহী" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। কলিকাতার গ্রাহকগণ বরাট প্রেসে শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে রসিদ লইয়া তাঁহাকে মূল্য দিতে পারেন।

৪। কেহ বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ পত্র লিখিয়া নিয়মাদি জানিবেন।

৫। গ্রাহকগণ স্ব স্ব নাম, ধাম ও নম্বর স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন।

শিক্ষা-পরিচর।

১ম ভাগ। } জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬ সাল। { ২য় সংখ্যা।

শিক্ষার উদ্দেশ্য।

"প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোহপি প্রবর্ত্ততে," ইহা ন্যায়শাস্ত্রের একটি কথা, কিন্তু আমরা জীবনে প্রতিনিয়ত ইহা মানিয়া চলি। কে কবে বিনা উদ্দেশ্যে কার্য্য করিয়া থাকে? ঐ যে বড় বাড়ীর বৈঠকখানায় প্রত্যহ ৮। ১০ ঘণ্টাকাল একাসনে বসিয়া বাবুরা তাস পাশায় বিভোর থাকেন, তাঁহাদের কি কোন উদ্দেশ্য নাই? অবশ্যই উদ্দেশ্য আছে,—হয় সুখ, না হয় সময় কর্ত্তন করা। সুখ! তুমি কি এত মূর্ত্তিই ধরিতে জান! সময়! আমাদের হাতে পড়িয়া কি তোমার এতই দুর্দশা!

যদি সকল কার্য্যেরই উদ্দেশ্য রহিল, তবে যে শিক্ষার জন্য এত অর্থব্যয়, সময়-ব্যয়, এবং কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, তাহার কি কোন উদ্দেশ্য নাই? উদ্দেশ্য আছে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন; তবে সে উদ্দেশ্য যে কি, তদ্বিষয়ে অবশ্য মতভেদ হইতে পারে, ফলতঃ উদ্দেশ্য-বিহীন কর্ম্ম কেবল বাতুলতারই পরিচয় দিতে পারে, নিরুদ্দেশ্য কার্য্যের কল্পনা কেবল বাতুলের মনেই সম্ভব পায়।

কিন্তু উদ্দেশ্য বিষয়ে যখন মতভেদ দৃষ্ট হয়, তখন একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রকৃত-উদ্দেশ্য-নিরূপণ নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। আচ্ছা, একবার যত্ন করিয়া দেখা যাউক, আমরা এবিষয়ে কত দূর কৃতকার্য্য হইতে পারি।

কেহ কেহ মনে করেন, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য চাকুরী করা। এমনও দেখা গিয়াছে, কোন ধনীর সন্তান লেখা পড়া শিখিয়া চাকুরী করেন, এবং বেতনে পোষায় না বলিয়া বাড়ী হইতে অর্থ আনিয়া বাসা খরচের সাহায্য করেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন,—"এই এক আমোদে আছি, কায কর্ম্ম না থাকিলে বাড়ীতে, কেবল বসিয়া থাকিয়া সময় কাটান ভাল লাগে না।" অবশ্য তাস পাশা খেলিয়া সময় নষ্ট করা অপেক্ষা এরূপ লোকের পক্ষে চাকুরী করা শতগুণে শ্রেয়ঃ, তাহার সন্দেহ নাই।

শ্রেণীর লোক স্ত্রীশিক্ষার প্রধান বিরোধী। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, রমণীদিগকে যখন চাকুরী করিতে হইবে না, তখন তাহাদিগের শিক্ষার আর কি প্রয়োজন। এই শ্রেণীর তার্কিকদিগের যুক্তিগুলি এতই স্থূল যে, তাহার খণ্ডন করিবার প্রয়াস কেবল সময়ের অপব্যবহার মাত্র।

অপর এক শ্রেণীর লোকে বলেন, ভোগ-বিলাসে চরিতার্থ করা, এবং সমাজে সম্মান-লাভ করাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। "লেখা পড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই। লেখা পড়া যেই জানে, সবলোকে তারে মানে।" মদনমোহন তর্কালঙ্কারের এই নীতিবাক্য তাঁহারা মনের সঙ্গে গাঁথিয়া রাখেন, এবং বালকদিগের মন এই বাক্য-গুলির প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগের ভবিষ্যৎ বিষময় করিয়া তুলেন। ইহার ফল এই হয় যে, সম্মান এবং গাড়ী ঘোড়ার আশা তাহাদের হৃদয়কে আজীবন সঙ্কুচিত করিয়া রাখে. শিক্ষা ছাড়িয়া গাড়ী ঘোড়া এবং সম্মানের পশ্চাতেই তাহাদের মন অনবরত ধাবিত হয়। শিক্ষার গুণে যৎকিঞ্চিৎ সম্মান লাভ করিলে, অথবা গাড়ী ঘোড়ার উপযোগী কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেই আপনাকে ব্যাস বাল্মীকি অপেক্ষাও অধিক বুদ্ধিমান মনে করিয়া কৃতার্থ হয়, এমন লোকের দৃষ্টান্ত আমরা শত সহস্র দেখিতেছি।

কিন্তু বাস্তবিকই কি ভোগবিলাস এবং সম্মান শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য? যদি তাহাই সত্য হইত, তাহা হইলে বিষয়-বিরাগী নির্ব্বিলাস আর্য্যঋষিগণ কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে জীবনের দীর্ঘকাল গুরু-পদান্তিকে কাটাইয়া অবশেষে স্ব স্ব জীবনে বিলাস-শূন্যতার একশেষ প্রদর্শন করিতেন না, আর ইংলণ্ডের প্রথম বিজ্ঞান-সাধক "অপস্-সেজস্" রচয়িতা মহাত্মা বেকন ও জ্ঞানের পিপাসায় অধীর হইয়া, সংসারকে জ্ঞানোপার্জ্জনের অন্তরায় মনে করিয়া দীন-হীন ভিক্ষুকদলে প্রবেশ করিতেন না। কেহ বলিতে পারেন যে, তাঁহারা বিলাসী ছিলেন না সত্য, কিন্তু লোকে তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ সম্মান করিত, এবং এই সম্মানের জন্যই তাঁহারা কঠোর পরিশ্রমে জ্ঞানশিক্ষা করিতেন। কিন্তু এ যুক্তিও ভ্রান্ত জ্ঞানের প্রতি মনুষ্য-হৃদয়ে স্বাভাবিকী এমন একটি শ্রদ্ধা আছে যে, জ্ঞানী-ব্যক্তি নিবিড় জঙ্গলে বসিয়া থাকিলেও লোকে তাঁহাকে সম্মান না করিয়া থাকিতে পারে না। ভুবন-বিজয়ী সেকন্দর এবং ডায়োনিসিয়-সের সাক্ষাৎকারের গল্প অনেকেই জানেন। সম্মান জ্ঞানলাভের অবশ্যম্ভাবী ফল হইলেও উদ্দেশ্য নহে।

অনেকের ধারণা, জীবিকার সংস্থান করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। "শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনং।" আহার পরিধেয়ের ভাব-নাই সকলের আগে। যখন জঠরে অগ্নি জ্বলিয়া উঠে, অথবা শীতে বুক কাঁপিতে থাকে, তখন ধর্ম্ম, কাব্য বা বিজ্ঞানের কথায় প্রাণ শীতল হয় না। আগে স্থিতি, তাহার পরে উন্নতি। আগে গাছটী বাঁচা-ইয়া রাখ, তাহার পরে গাছের ফলপুষ্পের আশা করিও।

একদেশ-দর্শী না হইয়া বিচার করিলে

এ যুক্তিতে অনেকটা সত্য আছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাঁহারা এমতের পোষকতা করেন, তাঁহারা প্রায়ই একদেশ-দর্শী। বৃক্ষকে যত্ন করিয়া জীবিত না রাখিলে ফল পুষ্প পাওয়া যায় না, সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া কি বৃক্ষকে জীবিত রাখাই চরম উদ্দেশ্য বলিতে হইবে? বাগানের শোভার জন্য কেহ কদাচিৎ দুই একটী বৃক্ষ পোষে বটে, তাই বলিয়া ধান্যাদি শস্য তৃণ বা আম্রাদি ফলবৃক্ষ কেবল শোভার জন্য পোষিবে, এমন বুদ্ধিমান লোক বোধ হয় সমাজে আজিও জন্মে নাই। সমাজ-উদ্যানে মানব-বৃক্ষ পোষিত হয় না, এ কথা আমি বলিতেছি না; যদি তাহা না হইত, তবে আয়না, চিরুণী এবং পমেটমের এত কাটতি থাকিত না। কিন্তু কথা কি, শোভার্থ-বর্দ্ধিত বৃক্ষ ব্যবহার-যোগ্য স্থান যুড়িয়া না থাকিলেও উদ্যান যেমন পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইত না, সেইরূপ এই সকল মানব-বৃক্ষ সমাজের অন্নধ্বংস না করিলেও বোধ হয় সমাজ হাহাকার করিয়া পথে পথে বেড়াইত না।

আগে স্থিতি, তাহার পরে উন্নতি। বটেইত, কথাটা কে অস্বীকার করিতেছে? কিন্তু উন্নতি বাদ দিয়া দেখ, দেখি, স্থিতির প্রয়োজন কোথায় দাঁড়ায়? উন্নতির ঈশ্বর-দত্ত বীজ মানবের আত্মায় নিহিত রহিয়াছে, উন্নতির দুর্দ্দমনীয় পিপাসাই মানবের জন্য সমাজ নির্ম্মাণ করিয়াছে। উন্নতি না থাকিলে মানবের জন্য সমাজের কি প্রয়োজন ছিল? সমাজ কি কেবল স্থিতির জন্য? পশু পক্ষীর স্থিতি-ব্যাপার চলিতেছে, অথচ তাহাদের সমাজ নাই। সমাজ না থাকিলেও মানব-পশু বাঁচিয়া থাকিতে পারিত। যাঁহারা বলেন কেবল স্থিতিই শিক্ষার উদ্দেশ্য, তাঁহাদিগকে আমি অনুরোধ করি, তাঁহারা একবার হৃদয় হইতে সমস্ত সুখ, সন্তোষ এবং উন্নতির আশা তাড়াইয়া দিয়া, কেবল বাঁচিবার ইচ্ছাটি হৃদয়ে ধারণ করিয়া দেখুন দেখি, কেমন বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়?

অতএব দেখা যাইতেছে, উন্নতিই শিক্ষার উদ্দেশ্য, স্থিতি কেবল সেই উন্নতির প্রয়োজন মাত্র। উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনের মধ্যে প্রভেদ কি? প্রভেদ অত্যন্ত। সে প্রভেদটা কিরূপ, একটুকু পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত মনে করিতেছি। মনে কর, জীবন ধারণ উদ্দেশ্য; এ উদ্দেশ্যের প্রধান প্রয়োজন কি? আহার। আবার মনে কর, আহার উদ্দেশ্য; ইহার প্রয়োজন কি? জল, অগ্নি, তণ্ডুল, কাষ্ঠ, কয়লা, হাঁড়ি, বাসন, রন্ধন-কার্য্য ইত্যাদি। আবার মনে কর, তণ্ডুল উদ্দেশ্য; ইহার প্রয়োজন কি? গরু, লাঙ্গল, জমি, বীজ, ঢেঁকি, কুলো ইত্যাদি। যদি জীবন ধারণ উদ্দেশ্য না থাকিত, তবে আহারের জন্য কাহার মাথা ঘামিত? যদি আহার উদ্দেশ্য না থাকিত, তবে, তণ্ডুলের জন্য কে গরজ করিত? যদি তণ্ডুল উদ্দেশ্য না থাকিত, তবে চৈত্রের মধ্যাহ্ন রৌদ্রে মাঠে থাকিয়া কৃষক প্রাণান্ত পরিশ্রম করিত না। এই সকল প্রয়োজনের মধ্যে যে যত উদ্দেশ্যের নিকটবর্ত্তী, তাহার অপরিহার্য্যতা

তত অধিক; কিন্তু এ স্থলে সে বিষয়ের বিস্তৃত সমালোচন নিষ্প্রয়োজন।

এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে, উদ্দেশ্যের যে সকল প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহাদের শিক্ষা কি অনাবশ্যক? অনাবশ্যক কেহ বলিবে না; প্রয়োজনের জন্য শিক্ষা না করিলে উদ্দেশ্য সাধন অসম্ভব। এ বিষয় হার্বার্ট স্পেন্সর যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা মানিয়া চলিলেই যথেষ্ট হয়। যাহার গুরুত্ব যেরূপ, সে বিষয়ে সেইরূপ যত্ন এবং সময় দিলেই আর কোন গোলযোগ থাকে না। গণিত পাঠের জন্য যেরূপ যত্ন ও সময়ের প্রয়োজন, উপন্যাসপাঠে সেরূপ যত্ন ও সময় খরচ করিলেই পরিণামে দুর্দ্দশা ঘটে। মোট কথা এই, প্রয়োজনীয় বিষয়-গুলি আগে ওজন করিয়া লও, পরে তাহাদের গুরুত্বের অনুপাতে সময় ও যত্ন বিভাগ কর। সকলেই যে এক নিক্তিতে ওজন করিবে, এমন নহে। তোমার নিকট যাহা গুরুতর বলিয়া বোধ হয়, আমি তাহাকে অপেক্ষাকৃত লঘু মনে করিতে পারি। তুমি যদি গণিতকে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাসন দিতে চাও, আমি হয়ত সাহি-ত্যকে তাহার তুল্যাসনে বসাইবার ইচ্ছা করিতে পারি। এরূপ সামান্য মতভেদে ক্ষতি হয় না, বরং মানবজাতির উন্নতির জন্য এরূপ বৈচিত্র্য থাকাই উচিত। "ভিন্ন-রুচির্হিলোকঃ।" নানা মুনির নানা মত আছে বলিয়াই অগণ্যবিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিয়া মানব-সমাজ ক্রমে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতেছে। এ বিষয়ে স্বর্গগত মাননীয় কৃষ্ণ-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট একটি বড় সুন্দর কথা শুনিয়াছি। তাঁহার শিক্ষক তাঁহাকে বলিতেন,—"Learn every thing of something and something of every thing." "কোন কোন বিষয়ের সমস্ত শিক্ষা কর, আর সকল বিষয়ের কিছু কিছু শিক্ষা কর।" অর্থাৎ দুই একটি বিষয়ে এমন অভিজ্ঞতা লাভ কর, যেন তাহা আর দশ জনকে শিক্ষা দিতে পার; অপর সকল বিষয়ে কিছু কিছু জানিয়া রাখ, যেন এসকল বিষয়ে অন্য কেহ কিছু বলিলে অন্ততঃ বক্তার কথা বুঝিয়া লইতে, এবং সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার যে সকল কুফল, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পার। বাস্তবিক বর্ত্তমান সময়ে যে সকল উচ্চ উচ্চ বিষয়ের গ্রন্থাদি প্রকটিত হইতেছে, সর্ব্বতো-মুখী বিদ্যা না থাকিলে সে সকল সুন্দররূপে বুঝিয়া উঠা ভার।

এতক্ষণে স্থির হইল যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য উন্নতি; কিন্তু উন্নতি প্রয়োজন সাপেক্ষ বা উপায়-সাপেক্ষ, সুতরাং উন্নতির অনুরোধে সে সকল প্রয়োজন বা উপায়গুলি শিক্ষা করিতে হইবে। এখন সেই উন্নতি কিম্ভূত কিমাকার পদার্থ, আর তাহার প্রয়োজন-গুলিই বা প্রধানতঃ কি কি, এসম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলেই আমাদের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিবে।

প্রায় সকল ভাষাতেই, বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষাতে, এমন কতকগুলি শব্দ প্রচলিত আছে, যাহাদের অর্থ সম্বন্ধে একটা স্থির নিশ্চিত ভাব অনেকের মনেই নাই। এই সকল শব্দের মধ্যে একটি "স্বাধীনতা", আর একটি "উন্নতি।" একবার কোন

তর্কসভায় (Debating Club) এক জন পরিণত বয়স্ক যুবক উপস্থিত ছিলেন। তার্কিক এক জন বালক পুনঃ পুনঃ "স্ত্রী স্বাধীনতার" উল্লেখ করিতেছিল, অথচ তাহার বক্তৃতায় সারবত্তা কিছু নাই দেখিয়া আগন্তুক বাবুটি তাহাকে স্বাধীনতার অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। বালক আশ্চর্য্যের সহিত উত্তর করিল,—"কেন মহাশয়! আপনি কি স্কুলে পড়েন নাই? স্বাধীনতা, এই স্বাধীনতা আর কি, যাহা সকলে বলে।"

স্বাধীনতা সম্বন্ধে বালক যেমন উত্তর করিয়াছিল, উন্নতির অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেও বোধ হয় অনেকে এইরূপ উত্তরই দিবেন। "অমুক লোকটা বেশ লেখা পড়া শিখিয়াছে, এদিকেও খুব ভাল, বেশ বিনয়ী, মিষ্টভাষী, পরোপকারী এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ। কিন্তু হইলে কি হয়, লোকটা উন্নতি করিতে পারিল না।" এস্থলে উন্নতির অর্থ, চাকুরী বা টাকা উপার্জ্জন। "রামদাসের টাকা আছে বটে, সে আজ ইচ্ছা করিলে দশ লাখ টাকা রাস্তায় ছড়াইয়া দিতে পারে; কিন্তু দেখিতে গেলে শ্যাম বাবুরই উন্নতি বলিতে হইবে। তাহার এক ভাই ডিপুটি, এক ভাই দারোগা, আর বড় ছেলেটি থার্ড ক্লাসের পড়া সারা না করিতেই আফিসের কেরাণী হইয়া গেল।" এখানে উন্নতির অর্থ লোকবল এবং গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সংস্রব। "অমুক দেশ বড় উন্নত হইয়াছে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাহার অধিকার, ছলে বলে কৌশলে কেহ তাহার সঙ্গে পারে না।" এ স্থলে উন্নতির অর্থ রাজ্য-বিস্তার এবং পাশব-বল।

এ সকল কিছুই যদি উন্নতি নয়, তবে উন্নতি কি? উত্তরটি অতি সংক্ষিপ্ত; উচ্চ দিকে অগ্রসর হওয়াকে উন্নতি বলে। এখন "উচ্চ" শব্দটি লইয়া আবার গোলে পড়িতে হইল। যদি উচ্চতাই উন্নতির পরিমাপক হয়, তবে হিমালয়ের অধিত্যকা-বাসিগণ বাঙ্গালী হইতে উন্নত, এবং পক্ষি-গণ জীবজগতে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উন্নতি বলিতে যে উচ্চতা বুঝায়, তাহা স্থানগত উচ্চতা নহে, ভাবগত উচ্চতা। সে উচ্চতা কি, তাহা একবার বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

হিমালয়ের অত্যুচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া একজন গায়ক প্রাণ খুলিয়া মুক্তকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছেন, কিন্তু সেই পর্ব্বতের পাদদেশে দাঁড়াইয়া একজন লোক তাহার কিছুই শুনিতে পাইতেছে না। তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া আর এক জন লোক অতি মৃদুস্বরে গান করিতেছে, সে তাহা স্পষ্ট শুনিতেছে। এরূপ হয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর সকলের নিকটই পাইব,—সকলেই বলিবেন, প্রথমোক্ত গায়ক এত উচ্চে দাঁড়াইয়াছেন যে, তাঁহার কণ্ঠস্বর সমভূমিতে আসিয়া পঁহুছে না। ইহা স্থানগত উচ্চতা, ইহা বেশ বুঝা গেল।

আচ্ছা, আর একটি দৃষ্টান্ত লইয়া দেখা যাউক। মনে কর, দুই জন লোক এক স্থানে দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময়ে অন্য একটি কৃষক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চুরি করা নিষিদ্ধ কেন? এক জন উত্তর করিল, "চুরি করা অন্যায় বলিয়া নিষিদ্ধ।" কৃষক বোকা হইয়া বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া

রহিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। তখন আর এক জন বলিল, "চুরি করিয়া ধরা পড়িলে জেলে যাইতে হয়, তাই উহা নিষিদ্ধ।" সরল কৃষক এতক্ষণে কথাটার অর্থ বুঝিতে পারিল, এবং চুরি করা অপেক্ষা নিরাপদে চাষ বাস করাই ভাল, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল। এই দুই জনের মধ্যে এক জনের কথা কৃষক বুঝিল, আর এক জনের কথা বুঝিতে পারিল না কেন? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রথম বক্তা ভাবজগতের এত উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়াছেন যে, তাঁহার কথা কৃষকের হৃদয়ে প্রবেশই করিতে পারিল না। দ্বিতীয় বক্তা কৃষকের সঙ্গে প্রায় সমভূমিতে দাঁড়াইয়া, সুতরাং তাঁহার কথাটি কৃষকের হৃদয়গ্রাহিণী হইল। প্রথম বক্তাও প্রথমাবস্থায় সমভূমিতেই ছিলেন, পরে অনেক কষ্ট পরিশ্রম সহ্য করিয়া, অনেক বন্ধুরভূমি অতিক্রম করিয়া তবে তিনি বর্ত্তমান উচ্চ স্থানে উপনীত হইতে পারিয়াছেন। চুরি করা প্রচলিত থাকিলে অর্থনীতিতে কিরূপ গোলযোগ হয়, সমাজনীতিতে কিরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে, রাজনীতিতে কিরূপ ফল ফলে, ধর্ম্মনীতিতে ন্যায়পরতার কিরূপ ক্ষতি সঙ্ঘটিত হয়, এবং বিবেক কিরূপে নির্জ্জীব ও অকর্ম্মণ্য হয়, এই সকল কথা তাঁহার বুঝিতে ও ভাবিতে অনেক সময় ও পরিশ্রম লাগিয়াছে, তবে তিনি শেষটা "চুরি করা অন্যায়" এই উচ্চ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন। আমরা "উন্নতি" বলিতে যে উচ্চতা বুঝি, তাহা এই ভাবগত উচ্চতা।

এই ভাবগত উচ্চতা লাভ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু শূন্যকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চে উঠিতে কেহ চায় না, শূন্যকে অবলম্বন করিয়া উচ্চে উঠিতে কেহ পারে না! হিমালয়ের উচ্চ শিখর, চন্দ্র, সূর্য্য অথবা নক্ষত্র, যাহাই হউক, জড়জগতে যেমন উচ্চতার একটি পরিমাপক চাই, অন্তর্জ্জগতেও সেইরূপ একটি পরিমাপক, একটি লক্ষ্য, একটি উদ্দেশ্য, চাই। বিনা লক্ষ্যে, বিনা উদ্দেশ্যে, কেবল উন্নতির জন্যই উন্নতি চাহিতেছি, আধ্যাত্মিক রাজ্যের এরূপ বালকতা, এরূপ অন্ধতা, এরূপ মত্ততা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি না।

সে লক্ষ্য কি? যাহার দিকে আত্মা সর্ব্বদা চলিতেছে, সর্ব্বদা উড়িতে চাহিতেছে, সে উদ্দেশ্য কি? সেই উদ্দেশ্য ঈশ্বর,—ঈশ্বরই মানবাত্মার চরম উদ্দেশ্য, কেননা, তিনিই চরম উন্নত, তিনিই পূর্ণ উন্নতি।

হার্বার্ট স্পেন্‌সর বলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য "to live completely" অর্থাৎ "সম্পূর্ণরূপে বাঁচিয়া থাকা।" তিনি সংশয়বাদী, সুতরাং বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা উচ্চতর বা মহত্তর কিছু তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই, তাঁহার হৃদয়ে ধারণা হয় নাই। শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিতে আমরা যাহা বুঝিলাম, "বাঁচিয়া থাকা" তাহার নিম্নতম স্তর মাত্র।

এক ব্যক্তি কয়েকটি সৎকার্য্যের সঙ্কল্প করেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাহা অসম্ভব দেখিয়া অবশেষে প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্থসঞ্চয় করিতে থাকেন। তিনি এত পরিশ্রম ও কৃপণতা অবলম্বন করেন যে কিছুকাল পরে

তাঁহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সঞ্চিত হইয়া উঠে। কিন্তু তখন তাঁহার সৎকার্য্যের সঙ্কল্প হৃদয় হইতে দূর হইয়াছে; জগতের উপকার করা দূরে থাকুক, তিনি ধনের অনুরোধে আত্মবঞ্চনা করিয়াও এক প্রকার বিকৃত সুখ অনুভব করিতেছেন! যাঁহারা আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কেবল বাঁচিয়া থাকাকেই পরমপুরুষার্থ মনে করেন, তাঁহাদেরও বোধ হয় এইরূপ দুর্দ্দশাই ঘটিয়া থাকিবে।

উন্নতি সর্ব্বাঙ্গীন হওয়া চাই; আংশিক উন্নতি প্রকৃত উন্নতি নহে। এক পক্ষ ভূমিতে রাখিয়া অপর পক্ষের সাহায্যে পক্ষী আকাশে উড়িতে পারে না, এক ব্যক্তির ধড় মাটিতে রাখিয়া মাথাটি গাছে রাখিলে, ঐ ব্যক্তি বৃক্ষ আরোহণ করিয়াছে, এমন কথাও বলা যায় না। সর্ব্ববিষয়ের যুগপৎ উৎকর্ষ বিধান করিতে পারিলে তবে প্রকৃত উন্নতি হইল বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। এই সর্ব্ববিষয়—শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক। যাহার শরীর সুস্থ ও সবল, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত বা আধ্যাত্মিক বৃত্তি কর্ষিত হয় নাই, তাহাকে বলবান্ বলিব, উন্নত বলিব না। যে বুদ্ধি প্রভাবে জগৎকে চমৎকৃত করিতে পারে, কিন্তু সুযোগ পাইলে মিথ্যা কথা বলিতে, অথবা পরস্বাপহরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সে বুদ্ধিমান হইলেও উন্নত নহে। যে দয়া ধর্ম্ম সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত, কিন্তু অমার্জ্জিত বুদ্ধির দোষে ভাল মন্দ হিতাহিত, ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া কার্য্য করিতে পারে না, অথবা শারীরিক রোগ বা দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত হৃদয়ের সৎসঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হয় না, তাহাকে ধার্ম্মিক বলিতে পারি, কিন্তু উন্নত বলিব না। যে সুস্থ শরীরে বুদ্ধির সহিত কার্য্য করিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে অগ্রসর হইতেছে, সেই প্রকৃত উন্নতিপথের যাত্রী। প্রকৃত ভক্ত ষোড়শোপচারে ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া থাকেন; প্রকৃত মানব শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ-কুসুমে ঈশ্বরের চরণে অঞ্জলী প্রদান করেন। মানব-জীবন-রূপ অপার্থিব সংগীত তান-লয়-শুদ্ধ হওয়া চাই; এই স্বর্গীয় বাদ্য-সম্ভারে শরীর, মন ও আত্মা-রূপ যন্ত্রত্রয়ের মিল থাকা চাই। যাঁহারা প্রকৃত উন্নতির সাধক, তাঁহারা প্রাণপণে এই মিল রক্ষা করিতে যত্ন করেন, ইহার অনুরোধে প্রাণ দিতেও সঙ্কুচিত হন না।

এই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভের পূর্ব্বে দুইটি অবশ্য সাধ্য প্রয়োজন রহিয়াছে,—প্রথম, আপদ্‌শূন্যতা, দ্বিতীয়, জীবিকা-সৌকর্য্য। সর্ব্বাগ্রে জীবনকে, সমাজকে, সম্পত্তিকে নিরাপদ করিতে হইবে। যদি সর্ব্বদা জীবনের ভয়ে ভীত থাকিতে হয়, যদি শ্রমোপার্জ্জিত সম্পত্তিকে কখন কাড়িয়া লইবে, এই ভয়ে ব্যাকুল থাকিতে হয়, যদি সমাজে কে কখন বিপ্লব ঘটায়, এই আশঙ্কায় সর্ব্বদা শশব্যস্ত থাকিতে হয়, তাহা হইলে উন্নতি সাধন করা দূরে থাকুক, উন্নতির চিন্তাও মানব-হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। এইজন্য গবর্ণমেণ্ট বা রাজশক্তি আমাদের পরম উপকারী, এবং যাহারা মূর্খতানিবন্ধন এই রাজশক্তিকে দুর্ব্বল বা অকর্ম্মণ্য করিতে

চায়, তাহারা সমাজের ঘোর শত্রু। এই পরম উপকারী রাজশক্তি যাহাতে সমাজে দৃঢ়রূপে স্থায়ী হয়, তাহার জন্য প্রত্যেকের কায়মনে যত্ন করা উচিত। রাজশক্তিকে দৃঢ় করিতে হইলে রাজা প্রজার বিরোধ তিরোহিত করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত রাজা মনে করিবেন, অগণ্য প্রজাপুঞ্জ তাঁহার ভোগ বিলাসের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, আর প্রজা মনে করিবে, রাজা কেবল অত্যাচারের জন্যই জন্মিয়াছেন, তাঁহা দ্বারা সমাজের কণামাত্রও হিত সাধিত হয় না, সে পর্য্যন্ত এ আশা সফল হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। রাজশক্তি অক্ষুণ্ণ না থাকিলে প্রতি মুহূর্ত্তে অগণ্য বিপদ হইতে মানবসমাজকে কোন্ দৈবশক্তি রক্ষা করিবে? এই বিপদকে দূর করিবার জন্য, বৈজ্ঞানিক ভাবে রাজনীতিশিক্ষা সর্ব্বসাধারণেরই নিতান্ত কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত প্রজাসাধারণ রাজশক্তির উপকারিতা শিক্ষা দ্বারা উপলব্ধি করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত ইহার সর্ব্বতোমুখী অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরিচালনাকে অত্যাচার বলিয়া কল্পনা করিবারই অধিক সম্ভাবনা।

দ্বিতীয় প্রয়োজন, জীবিকা-সৌকর্য্য। বলিতে পার, অসভ্য গারোজাতি তোমার ন্যায় উন্নত হইতে পারে নাই কেন? ইহার একমাত্র উত্তর, তোমার মত তাহার জীবিকা-সৌকর্য্য নাই। তোমার সৈনিকেরা রাজ্যরক্ষা করিতেছে, কৃষকেরা শস্যোৎপাদন করিতেছে, বণিকেরা জগতের বিলাসভাণ্ডার আনিয়া তোমার দ্বারে উপস্থিত করিতেছে, পণ্ডিতেরা দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু গারো-ভাগ্যে সে সুযোগ নাই। সে নিজে তাহার কৃষক, সৈনিক, বণিক ও উপদেশ দাতা। কেবল মাত্র আহার পরিধেয়ের যত্নই তাহার সমস্ত জীবনটিকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে, হতভাগ্য গারো জীবনের উন্নতি চিন্তা করিবার অবকাশ পায় কখন? উন্নত-সমাজে যে "বাঁচিয়া থাকা" উন্নতির একটি প্রয়োজন মাত্র, হতভাগ্য গারোর ভাগ্যে তাহা উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে! যাঁহারা উন্নতির সাধক, জীবিকা-সৌকর্য্য তাঁহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য। যাহাকে আহার-পরিধেয়ের ভাবনায় সময় নষ্ট না করিতে হয়, সে যত্ন করিলে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারে, ইহা একটি নিয়ত-প্রত্যক্ষ অতি মোটা সত্য।

জীবিকার সমস্ত উপাদান জড়-জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে, সুতরাং জীবিকা-সৌকর্য্যের জন্য জড়ের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হইতে হইবে, জড়-জগতের কোথায় কি আছে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে হইবে, জড়কে জয় করিয়া তাহার উপরে সম্পূর্ণ প্রাধান্য স্থাপন করিতে হইবে, তাহাকে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের দশায় পরিণত করিতে হইবে।

এ প্রাধান্য—জড় জগতে এ প্রভুত্ব, কিরূপে লাভ হইতে পারে? ইহার একমাত্র উত্তর -একমাত্র উপায়, জড় বিজ্ঞানের উন্নতি-সাধন। পদার্থের প্রকৃতি, দোষ-গুণ, কার্য্যকারিতা, পরস্পর সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয় অবগত না হইতে পারিলে সাংসারিক সুবিধা, অর্থাৎ জীবিকা-সৌকর্য্য কিরূপে

হইবে? শারীরিক স্বাস্থ্য সকল কার্য্যের মূল; কিন্তু আহার, পরিধেয়, বাসস্থান, জল, বায়ু, উদ্ভিজ্জতত্ত্ব এবং শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকিলে সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইবার আশা এবং সম্ভাবনা অতি অল্প। সমাজের হিতকার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে অনেক সময় লাগে, জীবনের অর্দ্ধেক সময় প্রায় ইহাতেই ব্যয়িত হয়। এই সুদীর্ঘ কালে প্রস্তুত হইয়া যখন কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করা যায়, তখন হঠাৎ সংসার পরিত্যাগ করিয়া আত্মীয়দিগকে শোক-সাগরে নিমজ্জন করা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়? অথচ আমাদিগের দেশে অধিকাংশের ভাগ্যেই এই দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। যাহাদিগের নিকট সমস্ত দেশের লোকে আশা করে, কি আক্ষেপ তাহারা প্রায়ই অকালে জীবনলীলা সংবরণ করে! স্বাস্থ্যের প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি না থাকাতে আমাদের দেশে লোকের ক্রমে আয়ুঃ ক্ষয় হইতেছে; কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, ইংলণ্ড প্রভৃতি যে সকল সভ্য দেশে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ যত্ন আছে, সে সকল দেশে লোকের আয়ুঃকাল ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা কি স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ ফল নহে?

ফলতঃ আজকাল যে দিকে দৃষ্টি করা যায়, সেই দিকেই বিজ্ঞানের প্রাধান্য—বিজ্ঞানের রাজত্ব। বিজ্ঞান গাড়ী চালাইতেছে, জাহাজ চালাইতেছে, বন্দুক চালাইতেছে, সংবাদ চালাইতেছে। ছোট কি বড়, যে কোন কায হউক না কেন, বিজ্ঞানের সাহায্য না লইলে তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না।

(ক্রমশঃ)

শিক্ষকের উপযোগিতা।

২—দায়িত্ববোধ।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, স্বেচ্ছা-প্রবৃত্তি শিক্ষকের প্রথম ও প্রধান উপযোগিতা। শিক্ষা-কার্য্যে স্বভাবতঃ যাহার প্রবৃত্তি নাই, বাঁধিয়া ধরিয়া প্রলোভন দিয়া তাহা দ্বারা শিক্ষাকার্য্য চালাইলে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু ইহাই প্রচুর নহে। অনেকের নিকটে শিক্ষাকার্য্য প্রলোভনের ব্যবসায়, সুতরাং ইহাতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হওয়াই তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তাঁহাদের বুদ্ধি লইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, শিক্ষকের কার্য্যে প্রলোভন অনেক।

প্রথমতঃ অন্যান্য বিভাগের ন্যায় ইহাতে কথায় কথায় জমা খরচ নাই, সুতরাং তহবিল গরমিল হইলে যে একটা জবাবদিহি আছে, শিক্ষককে তাহার জন্য বড় একটা ভাবিতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য ব্যবসায়ে যেমন দিন রাত্রি খাটিতে

হয়, ইহাতে তেমন খাটুনি নাই, নির্দ্দিষ্ট ৪।৫ ঘণ্টা স্কুলে থাকিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলেই হইল, তাহার পরে অবশিষ্ট সময় তাস পাশা, মদ অহিফেন, আমোদ প্রমোদ, আহার নিদ্রা, যাহার প্রাণে যাহা চায়! তৃতীয়তঃ অন্যান্য ব্যবসায়ে কায করিতে করিতে কতদূর অগ্রসর হওয়া গেল, তাহার একটা পরিমাণ আছে, কাগজে কলমে সে পরিমাণের একটা নিদর্শন থাকে; শিক্ষকের কাযে সেরূপ নিদর্শন কিছু নাই। চতুর্থতঃ কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া বালককে অনায়াসে ফাঁকি দেওয়া যায়, বালক সে ফাঁকি ধরিতে পারে না,—বুঝিতে পারিলেও তাহার বলিবার সাহস বা অধিকার নাই। পঞ্চমতঃ অন্যান্য ব্যবসায়ের কার্য্যে অবহেলা করিলে যাহার কার্য্য সে অসন্তুষ্ট হয়; শিক্ষকের ব্যবসায়ে শিক্ষক অলস হইলে বালকের আনন্দের সীমা থাকে না! এ গুলিকে প্রবল প্রলোভন বলিতে হইবে। এতগুলি প্রলোভন থাকিতে শিক্ষা-কার্য্যে লোক আকৃষ্ট হইবে না কেন?

কিন্তু এই সকল প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া যাঁহারা শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে দিয়া শিক্ষার গুরুতর কর্ত্তব্য সাধনের কতদূর সম্ভাবনা, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই জন্যই কেবল স্বেচ্ছা-প্রবৃত্তি থাকিলে চলিবে না, তাহার সঙ্গে শিক্ষকের বিলক্ষণ দায়িত্ব-বোধ থাকা চাই। দায়িত্ব-বোধ-শূন্য ব্যক্তি যে আসনকে দুগ্ধ-ফেননিভ বা কুসুমাস্তৃত মনে করে, যে দায়িত্ব বুঝিয়াছে তাহার নিকট উহা বৃশ্চিকময়, কণ্টকাবৃত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। চলুন পাঠক! সে সকল দায়িত্ব কি, একবার তাহা চিন্তা করিয়া দেখা যাউক।

সন্তানের প্রতি পিতামাতার দুইটি প্রধান কর্ত্তব্য;—প্রথম, উপযুক্ত অন্ন বস্ত্র দ্বারা তাহাকে প্রতিপালন করা; দ্বিতীয়, তাহাকে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করা। প্রথম কর্ত্তব্য পিতামাতা নিজেই পালন করেন; দুঃখেই হউক আর সুখেই হউক, তাঁহারা সন্তান পালনের জন্য অন্যের দ্বারস্থ হন না। কিন্তু দ্বিতীয় কার্য্যটি তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। সংসারে যদি অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন না থাকিত, যদি নানাবিধ সামাজিক কর্ত্তব্যে মানবকে নিযুক্ত থাকিতে না হইত, যদি আলস্য, উচ্চাভিলাষ, সুখবাসনা প্রভৃতি তস্করগণ অমূল্য সময় অপহরণ না করিত, যদি অনেক সময়ে রোগ এবং শোক মানবের কার্য্যকরী শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া না রাখিত, তাহা হইলে পিতামাতা সন্তানের লালনপালনে যেমন সমর্থ, শিক্ষাদানেও সেইরূপ সমর্থ হইতে পারিতেন। কিন্তু মানব-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা ঘটিবার নহে। সামাজিক মনুষ্যের অবসর নাই বলিলেই হয়। হিংসা, দ্বেষ, দলাদলি, সর্ব্বোপরি অর্থ-চিন্তা,—এ অবস্থায় সন্তানকে অনর্থকরী বর্ণমালা শিখাইবার সময় কোথায়? একমাত্র অর্থ-চিন্তা—ভাবিতে শরীরের রক্ত শুকাইয়া যায়; একমাত্র অর্থ-চিন্তা মানুষের সমস্ত সময়টাকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে! একটুকু বিশ্রামের সময় নাই, একটুকু আমোদ প্রমোদের সময় নাই, একটুকু আধ্যাত্মিক চিন্তা করিবার সময়

নাই! হিন্দুর ত্রিসন্ধ্যা, মুসলমানের পঞ্চনমাজ আমাদের নিকট উৎপাত হইয়া উঠিয়াছে;—শাস্ত্রকারদিগকে গালি দিতে ইচ্ছা হইতেছে, আর সপ্তাহের মধ্যে এক আধ ঘণ্টা সময় খরচ করিয়া সাধন ভজনকে ফাঁকি দিতে পারি কিনা, বুদ্ধিমান আমরা তাহারই উপায় দেখিতেছি! এদিকে সভ্যতার অনুচর নূতন নূতন অভাব দিন দিন দেখা দিতেছে, সেই সঙ্গে অর্থপ্রয়োজনও দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে; ইহার পরিণাম কি, তাহা জগদীশ্বরই জানেন। আমাদিগের নিকট কিন্তু সভ্যতা-ফল আজিও চালিতা-ফলের ন্যায়ই বোধ হইতেছে; আমরা আশায় বুক বাঁধিয়া খোষার পর খোষা ছাড়াইতেছি, কিন্তু শস্যের সঙ্গে এখনও সাক্ষাৎ হয় নাই।

সৌভাগ্যক্রমে মানুষের বুদ্ধি আছে, বিপদ উপস্থিত হইলে উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিবার শক্তি আছে, তাহাতেই রক্ষা। যদি তাহা না থাকিত, যদি মানব সংসারে দিন রাত্রি অর্থচিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া সন্তান-শিক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিত, তাহা হইলে সমাজের যে কি শোচনীয় অবস্থা হইত, সে কথা ভাবিতেও ভয় হয়। সন্তান-শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা এই উদ্ভাবনী শক্তির সৃষ্টি। সন্তানের মঙ্গল-কামনা জনক-জননীর প্রকৃতিগত গুণ। তাঁহারা সন্তানের পরিণাম ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন; অবশেষে উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে সন্তান-শিক্ষার ভার দিয়া সে চিন্তা হইতে কতক পরিমাণে অব্যাহতি লাভ করিলেন।

অতএব শিক্ষকের প্রথম দায়িত্ব বালকের পিতৃমাতার নিকট। বালকের পিতা বলিলেন, "বালকটিকে আপনার হাতে দিলাম, ইহাকে নিজ সন্তানের মত দেখিবেন, এবং যাহাতে ইহার ভাল হয় তাহাই করিবেন।" পিতা এই কয়েকটি সহজ কথা বলিয়া অবসর হইলেন; শিক্ষকও এই প্রকাণ্ড ভারটা নিজের ঘাড়ে লইয়া পিতাকে অভয় দিলেন।

বালকের পিতা যে কয়টি কথা বলিলেন, তাহা তাঁহার নিকট সহজ বটে; কিন্তু শিক্ষক যদি বিবেকবান্ হন, তাহা হইলে ইহা তাঁহার নিকট তেমন সহজ বোধ হইবে না। "ইহাকে নিজ সন্তানের মত দেখিবেন।" ব্যাপারটা কি, কথাটা কঠিন কত, শিক্ষক মহাশয় একবার অনুগ্রহ করিয়া মুহূর্ত্তকাল ভাবিয়া দেখুন। শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে প্রাচীনকালে যে গুরু শিষ্য-ভাব ছিল, আজ কাল তাহা তিরোহিত হইতেছে বা হইয়াছে। বালক মনে করে, শিক্ষক চাকর বিশেষ; তিনি বেতনভোগী ভৃত্য, সুতরাং বালককে লেখা পড়া শিখাইতে বাধ্য। শিক্ষক মনে করেন, তিনি যখন ভৃতি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তখন তিনি কয়েক ঘণ্টা খাটিয়া বালককে পাঠ্য পুস্তক কয়েক খানি পড়াইতে বাধ্য; তাহার অধিক কিছু করিতে তাঁহার অধিকার নাই, প্রয়োজনও নাই। বাস্তবিক শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে এইরূপ পর পর, আলগা আলগা একটা ভাব থাকাতে শিক্ষাকার্য্য এক প্রকার চলিয়া যাইতেছে, বাহিরে কোন গোলযোগ দেখা যাইতেছে না; যদি এক পক্ষ আপন মনে

করিতেন, আর অন্য পক্ষ পর মনে করিতেন, তাহা হইলে গোলযোগের সীমা থাকিত না।

পিতা বলিলেন, "ইহাকে নিজ সন্তানের মত দেখিবেন।" ইহাতে অনেক অর্থ থাকিল। তিনি জানেন, সন্তানের প্রতি তাঁহার ভালবাসা এবং মঙ্গল-কামনা অতুল; তাঁহার মত সন্তানকে ভালবাসিতে, অথবা তাহার মঙ্গল কামনা করিতে আর কেহ পারে না। যাহার এ দুইটি গুণ নাই,—বালককে যে ভালবাসে না, এবং বালকের মঙ্গল যে হৃদয়ের সহিত কামনা করে না,—সে বালকের শিক্ষা-বিধানে কিরূপে কৃতকার্য্য হইবে? ভালবাসা এবং মঙ্গল-কামনা না থাকিলে বালকের এত আবদার অত্যাচার কেমন করিয়া সহ্য করিবে? এ সকল সহ্য করিতে না পারিলে কেমন করিয়াই বা তাহাকে শিক্ষা দিবে? বালক সকল বিষয়েই অনভিজ্ঞ, কিন্তু এই বিষয়ে তাহার অতি চমৎকার একটি দৈবী শক্তি রহিয়াছে,—যে প্রকৃত ভালবাসে, তাহাকে ভাল বাসিবার কথা বালককে শিখাইয়া দিতে হয় না। পিতা মাতা কঠোর শাসন করিলেও বালক জানে, তাঁহাদের মত তাহার এমন হিতকারী আর কেহ নাই, সুতরাং তাঁহাদের উপদেশ তাহার মনে যেমন লাগিয়া যায়, তেমন করিয়া অন্যের উপদেশ লাগেও না।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, বালকের পিতামাতার নিকটে শিক্ষকের কতদূর দায়িত্ব। একটি দুইটি বালককে তাহাদের পিতামাতা যে ভাবে স্নেহ মমতা করেন, যে ভাবে তাঁহারা তাহাদের মঙ্গল কামনা করেন, এক জন শিক্ষক বিভিন্ন পরিবারের বহুসংখ্যক ছাত্রের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবেন, ইহা অসম্ভব। কিন্তু ঠিক সেইরূপ ব্যবহার অসম্ভব হইলেও যত্নের গুণে অনেক দূর কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে। বালকদিগের মাতা পিতা আমার নিকটে তাঁহাদের সন্তানগুলিকে রাখিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, আমি প্রাণপণে তাহাদের প্রতিনিধিত্ব করিব, প্রাণপণে তাহাদিগকে ভাল বাসিব, এইরূপ সঙ্কল্প যদি মনে মনে থাকে, তাহা হইলে অনেক পরিমাণে যে কৃতকার্য্যও হওয়া যাইতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রসিদ্ধ শিক্ষকদিগের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে এ সম্বন্ধে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইবে। বাস্তবিক স্নেহ মমতা এবং মঙ্গল কামনা সম্বন্ধে পিতামাতার অধিক উচ্চ আদর্শ আর নাই; যে শিক্ষক এই আদর্শের যত নিকটবর্ত্তী হইবেন, শিক্ষকদিগের মধ্যে তিনি তত উন্নত স্থান অধিকার করিবেন।

শিক্ষকের দ্বিতীয় দায়িত্ব বালকের নিকট। বালক সংসারের ভাল মন্দ, মঙ্গল অমঙ্গল কিছুই জানে না; তাহার একমাত্র সম্বল নির্ভর,—সে পিতামাতা এবং শিক্ষকের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তাহার বিশ্বাস তাঁহারা তাহাকে ভাল বিষয় শিখাইবেন, মঙ্গলের পথ দেখাইবেন। এই নির্ভর, এই বিশ্বাস যাহাতে প্রতারিত না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা শিক্ষকের একটি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মোন্নতি—শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি; বালক এই উন্নতি

শিক্ষকের নিকটে প্রত্যাশা করে। শিক্ষক যে বালকের এ আশা সম্যক্‌রূপে পূর্ণ করিতে কখনও সক্ষম হইবেন, এরূপ অসঙ্গত—আকাঙ্ক্ষা কাহারও করা উচিত নহে, কারণ আত্মোন্নতি আত্মযত্নেরই ফল। তবে আমরা অবশ্য এ আশা করিতে পারি যে, বালকের প্রকৃতি-নিহিত যে আত্মোন্নতি-বীজ আছে, কর্ত্তব্য-পরায়ণ চতুর শিক্ষক যত্ন করিলে তাহা অঙ্কুরোন্মুখ করিয়া দিতে পারেন;—অঙ্কুরিত বীজে জল-সেচনদ্বারা তাহাকে ফল-পুষ্প-শোভিত বৃক্ষে পরিণত করা বালকের আত্ম-কর্ত্তব্য। শুদ্ধ তাহাই নহে। বালক-প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে, যাহাতে তাহাকে পিতামাতা বা শিক্ষকের শাসনের বাহিরে লইয়া যাইতে প্রলুব্ধ করে, যাহাতে তাহাকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া অধঃপতনের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। বিজ্ঞতা-পরিচালিত প্রীতি এবং শাসনদ্বারা বালককে এ অধোগতি হইতে ফিরাইতে কেবল শিক্ষকই সমর্থ, অতএব ইহা তাঁহার একটি প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহাও প্রচুর নহে। শিক্ষকের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কর্ত্তব্য এবং উচিত অধিকার, বালকের হৃদয়ে মহত্ত্বের জন্য আকাঙ্ক্ষা, সাধুতার জন্য পিপাসা এবং পবিত্রতার জন্য ব্যগ্রতা জন্মাইয়া দেওয়া। যে শিক্ষকের এ শক্তি আছে, তিনি দেবতা; যে বালক এ শক্তির ফল-ভোগে সমর্থ হয়, সে পরিণামে দেবত্ব লাভ করে।

শিক্ষকের তৃতীয় দায়িত্ব বালকের পরিবারের নিকটে। জননী সূতা কাটিয়া, জনক ভিক্ষা করিয়া, সহোদর মজুরী করিয়া কত কষ্টে বালককে পড়াইলেন; কিন্তু সেই দুঃখীর সন্তান যখন হাকিম হইল, তখন তাহার প্রকৃতি অতি ভয়ানক পরিবর্ত্তন ধারণ করিল। তখন সে মাতাকে সূতা কাটার জন্য, পিতাকে ভিক্ষার জন্য, এবং ভ্রাতাকে মজুরীর জন্য তিরস্কার করে,—তাঁহাদিগকে বয়স্যদিগের নিকটে আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হয়! এদিকে কিন্তু যাহাতে তাঁহাদের সূতা কাটা, ভিক্ষা এবং মজুরী ঘুচিতে পারে, তাহার কোন উপায় দেখে না। কেমন করিয়া সে উপায় দেখিবে? সকল কাযেই অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু নিজের অভাব দূর হইলে ত পিতামাতার সাহায্য? যাহা উপার্জ্জন হয়, তাহাতে নিজের আসবাব এবং পরিবারের অলঙ্কারের খরচই অতি কষ্টে চলে। ফলতঃ আরও কিছু বেতন বৃদ্ধি না হইলে পিতামাতার আর্থিক সাহায্য অসম্ভব।

এ সকল উপন্যাসের কথা নহে,—সামাজিক জীবন্ত চিত্র, বিলাতী স্বাধীন সমাজের সদ্যঃপ্রসূত ফল। ভাগ্যে এরূপ ফল খুব অধিক পরিমাণে এখনও জন্মে নাই, ভাগ্যে এই গরল-স্রোতে সমাজ প্লাবিত হইবার পূর্ব্বেই গতি ফিরিয়াছে! পিতামাতা, ভাই ভগিনী, আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, বাল্যাবধি পাঠ্যবিষয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই বালক যদি এ বিষয়েও উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা করিতে পায়, তাহা হইলে সমাজে এরূপ শোচনীয় চিত্র দেখিতে হয় না। শিক্ষা দিবার সময়ে শিক্ষক যদি বালকের পরিবারের প্রতি এই দায়িত্বটুকু মনে রাখেন, তাহা হইলে এই

অনর্থের মূল অনেক পরিমাণে উৎপাটিত হইতে পারে।

শিক্ষকের চতুর্থ এবং শেষ দায়িত্ব সমাজের নিকটে। কোন জ্ঞানী ফরাসী পণ্ডিত অন্য এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি হয়ত জান না যে এই বালকের মধ্যেই ফরাসী জাতির ভবিষ্যৎ নিহিত থাকিতে পারে।" কেমন সার কথা! একটি ব্যক্তি বিশেষের নহে, একটি পরিবার-বিশেষের নহে, একটি সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ একটি সামান্য বালকের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে! কথাটা শুনিলেই যেন কেমন আশ্চর্য্য—অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কে বলিল এই বালক এক দিন বুদ্ধ, যিশু, চৈতন্য বা রামমোহনের মত—নেপোলিয়ন, ওয়াশিংটন বা শিবজীর মত হইবে না? কে বলিল এই বালক একদিন সহস্র সহস্র পরিবারের অশ্রু মুছাইতে পারিবে না? যদি আর কখনও অকিঞ্চিৎকর শুক্তির ভিতরে বহুমূল্য মুক্তা লাভ করিয়া থাক, তবে কে বলিল যে তোমার করস্থিত এই কুৎসিত শুক্তির ভিতরে আর একটি বহুমূল্য মুক্তাফল নাই? ঐরূপ কোন মহাত্মার জীবনের পূর্ণ মহিমার সময়ে তাঁহাকে তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিলে দেশের যে ক্ষতি, মানব-সমাজের যে অপকার, একটি বালকের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষায় অবহেলা করিলেও দেশের সেইরূপ ক্ষতি, সমাজের সেইরূপ অপকার হইতে পারে।

সমাজে একটি ভাল লোক থাকিলে তাহার প্রভাবে সমাজ যত উপকৃত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যদি একজন ভাল লোকের প্রভাবে সমাজের এত উপকার হয়, তবে যে সমাজে শত শত, সহস্র সহস্র ভাল লোক থাকেন, সে সমাজের অবস্থা কেমন হইতে পারে একবার ভাবিয়া দেখ। ভাবিয়া দেখ, যে একটিমাত্র বহুমূল্য মণির অধিকারী, তাহাকে যদি আমরা ধনী বলিতে পারি, তবে যে ঐরূপ শত শত, সহস্র সহস্র মণির অধিকারী, তাহাকে আমরা কি বলিব।

এক একটি বালক এক একটি অমূল্য রত্ন। ভারতের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে এইরূপ সহস্র সহস্র অমূল্য রত্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে; ইহারাই এক দিন দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিবে, মাতৃ-মুখ উজ্জ্বল করিবে বলিয়া জননী আশা করিতেছেন! স্বদেশের হিতসাধন যেমন মহৎ, তেমনই কঠিন। যাহার হৃদয়ে কিছুমাত্র মহত্ত্বের ভাগ আছে, সেই স্বদেশের হিতসাধনের জন্য লালায়িত হয়, কিন্তু ব্যাপারটি অত্যন্ত কঠিন বলিয়াই অতি অল্প লোক ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। বাস্তবিক ইহার মত কঠিন কাজ আর নাই। ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে হইলে অনেক উৎকট সাধনা, অনেক কঠোর অভ্যাস করিতে হয়; কিন্তু স্বদেশের হিতসাধনে একটি গুণ একেবারে অপরিহার্য্য,—সে গুণটি স্বার্থ-ত্যাগ। অগ্নিদ্বারা যেমন স্বর্ণের পরীক্ষা হয়, স্বার্থত্যাগ দ্বারা সেইরূপ দেশ-হিতৈষণার পরীক্ষা হয়,—ভাক্ত দেশ-হিতৈষী এ কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না। যে কার্য্য যত কঠিন, তাহার অভ্যাস তত দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ। বাল্যাবধি

সাহিত্য-শিক্ষা হয়, গণিত-শিক্ষা হয়, স্বার্থ-ত্যাগের শিক্ষা হইয়া থাকে কি? এ শিক্ষার যে প্রয়োজন, শিক্ষক তাহা চিন্তা করিয়া থাকেন কি? এ শিক্ষা যে কেবল মুখের-কথায় হয় না, সে বিষয় তাঁহার ধারণা আছে কি? অথচ সমাজ বালকের নিকট ইহাই চায়;—সমাজ চায়, বালক শিক্ষিত হইয়া নিজে উন্নত হইবে, সুখী হইবে, দেশকে উন্নত করিবে, সুখী করিবে। গবর্ণমেণ্ট এবং ধনিগণ বালকদিগের শিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রাব্যয় করিতে-ছেন, তাহাদিগকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি আত্ম-ম্ভরি করিবার জন্য নহে, তাহাদিগকে সুবোধ স্বার্থত্যাগী করিবার জন্য। শিক্ষ-কের এ বিষয়ে দায়িত্ববোধ থাকিলে সমা-জের আশা যাহাতে পূর্ণ হইতে পারে, বালককে তিনি তাহারও উপযোগী করিতে চেষ্টা করিবেন।

অথবা এত কথার কায কি? একমাত্র ঈশ্বরের নিকট দায়িত্ব স্মরণ রাখিলেই তিনি সকল দিক বজায় রাখিয়া কর্ত্তব্য-পথে চলিতে পারেন।

ভাষা-বিবেক।

বর্ণ পরিচয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

সুশীল। আপনি কা'ল বলিয়াছিলেন দন্ত্য স ছাড়া আরও দুইটা স আছে, আ'জ আগে আমি তাই শিখিব।

দেবদাস। আচ্ছা তাই শিখ, তাহা হইলে মনে রাখিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। (শ্লেটে অক্ষর দুইটি ঠিক ছাপার মত লিখিয়া) এই দেখ, ইহার নাম তালব্য শ, আর ইহার নাম মূর্দ্ধন্য ষ।

সু। এ দুইটা অক্ষর কি কোন কথার সঙ্গে লাগে না?

দে। লাগে বই কি, যত অক্ষর আছে, সমুদায়ই কোন না কোন কথায় লাগে।

সু। আচ্ছা তবে এ দুইটা অক্ষর কি কি কথায় লাগে বলুন শুনি।

দে। আগে অক্ষর দুইটি ভাল করিয়া চিনিয়া লও, অন্য অক্ষরের সঙ্গে দেখিলে যেন ভুল না হয়।

সু। আমি কতকটা চিনিয়াছি, কিন্তু আমার বোধ হইতেছে কথার সঙ্গে শিখিলে যেন ভালরূপ মনে থাকিতে পারে। 'কলম' এবং 'কলস' এই দুই কথার সঙ্গে আমি যে কয়টা অক্ষর শিখিয়াছি, তাহা বেশ মনে রহিয়াছে, আর ভুল হই-তেছে না।

দে। আচ্ছা তবে তাহাই শিখ। তুমি 'শণ' চিন?

সু। যে শণে দড়ি হয়?

দে। হাঁ সেই শণ।

সু। তা চিনি বই কি, তবে লিখিতে জানি না।

দে। আচ্ছা আমি লিখিয়া দেখাইতেছি। (শ্লেটে ছাপার মত লিখিয়া) এই দেখ শণ। এখন পড় দেখি?

সু। তালব্য শ এর পরে এ অক্ষরটা কি ণ?

দে। হাঁ। ণ বটে, কিন্তু ইহাকে মূর্দ্ধন্য ণ বলিতে হইবে।

সু। তা বুঝিয়াছি; যেমন তিনটা স আছে, সেইরূপ তালব্য, মূর্দ্ধন্য, আর দন্ত্য, এই তিনটা ণও আছে।

দে। যখন ণকে মূর্দ্ধন্য ণ বলা হইয়াছে, তখন ইহা ছাড়া আরও যে ণ আছে, তাহা ঠিক। কিন্তু আর একটি মাত্র ণ আছে, তাহার নাম দন্ত্য ন; তালব্য ণ নাই।

সু। তাই নাকি? আমিত, মূর্দ্ধন্য ণ এর নাম শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম ণও তিনটাই আছে। সবগুলি একরকম হইলেই ভাল হইত, নানা রকম হওয়াতে মনে রাখা কিছু কঠিন। দন্ত্য ন কি রকম?

দে। তা বলিতেছি। কিন্তু তুমি যে কথার সঙ্গে মূর্দ্ধন্য ষ দেখিতে চাহিয়াছিলে?

সু। আমি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আচ্ছা আগে একটা কথা দিয়া মূর্দ্ধন্য ষ দেখাইয়া দেন, তার পরে দন্ত্য ন দেখিব।

দে। (শ্লেটে 'ঔষধ' শব্দটি লিখিয়া) দেখ দেখি এ কথাটা পড়িতে পার কি না?

সু। সমস্তটা ত পড়িতে পারি না, কেবল মধ্যের মূর্দ্ধন্য ষ টাই পড়িতে পারিতেছি। আগে এবং পরে এ দুইটা অক্ষর কি?

দে। প্রথম অক্ষরটার নাম ঔ, আর শেষের অক্ষরটার নাম ধ। এ দুইটিও চিনিয়া রাখ।

সু। আচ্ছা তা রাখিতেছি। ঔ, মূর্দ্ধন্য ষ, ধ, ঔষধ; 'মূর্দ্ধন্য' কথাটা বলিতে হইবে না ত?

দে। না, পড়িবার সময়ে তালব্য, মূর্দ্ধন্য, বা দন্ত্য কিছুই বলিতে হইবে না।

সু। বুঝিয়াছি। ইহার আগে কি কথাটা শিখিয়াছিলাম? হাঁ, তালব্য শ, আর মূর্দ্ধন্য ণ, শণ, তালব্য বা মূর্দ্ধন্য বলিতে হইবে না। আর যে ঔ এবং ধ দুইটা অক্ষর শিখিলাম, ইহাদের ত দন্ত্য বা মূর্দ্ধন্য কিছু বলিলেন না?

দে। ঔ এবং ধ কেবল একটি করিয়াই আছে, সুতরাং ঔকে ঔ এবং ধকে ধ বলিলেই যথেষ্ট।

সু। বেশ, এইরূপ এক একটা অক্ষর এক এক রকমের থাকিলেই শিখিতে এবং মনে রাখিতে কোন গোলমাল হয় না। এখন দন্ত্য নটা শিখিতে পারিলেই হয়। মূর্দ্ধন্য ণ শিখাইবার সময়ে আর একটা দন্ত্য ন এর কথা বলিয়াছিলেন না?

দে। হাঁ বলিয়াছিলাম, তুমি যে সে কথা ভুলিয়া যাও নাই, ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি যে বেশ মনোযোগ দিয়া শিখিতেছ, ইহাতে তাহার বেশ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

সু। মনোযোগ দিব না কেন? ইহাতে আমার বেশ আমোদই বোধ হই-

তেছে, আর ইহার পরে আমি বড় বড় বই পড়িতে পারিব মনে করিয়া আমার মনে মনে কত আনন্দ হইতেছে। বাবার উপরে কিন্তু আমার বড় রাগ হইতেছে। যদি আরও কিছু দিন আগে তিনি আমায় পড়াইবার জন্য আপনাকে রাখিতেন, তাহা হইলে এত দিনে আরও কত শিখিয়া ফেলিতাম, হয় ত এখন বইও পড়িতে পারিতাম।

দে। তুমি ছেলে মানুষ, তাই তোমার বাবার উপর তোমার রাগ হইতেছে। তিনি বড় বুদ্ধিমান লোক, তাই এত দিন তোমায় লেখা-পড়া শিখিতে দেন নাই। একেবারে কচি মাথায় লেখা পড়া শিখাইলে তাহা শিখিতে ছেলের বড় কষ্ট হয়, আর শেষটা শরীর একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এখন দেখ লেখা পড়া শিখিতে তোমার কেমন আমোদ হইতেছে, কেমন মনোযোগ দিয়া শিখিতেছ, আর সুবোধ ছেলের মত কত কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতেছ। কিন্তু আর পাঁচ বছর আগে শিখাইতে বসিলে তুমি কিছুই বুঝিতে পারিতে না, কাযেই পড়িতে ভাল লাগিত না এবং কিছু শিখিতেও পারিতে না। তখন এক সপ্তাহে যাহা শিখিতে না পারিতে, এখন একদিনে তাহা শিখিতে পারিবে, আবার শিক্ষাতে আমোদও পাইবে। ইহা কি ভাল হয় নাই?

সু। আমি ত এত কথা ভাবি নাই! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য হইলে বাবা অবশ্যই ভাল কায করিয়াছেন। কিন্তু অনেকটা সময় বৃথা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমার কষ্ট হইতেছে।

দে। ইহাও তোমার ভুল। তুমি কয়েকটি অক্ষর শিখিয়া বই পড়িতে পার নাই বলিয়া কি তোমার শিক্ষা হয় নাই? এই যে তুমি এত সুবোধ ও সচ্চরিত্র হইয়াছ, আর সকলেই তোমার আচরণে সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বদা তোমার প্রশংসা করিতেছে, ইহা কি বিনা শিক্ষায় হইয়াছে? তোমাকে এরকম ভাল করিবার জন্য তোমার পিতা-মাতা কত যত্ন করিয়া কিরূপে কত বিষয়ে তোমাকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা তুমি এখন বুঝিতে পারিবে না। বড় হইলে যখন এসব বুঝিবে, তখন তাঁহাদের উপর তুমি কত সন্তুষ্ট হইবে, আর তাঁহাদের কত প্রশংসা করিবে।

সু। আপনার সব কথা বুঝিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু কথাগুলি শুনিতে বেশ ভাল লাগিল। আচ্ছা, আমি যদি সে সব কথা এখন না বুঝিতে পারি, তবে থাকুক। এখন আমাকে দন্ত্য ন টা বুঝাইয়া দেন।

দে। বসিবার আসন দেখিয়াছ?

সু। আসন আবার দেখি নাই! আমাদের ঘরেই কয়েক খান আছে।

দে। (শ্লেটে 'আসন' শব্দটি লিখিয়া) এই দেখ, আসন এইরূপে লিখিতে হয়।

সু। ইহার মধ্যে দন্ত্য স চিনি।

দে। আর দুইটা অক্ষর চিনিলেই হইল। প্রথম অক্ষরটি আ, আর শেষের অক্ষরটি দন্ত্য ন।

সু। বেশ! দন্ত্য ন শিখিতে যাইয়া আবার একটি নূতন আ শিখিলাম।

দে। বল দেখি এ যাবৎ কয়টি অক্ষর শিখিলে? যদি একদিকে শিখিতে শিখিতে

অন্য দিকে আগে যাহা শিখিয়াছ তাহা ভুলিয়া যাও, তবে সে শিক্ষায় কোন লাভ নাই।

সু। ভুলিব কেন? আমি যে কয়টি অক্ষর শিখিয়াছি, তাহা আমার বেশ মনে আছে। এই দেখুন আমি বলিতেছি;—ক, ল, ম, দন্ত্য স, তালব্য শ, মূর্দ্ধন্য ষ, মূর্দ্ধন্য ণ, দন্ত্য ন, আ। এ কয়টি অক্ষর যে খানেই থাকুক না কেন, আমি চিনিয়া লইতে পারিব। আজ আর ভাল লাগিতেছে না, আবার কা'ল শিখিব।

মে। আচ্ছা যদি ভাল না লাগে, যাও, এখন খেলা কর গিয়া।

ছাত্রোপদেশ।

২—শ্রদ্ধা।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, যাহা ভাল, তাহাই অভ্যাস করিতে থাক, অভ্যাসবলে অতি কঠিন বিষয়ও তোমার আয়ত্ত হইবে, এবং তোমাকে আনন্দিত করিবে। কিন্তু এ স্থলে একটি সমস্যা উপস্থিত হইতেছে। কোন্‌টি ভাল আর কোন্‌টি মন্দ, তাহা জানিলে ত তুমি ভালটি পছন্দ করিবে, এবং তাহার অভ্যাসে যত্নশীল হইবে? কিন্তু বালকের পক্ষে প্রথমতঃ ভালটি চিনিয়া লওয়াই যে বিষম কঠিন! বালকেও অবশ্য ভাল মন্দ বিচার করিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে বিচার অনেক সময়েই ঠিক হয় না। খেলা-ভূমি এবং পাঠশালা, অথবা সন্দেশ এবং 'শিশুশিক্ষা,' ইহার মধ্যে একটি নির্ব্বাচন করিবার ভার বালকের প্রতি অর্পণ করিলেই বালকের ভাল-মন্দ-বিচার-শক্তি কেমন প্রখর, তাহা সহজে অবধারণ করা যাইতে পারে। যে সন্দেশ পাইলে 'শিশুশিক্ষা' ভুলিয়া যায়, অথবা যে খেলা-ভূমিতে সমস্ত দিন কাটাইয়াও তৃপ্ত হয় না, কিন্তু পাঠশালাতে দুই চারি ঘণ্টা থাকিতে হইলেও অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে, সে কেমনে নিজের ভাল নির্ব্বাচন করিয়া লইবে? আমরা যে স্থলে নিজে অক্ষম, সে স্থলে অন্যের সাহায্য না লইলে আমাদের চলে না। জ্ঞানের অল্পতা-নিবন্ধন বালক নিজের ভাল মন্দ নির্ব্বাচন করিতে অক্ষম, সুতরাং তাহাকে পিতা, মাতা, এবং শিক্ষকের শরণাপন্ন হইতে হইবে,—যখন সে নিজে প্রকৃত পথ চিনে না, তখন তাহাকে তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথেই চলিতে হইবে।

অতএব শ্রদ্ধার নিতান্ত প্রয়োজন, অপরিণত বিচার-শক্তি বালকের পক্ষে শ্রদ্ধা অনিবার্য্য। কিন্তু শ্রদ্ধা কি? পূজ্য ব্যক্তির প্রতি অনুরাগকে সাধারণতঃ শ্রদ্ধা বলে।

বিশ্বাস, ভক্তি এবং নির্ভরের সঙ্গে শ্রদ্ধার পার্থক্য কতটুকু, এ স্থলে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

কোন ব্যক্তি আশানুরূপ কার্য্য করিবে বলিয়া মনের যে সন্দেহ-রহিত ধারণা, অন্তঃকরণের যে নিশ্চিত ভাব তাহাই বিশ্বাস। উপদেশানুরূপ কার্য্য করিবে মনে করিয়া শিক্ষক ছাত্রকে বিশ্বাস করিতে পারেন, আদেশানুরূপ কার্য্য করিবে মনে করিয়া প্রভু ভৃত্যকে বিশ্বাস করিতে পারেন। এই বিশ্বাস যখন একগ্রাম উপরে উঠে, যখন বিশ্বাসের সঙ্গে সম্মানের ভাব সম্মিলিত হয়, তখন তাহাকে শ্রদ্ধা বলা যায়। শিক্ষক সুশিক্ষা বই কুশিক্ষা দিবেন না, সুপথ বই কুপথ দেখাইবেন না, হিত-কামনা বই অহিত-কামনা করিবেন না, ইহাই শিক্ষকের প্রতি বালকের বিশ্বাস; শিক্ষকের সাধু এবং পবিত্র চরিত্র-জনিত সম্মানের ভাব যখন এই বিশ্বাসের সহিত মিলিত হয়, তখন ইহাকে শ্রদ্ধা বলা যায়। ভক্তি আর এক গ্রাম উচ্চে অবস্থিত। পিতা, মাতা, এবং ঈশ্বরের প্রতি এই বৃত্তি স্ফূর্ত্তি পায়। ইহা বিশ্বাস, সম্মান, এবং মঙ্গল-ভাবের সমবায়। কিন্তু এই সমবায় কার্য্য-কারণ-সম্ভূত নহে, উহা মানবের প্রকৃতি-সিদ্ধ। কোন ব্যক্তি বিশেষকে শ্রদ্ধা করি কেন, জিজ্ঞাসা করিলে তাহার দুই চারিটা কারণ দর্শাইতে পারি, কিন্তু ভক্তি করি কেন, এ প্রশ্ন করিলে হয়ত নির্ব্বাক্ থাকিতে বাধ্য হইব। ভক্তি একরূপ অননুভূত বন্ধন-বিশেষ,—বাঁধা রহিয়াছি, অথচ বন্ধন দেখিতে পাইতেছি না। ভক্তিতে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া, ভক্তি-পাত্রের প্রতি নিজের মঙ্গলামঙ্গলের ভার দিয়া সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত থাকাই নির্ভর। জননীর প্রতি শিশু সন্তানের, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, এবং ঈশ্বরের প্রতি সাধুভক্তের এই রূপ নির্ভর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রদ্ধা কি, তাহা একরূপ বুঝা গেল। শিক্ষা-সম্বন্ধে বালকের পক্ষে ইহার নিতান্ত প্রয়োজন। শিক্ষকের প্রতি যে বালকের শ্রদ্ধা নাই, সে কেমন করিয়া জ্ঞান-লাভে অধিকারী হইবে? এ সম্বন্ধে বালকদিগের মনে একটি বিষম কুসংস্কার আছে, তাহা দূর করা নিতান্ত প্রয়োজন। শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধার জন্য বালককে উপদেশ দিলে বালক মনে করে, উপদেষ্টার হৃদয়ে শ্রদ্ধার লালসা বড়ই বলবতী, তাই তিনি বালককে শ্রদ্ধার উপদেশ দিতেছেন; কিন্তু বাস্তবিক শ্রদ্ধাতে বালকের কোন উপকার নাই। অনেক শিক্ষক বালকদিগের এই ভ্রমের বিষয় অবগত আছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা বালকদিগের মন হইতে এই ভ্রম দূর করিতে চেষ্টা করেন না; তাঁহারা মনে করেন, এ বিষয়ে উপদেশ দিতে গেলে যে শ্রদ্ধাটুকু আছে, তাহাও চলিয়া যাইবে। তাঁহাদের এ আশঙ্কা একেবারে নিষ্কারণ নহে,—কোন যুক্তি না দিয়া, কোন প্রয়োজন না দেখাইয়া কেবল "আমাকে শ্রদ্ধা কর" এই কথা বলিলে শ্রদ্ধা জন্মিবার কোন কারণ নাই, বরং যে শ্রদ্ধাটুকু আছে, তাহা চলিয়া যাইবারই কথা। কিন্তু এরূপ যুক্তি-বিহীন ফাঁকা কথাকে উপদেশ বলা যাইতে পারে না, পণ্ডিতের মুখ হইতে বাহির হইলেও ইহা মূর্খতার বিজ্ঞাপন মাত্র। আমা-

দের বিশ্বাস, বালক-হৃদয়ে শ্রদ্ধার ভাব প্রকৃতি-সিদ্ধ; প্রকৃত শ্রদ্ধার পাত্র হইলে, এবং শ্রদ্ধার উপকারিতা বালকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারিলে, বালকের হৃদয় এমন অপদার্থ নহে যে তাহা উপেক্ষা করিবে।

শ্রদ্ধার এই কয়েকটি উপকারিতা বালকদিগের বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

প্রথম। শিক্ষকের মনে যদি বিশ্বাস থাকে যে বালকেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, তাঁহার উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয় উৎসাহে প্রফুল্ল হয়। এই উৎসাহ-জনিত প্রফুল্লতার ফল স্বকর্ত্তব্যে অনুরাগ, বালকের মঙ্গল সাধনে একাগ্রতা, এবং উপদেশে মধুরতা। এই অনুরাগ, একাগ্রতা, এবং মধুরতাকে শিক্ষকের হৃদয়ের শক্তি বলা যাইতে পারে। এপ্রকার শক্তিশালী হৃদয় হইতে সমুদ্গত উপদেশ, শক্তিশালী হস্তস্থিত লৌহ-শাবলের ন্যায়, পাষাণ-হৃদয়েও রেখা-পাত করিতে পারে। শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েই ক্ষণমাত্র চিন্তা করিলে একথার সারবত্তা বুঝিতে পারেন। যে দিন শিক্ষক ছাত্রের আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া বিমর্ষভাবে আসনে উপবেশন করেন, সে দিনটাই অনর্থক যায়,—শিক্ষক অসন্তুষ্ট-চিত্তে নিয়মিতরূপে কতকগুলি কথা বকিয়া যান মাত্র, কিন্তু তাহা ছাত্রের হৃদয়ে স্থানলাভ করিতে পারে না। ইহাতে শিক্ষকেরও ক্ষতি আছে বটে, কিন্তু ছাত্রের ক্ষতি অসীম।

দ্বিতীয়। আদরের সহিত যে বস্তু গ্রহণ করা যায়, তাহাই প্রকৃত কাযে লাগে। তুমি একজন বন্ধুকে একখানি পুস্তক উপহার দিয়া দেখ, তিনি কি ভাবে উহা গ্রহণ করেন। যদি তিনি বেশ আদরের সহিত ইহা গ্রহণ করেন, উপহারটি পাইয়া কৃতার্থ হইলেন, এমন ভাব যদি তাঁহার চেহারায় এবং আচরণে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও ইহা তিনি আগ্রহের সহিত পড়িয়া উপকার লাভ করিবেন। কিন্তু পুস্তক খানি পাইয়া যদি বাম হস্ত দ্বারা এক পার্শ্বে রাখিয়া দেন এবং সে সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া তোমার সঙ্গে বা অন্যের সঙ্গে অন্য বিষয়ের আলাপ আরম্ভ করেন, তাহা হইলে উপহার-গ্রহীতা সে পুস্তক হইতে কতদূর উপকার লাভ করিবেন, তাহা কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পার। তুমিও নিতান্ত বেহায়া না হইলে যে ঐ বন্ধুকে এজন্মে আর কিছু উপহার দিবে, এমন বোধ হয় না। বৃষ্টির জল পাষাণে এবং মৃত্তিকায় সমান ভাবে বর্ষিত হইয়া থাকে; মৃত্তিকা সেইজন্ম কেমন আগ্রহের সহিত শোষণ করে, এবং সেজন্য কেমন উর্ব্বরতা লাভ করে! কিন্তু পাষাণ উন্নত-মস্তকে অভেদ্য থাকিয়া সমস্ত জল প্রত্যাখ্যান করে, সুতরাং চিরদিন পাষাণই থাকিয়া যায়। তুমি শ্রদ্ধার সহিত, আগ্রহের সহিত যে বস্তুটি গ্রহণ কর, তাহা চির দিন তোমার মনে থাকিয়া যায়,—কোথায়, কোন্ সময়ে, কাহার নিকটে, কি উপলক্ষে বস্তুটি পাইয়াছ, তাহা চিরদিনের জন্য তোমার মনে থাকিয়া যায়; কিন্তু অবহেলার সঙ্গে যদি তাহা গ্রহণ করিয়া থাক, তবে দুই চারি দিন পরেই হারাইয়া যাইবে, আর খুঁজিয়া পাইবে না। জ্ঞানসম্বন্ধেও এই

কথা,—যাহা অশ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে, তাহা অতি শীঘ্রই হারাইয়া ফেলিবে। এক শ্রেণীতে দশটি বালক অধ্যয়ন করে। অধ্যাপিত বিষয়ে প্রশ্ন হইল; দুইটি মাত্র বালক যথাযথ উত্তর দিল, অবশিষ্ট আটটিই হা করিয়া রহিল, যেন এসব কথা তাহারা কোন দিন শুনেও নাই! ইহার কারণ, এই অপারগ বালকদিগের সমালোচনার রুচিটা কিছু বেশী, সুতরাং তাহাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার ভাগ সেই পরিমাণে কম; তাই তাহারা যাহা পাইয়াছিল, তাহা হারাইয়া বসিয়াছে। শ্রদ্ধার সঙ্গেও সমালোচনা থাকিতে পারে, কিন্তু এখানে যে সমালোচনার কথা বলিলাম, তাহা সেরূপ সমালোচনা নহে, তাহাকে নিষ্কারণ অশ্রদ্ধা বলিলে বোধ হয় মন্দ হয় না।

তৃতীয়। জ্ঞান লইয়াই শিক্ষকের ব্যবসায়। তিনি তোমাকে যাহা বলেন, তাঁহার নিজেরই হউক আর পরেরই হউক, তাহা জ্ঞানের কথা। যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু হিতকর, শিক্ষক তাহাই ছাত্রকে বলিয়া থাকেন। যদি শিক্ষককে অশ্রদ্ধা কর, তাঁহার কথাকেও অবশ্যই অশ্রদ্ধা করিবে, সুতরাং সেই কথার মধ্যে যে সুন্দর জ্ঞান নিহিত আছে, তাহার প্রতি কিরূপে তোমার শ্রদ্ধা হইবে? এই অশ্রদ্ধারূপ বিষ-বীজ এক সময়ে তোমার সর্ব্বনাশ করিবে, তোমার ভবিষ্যৎ জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিবে। আজ হাসিতে হাসিতে যে সর্প-শাবকের সঙ্গে খেলা করিতেছ, এক দিন ইহারই দংশনে তোমার প্রাণান্ত হইবে। যখন এই অশ্রদ্ধা অভ্যাস-বলে তোমার হৃদয়ে দৃঢ়মূল হইয়া যাইবে, তখন জগতে যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু মহান্, যাহা কিছু জ্ঞান-গর্ভ, যাহা কিছু আত্মার উন্নতিকর, তাহার কিছুতেই তোমার শ্রদ্ধা হইবে না; সুতরাং আকারে মানুষ হইলেও পবিত্রতা, মহত্ত্ব, জ্ঞান এবং আত্মোন্নতি হইতে বঞ্চিত থাকিবে। যে জ্ঞানদাতাকে অশ্রদ্ধা করিতে পারে, সে যে কিছু দিন পরে জন্মদাতা, অন্নদাতা বা জীবন-দাতাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবে, ইহাই স্বাভাবিক। এ দুর্দ্দশাকে দূরে রাখিতে হইলে,—আপনাকে সুখী, পবিত্র, মহৎ, ধার্ম্মিক করিতে হইলে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

তবে কি শিক্ষক হইলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে,—তাঁহার চরিত্র বা যোগ্যতার বিচার করিতে হইবে না? এ প্রশ্নের উত্তর কিছু কঠিন বটে; কিন্তু আমাদের পরামর্শ, অভিভাবক এবং তত্ত্বাবধায়কের হাতে এ প্রশ্ন-মীমাংসার ভার দিয়া তুমি শ্রদ্ধাপূর্ণ-হৃদয়ে শিক্ষা করিতে থাক? শিক্ষক তোমাকে শিক্ষা দিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত কি না, তোমার শিক্ষা-বিধান যাঁহারা করিতেছেন, সেই অভিভাবক এবং তত্ত্বাবধায়ক এবিষয় যেমন ভাল জানেন, তুমি তেমন জান না,—জানিতেও পার না। যাঁহারা তোমার শিক্ষার জন্য এত যত্ন, এত অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাঁহারা জ্ঞাতসারে তোমাকে কুশিক্ষকের হাতে রাখিবেন না, তাঁহারা যখন আপন কর্ত্তব্য সম্পূর্ণরূপে বুঝিবেন, তখন বিদ্যালয়ে কুশিক্ষকের নাম গন্ধও থাকিবে না।

কেবল আমরাই যে নূতন এই শ্রদ্ধার জন্য অনুরোধ করিতেছি, এমত নহে; গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম-জ্ঞান-পিপাসু অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং
তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।"

শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি তৎপর অর্থাৎ জ্ঞানলাভে একান্ত চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়-জয়ী হইলে তবে সে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। বাস্তবিক জ্ঞান্ যেমন উচ্চ বস্তু, তাহা লাভ করাও সেইরূপ কঠিন।

অতএব জ্ঞান-লাভে কৃতকার্য্য হইবার ইচ্ছা থাকিলে শ্রদ্ধার সহিত শিক্ষায় প্রবৃত্ত হও; অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, কোন্ বিষয় তোমার আত্মার পক্ষে হিতকর, শ্রদ্ধার সহিত জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা জানিয়া লও।

মাতৃকা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

তবে কি আমরা নিরাশ হইব? আমাদের উৎসাহী শিক্ষিত যুবকবৃন্দ থাকিতে সমাজের এই গুরুতর কল্যাণকর কার্য্যের কি অনুষ্ঠান হইবে না? ইঁহাদিগের ক্ষমতা কত, সমাজের মঙ্গলসাধনে ইঁহাদিগের শক্তি ও সুযোগ কত, এখনই আমরা তাহার প্রচুর প্রমাণ পাইয়াছি। গবর্ণমেন্টের যত্ন এবং পণ্ডিতদিগের বাগ্মিতায় যাহার বিশেষ কিছু হইতে পারে নাই, এই যুবকদিগের নীরব এবং নিরাড়ম্বর যত্নে সেই স্ত্রী-শিক্ষার আজ কেমন উন্নতি হইতেছে। ইঁহাদিগের যত্নে আজ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে লক্ষ্মী সরস্বতী সম্মিলিত হইতেছেন। ইঁহাদের প্রবর্ত্তিত-পরীক্ষা প্রণালীতে ধাতৃশিক্ষা এবং মাতৃশিক্ষা সন্নিবেশিত হওয়াতে শিশুদিগের অশেষ উপকার হইতেছে; আমরা আশা করি, ইঁহারা এখন হইতে মাতৃকা-শিক্ষার দিকেও মনোযোগ দিবেন। শ্রীহট্ট-সম্মিলনী, বিক্রমপুর-সম্মিলনী, ফরিদপুর-সুহৃৎ সভা, ময়মনসিংহ-সম্মিলনী, যশোহর-সম্মিলনী, পাবনা-সম্মিলনী এবং মধ্যবঙ্গ-সম্মিলনী প্রভৃতির সভ্যদিগের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবটি একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন।

যে সকল বিধবা শিশুদিগের শিক্ষা কার্য্যকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিবেন, আমরা তাঁহাদিগকে মাতৃকা নামে অভিহিত করিলাম, তাঁহাদিগের পবিত্র ব্রতের তুলনায় ইহা অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী নাম আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না।

প্রস্তাবিত মাতৃকা-শিক্ষা প্রচলিত হইলে সমাজের যে আর একটি মহান্ উপকার সাধিত হইবে, এস্থলে তাহারও উল্লেখ করা উচিত মনে করি। সমাজে এমন অনেক বিধবা আছেন, যাঁহাদের পুত্র

নাই, আত্মীয় বন্ধু নাই, অন্ন বস্ত্রের সংস্থান নাই। নানা উপায়ে ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, যে সকল রমণী পাপ-পথে পদার্পণ করে, তাহাদের অধিকাংশকেই এইরূপ সঙ্কটাবস্থায় পড়িয়া বাধ্য হইয়া নিজের ইচ্ছার প্রতিকূলে নরকের দ্বারে প্রবেশ করিতে হয়। এদিকে অনেক সম্পন্ন পরিবারে লোকাভাব বিশেষরূপে অনুভূত হয়; যদি তাঁহাদের শিশু-সন্তান গুলির যত্ন করিবার ভার কেহ হাতে লয়, তাহা হইলে যেন তাঁহারা হাতে স্বর্গ পান। কিন্তু হিন্দুর কুল-রমণী অনাহারে মরিবেন, তথাপি পরের বাড়ীতে চাকুরী করিতে যাইবেন না। যদি মাতৃকা-শিক্ষার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে এই উভয় পক্ষের অভাব দূর হইয়া হিন্দু-সমাজের পরম মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। হিন্দু-বিধবা চাকরাণীর কায করিতে নারাজ বটে, কিন্তু মাতৃকা নাম গ্রহণ করিয়া, মাতৃ-তুল্য সম্মানের সহিত শিক্ষয়িত্রীর পদে আরোহণ করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লজ্জিত হইবেন না। ইহাতে তাঁহার পক্ষে সুখ এবং স্বার্থ উভয়ই আছে। তিনি পরের গলগ্রহ না হইয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, এবং রমণী-হৃদয়ে যে ঈশ্বর-দত্ত অপত্য-স্নেহ আছে, তাহাও চরিতার্থ হইবে। যে নিঃসন্তান হিন্দু-বিধবা বিড়াল শাবককে 'ফুলমণি' 'যাদুমণি' 'কুসুম কুমারী' প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর নামে অভিহিত করেন এবং তাহাকে সন্তানের মত যত্ন করিয়া সুখী হন; গাছের সঙ্গে গাছের বিবাহ দিয়া পুত্রোৎসবের সুখ অনুভব করেন; তিনি যে মনুষ্য-সন্তানের যত্ন করিবার অবসর পাইলে কৃতার্থ হইবেন, সেই সন্তানেরা মা বলিয়া ডাকিলে আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিবেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

সুবাক্য-ভাণ্ডার।

সুলেখক।

স্পষ্ট, দ্রুত, শুদ্ধভাবে যে লিখিতে পারে,
বলেন পণ্ডিতগণ সুলেখক তারে।
সমানে অক্ষর গুলি হইলে সুন্দর,
সোণায় সোহাগা যেন মনোমুগ্ধকর।

কুলেখক।

পদে পদে বর্ণাশুদ্ধি, অস্পষ্ট অক্ষর,
ছোট বড় বর্ণ, পাঁতি অসম-অন্তর,
লিখিতে লিখিতে মুছি বিতিকিচ্ছা করে,
হাতটি অত্যন্ত ধীর—কলম না সরে;
লিখনেতে এত দোষ যাহার প্রকাশ,
কুলেখক বলি লোকে করে উপহাস।

সুপাঠক।

নড়ে না পা, হাত, সোজা দেহ নাই দোলে,
যেখানে যে ভাব, স্বর তার মত চলে,
না থাকিবে অহঙ্কার, ভয় না থাকিবে,
চিহ্নে চিহ্নে যথাযুক্ত বিরাম লইবে;
কৃত্রিমতা কর্কশতা করি পরিহার,
সহজে বলিবে, যেন কথা আপনার।

কুপাঠক।

না জানে দাঁড়াতে সোজা, হাত, পা চঞ্চল,
শব্দ উচ্চারিতে ভুল করে অবিরল,
শব্দের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে না জানে,
দুই চারি ভিন্ন শব্দ বলে একটানে,
চিহ্নের রাখে না খোঁজ, নাহি অর্থ-বোধ,
না হইতে বাক্য শেষ করে স্বর-রোধ,
কিম্বা এক বাক্য পরে অন্য বাক্য ধরে,
কোথায় থামিতে হবে বুঝিতে না পারে;
অস্পষ্ট জড়িত স্বর বুঝা নাই যায়,
কুপাঠ শুনিলে কার হাসি নাহি পায়?

সুরচক।

সংক্ষিপ্ত, সসার, আর সরল, সরস,
এই চারি গুণযুক্ত রচনার যশ।

কুরচক।

ভাব নাই, অর্থ নাই, লম্বা লম্বা কথা,
ছাঁদ নাই, বাঁধ নাই, নাই পাছা মাথা,
এক কথা না হইতে আর কথা পাড়ি,
গ্রন্থ গ্রন্থকার-নাম লেখে ঝুড়ি ঝুড়ি,
রস-শূন্য, মন্দ-রুচি, ব্যাকরণ-হীন,
জঘন্য রচনা লোকে নিন্দে চিরদিন।

সুকথক।

বলিবার বিষয়টি আগে স্থির করে,
কিরূপে বলিতে হবে ভাবে তার পরে;
একে একে চিন্তাগুলি মনেতে সাজায়,
বলিবার কালে যেন ভুলিয়া না যায়;
ভাবিয়া ভাবিয়া কথা ধীরে ধীরে বলে,
অথচ বাক্যের স্রোতঃ অনর্গল চলে;
কথায় ভাবেতে ভাল ঐক্য যদি বয়,
সতেজ সরস বাক্য অবশ্যই হয়।
বিশ্বাস, দৃঢ়তা, আর থাকিলে বিনয়,
নিশ্চয় সে আকর্ষিবে শ্রোতার হৃদয়।
হইবে মনোজ্ঞভাবে অঙ্গের সঞ্চার,
না করিবে আস্ফালন, বিকট চীৎকার।

কুকথক।

মনে ভাব নাই, তবু বলিবারে চায়;
বাঙ্গালা কথার মাঝে ইংরাজী মিশায়;
তার সঙ্গে মুদ্রা-দোষ থাকে ষোল আনা,—
'বুঝেছেন,' 'শুনেছেন,' 'বুঝিলেন কিনা;'
যে সব কথার মাঝে নাই কিছু সার,
ফিরিয়া সে সব কথা বলে বার বার;
'চুপকর' না বলিলে কথা নাহি ছাড়ে,
লজ্জা অপমান-বোধ কিছু নাই ধড়ে;
বাগ্মিতায় হাস্যকর এরূপ প্রয়াস
যে করে, সকলে তারে করে উপহাস।

প্রথম ভাগ।] আষাঢ়, ১২৯৬। [৩য় সংখ্যা।

আদর্শ হিন্দু-বিধবা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর পুণ্য-নাম-পূত

শিক্ষা-পরিচর

শিক্ষাবিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ,।

সূচী।

কলিকাতা

৯২ নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট; বরাট প্রেসে

শ্রীকিশোরীমোহন সেন দ্বারা মুদ্রিত

এবং

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৶০। পশ্চাদ্দেয় নাই। ডাক মাশুল লাগে না।

[প্রতি খণ্ডের মূল্য ৶০ আনা।]

[illegible] মাচরেৎ॥” বিষ্ণুশর্ম্মা। “Train up a child in the way he should go; and when he is old he will not depart from it.” Eng. Bible.—“The master is the best book, the most natural and efficient channel of communication.” D. Stow.—“Too generally words have been communicated without ideas.” D. Stow. “Be exact in your thoughts.” Lord Reay.—“The child is father of the man.” Wordsworth.—“The subject which involves all other subjects, and therefore the subject in which education should culminate, is the Theory and Practice of Education.” H. Spencer.—“True education is practicable only by a true philosopher.” H. Spencer.—“All breaches of the laws of health are physical sins.” H. Spencer.—“What is needed for the rooting out of vices is not legislation so much as education aided of course by example.” *Hope.*—“It is the greatest curse of ignorance it knows not how ignorant it is.” *Christian Life.* “অনন্ত শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ। যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রং॥ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। “—a sound mind in a sound body.” Locke.

গ্রাহকের জ্ঞাতব্য।

১। এই পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৸৴০ এক টাকা দশ আনা। পাঁচ, বা ততোধিক গ্রাহক একত্রে লইলে প্রত্যেকের ১৷৴০ এক টাকা ছয় আনা লাগিবে। মূল্য পরে লইবার নিয়ম নাই। কিন্তু পত্রিকা পাইলেই মূল্য পাঠাইয়া দিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া কোন শিক্ষক পত্র লিখিলে তাঁহার নিকট পত্রিকা প্রেরিত হইবে। ইচ্ছা করিলে তিনি নিজের ছাত্র বা ছাত্রীর জন্যও এইরূপ পত্র লিখিতে পারেন, কিন্তু ইহার মূল্যের জন্য তিনিই দায়ী থাকিবেন।

২। গ্রাহকগণ চিঠিপত্র, প্রশ্নোত্তর বা মূল্য পাঠাইতে নিজ নামের সঙ্গে নিজ নিজ নম্বরের উল্লেখ করিবেন, এবং তিনি শিক্ষক বা ছাত্র হইলে তাহাও লিখিবেন।

৩। চিঠিপত্র, প্রবন্ধ ও মূল্যাদি সমস্তই সম্পাদকের নামে “পুঁঠিয়া, রাজসাহী” এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। কলিকাতার গ্রাহকগণ বরাট প্রেসে শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে রসিদ লইয়া তাঁহাকে মূল্য দিতে পারেন।

৪। কেহ বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ পত্র লিখিয়া নিয়মাদি জানিবেন।

৫। গ্রাহকগণ স্ব স্ব নাম, ধাম ও নম্বর স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন।

৬। কাহারও কিছু জানিবার থাকিলে রিটার্ণ পোষ্টকার্ডে পত্র লিখিবেন।

৭। প্রকাশার্থ বা পুরস্কারের জন্য যিনিই যে কোন প্রবন্ধ লিখিবেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক ভাল কালি কলম দিয়া ভাল কাগজের কেবল এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শিক্ষা-পরিচর।

১ম ভাগ। | আষাঢ় ১২৯৬ সাল। | ৩য় সংখ্যা।

শিক্ষার উদ্দেশ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভারতের উপরে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠতা কিসে? কেবল বিজ্ঞানের বলে। ভারতের বণিক অপেক্ষা ইংলণ্ডের বণিক অধিক অর্থশালী, কেবল বিজ্ঞানের বলে; ভারতের সৈন্য অপেক্ষা ইংলণ্ডের সৈন্য অধিক পরাক্রান্ত, কেবল বিজ্ঞানের বলে; ভারতের শিল্পী অপেক্ষা ইংলণ্ডের শিল্পী অধিক নৈপুণ্যশীল, কেবল বিজ্ঞানের বলে; ভারতের অধিবাসী অপেক্ষা ইংলণ্ডের অধিবাসী অধিক দীর্ঘজীবী, কেবল বিজ্ঞানের বলে। সংক্ষেপে, ভারতবাসী অপেক্ষা ইংলণ্ডবাসীর সুখ সৌভাগ্য অধিক কেবল বিজ্ঞানের বলে। ভারতের তন্তুবায় যতক্ষণে একখান বস্ত্র বয়ন করে, ইংলণ্ডের তন্তুবায় ততক্ষণে বিজ্ঞান-বলে সহস্র বস্ত্র বয়ন করে, তাই আজ ভারতের তন্তুবায় নিরন্ন, আর ইংলণ্ডের নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিয়া আমরা লজ্জা নিবারণ করি। এই প্রকার সকল ব্যবসায়ে। কোন আমেরিক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের কর্ম্মকার যতক্ষণে একবার হাতুড়ি মারিতে পারে, যখন আমেরিকার কর্ম্মকারগণ ততক্ষণে দুই বার হাতুড়ি মারিতে পারিবে, তখন ইংলণ্ডের বাণিজ্য আমেরিকার বাণিজ্যের নিকট পরাস্ত হইবে। একথাটি অতি মূল্যবান্। কিন্তু এরূপ শ্রেষ্ঠতা লাভের উপায় কি? কেবল বিজ্ঞানের আরাধনা—বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন।

কেহ কেহ বলেন, অত্যধিক বিজ্ঞান চর্চ্চায় লোকের আস্তিক্য-বুদ্ধি লোপ পায় এবং সমাজে জড়বাদের বৃদ্ধি হয়। এ কথা নিতান্ত অসার। সমাজে যে কারণে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জন্মে, আধ্যাত্মিক রাজ্যেও সেই কারণে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি হয়। ঈশ্বরের গুণ, ঈশ্বরের শক্তি, ঈশ্বরের কৌশল আমরা যে পরিমাণে অনুভব করিতে পারি, সেই পরিমাণে তাঁহার প্রতি

আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি বৃদ্ধি হয়। এই সমস্ত বিশেষরূপে উপলব্ধি করিবার প্রশস্ত উপায় বিজ্ঞান। বিজ্ঞান-মার্গে প্রবেশ করিয়া যিনি সেই অনন্তদেবের অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত কৌশল, অনন্ত শক্তি উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহার আনন্দ এজগতে তুলনা রহিত। তিনি চক্ষুঃ মুদিত করিয়া আত্মাতে ঈশ্বরের দর্শন লাভ করেন, আবার চক্ষুঃ উন্মীলিত করিয়া, জড়জগতে ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্যে অবাক্ হন, আনন্দে অধীর বা স্তম্ভিত হন।

তবে যে অনেকে বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিতে যাইয়া নাস্তিক হইয়া পড়ে, তাহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, কারণ কেবল ভ্রান্তি বা অল্পবুদ্ধি। মণ্ডূক কূপ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমুদ্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করে; তাহার মন কূপের সঙ্কীর্ণ আয়তনে অভ্যস্ত হইয়া যায়, সমুদ্র যে কি পদার্থ তাহা তাহার হৃদয়ে ধারণাই হয় না। মনুষ্য জড়ের গুণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার শক্তিতেই স্তম্ভিত হইয়া যায়, জড়-শক্তির অন্তরালে যে আর একটি মহাশক্তি আছে, তাহা ভুলিয়া যায়। বালক দেব পূজার জন্য কুসুম চয়ন করিতে উদ্যানে প্রবেশ করে, কিন্তু কুসুমের সৌন্দর্য্য এবং সৌগন্ধিতে মুগ্ধ হইয়া দেব-পূজা ভুলিয়া যায়, দেবপ্রিয় কুসুম নিজেই ধারণ করে। অনেক জ্ঞান-পিপাসু মানব বিজ্ঞান-কুসুমাঞ্জলী ঈশ্বর-চরণে অর্পণ করিবে বলিয়াই প্রথমতঃ বিজ্ঞানের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু পরিণামে মূল উদ্দেশ্য—ঈশ্বরের কথা ভুলিয়া কেবল নিজের স্বার্থেই বিজ্ঞানের বিনিয়োগ করে। যে বিজ্ঞান মানব-জাতির উপকার সাধন ও সুখ বৃদ্ধি করিয়া ঈশ্বরের প্রীতিসম্পাদন করিতে পারিত, তাহার কিরূপ অপব্যবহার হইতেছে, বর্ত্তমান সভ্যজাতিদিগের যুদ্ধবিদ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইবে। বাস্তবিক কথা এই, প্রকৃত ভক্তি-বিনীত হৃদয়ে বিজ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে পারিলে উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া বিপন্ন হইবার অতি অল্পই আশঙ্কা থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ফলতঃ ইহাই জীবনের উদ্দেশ্য, ইহাই কার্য্যেরও উদ্দেশ্য। যাহাকে জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া জানি, তাহাই প্রাণপণে শিক্ষা করি, এবং তাহাই আজীবন কার্য্যে পরিণত করিবার যত্ন করি। কিন্তু হিতবাদিগণ বলেন, যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ সুখ হয়, তাহাই আমাদের করণীয়—সুতরাং শিক্ষণীয়। যে মতে সম্পূর্ণরূপে বাঁচিয়া থাকা'ই শিক্ষার উদ্দেশ্য; ইহাও সেই মতেরই কথা। আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য বিষয়ে যেমন স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছি, এখানেও আমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। সুখ উন্নতিরই অন্তর্ভূত, উন্নতিরই অবশ্যম্ভাবি ফল, সুতরাং উন্নতি হস্তগত হইলে সুখ অনায়ত্ত রহিল না। সুখ হয় শারীরিক, না হয় মানসিক, না হয় আধ্যাত্মিক। যখন শরীর, মন ও আত্মা, এই তিনেরই ক্রমোন্নতি, ক্রমোৎকর্ষ চলিতে লাগিল, তখন সুখের ব্যাঘাত হইবার অবসর রহিল

কোথায়? উন্নতি চলিতেছে, অথচ সুখ মিলিতেছে না, ইহা অসম্ভব। যখন দেখিবে সুখ ঘটিতেছে না, তখন অবশ্যই বুঝিয়া লইবে, শরীর, মন ও আত্মার ঐকতানবাদ্য প্রতিহত হইয়াছে, কোন না কোন যন্ত্রের একটি তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে। যে উন্নতি-সূত্রের এক প্রান্ত আমি আর অপর প্রান্ত ঈশ্বর, তাহাতে যতই অগ্রসর হওয়া যাইবে, ততই সুখের বিস্তার হইতে থাকিবে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য মধ্যে সুখকে বিশেষ প্রাধান্য না দেওয়ার আর একটি প্রবল কারণ আছে। সুখের আকাঙ্ক্ষা মনকে নীচতার দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। কেবল সুখের জন্য যে পাগল, জগতে কোন্ দেশে, কোন্ সময়ে, কোন্ মহৎ কার্য্যটি সে সম্পাদন করিতে পারিয়াছে? যাঁহারা মানবজাতির শিক্ষা গুরু, তাঁহারা কেহই সুখের সেবক ছিলেন না। বুদ্ধদেব, যিশু-খৃষ্ট, নানক, গৌরাঙ্গ, ম্যাট্‌সিনি, ওয়াশিংটন প্রভৃতি যে সকল মহাত্মার পবিত্র নামে মানবকুল ধন্য, তাঁহারা কেহই পুষ্পশয্যায় শয়ান থাকিয়া সমাজের হিত-সাধন করেন নাই। সুখের কেমন একটা মোহিনী শক্তি আছে যে, উহার নাম শ্রবণেই যেন মনের বল কতকটা কমিতে থাকে। সভ্য-সমাজে এত যে শিক্ষার উন্নতি হইতেছে, এত যে সামাজিকতার বিস্তার হইতেছে, তথাপি সুখের কল্পনায় লোকের মন গলিয়া যায়, সুখের অনুরোধে লোকে দয়া ধর্ম্ম, ন্যায়ান্যায় বিচার করিতে বিস্মৃত হইয়া যায়। যাঁহারা সুখের পক্ষপাতী তাঁহারা বলিবেন, সুখের প্রত্যাশা ব্যতীত মানবের পক্ষে কার্য্য করা অসম্ভব। যখন কার্য্য সকলের পক্ষে সুখকর হয়, তখন তাহা করিতে কোন প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে না, কিন্তু যখন কোন কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সুখের সম্ভাবনা, অথচ তাহাতে কর্ম্মকর্ত্তার দুঃখ নিশ্চিত, তখনই বিপদ! এস্থলে হিতবাদিগণ অকাট্য যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিবেন যে, যাহা দ্বারা সকলের উপকার হইবে, তাহাতে কর্ম্ম-কর্ত্তার দুঃখ হইলেও সে কর্ম্ম করা তাঁহার পক্ষে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এস্থলে আমার দুইটী ক্ষুদ্র কথা আছে। প্রথম, যুক্তি-দাতা যাহা বলিলেন, তাহা যেন আমরা শ্রোতৃগণ বুঝিলাম, কিন্তু এ যুক্তি দ্বারা যিনি কার্য্য করিতে বাধ্য, তিনি তাহা বুঝিবেন কি? বেকনের ন্যায় মহাপণ্ডিতও দেখাইয়াছেন, কার্য্যকালে যুক্তি তর্ক সকলই প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় কথা, লোকে যদি জটিল সমাজ-যন্ত্রের কুটিল তত্ত্ব-নিচয় উপলব্ধি করিয়া, নিজের সুখ বিস্মৃত হইয়া সমাজের জন্য খাটিতে পারে, তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গীন বা অবিরোধী উন্নতিই সমগ্র সমাজের উন্নতি, এবং সুখ তাহার অবশ্যম্ভাবি ফল, এ কথাটা কি এতই কঠিন যে ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না? বরং এই শেষোক্ত প্রকারে যাহারা কর্ত্তব্যাবধারণ করে, তাহাদের কার্য্যকরী শক্তি বৃদ্ধি হইবার একটি বিলক্ষণ প্রবল কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। সুখ যাহাদের

কার্য্যের নিয়ামক, সুখ-ভঙ্গে তাহাদের উৎসাহ থাকে না,—যেমন উৎসাহ থাকা উচিত, তেমন থাকিতে পারে না। কিন্তু উন্নতি যাহার কার্য্যের নিয়ামক, তাহার পক্ষে সেরূপ নহে। সে যখন পরের জন্য নিজের সুখে জলাঞ্জলী দেয়, তখনও তাহার উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা এবং নিঃস্বার্থতা পরিচালিত ও পরিমার্জ্জিত হইতেছে দেখিয়া সে পুলকিত হয়। পরোপকারে সুখ আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে, পরোপকারের সঙ্গে যখন নিজের উপকার মিশ্রিত থাকে, তখন যে মণি-কাঞ্চনের যোগ হয়, সে বিষয় সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এতক্ষণ যাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইল, তাহার শেষ সিদ্ধান্ত এই;—

(১) শিক্ষার—সুতরাং জীবনের এবং কার্য্যের—উদ্দেশ্য, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি—পূর্ণতা—ঈশ্বর লাভ।

(২) এই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিলাভের উপযোগী যে উপায়—যে প্রয়োজন, তাহাই কর্ত্তব্য।

(৩) এই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির—সুতরাং কর্ত্তব্য পালনের—অবশ্যম্ভাবি ফল, সুখ।

আত্ম-পরীক্ষা।

[প্রুসিয়াদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকদিগের জন্য বেকেডফ কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জর্ম্মণ ভাষায় প্রস্তুত হইয়াছিল, পরে হেন্‌রি ডন নামে এক জন সাহেব ঐ গুলি ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। বঙ্গদেশীয় শিক্ষকদিগের ইহাতে বিশেষ উপকার হইতে পারে, এই আশায় ঐ প্রশ্নগুলি শিক্ষা-পরিচয়ের জন্য ইংরাজী হইতে বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইল।]

১। অদ্য প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া আমি কি প্রথমেই ঈশ্বরের চিন্তা করিয়াছিলাম, অথবা সংসারের চিন্তা করিয়াছিলাম?

২। দিবসের কার্য্যারম্ভ করিবার পূর্ব্বে প্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের উপাসনায় আত্মাকে নূতন ভাবে আবার পবিত্র করিয়াছি কি না?

৩। দিবসের পরিশ্রমের জন্য ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ, বিশেষতঃ আমার তত্ত্বাবধানে স্থিত বালকদিগের জন্য তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছি কি না?

৪। যে সকল বালকের সাহায্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়, তাহাদিগের জন্য ঈশ্বরের নিকট বিশেষরূপে প্রার্থনা করিয়াছি কি না?

৫। ঈশ্বরের বল এবং বিশ্বাস পূর্ণ হইয়া আমি দিবসের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি কি না?

৬। অদ্য কি কি কায করিতে হইবে,

বিদ্যালয়ে কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে আমি সে সকল বিশেষরূপে চিন্তা করিয়াছি কি না?

৭। আমার কর্ত্তব্য কার্য্যের জন্য আমি যথোচিত ভাবে প্রস্তুত হইয়াছি কি না?

৮। আমি কি সকল বালকের জন্য সমান ভাবে যত্ন করিয়া থাকি, অথবা কতকগুলির প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া আর কতকগুলিকে বিশেষ ভাল বাসি?

৯। বালকদিগের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, প্রয়োজন মত তাহাদিগের প্রতি আমার মনোযোগ বিশেষরূপে চালিত হইয়াছে কি না?

১০। অথবা, কেবল আমার রুচি অনুসারে, যাহারা বুদ্ধিমান্ এবং শিখিতে অভিলাষী, শুধু তাহাদিগকে লইয়াই ব্যাপৃত থাকি?

১১। তাহাদিগের নৈতিক উন্নতি আমি কিরূপে সম্পাদন করিয়াছি?

১২। বাহ্য বিষয়ে, তাহাদিগকে শৃঙ্খলা, শান্তভাব, উপযুক্ত আদব কায়দা এবং পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিতেছি কি না?

১৩। আলস্য অথবা অমনোযোগবশতঃ এ সকল বিষয়ে অবহেলা করিয়া আমি অপরাধী হই নাই ত?

১৪। যে সকল বালক আমার শাসনের প্রতিকূলতা করিয়াছে, বিরক্ত হইয়া তাহাদের অধঃপতনের পথে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেই নাই ত?

১৫। বিবেকের নিকটে নিজের নির্দ্দোষিতার প্রমাণ না দিয়া, কোন কোন্ বালকের সংশোধন অসম্ভব বলিয়া প্রকাশ করি নাই ত?

১৬। আমার তত্ত্বাবধানে যে সকল বালক রহিয়াছে, তাহাদিগের উন্নতি সম্বন্ধে নিরাশ না হওয়া আমার একটি প্রধান কর্ত্তব্য; আমি ইহাতে অবহেলা করি নাই ত?

১৭। যখন ভর্ৎসনা করা, দণ্ড দেওয়া, অথবা উপদেশ দিয়া কর্ত্তব্য-পথে আনয়ন করিবার প্রয়োজন হয়, তখন কি ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য এবং সুবিবেচনার সহিত ইহা করিয়া থাকি?

১৮। হটকারিতা, অধৈর্য্য, ক্রোধ এবং অনুদারতা দ্বারা কি আমি চালিত হইয়াছি; অথবা, পক্ষান্তরে, আমি কি বালকদিগকে অন্যায় নাই দিয়াছি?

১৯। সাধারণতঃ ছাত্রদিগের সঙ্গে ব্যবহারে আমি ন্যায়পরতা রক্ষা করিতে পারিতেছি কি না?

২০। সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কতকগুলিকে ঘৃণা, আর কতকগুলিকে আদর করিয়া থাকি কি না?

২১। এরূপ পক্ষপাতিতার কারণ কি?

২২। মনে মনে বিচার করিয়া এরূপ ভাবকে ক্ষমা করিবার যদি কোন কারণ না পাই, তাহা হইলে আচরণে তাহা প্রকাশ করা কি আমার উচিত?

২৩। এইরূপ আচরণ দ্বারা, আমাকে পক্ষপাতী বলিয়া দোষী করিবার সুযোগ বালকদিগকে দেই নাই ত?

২৪। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মনে যে ভাব হয়, তাহা দ্বারা পরিচালিত হইয়া অসম-প্রকৃতি,

খামখেয়ালী হই না ত? কখন অত্যন্ত সদয় হইয়া, আবার কখন নিষ্কারণে ক্ষটিয়া ক্রোধ-বৃত্তিকে প্রশ্রয় দেই না ত?

২৫। যখন ভৎর্সনা বা দণ্ডের প্রয়োজন হয়, তখন কিরূপে ভৎর্সনা করিতে হইবে বা দণ্ড দিতে হইবে, ইহা ভালরূপে বিবেচনা করিবার জন্য, দণ্ডার্হ ব্যক্তির চরিত্রে যে বিশেষত্ব আছে, তাহা কি খুঁজিয়া দেখি?

২৬। অনবধান, আলস্য এবং বদ্ধমূল অভ্যাসবশতঃ যে সকল অপরাধ ঘটিয়া থাকে, তাহার সঙ্গে অসদ্ভাব-জনিত অপরাধের প্রভেদ সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া চলি কি না?

২৭। আমি কি কখনও অতর্কিত ভাবে প্রশংসার বাসনাকে উত্তেজিত করি নাই, এবং আত্মম্ভরিতা ও অসার গর্ব্বের বৃদ্ধি করি নাই?

২৮। অদ্য আমার দোষে আমার ছাত্রদিগের মধ্যে কোন ভ্রম বা নিন্দা ঘটে নাই ত?

২৯। আমার আচরণে চিন্তাশূন্যতা, অনবধানতা, কর্কশতা, অপ্রেম, অথবা দণ্ড প্রদানে আমোদ প্রকাশ পায় নাই ত?

৩০। অহঙ্কার, বৃথা গর্ব্ব, স্বার্থানুরাগ অথবা আত্মম্মন্যতার পরিচয় দেই নাই ত?

৩১। কর্ত্তব্য-পরায়ণ শিক্ষকের উচিত, যাহাতে বালকদিগের অভিভাবকেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন তাহার চেষ্টা করা; আমি কি উচিত মত সে চেষ্টা করিয়াছি?

৩২। অহঙ্কার, আত্মাদর, অসঙ্গত অপমান বোধ দ্বারা আমি এই কর্ত্তব্য-পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হই নাই ত?

৩৩। যাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত আমার মাথার এক গাছি কেশও স্খলিত হইতে পারে না, এবং যিনি আমার সমস্ত অভাব জানিতেছেন, তাঁহাতে আমার যথোচিত বিশ্বাস আছে কি না?

৩৪। ঈশ্বর আমাকে যে কঠিন অবস্থায় এবং যে কার্য্য-ক্ষেত্রে রাখিয়াছেন, তাহাতে আমি কেবল আত্ম-তুষ্টির জন্য বিশ্রাম খুঁজিয়া থাকি কি না?

৩৫। আমার নিয়োগকারিগণ কেবল আদেশ করিলে আমি তাহাতে অপমান বোধ করি কি না, এবং সেই সময়ে অসন্তোষ প্রকাশ করি কি না?

৩৬। অটলভাবে সত্য স্বীকার করিতে, এবং যদি ঈশ্বরের এরূপ ইচ্ছা থাকে, তবে সত্য হইতে পদমাত্র পরিভ্রষ্ট না হইয়া তজ্জন্য কষ্টভোগ করিতে আমি প্রস্তুত আছি কি না?

৩৭। অদ্য প্রাতে যে সকল সঙ্কল্পের পুনরালোচনা করিলাম, সে সমুদায় আমি যথাযথ পালন করিতেছি কি?

৩৮। যে সকল পুরাতন দোষ এবং অভ্যাস এতদিন পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা কি পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছি?

৩৯। যদি আমি পুনরায় পাপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে, যে সকল অন্তরায় এপর্য্যন্ত আমায় বাধা দিতে ছিল, সে সকল স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করিবার জন্য কি দ্বিগুণ শক্তি প্রার্থনা করা উচিত নহে?

৪০। অদ্য আমি জ্ঞান এবং ধর্ম্মেতে

কিছু উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছি কি না?

৪১। যে সময়ে আমাকে নিয়মিত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, সেই সময়েও পদোচিত কার্য্যে উন্নতি লাভ করিবার জন্য আমি যথেষ্ট যত্ন করিয়াছি কি না?

৪২। আমি ধর্ম্মগ্রন্থ অথবা অন্য কোন হিতকর গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি কি না?

৪৩। যাহা আত্মোন্নতি বিষয়ে দৈনিক লাভ বলিয়া গণনা করিতে পারি, এমন কিছু কি সেই গ্রন্থে শিখিতে পারিয়াছি?

শিক্ষা, শিক্ষক ও সাহিত্য।

শরীর ও মনে নিত্যসম্বন্ধ। শরীর ভাল থাকিলে, মন ভাল থাকে; মন ভাল থাকিলে, শরীর ভাল থাকে। একথা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও যে আংশিক সত্য, তাহার আর ভুল নাই। শরীর ও মন ভাল রাখা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য। শরীর ও মন ভাল রাখিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষা অর্থে অনেকে অনেক রকম বুঝিয়া থাকেন। যাহা অভ্যাস করিতে হয়, তাহা শিক্ষা বা শিক্ষার বিষয়। আমরা এই অর্থে শিক্ষা শব্দ প্রয়োগ করিব। অঙ্গ-পরিচালনা বা ব্যায়াম অভ্যাস করিতে হয়; সুতরাং, ব্যায়াম শিক্ষার অন্তর্গত। নীতি অভ্যাস করিতে হয়, সুতরাং নীতিকেও শিক্ষা বলিব। মানসিক বৃত্তিগুলির প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য আছে। প্রত্যেক বৃত্তিকে সম্যক্ প্রকারে পরিস্ফুট করিতে হইলে—অভ্যাসের প্রয়োজন; সুতরাং বৃত্তি-পরিস্ফুটনকেও শিক্ষা নামে অভিহিত করিব।

শরীর ও মন ভেদে শিক্ষা দুই প্রকার—শারীরিক ও মানসিক। শারীরিক শিক্ষা, যথা ব্যায়ামাদি। মানসিক বৃত্তি পরিচালনার নাম, মানসিক শিক্ষা। শরীর বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি পরিচালনার নাম—শারীরিক শিক্ষা। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির পরিচালনাও শারীরিক শিক্ষার অন্তর্গত। স্বাস্থ্য সুখ, বল ও সৌন্দর্য্য-লাভ শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য। বিশুদ্ধ জ্ঞান-লাভ এবং তজ্জনিত অপরিসীম আনন্দ মানসিক শিক্ষার উদ্দেশ্য। ব্যায়াম, ক্রীড়া ও শিল্পকার্য্যাদি-শারীরিক শিক্ষার উপযোগী। দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম প্রভৃতি, মানসিক শিক্ষার উপযোগী। দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মদ্বারা নীতি-বৃত্তি পরিচালিত হয়। ব্যায়াম, ক্রীড়া ও শিল্প-কার্য্যাদির দ্বারা শরীর সুস্থ থাকে, মাংসপেশী দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হয়, দীর্ঘজীবন লাভ হয় এবং সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। মানসিক শিক্ষা দ্বারা অজ্ঞানতা দূর হয়, কুসংস্কার অপনীত হয়, মন সমুন্নত ও নববলে বলীয়ান্ হয়, এবং জ্ঞানালোকে আলোচিত হইয়া, চিত্তপূত-সলিলা গঙ্গার

ন্যায় পবিত্র ও নির্ম্মল হয়। শারীরিক শিক্ষা ও মানসিক শিক্ষা, এই উভয়বিধ শিক্ষার সম্মিলনে, মনুষ্য উন্নতি ও সৌভাগ্যের অত্যুচ্চ শিখরে উপনীত হইতে পারে—এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। আমেরিকা, জার্ম্মেণি, ফ্রান্স, ও ইংলণ্ডের উন্নতি ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মনুষ্যমাত্রেরই সৎ ও অসৎ দুই প্রকার মনোবৃত্তি থাকায়, মানসিক শিক্ষাও সৎ ও অসৎ দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। নিজের ও পরের সুখ বর্দ্ধন, এবং দুঃখের অপনোদন মনুষ্যমাত্রেরই শিক্ষার ফল, এবং জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। নিজের সুখবর্দ্ধন করিতে গিয়া অন্যের যদি দুঃখ বর্দ্ধন হয়, তাহা হইলে সমাজের নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটে। প্রত্যেকেই যদি প্রত্যেকের অপকার করিয়া, অথবা, অন্যের উপকারের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, আপন আপন স্বার্থ সাধনে ব্যগ্র হয়, তাহা হইলে সমাজের কিরূপ দুর্দ্দশা হয়, তাহা বোধকরি, কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। আত্মোন্নতি বা নিজের সুখবর্দ্ধন জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, পরোন্নতি বা অন্যের সুখবর্দ্ধন জীবনের গৌণ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। নিজের ও অপরের সুখ-বর্দ্ধন শিক্ষার ফল হইলে, অভ্যাস বলে অসৎবৃত্তিগুলিকে ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ করিয়া, উপযুক্ত পরিচালনা দ্বারা সৎবৃত্তি-গুলির জড়তা অপনীত করিয়া তাহাদের সজীবতা সম্পাদন করা মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। অভ্যাস বলে অসৎবৃত্তি-গুলিকে নিস্তেজ রাখিয়া, সৎবৃত্তিগুলিকে সতেজ রাখিলে মনুষ্য নামের যথার্থ গৌরব সংরক্ষিত হয়। সমাজের প্রত্যেকেই যদি অসৎবৃত্তিগুলিকে নিস্তেজ করিয়া সৎবৃত্তি-গুলির সম্যক্ পরিচালনা করে, তাহা হইলে সমাজের প্রভূত মঙ্গল সংসাধিত হইবে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

সকল প্রকার শিক্ষাই বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। বাল্যকালে শরীর ও মন অপেক্ষাকৃত কোমল থাকে। তৎ-কালে, শরীর ও মনকে যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ ভাবে সহজেই গঠিত করা যাইতে পারে। শিল্পাদি শিক্ষার বিষয়ে বাল্যকাল প্রশস্ত না হইলেও, ব্যায়াম ও নীতি শিক্ষা-বিষয়ে সম্পূর্ণ উপযোগী। সুকুমার-মতি বালক বালিকাগণ; বাল্যকালে, যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, সমস্ত জীবন সেইরূপ শিক্ষার ফল ভোগ করে। আজি যাহারা বালকবালিকা, দশ বৎসর পরে তাহারা যুবক যুবতী হইবে। আজি যাহারা সংসারের কেহই নহে, দশ বৎসর পরে সংসারর সমস্ত ভার তাহাদের উপরে সমর্পিত হইবে। সুতরাং যাহাদের শুভা-শুভ কর্ম্মানুসারে সংসারের শুভাশুভ ফল নির্ভর করিতেছে, তাহাদের সুকোমল মানসক্ষেত্রে শুশিক্ষার বীজসমূহ রোপণ করা, বাল্যকাল হইতে, পিতামাতা ও শিক্ষকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। সমাজের উন্নতি-সাধন শিশুগণের সুশিক্ষা সাপেক্ষ একথা সুসভ্য আমেরিকাবাসিরা যতদূর হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এতদূর বোধ হয়, জগতের আর কোন জাতিই করেন নাই। সাধারণ শিক্ষাবিষয়ে আমেরিকা যত অর্থ

ব্যয় করে, এত অর্থ ব্যয় আর কোন দেশেই করে না। তাহার ফলে আমেরিকাবাসিরা অল্পদিনে যতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে, এতদূর উন্নতি লাভ অন্য জাতির সৌভাগ্যে ঘটে নাই।

শিক্ষার কালাকাল নাই। আজীবন মৃত্যু পর্য্যন্ত শিক্ষার সময়। বাঙ্গালীরা অনেকে মনে করেন, বি. এ, এম. এ পাশ করিলেই শিক্ষার চরম হইল। এ কথা সত্য নহে। এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া অনেকে সুখ্যাতির সহিত বি. এ, এম. এ পাশ করেন; এবং পঠদ্দশা শেষ হইয়াছে ভাবিয়া উকিল বাবু, অথবা ডেপুটি বাবু কিম্বা কেরাণী বাবু হইয়া, বিলাসিতাস্রোতে গা ভাসাইয়া, অন্যের সুখ দুঃখের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, সুখেই বল, আর দুঃখেই বল, জীবনের অবশিষ্ট ভাগ কোনরূপে যাপন করেন। আমরা এরূপ ব্যবহার অনুমোদন করিতে পারি না। বি. এ, এম. এ পাশ করা নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু, তাই বলিয়া যে শরীর ক্ষয় করিতে হইবে, এবং স্বাস্থ্য হানিনিবন্ধন যাবজ্জীবন কষ্ট পাইতে হইবে—এ কথা কখনই স্বীকার করি না। বি. এ, এম. এ, পাশ করিয়া সকলকেই যে চাকরী লইতে হইবে, এ কথাও আমাদের অনুমোদিত নহে। বি. এ, এম. এ, যাঁহারা পাশ করিয়াছেন, অবশ্যই তাঁহারা সৌভাগ্যের নূতন নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিতে পারেন। আমাদের মতে, তাঁহাদের সেই সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া অশিক্ষিতদিগকে সঙ্গে লইয়া, সৌভাগ্যের অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করা, এবং যথাসম্ভব নিজের ও অন্যের হিত সাধনে বদ্ধপরিকর হওয়া, চাকরী অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর। বি. এ, এম. এ, পাশ করিলেই যে শিক্ষা শেষ হইল, এরূপ ভাবাও নিতান্ত অসঙ্গত। স্কুল ও কলেজে আমরা যে শিক্ষা প্রাপ্ত হই, তাহা সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন নহে। স্কুল ও কলেজের শিক্ষা আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেয় মাত্র। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে আমরা শিক্ষিতব্য বিষয় দেখিতে পাই, এবং দেখিতে পাইয়া, আমাদের মন নূতন নূতন বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য লালায়িত হয়। মনের সেই লালসা পূর্ণ করা শিক্ষিত মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্ঞানের শেষ নাই, শিক্ষারও শেষ নাই। অপার অপরিমেয়, অনন্ত জ্ঞানসাগর আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে, আমরা সেই সাগরের একবিন্দু বারি স্পর্শ করিয়াই কি মনে মনে ভাবিব, আমাদের শিক্ষা শেষ হইয়াছে,—আমরা সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছি! অদ্বিতীয় পণ্ডিত, মহাজ্ঞানী নিউটন বলিয়াছিলেন, 'আমি জ্ঞান সাগরের তীরে বসিয়া উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি।' নিউটন যদ্যপি তীরে বসিয়া উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমরা জ্ঞানার্ণবের কতদূর বসিয়া উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি—এ কথা আমাদের ভাবা উচিত। বি. এ, এম. এ পাশ করিলে, ইউরোপীয়দের শিক্ষা শেষ হয় না, বরং তখন হইতে তাঁহাদের শিক্ষা আরম্ভ হইল, তাঁহারা এরূপ মনে করেন। অন্য জাতির আচার

ব্যবহার, শাসন প্রণালী, শিল্পনৈপুণ্য, ব্যবসায় বাণিজ্য, দর্শনবিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, না দেখিলে তাঁহাদের শিক্ষা তাঁহারা অসম্পূর্ণ মনে করেন। এজন্য, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বদেশের ও বিদেশের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া,—প্রকৃতি-গত শিক্ষাই হউক, অথবা, রাজনীতি, সমাজনীতি, ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক শিক্ষাই হউক, কিম্বা দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতি-হাস বিষয়ক শিক্ষাই হউক, অথবা ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্পনৈপুণ্য প্রভৃতি বিষয়ক শিক্ষাই হউক, নানাস্থান হইতে শিখিয়া আসিয়া আপনাদের দেশের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করেন। বি. এ, এম. এ, পাশ করিয়া তাঁহারা শিক্ষিত বাঙ্গালী বাবুদের মত, নিশ্চেষ্ট হইয়া, জীবনের মহদুদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া, উদাসীন-ভাবে জীবনের একটী দিনও বৃথা ক্ষেপণ করেন না, সুপ্রসিদ্ধ রোম সম্রাট মহামতি টাইটস্ প্রজাদের হিত সাধনোপযোগী কোন কার্য্যই একদা করেন নাই বলিয়া, সন্ধ্যাকালে, বিষণ্ণ ভাবে বলিয়াছিলেন 'আমি একটী দিন হারাইলাম'। ভাই শিক্ষিত যুবক? ভাব দেখি, তুমি কত দিন হারাইলে?

আজ উনবিংশ শতাব্দী অতীত হইতে চলিল। কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি সকল বিষয়েই তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই তুমুল আন্দোলনে সমস্ত সুসভ্য জাতি যোগ দিয়াছে। ভাই ভারতবাসি! তুমি কি নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিবে? এই বিশ্বব্যাপী ঘোর আন্দোলনে তুমি কি ভাই, যোগ দিবে না? আর কত-কাল শবের ন্যায় নিস্পন্দভাবে মোহ-নিদ্রায় অভিভূত থাকিবে? ঘুমিয়া ঘুমিয়া আর কতকাল প্রাচীন গৌরবের সুখস্বপ্ন দেখিয়া আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে নিদ্রোত্থিতের ন্যায়, এক একবার চমকিয়া উঠিবে? শুভক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বাকাশে উষার আলোক দেখা দিয়াছে। জগত জাগিয়াছে। তুমিও ভাই, জাগ। আপন কর্ত্তব্য সাধনে বদ্ধ পরিকর হও। ভাই শিক্ষিত যুবক! জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়াছ,—পাশ্চাত্য শিক্ষার বিমল কৌমুদী-কিরণ—তোমার হৃদয় ক্ষেত্রে পতিত হই-য়াছে। সুখের বিষয়। তুমি শিক্ষিত হইয়াছ, আমরা অশিক্ষিত রহিয়াছি। আমাদিগকে শিক্ষিত কর—আমাদিগকে সমুন্নত কর। আমরা সহস্র সহস্র নরনারী অন্ধকারে ডুবিয়া গন্তব্যস্থলে যাইতে পারি-তেছি না, পথ দেখিতে পাইতেছি না। উন্মত্তের মত এক দিকে ছুটিয়া, বাধা পাইয়া, হতশ্বাস হইয়া ফিরিয়া আসিতেছি। তোমার জ্ঞানের জ্বলন্ত মসাল আমাদের সম্মুখে ধর—অন্ধকার হইতে আমাদিগকে আলোকে লইয়া যাও। ইহাই তোমার কর্ত্তব্য; ইহাই তোমার জীবনের মুখ্যব্রত। শিক্ষা-পরিচয় সম্পাদক যথার্থই বলিয়াছেন (এ অন্ধকার দেশে তুমিই জ্বলন্ত মসাল, এই পূতিগন্ধময় বায়ুমণ্ডলে তুমিই সুবাস কুসুম; এই আলোক এবং সুবাস চতু-র্দ্দিকে বিকীরণ করিয়া বেড়াও। দেশের অগণ্য হিন্দু মুসলমান অভিভাবক, শিক্ষক এবং বালক তোমার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে; তুমি তাহাদিগকে

জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি এবং কর্ত্তব্য শিক্ষা দিবে,—তুমি তাহাদিগকে অজ্ঞান, অলস, জড়ত্ব হইতে চেতনার পথে, সুখের পথে আনিবে।” ভাই শিক্ষিত যুবক! কথাগুলি হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখ।

শিক্ষা ও শিক্ষিত যুবকদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ হইল। শিক্ষক ও সাহিত্য সম্বন্ধে বারান্তরে আমাদের মত ব্যক্ত করিব।

ইংরাজ শাসনে ভারতবর্ষ।

যখন হিন্দুজাতির আদিপুরুষগণ ভারতে প্রথম শুভাগমন করিয়া জঙ্গলময় ভারতবক্ষে সভ্যতা ও আধ্যাত্মিকতার মঙ্গলময় স্রোত চালাইয়া দিয়াছিলেন, এবং কাল সহকারে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তখন হইতে আজ কত দিন! এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে অদৃষ্ট-চক্রের দুর্বিজ্ঞেয় গতি ক্রমে ভারতে কত মঙ্গলকর—কত অমঙ্গলকর ঘটনা ঘটিয়াছে! হিন্দুরাজগণ ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে আর্য্যগৌরব এবং আর্য্য-সভ্যতা বিস্তার করিয়া সমগ্র ভারতকে এক আধ্যাত্মিকসূত্রে গ্রথিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং ভৌতিক সুখাভিলাষী পাশ্চাত্য জাতিসমূহ পুনঃ পুনঃ ভারতের পবিত্রবক্ষে পদার্পণ করিয়া স্বীয় পাশববলে আর্য্যসভ্যতার ঐকান্তিক বিস্তৃতির বিঘ্ন ও বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে। সুতরাং আর্য্য-সভ্যতা অবিচ্ছেদে অপ্রতিহত প্রভাবে স্ফুরিত ও ব্যাপ্ত হইতে পারে নাই। বরং ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহ ভারতে আসিয়া যে সমুদয় রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল, তাহাদিগের সহিত পরস্পর ঘাত ও প্রতিঘাতে ভারতে সর্ব্ববিষয়েই ঘোর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়া সকলেরই উন্নতির বিশেষ বিঘ্ন ঘটাইয়াছিল এবং রাজনৈতিক দৌর্ব্বল্য জন্মাইয়াছিল।

অবসরে ইউরোপীয় জাতি সকল বাণিজ্য প্রয়াসে দলে দলে ভারতে আসিতে লাগিল এবং পূর্ব্বোক্ত কারণে অনায়াসেই ভারতের নানা স্থানে স্ব স্ব আধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইল। তৎকালে মুসলমান রাজগণ ভারতে সমধিক প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং সমগ্র ভারতে ইস্‌লামের জয়পতাকা বিস্তার করিয়া রাজনৈতিক একতা বিধান করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। মহাত্মা আকবর ভারতবাসী অসংখ্য জাতিসমূহকে ধর্ম্মসম্বন্ধে স্বাধীনতা প্রদান এবং হিন্দুরাজগণের সহিত সন্ধি ও কুটুম্বিতা স্থাপন করিয়া সাম্রাজ্যময় শান্তি ও সুশৃঙ্খলতার বীজ বপন করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ, বিশেষতঃ আরংজেব, তাঁহার এই উদার নীতির মর্ম্ম বুঝিতে অশক্ত হইয়া ভারতে পুনশ্চ যুদ্ধ ও অরাজকতা-

রাক্ষসীর স্পর্দ্ধা বাড়াইয়া দেন। হতভাগ্য ভারতবর্ষ অদৃষ্টের অনেক নিগ্রহের পর হিন্দুস্থানরূপে পরিণত হইতেছিল, আরং-জেবের দৌরাত্ম্যে তাহাকে আরো নিগ্রহ সহ্য করিয়া শেষে ইণ্ডিয়া হইতে হইল। সৌভাগ্যক্রমে ইউরোপীয় জাতি সমূহ পরস্পর নির্ব্বিরোধে ভারতে রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। ইংরাজ সর্ব্বাপেক্ষা সংসারী। ইংরাজ সকলকে পরাভূত করিয়া ঠকাইয়া ক্রমে ক্রমে ভারতকে বশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অনেক দিনের পর ভারত আবার আভ্যন্তরিক যুদ্ধ বিগ্রহের হাত এড়াইয়াছে! "

এই বিশাল ভারত-ক্ষেত্রে ইংরাজের আজ একাধিপত্য। আজ ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, ইংলণ্ডীয় সভ্যতার নূতন খরতর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে! ভারতের প্রাচীন চিন্তা-তরঙ্গে ইংলণ্ডীয় নূতন মহাতেজস্বী চিন্তা-তরঙ্গ প্রতিহত হইয়া দেশময় কি এক বিষম উদ্বেলন উপস্থিত করিয়াছে! ইহার অস্তিত্ব সকলেই অনুভব করিতেছেন, কিন্তু ইহার পরিণাম ফল কি হইবে তাহা কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতেছেন না।

আমাদিগের প্রাচীন রাজনীতি, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মূলে যে কঠোর কুঠারাঘাত হইয়াছে, তাহা কেহই আর অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু তাহার প্রকৃতি ও ফলাফল সম্বন্ধে ঘোরতর মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ ইউরোপীয় সভ্যতার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া বলিতেছেন যে তাহাই আমাদের গ্রহণীয়। তাঁহারা ইউরোপীয় সভ্যতাকে প্রকৃতির নিয়ম ও সত্যের দৃঢ়তর ভিত্তির উপর গঠিত ও সর্ব্বথা অনবদ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং কৃত্রিম সীমাবদ্ধ দেশজ সভ্যতা তৎকর্ত্তৃক অবশ্যই স্থানচ্যুত হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। আবার অন্যদিকে এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন যাঁহারা বলিয়া থাকেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ-প্রবর্ত্তিত আচার ব্যবহার ধর্ম্ম ও নীতি সকল অভ্রান্ত ও হিন্দু জাতির একান্ত উপযোগী—আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সভ্যতা ও সত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাহা পরিত্যাগ করিয়া এক পদ ব্যতিক্রম করিলে আমরা অধঃপাতে যাইব, এবং বৈদেশিকগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দলে দলে ভারতের পবিত্রবক্ষে পদার্পণ করিয়া, আর্য্য হিন্দু সন্তানকে নিজ পাশব সংস্পর্শে আনিয়া, কলুষিত হিন্দুগণ মধ্যে প্রাচীন প্রথা সকলের যে ঘোর ব্যভিচার ঘটাইয়াছে, তাহা সংশোধন করিয়া পূর্ব্ব মার্গ অবলম্বন করিতে পারিলেই ভারতের প্রকৃত মঙ্গল হইবে।

এই দুই চরম দলের মধ্যস্থিত আর এক সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা বিশ্বাস করেন ভারতের এই উদ্বেলন কেবল একটী আকস্মিক ঘটনা মাত্র নহে এবং ইহা বিপ্লবেও পরিণত হইবার নহে। ইঁহাদিগের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক এবং ইঁহারা বিদ্যাবুদ্ধিজ্ঞানে অন্য কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা ন্যূন নহেন। এই দলের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দুই চরম দলের সহিত সহানুভূতির ন্যূনাধিক্যে ভিন্ন ভিন্ন থাক দৃষ্ট হয়, কিন্তু আমাদিগের

বর্ত্তমান প্রস্তাবে অতদূর সূক্ষ্মভেদ করিবার কোন প্রয়োজন হইবে না। এই দলের একটি সাধারণ ধর্ম্ম বা লক্ষণ এই যে ইঁহারা উভয় প্রকারের সভ্যতারই উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন এবং উভয়ের সংমিশ্রণসংজাত ভাবী এক প্রকার সভ্যতা ভারতভাগ্যে অবশ্যম্ভাবী ও একান্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়া স্বীকার করেন।

কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের লোকই দেখিতে পাইতেছেন, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। ইংরাজ ভারতময় একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, তাহাতে আভ্যন্তরিক যুদ্ধ বিগ্রহ একবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ভারতবাসী এখন দস্যুভীতি অতিক্রম করিয়া রাত্রিতে স্বচ্ছন্দে ঘুমাইতে পায়। ইংরাজের রাজ্যে ভারতবাসীর অনেক দুঃখ দূর হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজ ভারতে প্রকৃত শান্তির রাজ্য স্থাপন করিতে পারিয়াছেন কি? ইংরাজ ভারতের যে সকল দুঃখ দূর করিয়াছেন, তৎপরিবর্ত্তে কি আরও বহুতর এবং গুরুতর দুঃখ ভারতভাগ্যে ঘটে নাই? ইংরাজের রাজ্যে ভারত যে শান্তি—বাহ্য শান্তি মাত্র ভোগ করিতেছে, তজ্জন্য কি আমরা অতি উচ্চ মূল্য দিতেছি না? ফলতঃ ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা এতই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে যে, এখন উহা কি স্বদেশী কি বিদেশী সকলেরই চক্ষু আকর্ষণ করিতেছে। ইংরাজ কর্ম্মচারী এবং এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান মহোদয়গণ ভারতের সার শস্য গ্রাসিতে গ্রাসিতে যদিও ভারতের অবস্থা সর্ব্ববিষয়েই উন্নতিশীল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পরাঙ্মুখ নহেন, তথাপি স্বার্থান্ধ ব্যক্তি বিশেষ ব্যতিরেকে আর কেহই তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। বরং ইংরাজদিগের মধ্যেও অনেক সদাশয় মহাপুরুষ ভারতের প্রকৃত অবস্থা কীর্ত্তন করিয়া তাহার সংশোধন পক্ষে সাধ্যানুসারে স্বার্থশূন্য ভাবে যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। সকলেই দেখিতেছেন এই উচ্ছৃঙ্খলতা ভারতের ঘোর অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে, ভারতের উন্নতির পথে বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারত সন্তান এখন আর কোন প্রকারেই শান্তি ভোগ করিতে পারিতেছেন না। ভারতের সর্ব্বত্রই নূতনে পুরাতনে বিষম একটা গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিয়াছে। সুকৌশলী অধিনেতা কেহই নাই যে এই উদ্বেলিত সমুদ্রে তৈল ঢালিয়া দিয়া সর্ব্বত্র শান্তিময় শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারেন।

ভারত ক্রমেই দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে—কিছুকাল পর ভারতবাসীর পেটে অন্ন জুটিয়া উঠা ভার হইবে, তাহারও উপক্রম দেখা যাইতেছে। "তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার"—কিন্তু তাহাদের হাহাকারও অধিক দিন থাকিবে বলিয়া, আমাদের বিশ্বাস হয় না। তাহাদের অস্তিত্ব ক্রমেই অননুভূত হইতেছে—কালে একবারেই লোপ পাইবে। হিন্দু সমাজ বিধর্ম্মী বিদেশীর রাজ্যে জীবন হারাইয়া প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কাহারও ভীতি কাহারও ঘৃণার উদ্রেক করিয়া দিতেছে মাত্র; তন্মধ্যস্থ অভাগাদিগকে কোনরূপে শান্তি দিতে পারিতেছে না। গতিকেই নিজের ক্ষমতা ও উপকারিতা অব্যাহত রাখিতে

পারিতেছে না। রুক্মা বাইয়ের কাজটা অনেকের উপহাসের বিষয় মাত্র হইয়াছিল। কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে উহা হিন্দু সমাজের ঘোর কলঙ্কের লজ্জার ও খেদের বিষয় বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। বুঝা যাইবে যে, সমাজের মঙ্গলময় ক্রোড়ে মনুষ্য যে শান্তি যে সুখ পাইবার আশা করিয়া থাকে, হিন্দু সমাজ সে শান্তি সে সুখ দিতে অশক্ত। সুতরাং শত শত হিন্দু সন্তান শান্তির অন্বেষণে সমাজের বাহিরে যাইতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। যেমন সমাজে তেমনি ধর্ম্মেও দেখিতে পাই—হিন্দু ধর্ম্মের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মের জড়দেহ মাত্র পুরাতন কারুকার্য্যময় জীর্ণ বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া পড়িয়া আছে। অনেকের চক্ষু আকর্ষণ করিতেছে বটে, কিন্তু তাহার একটুকু মাত্রও জীবনীশক্তি নাই যে কালের বিচক্ষণ গতিতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত তত্ত্বের মধ্যে যে সকল তত্ত্ব নবাবিষ্কৃত হইয়া পার্থিব বায়ুতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহা আত্মসাৎ করিয়া পুষ্ট হইতে পারে। বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্ম অনেক হিন্দুর আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছে না। তজ্জন্য অনেকেই উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছে। যখন হিন্দু ধর্ম্ম জীবিত ছিল, তখন আপনার প্রশস্ত স্নেহময় ক্রোড়ে অতিশয় বিসদৃশ মতাবলম্বিগণকেও সমানভাবে ধারণ করিয়া সকলেরই ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ ছিল। আর এখন হিন্দু ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মকেও নিজ সন্তান বলিয়া চিনিতে ও আদর করিতে অশক্ত হইয়াছে।

সংক্ষেপত ভারতে সর্ব্ব বিষয়েই অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে, অরাজক জনপদে যে সকল দোষ জন্মে, ভারতে তাহার অনেকেই দিন দিন হইতেছে। রাজকর্ম্মচারিগণ দরিদ্র প্রজার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াও কর সংগ্রহে ব্যস্ত রহিয়াছেন, অথচ কিছুতেই রাজ্যের অভাব মোচন করিতে পারিতেছেন না—কেন? ভারত সন্তান শত সহস্রবার প্রপীড়িত হইয়া, দুর্ভিক্ষের ভীষণ পৈশাচিক মূর্ত্তি অনুক্ষণ সম্মুখে দেখিয়াও তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না—কেন? আমরা নানাপ্রকারে শিক্ষিত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন জাতির নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও সংজ্ঞানী বা সাধু চরিত্র হইতে পারিতেছি না কেন? ইহার সকলেরই উত্তর ঐ এক অরাজকতা—রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক অরাজকতা! ভারত বিশাল অর্ণবপোতের ন্যায় বাত্যাতাড়িত হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, ইতস্তত অগণিত জলমগ্ন পর্ব্বত পাহাড় ছড়াইয়া পড়িয়া আছে—কাণ্ডারী যিনি তিনি যাত্রীগণের নিকট ভাড়া সংগ্রহেই ব্যস্ত আছেন, কলেরপ্রতি লক্ষ্য রাখিবার বড় অবসর পাইতেছেন না। যাত্রীগণ সমবেত হইয়া সত্রাসে চীৎকার করিতেছে "সাবধান! সম্মুখে বড় বিপদ! আমাদের কথা শুন! নিজে যখন পার না অন্যের বুদ্ধি লইলে দোষ কি?"—কাণ্ডারী বিষম ভ্রূকুটি করিয়া বলিতেছেন "চুপরহ বেইমান! আমার জাহাজে তুমি কাণ্ডারী হইতে চাহ?" হরি, হরি, ইহার ঔষধ কি?

ভারতের এই শোচনীয় অবস্থা কি উপায়ে দূর করা যাইতে পারে, ইহা ভারতবাসী ও ভারতহিতৈষী মাত্রেরই বিশেষ বিবেচনার বিষয়, এবং ইহার জন্য সকলেরই কাল বিলম্ব না করিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত্। সংসারে সকলেই জীবমানে নিজ পরিবারের সুখসম্পাদনে ব্যস্ত আছেন, এবং নিজের অভাবেও তাহাদের কোনরূপ কষ্ট না হয় তজ্জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া, নিজে সহস্র দুঃখ সহ্য করিয়াও, তাহাদের জন্য অর্থ সঞ্চয় ও সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতেছেন। কিন্তু অনেকেই দেখেন না প্রিয়পুত্র নির্ব্বিঘ্নে সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিবে কি না। দেখেন না যে পুত্র উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষিত না হইলে সম্পত্তি সম্যক্‌রূপে ভোগ করিতে অক্ষম হইবে। দেখেন না যে ভারতের অনন্ত দুঃখরাশি দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া আছে—যাহার জন্য নিজে ইহ জীবনে প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে পারিলেন না, তাহা তাঁহার পুত্রেরও সুখের পথে কণ্টক হইবে। তিনি যে সম্পত্তি পুত্রের সুখের জন্য রাখিয়া যাইতেছেন, তাহা ভারতের অনন্ত দুঃখরূপ দায়ে আবদ্ধ রহিয়াছে। যদি পুত্রের জন্য সম্পত্তি রাখিয়া যাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে সেই সম্পত্তি দায়মুক্ত করিয়া যাওয়াও সকলের প্রাথমিক কর্ত্তব্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যাঁহারা পুত্রের বিবাহের জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা জলবৎ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না, তাঁহারাই আবার দেশের হিতকর—তাঁহার নিজ সম্পত্তি রেহেন মুক্তকর—বিশেষ ব্যয় সাধ্য কার্য্যও মুদ্রা কতিপয় মাত্র সাক্ষর করিয়া আপনার অসাধারণ বদান্যতায় স্তম্ভিত হইয়া যান! ইঁহারা বাহ্যেন্দ্রিয় গ্রাহ্য সাক্ষাৎ উপকার ব্যতীত অন্য কিছুতেই আপনাকে উপকৃত জ্ঞান করিতে সক্ষম নহেন।

ভারতের অনেক দুঃখের প্রতিবিধান করিবার জন্য আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং কতিপয় সদাশয় মহানুভব ইংরাজ গত কয় বৎসর হইতে জাতীয় মহাসমিতি নামক রাজনৈতিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহার ফলে আমরা অনেক উপকার আশা করিয়া থাকি। কিন্তু কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে ভারতের প্রকৃত কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা নাই। ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার জন্য ভারতবাসীগণই সমধিক দায়ী; সুতরাং রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজের যথাবৎ সংস্কার এবং শিক্ষার বহুল বিস্তৃতি ও উন্নতি হওয়া একান্ত আবশ্যক। এ সম্বন্ধে আমাদের নিজে নিজে সমধিক যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। আমরা গবর্ণমেণ্টের উপরই সব বিষয় নির্ভর করিতে শিখিয়াছি—এটা আমাদের আরও অশুভের লক্ষণ।

ইংরাজ আজ দেশের রাজা। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যে ভারতের অনেক হিত সাধন করিয়াছেন এবং এখনও করিতে ইচ্ছুক আছেন, তাহা সকলকেই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতে হইবে। যাহাতে মহারাণীর রাজ্য ভারতে দৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা সকলেরই প্রার্থনীয় এবং

ভারতবাসী মাত্রেরই তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া স্বার্থ ও কর্ত্তব্য। কিন্তু ইংরাজ বিদেশী। বিদেশী বলিয়া বিদেশী নয়—ইংরাজের সহিত ভারতবাসী জাতি সমূহের কোন বিষয়ে সাদৃশ্য নাই। তাই ইংরাজ শাসনে ভারতের এত দুর্দ্দশা। ইংরাজের সদিচ্ছা থাকিলেও, সকল বিষয় বুঝিতে পারে না কিরূপ শাসনে ভারতের প্রকৃত মঙ্গল হইবে। ইংরাজ যেরূপ সভ্যতার ক্রোড়ে পালিত হইয়া বড় হইয়াছে তাহাই ইংরাজের আদর্শ, এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া ভারতকেও বড় হইতে হইবে, ইহা গবর্ণমেণ্টের মূলমন্ত্র। কিন্তু ভারতের প্রকৃতি ও সভ্যতা সম্পূর্ণ ভিন্নসূত্রে গ্রথিত। ভারত ইংরাজ আদর্শে চলিতে না পারিয়া অথচ ইংরাজের সংস্পর্শে নিজ প্রকৃতির অনুরূপ রীতিনীতি রক্ষা করিতে না পারিয়া পুনঃ পুনঃ স্খলিতপদ হইতেছে। কঠোর সংসারে ভারত উন্নতি মার্গে অধিক অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

ইংরাজের রাজ্যে ভারতের দুরবস্থা দূর করিতে হইলে আমাদিগকে কতক পরিমাণে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নূতন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে, নূতন পথ অনুসরণ করিতে হইবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ-প্রবর্ত্তিত অধ্যাত্মবিদ্যা সর্ব্বদাই আমাদের গৌরবের আদরের ধন থাকিবে। কিন্তু আর্য্যঋষিগণ সমাজনীতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে অনেক সময়ে অনধিকার চর্চ্চা মাত্র করিয়া যে সকল অনাবশ্যক ও অনিষ্টকর সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া হিন্দুসমাজের যথাযথ স্ফুরণের বিঘ্নের কারণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে সরাইয়া ফেলিতে হইতেছে। আর্য্যশাস্ত্র কর্ত্তাগণের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির সঙ্গে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে তাঁহাদিগের এই অনধিকার চর্চ্চাই ভারতের অবনতির মূলীভূত কারণ। তাঁহারাই আর্য্য সভ্যতার সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, অথচ তাঁহারা সংসারে লিপ্ত ছিলেন না—সুতরাং সাংসারিক বিষয় সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে সকল ব্যবস্থা শাস্ত্রে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে অনেক সময়ে সমাজের প্রকৃত উন্নতির প্রতিকূল হইবে তাহা সহজেই বোধ হইতে পারে। যাঁহারা বিশ্বাস করেন যোগবলে আর্য্যঋষি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিকজ্ঞানও সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা হিন্দুগণের পক্ষে যে সকল নিয়ম করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বপ্রকারেই আর্য্যজাতির উন্নতির হেতু হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে আমরা দেখাইতে পারি—ভারত অতিপ্রাচীন কাল হইতে বৈদেশিকগণ কর্ত্তৃক কতবার আক্রান্ত এবং পরাজিত হইয়া কার্য্যতঃ আপনার বৈষয়িক জ্ঞানের অভাবের পরিচয় দিয়াছে!

কথাটা একটু বিবেচনা করিবার কথা। প্রত্যেক জাতির সভ্যতা তাহাদের আভ্যন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার অনুরূপ হইয়া থাকে। জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা জাতীয় শিক্ষার ফল। ভারতের প্রাচীন ঋষি ভারতকে যেরূপ শিখাইয়াছিলেন, ভারতের আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা ও সভ্যতাও তদনুরূপ হইয়াছে।

ভারত শিখিয়াছিল মনুষ্য জীবন প্রায়শ্চিত্তের জন্য। জগতে মনুষ্যের সুখ নহে, জগন্মুক্ত হইতে পারিলেই মনুষ্যের অর্থাৎ আত্মার প্রকৃত সুখ ও মঙ্গল। সুতরাং ভারত জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘনীভূত করিতে যায় নাই। জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ভারতের সাংসারিক জ্ঞানও ততটুকু মাত্র। পরিদৃশ্যমান জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া, তাঁহার নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া যে সভ্য হওয়া যায় এবং তাহাও মনুষ্যের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক, ভারত তৎপ্রতি যথোচিত লক্ষ্য রাখে নাই।

ইহাই আর্য্য-সভ্যতার কীটস্বরূপ হইয়াছে। ভারতীয় ঋষি শিখাইলেন "মনুষ্য-জীবন দুঃখের জন্য। প্রকৃতির সহিত আত্মার সম্মিলন এই দুঃখের হেতু। আত্মা যাহাতে প্রকৃতির সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিয়া মুক্ত হইতে পারে, তাহাই প্রত্যেক মনুষ্যের দ্রষ্টব্য ও হৃদয়ের সহিত প্রার্থিতব্য। সাংসারিক আসক্তি মোক্ষের বিঘ্নকারী। অতএব সকলেই নির্লিপ্ত হইয়া আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানানুমোদিত নিয়মে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল না "মহাত্মন! দেখিতেছি আপনার শিষ্য জনকত মাত্র। এই জগতে আরও অনেক মনুষ্য আছে যাহারা সংসারে উদাসীন নহে—যাহারা উদাসীন ব্যক্তির উপর অত্যাচার করিয়া তাঁহাকে ভৌতিক সুখের হেতু বানাইয়া লইবে। ইহাদিগের হস্ত হইতে আমাদিগের নিস্তার পাইবার কি উপায় হইবে? যেমন তেমন করিয়া শরীর হইতে আত্মার বিচ্ছেদ জন্মাইতে পারিলেই কি মুক্ত হয়? নতুবা তখন আমাদিগের আত্মার কি গতি হইবে? আর প্রকৃতি যে সময়ে সময়ে নানা প্রকারে নিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহারই বা সম্যক্ উপশান্তি করিতে সমর্থ হইব কি প্রকারে? কেহ জিজ্ঞাসা করিল না, ঋষি ইহা বিবেচনা করিবার আবশ্যকতা বুঝিলেন না। তদবধি ভারতবাসীর জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের সহিত আধ্যাত্মিক ভাব জড়াইয়া গেল। প্রত্যেক বিষয়ে ভারতবাসী জড়-জগতের প্রতি আস্থা শূন্যের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ।)

উপকথা।

সুকুমার মতি বালক বালিকাদিগকে হিতোপদেশ দেওয়া বড় কঠিন। কোন একটী উপদেশ সরল ভাষায় কথিত হইলেও তাহারা তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে, কিম্বা অধিক দিন স্মরণ রাখিতে পারে না। সেইজন্য বিষ্ণুশর্ম্মা গল্পচ্ছলে, এবং চাণক্য

পণ্ডিত পদ্যে, হিতোপদেশ লিখিয়া গিয়াছেন। ইয়ুরোপে ঈশপ সাহেবের গল্পাবলী বড় প্রসিদ্ধ ও আদরণীয়। গল্প কথায় মন বড় আকৃষ্ট হয় এবং উপদেশগুলি অনেক দিন স্মরণ থাকে। সেইজন্য আমরা মনস্থ করিয়াছি যে "শিক্ষা-পরিচয়ে" সময়ে সময়ে এক একটী গল্প বা উপকথা লিখিয়া বালক বালিকাদিগের মন আকর্ষণ করি, এবং তদ্দ্বারা তাহাদিগকে শিক্ষা ও উপদেশ দিব।

উপদেশ সূচক গল্পকথা ভারতবর্ষে যত প্রচলিত আছে তত আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। রাজা, মহারাজা, নবাব, বাদসার প্রাসাদ হইতে ফকির ফাকুরা দীন দুঃখীর কুটীর পর্য্যন্ত ঐ সকল উপকথা প্রচলিত ছিল। তাহাতে ভারতের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, নীতি সমুদায়ই বিশদরূপে বিবৃত থাকিত। এই সকল প্রাচীন গল্প বড় আদরণীয় এবং বহুমূল্য। উহা একত্রিত ভাবে পুস্তকাকারে পাওয়া বড় কঠিন। ভারনিউ নামক এক সাহেব কতকগুলি গল্প সংগ্রহ করিয়া ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে (Indian Tales and anecdotes) "ভারতীয় গল্প এবং উপকথা" নামক একখণ্ড পুস্তক প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তক পরে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহা পাওয়া বড় কঠিন। পরে শ্রীযুক্ত লালবেহারী দে (Folk Tales of Bengal) "বঙ্গীয় উপকথা" নামক এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার উপকথাগুলি পূর্ব্বে "Bengal Magazine" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। এই উভয় পুস্তকই ইংরাজি ভাষায় লিখিত। অতএব ইংরাজি-অনভিজ্ঞ লোক এবং অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগের তাহাতে কোন উপকার নাই। ভারতবাসী সাহেব ও ইউরোপবাসী লোকদিগের জন্য ঐ পুস্তকদ্বয় মুদ্রিত হইয়াছিল। বঙ্গ ভাষায় এরূপ কোন পুস্তক আছে কি না আমরা অবগত নহি। অতএব প্রাচীনকালের উপদেশ পূর্ণ গল্পগুলি যত দূর সম্ভব সংগ্রহ করিয়া আমরা ক্রমশঃ "শিক্ষা-পরিচয়ে" প্রকাশ করিব।

১। দুই ফকির।

কোন এক দেশে দুই ফকির বাস করিত। উভয়েই বড় গরীব, ভিক্ষা ব্যতীত অন্য কোন জীবনোপায় ছিল না। উভয়েই সমবয়স্ক ছিল এবং একত্রে ভিক্ষান্বেষণ করিত। প্রায় সকল বিষয়েই উভয়ের এক অবস্থা ছিল, কেবল মাত্র ধর্ম্ম বিষয়ে নহে। দুঃখে কষ্টে এক জনের মন ধর্ম্ম-পথ হইতে বিচলিত হইয়াছিল; অপরের মন পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং বিশ্বাসে শান্ত এবং দৃঢ় হইয়াছিল।

ভিক্ষা করিতে বহির্গত হইয়া অনেক সময়ে তাহারা তথাকার বাদসার প্রাসাদের নিকট দিয়া যাইত। তৎকালে একজন চীৎকার করিয়া বলিত, "হে বাদসা! আমাকে কিছু ভিক্ষা দিন। অপরটী বলিত "হে পরমেশ্বর! আমাকে কিছু ভিক্ষা দিন।" প্রাসাদের লোকে ক্রমশঃ তাহাদের প্রার্থনা শুনিল; শেষে তাহা বাদসার কর্ণে উঠিল।

শ্রবণান্তর বাদসাহ মনে মনে করিলেন—

"এক ব্যক্তি আমার নিকট কিছু চাহিতেছে না—সে আমাকে অতিক্রম করিয়া পরমেশ্বরের দ্বারস্থ হইয়াছে—আমি তাহাকে কিছু দিব না—দেখা যাউক পরমেশ্বর তাহার কি করেন।" এইরূপ স্থির করিয়া যে ফকিরটী তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া ডাকিয়া থাকে তাহাকে নিজ সম্মুখে আনয়ন জন্য এবং অপরটীকে সত্বর রাজপ্রাসাদের নিকট হইতে প্রস্থান জন্য আজ্ঞা করিলেন। এতদিন উভয় ফকিরই একত্রে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত; কিন্তু অদ্য হইতে রাজাদেশে তাহাদের ছাড়াছাড়ি হইল। তথাপি তাহাদের বাসস্থান বা পর্ণ কুটীর একস্থানে থাকায় প্রতিদিন ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাহাদের দেখা সাক্ষাৎ হইত। এবং তৎকালে কোথায় কে কিরূপ ভিক্ষা পাইল না পাইল তৎসম্বন্ধে কথোপকথন করিত।

ফকির বাদসার সদনে উপস্থিত হইলে, বাদসা তাঁহার উজিরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উজির করযোড়ে নতভাবে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে বাদসা তাঁহাকে আপন পার্শ্বে ডাকিয়া বলিলেন—"তুমি ঐ ফকিরকে প্রতিদিন এক খানি রুটী প্রদান করিবে এবং ঐ রুটীর মধ্যে একটী স্বর্ণ মুদ্রা লুক্কায়িত ভাবে রাখিয়া দিবে।" উজির শির নোয়াইয়া প্রস্থান করিল এবং ক্ষণেক পরে এক খণ্ড রুটী আনিয়া ফকিরের হস্তে প্রদান করিল। তখন বাদসা ফকিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দেখ ফকির! তুমি প্রতি দিবস এইরূপ একখানি রুটী পাইবে। কিন্তু সাবধান, অদ্য হইতে অন্য কাহারও দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাইও না।" ফকির অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

কুটীরে আসিয়া ফকির বড় চিন্তাযুক্ত হইল। তাহার পরিবার বড়, এক স্ত্রী এবং সাত সন্তান। একখানি রুটীতে কি হইবে? অথচ অন্যত্র ভিক্ষা করা নিষেধ। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিলে চাউল, দাইল এবং কখন কখন দুই একটি পয়সা পর্য্যন্ত পাওয়া যাইত। তাহাতে পরিবারের জীবিকা একরূপ চলিত। এক্ষণে সম্পূর্ণ নিরুপায়। সে এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় অপর ফকির আসিয়া নমস্কার জানাইল এবং তাহার চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। পরে সবিশেষ অবগত হইয়া বলিল "ভ্রাতঃ তুমি চিন্তা করিও না। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আজ আমি যথেষ্ট ভিক্ষা পাইয়াছি। তদ্দ্বারা যতদূর সম্ভব তোমাকে সাহায্য করিব।" তখন প্রথমোক্ত ফকির উল্লাস সহকারে বলিল, "ভাই, আমার রুটীখানি বিক্রয় করিব; তুমি তাহা গ্রহণ করিয়া আমাকে দুইটী পয়সা দাও; আমি তদ্দ্বারা খুদগুঁড়া ক্রয় করিয়া একরূপ দিনপাত করিতে পারিব।" ধর্ম্মভীরু ফকির তাহাকে চারিটী পয়সা প্রদান করিয়া বলিল "আমার আশার অতিরিক্ত অদ্য এই এক আনা পাইয়াছিলাম; তাহা তোমাকে দিলাম।" এই বলিয়া রুটীখানি লইয়া নিজ কুটীরে প্রস্থান করিল এবং আপন স্ত্রীর হস্তে তাহা প্রদান করিয়া আহার প্রস্তুত করিতে বলিল। তাহার স্ত্রী সংসার ধর্ম্মে চতুর, আহারের জন্য রুটী কাটিবার সময় তন্মধ্যস্থিত লুক্কায়িত স্বর্ণমুদ্রা দেখিতে পাইল এবং তাহা সযত্নে রাখিয়া দিল।

ক্রমে এইরূপে ছয় মাস অতীত হইল। বাদসানুগৃহীত ফকির প্রতি দিবসই একখণ্ড রুটী পাইত, এবং তাহা ধর্ম্মভীরু ফকিরের নিকট বিক্রয় করিত। প্রতিদিন এক একটী স্বর্ণমুদ্রা পাওয়ায় শেষোক্ত ফকিরের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু অপরের অবস্থা যেমন শোচনীয় তেমনি রহিল। তাহার পরিধানের বস্ত্র ছিন্ন, শরীর অস্থি চর্ম্মসার, কপালে চিন্তার রেখা, সর্ব্বদা নিরানন্দ; দেখিলে বোধ হয় যে তাহার অপেক্ষা দুঃখী আর কেহ নাই।

এক দিবস বাদসা এই ফকিরের দুরবস্থা দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি উজিরের নিকট হইতে প্রতিদিবস রুটী পাও কি না?" ফকির বলিল "ধর্ম্মাবতার! রুটী নিয়মিত রূপ পাইয়া থাকি।" বাদসা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে তুমি ঐ রুটী দ্বারা কি কর?" ফকির কর-যোড়ে বলিল "আমার পরিবার বড়; এক খানি রুটীতে চলে না। তজ্জন্য আমি তাহা এক আনাতে বিক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা একরূপে জীবন ধারণ করিয়া থাকি।"

বাদসা তখন সকল অবস্থা বুঝিতে পারিয়া উজিরকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন "এইক্ষণেই এক গাড়ি স্বর্ণমুদ্রা এই ফকি-রের কুটীরে পাঠাইয়া দেও, ইহাকে অদ্যই বড় মানুষ করিতে হইবে।"

বাদসার হুকুম শ্রবণ করিয়া ফকির নৃত্য করিতে করিতে বাটী রওনা হইল, এবং স্ত্রীকে সম্বাদ দেওয়ার মানসে কুটীরে প্রবেশ করিতে গেল। কুটীরের দ্বার ছোট, ফকির আনন্দে তাহা বিস্মৃত হইয়াছিল। উল্লাসে মস্তক অবনত না করিয়া সে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করায়, মস্তকে আঘাত লাগিয়া হঠাৎ পড়িয়া গেল ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে উজির স্বর্ণমুদ্রার গাড়ি সহকারে কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইল, এবং সকল অবস্থা দৃষ্ট করিয়া বাদসার নিকট খবর দিল। বাদসা বড়ই দুঃখিত হইয়া ফকিরের মৃত দেহ দেখিতে আসিলেন এবং তাহার মস্তকের আঘাত পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিলেন যে তাহার খুলির উপর এই কথা লিখা আছে:—

"পরমেশ্বরে বিশ্বাস না থাকিলে
মনুষ্য চেষ্টা বৃথা।"

এই কি প্রকৃত শিক্ষা?

আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখি-লাম, আমাদের দেশে যদি কিছু অভাব থাকে, তবে তাহা শিক্ষার অভাব; যদি কিছু দোষ থাকে, তবে তাহা শিক্ষার দোষ; যদি কিছু দুর্দ্দশার কারণ থাকে, তবে তাহা শিক্ষার অভাব-জনিত। অনেকে

হাস্য করিয়া বলিবেন, এই যে বৎসর বৎসর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পরীক্ষার সময় সহস্র সহস্র ছাত্র পরীক্ষা প্রদানার্থ সমাগত হয়, তাহা কি শিক্ষার উন্নতির পরিচায়ক নহে? এই যে সুশিক্ষিত সম্প্রদায় মিলিত হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত কম্পমান করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা কি সুশিক্ষার অমৃতময় ফল বলিয়া কেহ অস্বীকার করিতে পারে? আমার উত্তর এই যে, ভাই? আমি সে শিক্ষার কথা বলিতেছি না; আমার শিক্ষার অর্থ একটু স্বতন্ত্র। যে শিক্ষা দ্বারা বাল্যে যৌবন, যৌবনে বার্দ্ধক্য, বৃদ্ধাবস্থার পূর্ব্বে দেহ ত্যাগ করিতে হয়, আমি সে শিক্ষার কথা বলিতেছি না। যে শিক্ষা দ্বারা মস্তিষ্ক দুর্ব্বল, পরিশ্রম নিস্ফল ও সংসার অচল হয়, আমি সে শিক্ষার উল্লেখ করি নাই। যে শিক্ষা দ্বারা মন বিকৃত, চরিত্র দূষিত ও ইহকাল পরকাল চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়, আমার শিক্ষা সে শিক্ষা নয়। স্বার্থপরতায় যাহার জন্ম, অভিমান যাহার ফল, দাসত্বে যাহার শেষ, তাহাকে শিক্ষা, সুশিক্ষা, সভ্যতা, আলোক, উন্নতি যে নামেই অভিহিত বা অলঙ্কৃত কর, আমার প্রস্তাবিত শিক্ষা তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। যে শিক্ষা দ্বারা আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত, শরীর বলিষ্ঠ; শ্রম সহিষ্ণু ও কর্ম্মঠ হয়, যে শিক্ষা দ্বারা আমাদের বাল্যকাল হইতে মনোবৃত্তি সমূহের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়া সদ্বৃত্তিগুলি ক্রমশঃ বিকশিত হয়, যে শিক্ষা দ্বারা আমরা সুখস্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি, যে শিক্ষা দ্বারা আমরা সমাজের গলগ্রহ না হইয়া সাধ্যানুসারে সকলকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ও সমর্থ হই, যে শিক্ষা দ্বারা আমাদের স্বদেশ হিতৈষিতা কেবল বাক্যাড়ম্বরে পর্য্যবসিত না হইয়া প্রকৃত দেশ-হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে তৎপর হয়, যে শিক্ষা-প্রভাবে ধর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলি সতেজ থাকিয়া দেশস্থ লোকদিগের প্রতি নিঃস্বার্থ ও অকৃত্রিম ভালবাসা জন্মাইয়া দেয়, ভাই? আমার শিক্ষা তাই, আমার শিক্ষা কেবল বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা ও উপাধি লাভ নয়, আমার শিক্ষার অর্থ একটু স্বতন্ত্র।

বাহ্যাড়ম্বরে ভুলিও না, বাক্যাড়ম্বরে মুগ্ধ হইও না, স্বার্থপরদিগের সভার আড়ম্বরে আপনাকে হারাইও না, একবার চারিদিকে তাকাইয়া তোমার "শিক্ষিত সম্প্রদায়ের" দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া দেখ দেখি? আমরা দরিদ্র হইয়া পড়িতেছি কেন? সকলে খাইতে পায়, আমরা খাইতে পাইতেছি না কেন? কোন জাতি চাকুরীর জন্য এত লালায়িত নয়, আমরা চাকুরীর জন্য এতই লালায়িত হই কেন?—কেবল শিক্ষার দোষে। স্বদেশের হিতের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে কেন শিখি নাই, নিজের সামান্য কষ্টের কথা ভাবিলেই কেন আকুল হই? মন এতই নিস্তেজ কেন হইয়া পড়িয়াছে যে পোড়া দাসত্ব ভিন্ন জীবন-যাত্রার উপায় আর কিছু ভাবিয়া উঠিতে পারে না?—কেবল শিক্ষার অভাব বলিয়া।

কিছুই আপনি হয় না, সকলই শিখিতে হয়, আবার সকল বিষয়েরই উন্নতি শিক্ষা সাপেক্ষ। যাহার গোড়াই জানি

না, তাহার উন্নতি করিব কিরূপে? সুতরাং আগে অন্যের নিকট শিখিতে হইবে, তার পর তাহার উন্নতির চেষ্টা দেখিতে হইবে। আবার সকলের মনোবৃত্তি সমান নয়, সকলের অবস্থা সমান নয়, সকলের শিক্ষাও একই প্রকার হওয়া উচিত নয়। সংসারও একই প্রকার শিক্ষিত লোক চায় না, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মনোবৃত্তি বুদ্ধি প্রাখর্য্য ও প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষাও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হওয়া আবশ্যক। সকলেই যদি কষ্টে স্বষ্টে বিএ, বিএল পাশ করিয়া উকীল হইয়া পরের মোকদ্দমা আইনের নিত্য-নূতনত্ব ও জটিলতা এবং নিজের বক্তৃতা শক্তির উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চেষ্টা করে তা হলে কি আর সংসার চলে? আমাদের ঠিক তাই হইয়াছে; এ নির্ব্বুদ্ধিতার মূল শিক্ষার দোষ নয় ত কি বলিব?

উকীল বাবুরা মনে করেন তাঁহারা "সুশিক্ষিত" তাহাতে আবার স্বাধীন, তাঁহারাই দেশের অগ্রগণ্য। হাকিম বাবুরা মনে করেন, যদি দেশের উচ্চ পদস্থ কেহ থাকেন তবে সে তাঁহারা; আর ছোট ছোট আপিসের কেরাণী ভিন্ন আর মোটা বেতনের সকলেই হাকিমের দলে। এ সকল বিষম বোধহীনতার মূল, যে যাহা ইচ্ছা বলুন, আমার সিদ্ধান্ত শিক্ষার দোষ।

পুত্র পিতাকে তাচ্ছিল্য করিতেছে, স্ত্রী স্বামীর প্রিয়কারিণী নয়, ভ্রাতায় ভ্রাতায় সদ্ভাব নাই, বন্ধুতা মৌখিক, পারিবারিক বিচ্ছেদ, শ্রেণীতে শ্রেণীতে পরস্পর বিদ্বেষ-ভাব ও ঘৃণা, জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংসকারী, দেশীয় দুর্দ্দশার অসীম বৃদ্ধিকারী এ সকল দোষ, এ সমস্ত বিশৃঙ্খলা কোথা হইতে আসিল? শিক্ষা—প্রকৃত শিক্ষা আমাদের দেশে নাই বলিয়া নয় কি? একটু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ দেখি?

বিষ-বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিয়া তাহার পল্লবগুলি ছেদন করিলে কি হইবে? তোমার গোড়ার শিক্ষাই মন্দ, তুমি সভা সমিতি করিয়া দেশের দুর্দ্দশা নিবারণের কি চেষ্টা করিবে? ভাল শিক্ষা দেও, দেখিবে দুর্দ্দশাগুলি আপনা হইতেই কমিয়া আসিতেছে। যদি তোমার চক্ষেরই দোষ থাকে তবে গৃহটী সহস্রবার সৌধ-ধবলিত করিলেও তাহা কখনই শ্বেতবর্ণ হইবে না। তাই আগে জ্ঞান-চক্ষুকে প্রখর কর।

শিক্ষা-দোষে আমরা যে কার্য্যকে অধিক সমাদর করিয়া আসিতেছি, সে কার্য্য হয়ত আমাদের তত সমাদরের যোগ্য নয়, আবার যাহাকে একেবারেই সমাদর করি না, সেইটিও হয় ত আমাদের পক্ষে অধিক উপকারী। আমাদের জাতীয় শরীরের হয় ত একটি অঙ্গের অধিক চালনা ও পুষ্টি বৃদ্ধি হইতেছে, অন্যগুলির হইতেছে না; ফল পীড়া ও দুঃখ বৃদ্ধি।

অনেকে আবার বিদেশীয় লোকতত্ত্ব-বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহারা বলেন, আমাদের দেশে লোক সংখ্যা ভয়ানক বৃদ্ধি হইয়াছে, সুতরাং দুর্দ্দশা অবশ্যম্ভাবী; অর্থাৎ তাঁহারা পুস্তকগত বিদ্যাবলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এত লোক কখনই বাঁচিতে পারে না, তাহাদের কিয়দংশ হয়ত দুর্ভিক্ষে, না হয় মারী ভয়ে, না হয় রণক্ষেত্রে প্রাণ-

ত্যাগ করিবে। এটিও শিক্ষার দোষ। প্রথমতঃ ভারতবর্ষে অতিরিক্ত লোক-সংখ্যা-বৃদ্ধি একটি অপসিদ্ধান্ত; দ্বিতীয়তঃ অতি-রিক্ত লোকসংখ্যা কমাইবার অন্য উপায় বিদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন ও বিদেশ হইতে অর্থ আহরণ। আমাদের শিক্ষার দোষে আমরা এ সকল উপায় একবার ভাবিয়াও দেখি না, আবার আপনাদিগকে সুশিক্ষিত বলিয়া কতই অভিমান করি। এখন এত দুর্দ্দশাতেও যদি শিক্ষা হয়, তবু উপকার।

উপদেশ মালা।

(১)

মনন করেছ যাহা
যতনে সাধিলে তাহা,
অবশ্যই কৃতকার্য্য হ'বে।
একান্ত করিলে যত্ন
অবশ্যই পাবে রত্ন;—
যত্নফলে রত্ন মিলে ভবে॥
ভাবিছ কঠিন যাহা,
সহজ হইবে তাহা,
দিনে দিনে অভ্যাসের বলে।
কিছুই সহজ নয়,
সহজ কঠিন হয়,
ক্রমে ক্রমে অনভ্যাস ফলে॥
মানুষ করেছে যাহা,
মানুষে করিবে তাহা;—
এই মূলমন্ত্র-কর সার।
অবশ্য সাধনা ফলে,
অবশ্য যত্নের বলে,
পূর্ণ হবে—উদ্দেশ্য তোমার॥

(২)

যে কার্য্য করিবে,
আগে তা বুঝিবে,
সম্ভব সে কার্য্য কিনা।
বৃথা কার্য্যে হয়
পুরুষার্থ ক্ষয়;
শুধু শ্রম;—ফল বিনা॥
যদ্যপি বায়স
রজনী দিবস
চঞ্চুঘাত করে তার।
তবুও শ্রীফল
রবে অবিকল;
চঞ্চুর বেদনা সার॥
মরীচিকা তরে
ছুটাছুটি করে
মরুভূ প্রান্তরে যেই।
কি ফল তাহার?
শুধু হাহাকার,—
জল বিনা মরে সেই॥

(৩)

জীবন সমরে প্রাণপণ করি
কর যুদ্ধ যোদ্ধাগণ।
রণে ভঙ্গ দিয়া কাপুরুষ মত,
পলাওনা কদাচন॥
যে দিকে যাইবে প্রতিদ্বন্দ্বিগণ
পথপানে চেয়ে আছে।
তুমুল সমরে জয়ী হবে যেই,
ভাগ্যলক্ষ্মী তার কাছে॥
জীবন-সংগ্রামে নিশ্চেষ্ট থাকিলে
জয়লাভ নাহি হবে।
বিজিত হইয়া, দীনহীন বেশে,
পরের পাদুকা ব'বে।

(৪)

তোমরা মানব, জ্ঞান, বুদ্ধি সব
তোমাদের কাছে।
জ্ঞান বুদ্ধি বলে, সম ভূমণ্ডলে
কোন জীব আছে?
মদ-মত্ত করী বুদ্ধি বলে ধরি
করিয়াছ বশ।
গিরি, নদী, বন করিছে কীর্ত্তন
তোমাদের যশ॥
মানব হইয়া মানবের মত
কর ব্যবহার।
পশুর মতন, ক'রোনা কখন
স্বেচ্ছায় বিহার॥

(ক্রমশঃ।)

পুরস্কারের প্রবন্ধ।

[প্রবন্ধ লেখকগণ অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিবেন না। এ বিষয়ে তাঁহাদের সততার উপরেই নির্ভর করা যাইতেছে।]

১। শিক্ষকের জন্য। সৎসাহস।

২। ছাত্রের জন্য। শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা।

৩। মহিলার জন্য। লজ্জা।

প্রবন্ধ কেহ ফেরত পাইবেন না।

বৈশাখ মাসের পুরস্কার প্রাপ্ত।

(প্রথম ভাগ, ১ম সংখ্যা, ১২৯৬)।

১। শিক্ষক—শ্রীরজনীকান্ত মজুমদার, রাজারামপুর উচ্চ প্রাথমিক ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ ৩৲

২। ছাত্র—শ্রীউমেশচন্দ্র অধিকারী, পুঁঠিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, রাজসাহী ২৲

আদর্শ হিন্দু-বিধবা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর পুণ্য-নামপূত

শিক্ষা-পরিচর

শিক্ষাবিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ,।

সূচী।

কলিকাতা

৯২ নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট ; বরাট প্রেসে

শ্রীকিশোরীমোহন সেন দ্বারা মুদ্রিত

এবং

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥" বিষ্ণুশর্ম্মা। "Train up a child in the way he should go; and when he is old he will not depart from it." Eng. Bible.—"The master is the best book, the most natural and efficient channel of communication." D. Stow.—"Too generally words have been communicated without ideas." D. Stow. "Be exact in your thoughts." Lord Reay.—"The child is father of the man." Wordsworth.—"The subject which involves all other subjects, and therefore the subject in which education should culminate, is the Theory and Practice of Education." H. Spencer.—"True education is practicable only by a true philosopher." H. Spencer.—"All breaches of the laws of health are physical sins." H. Spencer.—"What is needed for the rooting out of vices is not legislation so much as education aided of course by example." *Hope.*—"It is the greatest curse of ignorance it knows not how ignorant it is." *Christian Life.* "অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ। যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রং॥ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। "—a sound mind in a sound body." Locke.

গ্রাহকের জ্ঞাতব্য।

১। এই পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৸৵০ এক টাকা দশ আনা। পাঁচ বা ততোধিক গ্রাহক একত্রে লইলে প্রত্যেকের ১৶০ এক টাকা ছয় আনা লাগিবে। মূল্য পরে লইবার নিয়ম নাই। কিন্তু পত্রিকা পাইলেই মূল্য পাঠাইয়া দিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া কোন শিক্ষক পত্র লিখিলে তাঁহার নিকট পত্রিকা প্রেরিত হইবে। ইচ্ছা করিলে তিনি নিজের ছাত্র বা ছাত্রীর জন্যও এইরূপ পত্র লিখিতে পারেন, কিন্তু ইহার মূল্যের জন্য তিনিই দায়ী থাকিবেন।

২। গ্রাহকগণ চিঠিপত্র, প্রশ্নোত্তর বা মূল্য পাঠাইতে নিজ নামের সঙ্গে নিজ নিজ নম্বরের উল্লেখ করিবেন, এবং তিনি শিক্ষক বা ছাত্র হইলে তাহাও লিখিবেন।

৩। চিঠিপত্র, প্রবন্ধ ও মূল্যাদি সমস্তই সম্পাদকের নামে "পুঁঠিয়া, রাজসাহী" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। কলিকাতার গ্রাহকগণ বরাট প্রেসে শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে রসিদ লইয়া তাঁহাকে মূল্য দিতে পারেন।

৪। কেহ বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ পত্র লিখিয়া নিয়মাদি জানিবেন।

৫। গ্রাহকগণ স্ব স্ব নাম, ধাম ও নম্বর স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন।

৬। কাহারও কিছু জানিবার থাকিলে রিটার্ণ পোষ্টকার্ডে পত্র লিখিবেন।

৭। প্রকাশার্থ বা পুরস্কারের জন্য যিনিই যে কোন প্রবন্ধ লিখিবেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক ভাল কালি কলম দিয়া ভাল কাগজের কেবল এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শিক্ষা-পরিচর।

১ম ভাগ। | শ্রাবণ ১২৯৬ সাল। | ৪র্থ সংখ্যা।

শিক্ষা, শিক্ষক ও সাহিত্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শিক্ষা ও শিক্ষকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সম্প্রতি শিক্ষক সম্বন্ধে আমাদের মতামত ব্যক্ত করিব। শিক্ষা-শব্দ যেরূপ বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, শিক্ষক শব্দও সেইরূপ বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। যে শিক্ষা দেয়—সে শিক্ষক। এস্থলে, শিক্ষক শব্দে শুধু পাঠশালার গুরুমহাশয়, টোলের পণ্ডিত মহাশয়, বা স্কুলের মাষ্টার মহাশয়কে বুঝিতে হইবে না। জগতে কি ছোট, কি বড়—সকল প্রকার বস্তু হইতে আমরা শিক্ষা লাভ করি। কি জড়-জগৎ, কি প্রাণী-জগৎ, কি অন্তর্জগৎ, কি বহির্জগৎ—প্রত্যেকে আমাদিগকে নূতন নূতন বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করে। মানব-বুদ্ধি-সম্ভূত সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস—এই সার্ব্বভৌমিক শিক্ষার ফল-স্বরূপ। কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ্—প্রত্যেক পদার্থ হইতে আমরা শিক্ষিতব্য বিষয় গ্রহণ করি। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে, অসংখ্য তারকা-খচিত অনন্ত মহাকাশ; সামান্য কীট-পতঙ্গ হইতে বৃহদাকার হস্তী, এবং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ-জীব মানব;—প্রত্যেক পদার্থ, বা প্রত্যেক প্রাণী হইতে আমরা নানাবিধ শিক্ষা প্রাপ্ত হই; সুতরাং, কি ছোট, কি বড়, কি জড়জগৎ, কি প্রাণীজগৎ—সকলেই আমাদিগের শিক্ষক। কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত বোধে আমরা শিক্ষকের এই বিস্তৃত অর্থ গ্রহণ না করিয়া প্রচলিত অর্থেই শিক্ষক শব্দ প্রয়োগ করিব। শিক্ষক বলিতে, পাঠশালার গুরুমহাশয়, টোলের পণ্ডিত মহাশয়, বা স্কুলের মাষ্টার মহাশয়কে বুঝিব; এবং সাহিত্য বলিতে, স্কুলে, বা টোলে, বা পাঠশালে, সচরাচর শিক্ষক মহাশয়েরা যে সকল বিষয়ের শিক্ষা দিয়া থাকেন, সেই সকল বিষয়ক গ্রন্থাদি বুঝিব।

শিক্ষকের কার্য্য অতি গুরুতর—এ কথা

সর্ব্ববাদি-সম্মত। যাঁহার সৎশিক্ষার উপরে সন্তানগণের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে,—তাঁহার কার্য্য যে অতি গুরুতর, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? শিক্ষকের সৎশিক্ষার উপরে শুধু, সন্তানগণেরই যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে, এরূপ নহে; তাহাদের পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, প্রতিবেশীগণেরও সুখ স্বচ্ছন্দতা অল্প বা বেশী পরিমাণে নির্ভর করে। বলিতে গেলে, দেশের প্রকৃত উন্নতি, রাজ্যের প্রকৃত গৌরব এবং সুখ-সমৃদ্ধি লাভ, সুশিক্ষকগণের সুশিক্ষাসাপেক্ষ। সুতরাং বৈষয়িক উন্নতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া, নিস্বার্থ পরোপকার-ব্রতে ব্রতী হইয়া, যাঁহারা সন্তানদিগের সুশিক্ষা-ভার গ্রহণ করিয়া, জগতের হিতসাধনে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে জগৎ যত ঋণী, এত ঋণী, বলিতে গেলে, আর কাহারও নিকটে নহে।

সন্তানদিগকে সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র করিতে হইলে, বাল্যকাল হইতে, সৎশিক্ষকের হাতে তাহাদিগকে অর্পণ করা, পিতা মাতা ও অভিভাবকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। সৎশিক্ষক বলিতে, যাঁহারা সচ্চরিত্র, এবং যাঁহাদের শিক্ষা দিবার ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য-বোধ আছে—তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে। বিদ্বান্ ও জ্ঞানবান্ হইলেই যে সৎশিক্ষক হইবে, ইহার কোন প্রমাণ নাই। বিদ্যাবত্তা বা জ্ঞানবত্তা সর্ব্বত্র সৎশিক্ষকের পরিচায়ক নহে। এরূপ দেখা যায়, অনেকানেক কৃতবিদ্য যুবক—যাঁহারা প্রতি পরীক্ষায় খুব উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারাও শিক্ষকতা কার্য্যে কাঙ্ক্ষিত যশোলাভ করিতে না পারিয়া, পদে পদে শিক্ষকতা কার্য্যের কাঠিন্য অনুভব করিয়া, হতাশ্বাস হইয়া, শিক্ষকতা কার্য্য পরিত্যাগ করিতেছেন। পক্ষান্তরে, তাদৃশ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বিদ্বান্ বা বুদ্ধিমান না হইয়াও শিক্ষকতা কার্য্যে বিমল আনন্দানুভব করিয়া, অনেকে সুচারুরূপে শিক্ষকতা কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, এবং সুশিক্ষক বলিয়া দেশ মধ্যে পরিচিত হইতেছেন। ফলতঃ, যিনি শিক্ষিতব্য বিষয়গুলি নিজে উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন, এবং যাঁহার স্বাভিপ্রায় অন্যকে সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার ক্ষমতা আছে, তিনি ততদূর শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলেও যে ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রম বলে সুশিক্ষক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবেন, এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। শিক্ষকের কার্য্য যেরূপ গুরুতর ও দায়িত্ব-পূর্ণ, তাহাতে সৎশিক্ষক না হইলে, এবং তাঁহার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য-বোধ না থাকিলে, সেই গুরুতর দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে।

চাণক্য পণ্ডিতের একটী শ্লোক আছে,—"মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ।" শ্লোকটী সেকেলে ভদ্রলোকমাত্রেই অবগত আছেন; কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই, অনেকে অবগত থাকিয়াও এই বহুমূল্য বাক্যে আস্থা প্রদর্শন করেন না। সচ্চরিত্র সুশিক্ষকের অধীনে রাখিয়া সন্তানদিগকে সচ্চরিত্র এবং সুশিক্ষিত করা, এবং যথাসম্ভব তাঁহাদের সুশিক্ষার ব্যয়-ভার কায়ক্লেশে বহন করা যে, পিতামাতা ও অভিভাবকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য, এ কথা সুসভ্য ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীরা যতদূর

বুঝিয়াছেন, এতদূর অস্মদ্দেশীয় পিতামতা ও অভিভাবকগণ অবশ্যই বুঝেন নাই। অস্মদ্দেশীয় পিতামাতা ও অভিভাবকগণ যে সন্তানদিগের সুশিক্ষার জন্য তাদৃশ যত্নবান্ নহেন, এবং বৃথা আমোদ প্রমোদে, কিম্বা সাংসারিক কার্য্যে সদা সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিয়া, সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্ত্তব্য কার্য্য ভুলিয়া গিয়া, প্রাণসম প্রিয়তম সন্তানগণকে যে, যাবজ্জীবন দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করেন, একথা কে অস্বীকার করিবে? সন্তানদিগকে লালনপালন করা যেরূপ পিতামাতার অবশ্য-কর্ত্তব্য, তদ্রূপ সাধ্যমত তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করাও তাঁহাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। সন্তানবর্গ সুশিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র না হইলে, আপন আপন দুষ্কর্ম্মের ফল-ভোগ শুধু তাহারাই যে করিবে, এরূপ নহে; তাহাদের পিতামাতাগণকেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে তাহাদের দুষ্কর্ম্মের ফল-ভাগী হইতে হইবে। অশিক্ষিত এবং অসচ্চরিত্র সন্তানবর্গের দুর্দ্দশাবলোকন করিয়া, সহজ-স্নেহ-বিবর্জ্জিত কোন্ পিতামাতা দুঃখ-সন্তপ্ত না হইবেন? অশিক্ষা অথবা কুশিক্ষা প্রভাবে সমাজের কণ্টক-স্বরূপ, অসচ্চরিত্র সন্তানদিগকে নানারূপ কুকার্য্যে ব্যাপৃত ও নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইতে দেখিয়া, পাষাণ-হৃদয় কোন পিতামাতা স্থির থাকিবেন? এবং আপনাদের নিরুদ্ধিতার দোষে, সন্তানগণের এরূপ দুর্দশা ঘটিয়াছে ভাবিয়া, অনুতাপানলে জর্জ্জরিত না হইবেন? পক্ষান্তরে, সন্তানবর্গ সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র না হইলে, তাহারা নিজেই যে শুধু সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, এরূপ নহে; তাহাদের পিতামাতাগণও স্বনাম-ধন্য সন্তানগণের জনকজননী হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিবেন। দেশের মধ্যে সুশিক্ষিত এবং সচ্চরিত্রের সংখ্যা যতই বাড়িবে, ততই দেশের মঙ্গল সংসাধিত হইবে,—ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

আমরা পূর্ব্বে একস্থলে বলিয়াছি, 'আজীবন মৃত্যু পর্য্যন্ত শিক্ষার সময়'। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবাবধি 'শেষের সে দিন' পর্য্যন্ত শিক্ষার সময়, একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই, লিখন পঠন দ্বারাই যে শুধু শিক্ষা হয়, এরূপ নহে; দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি দ্বারাও শিক্ষা হইয়া থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র, তাহার লিখন বা পঠনের ক্ষমতা থাকে না, একথা সত্য; কিন্তু, তাহার ইন্দ্রিয়াদি তখনও কার্য্যপটু থাকে, একথা অস্বীকার্য্য নহে। সুতরাং বলিতে গেলে, তখন হইতেই তাহার শিক্ষা আরম্ভ হইল। বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত, শরীর যতই পুষ্ট হয়, মানসিক বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়গুলিও ক্রমশঃ ততই সতেজ হইয়া উঠে। সাহস, অধ্যবসায়, যত্ন, পরিশ্রম, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, আলস্যশূন্যতা, কার্য্য-তৎপরতা, জ্ঞান-লাভেচ্ছা, সৌন্দর্য্যানুরাগ, প্রেম, ভক্তি, দয়া দাক্ষিণ্যাদি সৎশিক্ষার বীজ, অতি শৈশবকাল হইতে, সুকুমারমতি বালক বালিকাগণের হৃদয়-ক্ষেত্রে, রোপণ করা যাইতে পারে। প্রচলিত রীত্যনুসারে, অস্মদ্দেশে, সচরাচর সন্তানবর্গ প্রায় পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত, জনকজননীর নিকটে থাকে। সুতরাং, তৎকালে জনকজননী তাহাদের শিক্ষক।

পিতার নিকটে যত সময় থাকে, জননীর নিকটে তদপেক্ষা অধিক সময় থাকায়, তৎকালে, সন্তানবর্গের সৎশিক্ষার ভার, পিতার অপেক্ষা মাতার প্রতিই অধিক পরিমাণে সংন্যস্ত। জর্জ্জ হারবার্ট বলিয়াছেন "শত স্কুল মাষ্টারের মূল্য যত, জনৈক সচ্চরিত্রা জননীর মূল্য তত"। সন্তানবর্গের দোষ-গুণ অনেকটা মাতার দোষগুণের উপরে নির্ভর করে, ইহা একরূপ সর্ব্ববাদি-সম্মত। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলিতেন, "সন্তানগণের ভাবী সদসদ্ব্যবহার, জননীর চরিত্রের উপরে, সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে"। সুতরাং, জননী যদ্যপি বিদ্যাবতী বা বুদ্ধিমতী না হয়েন, তাহা হইলে সন্তানদিগের প্রথম পাঁচ বৎসর বৃথা অতিবাহিত হয়। লর্ড ব্রাউহাম বলিয়াছেন, "আঠার হইতে ত্রিশ মাস পর্য্যন্ত সন্তানগণ যত শিক্ষা করে, পরে সমস্ত জীবনেও, তত শিক্ষা করে না"। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে প্রথম পাঁচ বৎসর শিক্ষার পক্ষে কতদূর আবশ্যকীয়, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য-বিহীনা, অশিক্ষিতা, বুদ্ধিহীনা জননীর নিকটে তৎকালে, সন্তানগণ, সৎশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলেও, সমবয়স্ক বা সমবয়স্কাগণের নিকটে, অথবা তাহাদের সম্মুখে যাহা পড়ে তাহা হইতে, ভাল হউক, মন্দ হউক,—শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে; এবং তদনুসারে যাবজ্জীবন কার্য্য করে। অনুকরণ-স্পৃহা বাল্যকালে খুব বলবতী থাকায়, কার্য্যের ফলাফল, অথবা দোষগুণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, যে কার্য্য তাহাদের নিকটে ভাল বোধ হয়, সে কার্য্য অনুকরণ করে, এবং সেই কার্য্যের দোষ গুণানুসারে সমস্ত জীবন সুখ-দুঃখের ফলভাগী হয়। সদসদ্বিবেকহীন বালক বালিকাগণ, তৎকালে, যাহা অনুকরণ করে, সমস্ত জীবন তাহা তাহাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া থাকে; এবং হাজার চেষ্টা সত্বেও, পরে তাহার পরিবর্ত্তন একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। প্রচলিত রীত্যনুসারে, পাঁচ বৎসর পরে সন্তানগণ, স্কুলে, বা টোলে বা পাঠশালে প্রেরিত হয়। তখন হইতে স্কুলের মাষ্টার, টোলের পণ্ডিত, বা পাঠশালার গুরুমহাশয় তাহাদের শিক্ষক। অন্যায় প্রশ্রয় পাইয়া, সন্তানগণ জনকজননীর দোষে, প্রথম পাঁচ বৎসরে যদ্যপি দুর্বৃত্ত বা কু-ক্রিয়া-পরায়ণ হয়, তাহা হইলে পরে তাহা সংশোধন করা, শিক্ষকগণের পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। একারণ, জনকজননীর নিকটে অন্যায় প্রশ্রয় পাইয়া সন্তানগণ যাহাতে কুক্রিয়া-পরায়ণ বা অসৎ-স্বভাবাপন্ন না হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা জনকজননীর অবশ্য-কর্ত্তব্য। সন্তানগণের অন্যায় আবদার পরিপূরণ করিয়া, সামান্য অপরাধে গুরুতর দণ্ড বিধান করিয়া অপরিণামদর্শী শত শত জনকজননী প্রাণসম প্রিয়তম সন্তানবর্গের পরকাল নষ্ট করেন, এবং স্ব-হস্ত-পালিত বৃক্ষে কুঠারাঘাত করিয়া যাবজ্জীবন অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হয়েন, একথা কে অস্বীকার করিবে? নাতি-প্রখর-নাতি-মৃদু ব্যবহার করিয়া, পবিত্র বাৎসল্যভাবে প্রণোদিত হইয়া, অসৎকার্য্যে দণ্ড প্রদান এবং সৎকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিয়া, নিরন্তর সন্তানগণের

হিতসাধনে বদ্ধ-পরিকর হইয়া, জনকজননী যদ্যপি সন্তানগণের প্রতি আপন আপন কর্ত্তব্য-কার্য্য প্রতিপালন করিয়া, পরম-হিতৈষী সুশিক্ষকগণের হস্তে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সন্তানগণকে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে, সুশিক্ষকগণ, সন্তানদিগের সুশিক্ষা বিধানে, সহজেই কৃতকার্য্য হইবেন; এবং সন্তানগণও সুশিক্ষার ফলে, অল্প কালে, বিদ্যার নির্ম্মল আলোকে আলোকিত হইয়া, স্বদেশের ও স্বরাজ্যের মুখোজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইবে; ইহা একরূপ স্থির সিদ্ধান্ত।

শিক্ষকের উপযোগিতা ও শিক্ষক সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় শিক্ষা-পরিচয়ে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমাদের বেশী কিছু বলিবার নাই। আমরা পাঠকবর্গকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন মনোযোগপূর্ব্বক সেগুলি অধ্যয়ন করেন।

সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের মতামত বারান্তরে প্রকাশ করিব।

ইংরাজ শাসনে ভারতবর্ষ*।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তাহাতেই দেখিতে পাওয়া যায় ভারতে দর্শনশাস্ত্রের যে পরিমাণ আলোচনা ও উন্নতি হইয়াছে, তাহার তুলনায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ভারতবাসী একেবারে অনভিজ্ঞ বলিলেই হয়। যাঁহারা তাড়িতান্বিত মস্তকের দ্বারা আর্য্যঋষির প্রত্যেক অনুশাসনে সুন্দর বৈজ্ঞানিক সত্যের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া ভারতের প্রাচীন প্রথা সকল সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমরা কোন প্রকারেই কৃতজ্ঞ হইতে পারি না। তাঁহারা ভারতের প্রকৃত কল্যাণ কামনায় রঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াও ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াও জাতীয় অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাচীন রীতিনীতির প্রশংসায় মজিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, ভারত ত হিন্দুরই দেশ, ভারতে ত হিন্দুরাজগণই আর্য্যসভ্যতার পালক ছিলেন;—এখন তাঁহারা কোথায়, এখন আমরা কোথায়?—আমরাও তাঁহাদিগের সহিত স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি যে, আর্য্যঋষিগণ তাঁহাদি-

*যে সকল সামাজিক বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে, সে সকল বিষয়ে কেহ কোন প্রবন্ধ লিখিলে, তাহাতে লেখকের নাম উল্লেখ থাকিবে, একথা আত্ম-পরিচয়ে বলা হইয়াছে। মুদ্রাকরের ভ্রম বশতঃ উপস্থিত প্রবন্ধে তৃতীয় সংখ্যায় লেখকের নাম দেওয়া হয় নাই।

শিঃ সঃ।

গের প্রণীত শাস্ত্র সমূহে আমাদিগের পক্ষে যে সকল আচার ব্যবহার শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আধ্যাত্মিক ভাবের অত্যন্ত পোষক। কিন্তু আমরা তৎসঙ্গে সঙ্গেই আবার দেখিতে পাইতেছি যে, আর্য্যাচার অনেক সময়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিরোধী এবং আত্মার প্রকৃতি বিহারের অপ্রশস্ত উপায় মাত্র। আত্মার স্বরূপ যেমনই কেন হয় না, মনুষ্য কতক পরিমাণে জড় জগতের নিয়মের অধীন না হইয়া থাকিতে পারেন না। "নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধমুক্তস্বভাব' আত্মা প্রকৃতির অধীন না হইতে পারেন, কিন্তু স্থূল শরীরাবদ্ধ মনুষ্যাত্মা "শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত" নহেন। তিনি শীত গ্রীষ্ম শ্রমাতুর না হইয়া পারেন না; প্রকৃতির সহিত আত্মার সম্মিলন মনুষ্যের যাবদীয় দুঃখের হেতু হইলেও মনুষ্যাত্মা প্রকৃতির আয়ত্ত। প্রকৃতিকে আশ্রয় না করিয়া আত্মার মুক্তির সম্ভাবনা নাই। তাহাই যদি না হইবে, তবে আত্মার প্রকৃতির সহিত সম্মিলন হইবার কোন তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। প্রাকৃতিক নিয়ম সকল উত্তমরূপে অবগত না হইলে, প্রকৃতির উপর নিজের আধিপত্য সম্যক্ স্থাপন করিতে না পারিলে প্রাকৃতিক নিগ্রহের হস্ত এড়াইবার যো নাই। সুতরাং আত্মার স্বচ্ছন্দতা থাকে না এবং যথাযথ স্ফুরণের ব্যাঘাত বিবেচনা করিলে বুঝা যায় প্রধানতঃ প্রাকৃতিক নিগ্রহের প্রতিকারের জন্যই সমাজের সৃষ্টি। সেই জন্যই সমাজ মূলতঃ উন্নতিশীল হইবে।

এক্ষণে আমাদিগকে শিখিতে হইবে মনুষ্য জীবনের যে দুইটি ভাল আছে—আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক—মনুষ্য তাহার একটিকে অবহেলা করিয়া অপরটির পরিচালনা করিলে তাহার প্রকৃত মঙ্গল হয় না। ভারত এত দিন যে বাহ্য বস্তুর প্রতি অনাস্থা মূলক আচার ব্যবহার অবলম্বনে চলিয়াছে, তাহার ফল আজ আমরা পরাধীনতায়, দরিদ্রতায় ও সর্ব্ব বিষয়ে দৌর্ব্বল্যে দেখিতে পাইতেছি। উহার ফলে ভারতের ভৌতিক উন্নতি এতই কম হইয়াছে যে, জেমস্ মীল প্রভৃতি জড় প্রাকৃতিক দার্শনিকগণের নিকট হিন্দুগণ অসভ্য জাতিমাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। মীল ভারতের ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন—অধিকাংশ ইংরাজ ভারত সংক্রান্ত জ্ঞানে মীলের শিষ্য এবং ভারতবর্ষীয় জাতিসমূহকে অসভ্য জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। ইহার কারণ ভারতের বেদ, ভারতের দর্শন সকলের মর্য্যাদা সকলের বুঝিবার যো৹ নাই। ইংরাজ যাহাকে সভ্যতা চিহ্ন বলিয়া বুঝিতে পারে, ভারতে তাহার বিশেষ কিছু দেখিতে পায় না। ভারত যদি স্বাধীন থাকিত, তবে ইংরাজের, অবজ্ঞাতে ভারতের কিছু যাইত আসিত না। কিন্তু ইংরাজ ভারতের বিধাতা। ইংরাজ ভারতবাসীকে যেরূপ চক্ষে দেখিবে ভারতবাসীর প্রতি, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ব্যবহারও তদনুরূপ হইবে। সুতরাং ইংরাজ আমাদিগকে অবজ্ঞা করিলে আমরা ইংরাজকে অবজ্ঞা করিয়া তাহার শোধ লইতে পারি না। ইংরাজ করিবে কাযে, আমরা করিব মুখে!—সুতরাং আমরা যদি ইংরাজকে দেখাইতে পারি যে ভারত-

বাসীও মনে করিলে ইংরাজের ন্যায় বাহ্য সভ্য হইতে পারে; কিন্তু ইংরাজ তাহার ভৌতিক সুখাভিলাষ পরিত্যাগ না করিলে ভারতঋষির আধ্যাত্মিক ধনভাণ্ডারের অধিপতি হইতে পারিবে না, তবেই আমাদের প্রকৃত প্রতিশোধ হয়।

সৌভাগ্যক্রমে ইউরোপীয় জাতি সকল বহু যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে প্রকৃতির অনেক গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। প্রকৃতির অনন্ত শক্তি নিচয়ের পরস্পর সংযোগ বিয়োগের দ্বারা তাঁহারা মনুষ্যের অনেক কার্য্য সাধন করিবার উপায় বিধান করিয়াছেন। হতভাগ্য হিন্দুজাতি চিরজীবন পরিশ্রম করিয়াও সংসারের যে অভাব মোচন করিতে পারিতেছিল না, ইউরোপীয় জাতিগণ অতি স্বল্প সময়ে সেই কার্য্য সাধন করিতেছে এবং আমাদিগকেও শিক্ষা দিতেছে। ধিক্ হিন্দুকুলে যদি আমরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বড়াই করিয়া এই সুযোগের সমুচিত ব্যবহার করিতে না পারি। যদি হিন্দুগণ এখনও আধ্যাত্মিকতার স্বপ্নময় প্রদেশে থাকিয়াই ভারতের প্রকৃত উন্নতি হইবার সম্ভাবনা বিবেচনা করেন, তবে তাঁহাদের বৈষয়িক জ্ঞানের অত্যন্ত অভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে মাত্র।

ইংরাজের অর্থব্যবহার, ইংরাজের বিজ্ঞান যেমন আমাদিগকে শিক্ষা দিবে, তেমনি ইংরাজ চরিত্রেও আমরা অনেক অনুকরণীয় গুণ দেখিতে পাইব। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার যে সকল দোষ আছে, তাহা আমাদিগকে অতি যত্নের সহিত পরিহার করিয়া চলিতে হইবে। পাশ্চাত্যগণ সাধারণতঃ যেরূপ অর্থের দাস এবং ভৌতিক সুখের অভিলাষী হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব সজীব রাখা এবং সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলা বিশেষ কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজ পিতামাতার বড় ধার ধারেন না,—তাঁহাদিগের সহিত সাধারণতঃ "গুদমভাড়া" পর্য্যন্তই সম্বন্ধ—ইংরাজের স্ত্রীই সংসারে প্রভু। ইংরাজি সভ্যতার অনেক দোষ। সুতরাং ইংরাজের অর্থনীতি ও সমাজনীতিকে আমরা অনেক সময়েই সন্দেহের চক্ষে দেখিব। কিন্তু উক্ত শাস্ত্রের যে সকল তত্ত্ব সমাজের যথার্থ মঙ্গলবিধায়ক বলিয়া আমরা বুঝিতে পারিব, তাহা আমাদিগকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। সামাজিক পবিত্রতা বা আধ্যাত্মিকতার বৃথা ভাণ করিয়া আমরা তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে ক্ষান্ত থাকিব না।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র মৈত্র।

উপকথা।

২। নফর।

কোন এক দেশে নফর নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। সে বড় গরীব ছিল। বিদ্যাবুদ্ধি তাহার বিশেষ কিছু ছিল না। তাহার বাটীর নিকটস্থ এক পাহাড় হইতে সে প্রতিদিবস পাথর কাটিত; এবং সেই পাথর বাজারে বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইত তদ্দ্বারা একরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। নফর বড় উচ্চাভিলাষী ছিল। তাহার নিজের অবস্থায় সে সন্তুষ্ট ছিল না; সর্ব্বদা মনে মনে খুঁত্ খুঁত্ করিত।

এক দিবস নফর পাথর কাটিতেছিল। পরিশ্রম করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়াছিল। এমন সময় দেখিল যে তাহার দেশের রাজা ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। রাজার সঙ্গে অনেক লোক-জন হাতি ঘোড়া। রাজার ঐশ্বর্য্য ও ধুমধাম দেখিয়া নফর মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহারও রাজা হইবার ইচ্ছা হইল। মনে মনে বলিল "হে পরমেশ্বর! আমি রাজা হইলে আর আমার কোন দুঃখ থাকিত না।"

সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর নফরের প্রার্থনা শুনিলেন; এবং নিমেষ মধ্যে তাহাকে অন্য এক দেশে উড়াইয়া লইয়া তথাকার রাজা করিয়া দিলেন।

রাজা নফর আর পাথর কাটে না। এখন তাহার ধুমধাম দেখে কে? সময়ে অসময়ে হাতিতে চড়িয়া লোক জন সহকারে নগর ভ্রমণে বাহির হইত। নগরবাসী সকলে তাহার কাণ্ড দেখিয়া হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিত।

এক দিবস নফর এইরূপ নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছে। তখন বৈশাখ মাসের দুই প্রহর বেলা, ভয়ানক রৌদ্র। নফর কতক দূর ভ্রমণ করিয়া রৌদ্রে বড় ঘর্ম্মাক্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তখন সে মনে করিল "আমি সামান্য রাজা হইয়া কি করিলাম? এখন দেখিতেছি আমার অপেক্ষাও বড় লোক আছে। হে পরমেশ্বর! আমি যদি সূর্য্য হইতে পারি তবে আর কিছুই চাহি না।"

সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর নফরের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। তাহাকে অন্য ভূমণ্ডলে পাঠাইয়া তথাকার সূর্য্য করিয়া দিলেন।

নফরের বাসনা পূর্ণ হইল। সে এইক্ষণে সূর্য্য হইয়াছে। আপন প্রতাপ দেখাইবার জন্য সে সর্ব্বদা কিরণ প্রকাশ করিতে লাগিল। দিবা রাত্রি এক সমান হইয়া উঠিল। প্রখর রৌদ্রে জন প্রাণী ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল। গাছ পালা পুড়িয়া যাইতে লাগিল।

নফর এইরূপ ভাবে কিরণ বিতরণ করিতেছে, এমত সময়ে এক দিন তথায় ভয়ানক মেঘ হইয়া সূর্য্যকে আবরণ করিল। নফরের জ্যোতি আর প্রকাশ হয় না। তখন

সে ভাবিল "কি আশ্চর্য্য! সূর্য্য হইয়াও সুখ নাই! মেঘ আমাকে আবরণ করিয়া আমার ক্ষমতা নষ্ট করিল? হে পরমেশ্বর! আমি মেঘ হইতে ইচ্ছা করি।"

দয়ার সাগর পরমেশ্বর "তথাস্তু" বলিয়া নফরকে মেঘ করিয়া দিলেন। এখন নফরের প্রতাপ দেখে কে? দিবারাত্রি বৃষ্টি; পৃথিবী রসাতলে যাইবার লক্ষণ হইল।

নফর মেঘ হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এক দিবস দেখিল যে একটি পাহাড় তাহার প্রতাপ সহ্য করিয়া অচল অটল ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। নফর তাহা আর সহ্য করিতে পারিল না। সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইবার তাহার ইচ্ছা, সুতরাং মেঘের অবস্থায় সে আর কিছু সুখ অনুভব করিল না। তখন বলিল "পরমেশ্বর! আমি আর কিছুই প্রার্থনা করি না; আমাকে পাহাড় করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়।"

সর্ব্বজ্ঞানী পরমেশ্বর ঈষৎ হাস্য করিয়া নফরকে পাহাড় করিয়া দিলেন। নফর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া গগন মার্গে উঠিতে লাগিল। তাহার দেহ পাহাড় হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সে আপন বক্ষস্থল প্রশস্ত করিয়া মস্তক উন্নত করিয়া গর্ব্বিত ভাবে সমস্ত পৃথিবী অবলোকন করিতে লাগিল। এখন নফরের আনন্দের আর সীমা নাই। সকলেই তাহার অপেক্ষা ছোট। ভাবিল "এইবার আমার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। এতদিন সকলের ছোট থাকিয়া বৃথা জীবন কাটাইয়াছি।"

এই ভাবে কিছু দিন গেল। হঠাৎ এক দিবস নফর দেখিল যে তাহার পাদদেশ হইতে এক ব্যক্তি পাথর কাটিয়া লইয়া যাইতেছে। দেখিবা মাত্র তাহার গর্ব্বিত হৃদয়ে আঘাত লাগিল। মনে করিল "ঐ ব্যক্তি আমার অপেক্ষাও বড়। সকলে আমার প্রতি আশ্চর্য্য হইয়া ভক্তি সহকারে তাকাইয়া থাকে আর ঐ ব্যক্তি আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া আমার গাত্রে আঘাত করিয়া পাথর কাটিয়া লইতেছে। অতএব হে পরমেশ্বর! আমি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হইতে ইচ্ছা করি।"

তখন পরমেশ্বর তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বাপু নফর! তোমার আশা কিছুতেই মিটিবে না। তোমার কিছুতেই সুখ নাই। আমি যাহাকে যে অবস্থায় প্রেরণ করিয়াছি তাহার তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সন্তুষ্ট চিত্ত ব্যক্তিরা সর্ব্বদা মনের সুখে থাকে। অসন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তিরা কিছুতেই সুখ পায় না। তুমি পূর্ব্বে পাথর কাটিয়া জীবন ধারণ করিতে; এক্ষণে যাও, সেই কার্য্য পুনরায় আরম্ভ কর। তোমার ইচ্ছানুসারে পাঠাইলাম। এবার আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিও।"

নফর পুনরায় পাথর কাটিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল। এখন সে আপন অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছে। অল্পতেই সে সন্তুষ্ট। অতএব সুখে তাহার দিন যাইতে লাগিল।

ভাষা-বিবেক।

বর্ণ-পরিচয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

দেবদাস। সুশীল! আ'জ অনেক বেলা হইল, তবু যে তুমি পড়িতে আসিলে না?

সুশীল। আজ্ঞে এই যে আসিলাম। বলুন দেখি, আর কতটি অক্ষর শিখিবার বাকি আছে?

দে। সবশুদ্ধ তোমাকে পঞ্চাশটি অক্ষর শিখিতে হইবে। কতটি অক্ষর শিখিয়াছ গণিয়া বলিতে পার?

সু। হাঁ পারি। কা'ল আপনার কাছে যখন বলি, তখন ঔষধের ঔ আর ধ এই দুইটা অক্ষর বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। রাত্রিতে শুইয়া যখন মনে করিতেছিলাম, তখন ঐ দুইটা অক্ষরও মনে পড়িল। আমি গণিয়া দেখিলাম, এগারটা অক্ষর শিখিয়াছি।

দে। তুমি কত গণিতে জান?

সু। আমি মার নিকট এক শ গণিতে শিখিয়াছি। মা বলিয়াছেন আরও ঢের আছে।

দে। আচ্ছা বলিতে পার, সবশুদ্ধ পঞ্চাশটি অক্ষরের মধ্যে যদি এগারটি শিখিয়া থাক, তাহা হইলে আর কতটি অক্ষর শিখিবার বাকি আছে?

সু। তা বলিতে পারিব না। কতটি?

দে। ঊনচল্লিশটি।

সু। তবেত এখনও অনেক বাকি আছে দেখিতেছি! আচ্ছা, আ'জ আমি অনেকটি শিখিয়া ফেলিব, আপনি বলুন। আ'জ আমার শিখিতে খুব ইচ্ছা হইয়াছে।

দে। বল দেখি 'স্বর' কথাটাতে কয়টা অক্ষর আছে?

সু। য আর র, স্বর, দুইটা অক্ষর আছে?

দে। হাঁ তাই আছে। এ দুইটা অক্ষর চিন কি?

সু। না, ইহার একটাও চিনি না।

দে। এই দেখ, (শ্লেটে লিখিয়া) 'স্বর' এইরূপ লিখিতে হয়।

সু। স্ব, র, স্বর; আচ্ছা শিখিলাম। ইহাদের দন্ত্য মূর্দ্ধন্য কিছু নাই ত?

দে। সকল অক্ষরেরই যে দন্ত্য মূর্দ্ধন্য আছে তা নয়। যেখানে থাকে সেখানে আমিই তোমাকে বলিয়া দিব।

সু। তবে 'স্বর' ত আমি শিখিয়াছি, আর কোন্‌টা শিখিব বলুন।

দে। (শ্লেটে লিখিয়া) এই দেখ, এই রূপে 'বই' লিখিতে হয়।

সু। ব, আর ই, বই। শিখিয়াছি।

দে। অমন করিয়া তাড়াতাড়ি কেবল মুখে বলিলেই হইল না। অক্ষর গুলি

ভাল করিয়া চিনিলে তবে শিখিয়াছ বলিতে পার।

সু। (স্থির ভাবে কিছুকাল অক্ষর কয়টি দেখিয়া) হাঁ আমি চিনিয়াছি; ষ, র, ব, আর ই, এই কয়টা অক্ষর আমি যেখানে সেখানে চিনিতে পারিব।

দে। 'বই' বলিতে কেবল ব আর ই বলিলে চলিবে না, ব আর হ্রস্ব ই বলিতে হইবে।

সু। তবে কি আরও ই আছে নাকি?

দে। আর একটা ই আছে, তাহাকে দীর্ঘ ঈ বলে।

সু। আগে শিখিয়াছি দন্ত্য, মূর্দ্ধন্য, আর তালব্য। এখন আবার শিখিতে হই-তেছে রস্ব দীর্ঘ।

দে। রস্ব নয়, হ্রস্ব।

সু। হস্ব।

দে। হইল না; হ্রস্ব বলিতে হইবে।

সু। হস্বও নয়, রস্বও নয়, হরস্ব!

দে। তাও হইল না। দন্ত্য স শিখি বার সময়ে কেমন করিয়া শিখিয়াছিলে, মনে আছে?

সু। আছে। আপনি অনেক বার দন্ত্য কথাটা বলিয়া ছিলেন, আর আমিও আপনার সঙ্গে মনে মনে উহা বলিতে ছিলাম, তার পরে যখন একবার চেষ্টা করিলাম, তখন কথাটি অবাধে মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

দে। আচ্ছা, এখানেও একব্যর সেই-রূপ চেষ্টা করিয়া দেখ। হ্রস্ব, হ্রস্ব, হ্রস্ব, হ্রস্ব।

সু। হ্রস্ব। এত বড় সহজ উপায় দেখিতেছি?

দে। পুনঃ পুনঃ কোন বিষয়ে চেষ্টা করাকে অভ্যাস বলে। আমার মুখে যেমন শুনিলে, সেইরূপ 'হ্রস্ব' কথাটি বলিবার জন্য যে তুমি অনেকবার চেষ্টা করিলে, ইহা একটি অভ্যাসের কায হইল। ইহার পরে দেখিতে পাইবে, মানুষের উন্নতি ও সুখ অভ্যাসের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। ভাল বিষয়ে অভ্যাস করিলে মানুষ ভাল হয়, আর অভ্যাসের গুণে কঠিন বিষয়ও সহজ হইয়া আইসে।

সু। অভ্যাস করিলে কঠিন বিষয়ও যে সহজ হয়; তাহা ত এই অক্ষর গুলি শিখিতেই বেশ বুঝিতে পারিতেছি। হ্রস্ব ই শিখিলাম, এখন দীর্ঘ ঈ দেখাইয়া দেন।

দে। তুমি লাঙ্গল চিন?

সু। যে লাঙ্গল দিয়া চাষ দেয়? তা চিনি বই কি?

দে। লাঙ্গলের ঈষ চিন?

সু। তা চিনি না। কোন্‌টাকে ঈষ বলে?

দে। যেটা মাটি খুঁড়ে, সেইটাই লাঙ্গল, আর তার সঙ্গে যে লম্বা একখান কাঠ লাগান থাকে, তাহাকে ঈষ বলে।

সু। চিনিলাম। এই ঈষ লিখিতে কি দীর্ঘ ঈর দরকার হয়?

দে। হাঁ, ঈষ লিখিতে দীর্ঘ ঈ, আর মূর্দ্ধন্য ষ লাগে। (শ্লেটে লিখিয়া) এই দেখ, ঈষ এইরূপে লিখিতে হয়।

সু। দীর্ঘ ঈ শিখিলাম; আর কি শিখিতে হইবে বলুন।

দে। তুমি খড়ম অবশ্যই চিন; (শ্লেটে লিখিয়া) 'খড়ম' এইরূপে লিখিতে হয়।

সু। খ, ড়, ন, এই তিনটা অক্ষর, ইহার মধ্যে ন ত জানাই আছে, কেবল খ আর ড় এই দুইটা অক্ষর নূতন। তার পরে আর কি আছে বলুন।

দে। আছে ত অনেকই; কিন্তু এক দিনে এতগুলি শিখিলে মনে রাখিতে পারিবে ত?

সু। আমার আজ বেশ মন লাগিয়াছে, আরও কয়েকটা অক্ষর আমায় দেখাইয়া দেন, আমি ভুলিব না।

দে। আচ্ছা আমি আর এবিষয়ে কিছু বলিব না; তুমি যখন নিজ হইতে বিশ্রাম চাহিবে তখনই তোমাকে ছাড়িব, তাহার আগে নয়। তুমি 'যব' চিন?

সু। এই যে মাঠে ধানের মত জন্মিয়া থাকে, তাই? তা চিনি বই কি?

দে। (শ্লেটে লিখিয়া) এইরূপে যব লিখিতে হয়।

সু। য আর ব, যব। শিখিলাম।

দে। খালি য বলিলে চলিবে না, অন্তঃস্থ য বলিতে হইবে।

সু। আরও কি য আছে?

দে। হাঁ আর একটা য আছে, তাহার নাম বর্গীয় জ; 'জল' লিখিতে সেই জ লাগে। (শ্লেটে লিখিয়া) এই দেখ, এইরূপে জল লিখিতে হয়।

সু। অন্তঃস্থ য আর ব, যব। বর্গীয় জ আর ল, জল। শিখিয়াছি।

দে। তুমি 'পশম' অবশ্যই চিন। (শ্লেটে লিখিয়া) এইরূপে পশম লিখিতে হয়।

সু। প, শ, ম। তালব্য শ আর স ত আগেই শিখিয়াছি, এখন প শিখিলাম।

দে। (শ্লেটে 'দই' শব্দটি লিখিয়া) এইরূপে দই লিখিতে হয়।

সু। ও বাবা! দই আবার লিখিতে হয়! আচ্ছা হ্রস্ব ই ত 'বই' লিখিবার সময়েই শিখিয়াছি, এখন দ শিখিলাম।

দে। (শ্লেটে 'ফল' শব্দটি লিখিয়া) দেখ এইরূপে ফল লিখিতে হয়।

সু। ফ আর ল, ফল। এখন ত বেশ সোজাই বোধ হইতেছে। প্রথমে কিছুই জানিতাম না, এখন সকল কথাতেই দুইটি একটি অক্ষর চিনিতে পারি।

দে। যত শিখিবে, ততই সব সোজা হইবে। (শ্লেটে লিখিয়া) এই দেখ, 'ঝড়' এই রকম লিখিতে হয়।

সু। দেখুন ঠিক কি না। খড়মের মধ্যে ড় শিখিয়াছি এখন কেবল ঝ শিখিতে হইল।

দে। (শ্লেটে 'ঘট' শব্দটি লিখিয়া) এই রকমে ঘট লিখিতে হয়।

সু। ঘ আর ট, ঘট; ঘ চিনি, পরের অক্ষরটা বুঝি ট। আজ অনেকটি অক্ষর শিখিলাম, এখন যেন কিছু ভুল ভুল বোধ হইতেছে। যা হউক, আরও কয়েকটা অক্ষর শিখিয়া রাখি; যদি ভুলিয়া যাই, আবার দেখিয়া লইলেই হইবে।

দে। তা হইবে না। যাহা শিখিবে, তাহা একেবারে মনের সঙ্গে গাঁথিয়া রাখিবে, যেন আর কখনও ভুলিতে না হয়। একটা সম্পূর্ণ রূপে শিক্ষা না হইলে আর একটা শিখিতে কখনও চাহিবে না। এ অভ্যাস এখন হইতেই করিতে হইবে। যাহাদের এ অভ্যাস নাই তাহারা বড় হতভাগ্য;

তাহারা একটা শিখিতে যাইয়া আর একটা ভুলিয়া যায়, সুতরাং তাহারা পরিশ্রম করিলেও জ্ঞানী হইতে পারে না।

সু। আপনার কথা ভাল করিয়া বুঝিলাম না।

দে। বুঝিলে না! আচ্ছা মনে কর, তোমার মা তোমাকে একটি ঘটী দিয়া জল তুলিয়া একটি কলস পূর্ণ করিতে বলিলেন। তুমি দুই ঘটী জল কলসে ঢালিয়া দেখিলে, কলসের নিম্নে একটা ছিদ্র আছে, তাই দিয়া সব জল বাহির হইয়া যাইতেছে। তখন তুমি কি করিবে?

সু। আমি উহাতে আর জল ঢালিব না, কলস বদলিয়া দিতে মাকে বলিব।

দে। কিন্তু মনে কর আর কলস নাই, ঐটাই তোমাকে পূর্ণ করিতে হইবে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে?

সু। তাহা হইলে আগে মাটি বা ময়দা দিয়া ছিদ্র বন্ধ করিয়া তাহার পরে জল ঢালিব।

দে। কেন?

সু। জল যদি কলসীর ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়, তবে সেই কলসে জল ঢালা কেবল বৃথা পরিশ্রম বইত না?

দে। সেইরূপ, যাহা শিখিলে, তাহা যদি মনে না রহিল, তাহা হইলে নূতন নূতন কথা শিক্ষা করা কেবল বৃথা পরিশ্রম বই আর কি?

সু। এখন বেশ বুঝিলাম। আচ্ছা তবে আজ আর শিখিব না।

ছাত্রোপদেশ।

৩—মনোযোগ।

অবধান, মনোযোগ, অভিনিবেশ, একাগ্রতা, তন্ময়তা, ইহারা একটিমাত্র মানসিক কার্য্যের প্রকাশক, তবে পরিমাণ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। অবধান—আলোচ্য বিষয়ে মনকে রাখা। মনোযোগ—আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে মনকে যুক্ত করা। অভিনিবেশ—আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে মনকে প্রবিষ্ট করা। একাগ্রতা—সমগ্র মানসিক বৃত্তি বা মানসিক শক্তিকে একীভূত করিয়া মনকে আলোচ্য বিষয়ের প্রতি ধাবিত করা। তন্ময়তা—সময়ের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ভুলিয়া, স্থানের দূরত্ব এবং নৈকট্য ভুলিয়া, এমন কি, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যথাসম্ভব বিস্মৃত হইয়া, আলোচ্য বিষয়ে মনকে সম্পূর্ণরূপে লীন করা। ইহাতে দেখা যাইতেছে, অবধানে যে বৃত্তির আরম্ভ, তন্ময়তায় তাহার পরিণতি—পরিসমাপ্তি। যে অবস্থায় এই মানসিক কার্য্য তন্ময়তা-সংজ্ঞা লাভ করে, ইহার পরিমাণ বা গাঢ়তা তদপেক্ষা অধিক হইতে

পারে বলিয়া আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। কিন্তু এই সকল শব্দের মধ্যে মনোযোগ-শব্দই সচরাচর বহুলরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং 'অল্প,' 'অধিক' প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ হয়। এই প্রবন্ধে আমরাও সাধারণতঃ মনোযোগ-শব্দই ব্যবহার করিলাম।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, জ্ঞানলাভের জন্য অভ্যাস এবং শ্রদ্ধার নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু এখন বলিতেছি মনোযোগের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বিদ্যা অমূল্য ধন ; কোন প্রকার মূল্য দিয়া এ ধন কিনিয়া লইবার উপায় নাই। কিন্তু যদি এই অমূল্য ধনের কোন মূল্য থাকে, যদি বিনিময় দিয়া বিদ্যালাভ করিবার উপায় কিছু থাকে, তবে তাহা মনোযোগ।

বিনিময়—এক বস্তু দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে আর এক বস্তু লাভ করা। বিনিময়ের নিয়ম এই, দত্ত বস্তুর পরিমাণ অনুসারে প্রাপ্ত বস্তুর পরিমাণ অধিক বা অল্প হয়। মনে কর, আমি কুড়ি তোলা রৌপ্য দিয়া যদি এক তোলা স্বর্ণ পাই, তবে চল্লিশ তোলা রৌপ্য দিলে দুই তোলা স্বর্ণ এবং একশত তোলা রৌপ্য দিলে পাঁচ তোলা স্বর্ণ অবশ্যই পাইব। যদি কাগজের দিস্তা চারি আনা হয়, তাহা হইলে তুমি চারি আনা দিলে এক দিস্তা কাগজ পাইবে বটে, কিন্তু চার পয়সা দিলে ছয় তক্তার অধিক কখনই পাইবে না। যেমন দাম, তেমনি জিনিস ; যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল ; যেমন সাধনা, তেমনি সিদ্ধি ; যেমন দেনা, তেমনি পাওনা ; ইহা ঈশ্বরের একটি অপরিবর্ত্তনীয় বিধান, সৃষ্টির কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

বিদ্যা-শিক্ষাও এই ধ্রুব নিয়মের অধীন। তুমি যে পরিমাণে মনোযোগ দিতে পারিবে, সেই পরিমাণেই বিদ্যালাভ করিবে,—এখানেও অল্প দিয়া অধিক পাইবার নিয়ম নাই। ইহার দৃষ্টান্ত আর কি দিব, নিজের জীবন, নিজের অন্তর, নিজের অবস্থা, নিজের সঙ্গিগণের দিকে একবার চাহিয়া দেখ, সহজেই বুঝিতে পারিবে। রাম এবং শ্যাম এক পিতামাতার সন্তান, এক রকম বুদ্ধিমান, এক শিক্ষকের নিকট একই বই পড়িতেছে, তথাপি রাম বার্ষিক পরীক্ষায় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইল, আর শ্যাম উত্তীর্ণও হইতে পারিল না, এক বৎসর যে শ্রেণীতেই ছিল, আর এক বৎসর সেই শ্রেণীতেই তাহাকে থাকিতে হইল! এরূপ কি প্রতি বৎসর প্রতি বিদ্যালয়ে ঘটিতেছে না? ইহার কারণ কি? কারণ, শ্যামের পক্ষে মনোযোগের অভাব। যখন শিক্ষক পড়া বুঝাইয়া দিতেন, তখন রাম অনন্যমনে তাঁহার কথা শুনিত, কিন্তু শ্যাম অন্য অমনোযোগী বালকের সঙ্গে গল্প করিত, না হয় পুস্তকের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অন্য কথা ভাবিত। বাড়ীতে রাম যখন নির্জ্জনে বসিয়া পড়া শুনা করিত, তখন শ্যাম হয়ত খেলা করিত, না হয় গল্প করিত, না হয় জুতায় কালি দিত, না হয় ঘুমাইত। সে বৎসর ভরিয়া শিক্ষককে ফাকি দিয়াছে, আজ নিজে সেই ফাকিতে পড়িল ; কেন না, যেমন দান, তেমনি প্রাপ্তি অনিবার্য্য।

পরিশ্রমের মূল্য অবশ্যই খুব বেশী,

বিনা পরিশ্রমে কোন কার্য্যই সাধিত হয় না; কিন্তু মনোযোগ-বিহীন পরিশ্রম কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। অনেক বালকের জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ হয়। অনেকে মনে করে, পরিশ্রম করিলেই বিদ্যা হইবে; পরিশ্রমের সঙ্গে যে মনোযোগের প্রয়োজন আছে, ইহা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে না। কি দিনে কি রাত্রিতে, তাহাদের সঙ্গে যখনই সাক্ষাৎ হয়, তখনই দেখিবে তাহাদের হাতে পুস্তক রহিয়াছে, তাহারা মুখে বিড় বিড় বকিতেছে। তুমি দেখিয়া মনে করিতে পার ইহারা বাল্যকাল অতীত না হইতেই সকল বিদ্যায় অগাধ অধিকার লাভ না করিয়া ছাড়িবে না; কিন্তু একটুকু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তোমার এ ভ্রম ঘুচিবে। তখন দেখিবে, অনেক স্থলেই প্রচুর পরিশ্রম আছে বটে, কিন্তু কৃতকার্য্যতার আসল উপাদান যে মনোযোগ, তাহাই নাই, সুতরাং কৃতকার্য্যতাও নাই।

যথেষ্ট পরিশ্রম করে, পাঁচ কিছুই শিখিতে পারে না, এরূপ বালকের দৃষ্টান্ত হয়ত অনেকেই দেখিয়াছ, হয়ত অনেকে নিজেই তাহার প্রমাণ; তথাপি আমি এ স্থলে একটি বালকের গল্প বলিব। এক জন ভদ্রলোক বাল্যকালে যখন কোন গ্রাম্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন, তখন একটি বালক এক দিন তাঁহার নিকটে পড়া শিখিতে আইসে। বালকটি তিন বৎসর যাবৎ বোধোদয়, বঙ্গ-বিবরণ, আর এক খানি ক্ষুদ্র বাঙ্গালা ব্যাকরণ পড়িতেছে, কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষায় একবারও উত্তীর্ণ হইতে পারে না। বালকের মা ছেলেকে উপরের শ্রেণীতে তুলিয়া দিবার জন্য অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু শিক্ষকেরা তাঁহার অনুরোধ রাখিলেন না। অবশেষে তিনি উক্ত ভদ্রলোকের নিকটে ছেলেটিকে পাঠাইয়া দিলেন। ভদ্রলোক বালককে বলিলেন,—"ভাই! এখানে বসিয়া বেশ মনোযোগ দিয়া পড়; যেখানে বুঝিবে না, সেখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। কিন্তু পড়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত স্থান ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না।" বালক তথাস্তু বলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল; ফলে পড়া ছাড়িয়া এদিক ওদিক যাইবার অভ্যাস তাহার বড় একটা ছিল না। বঙ্গ-বিবরণের প্রথমেই লেখা আছে, "বঙ্গদেশের উত্তর সীমা নেপাল, শিকিম ও ভোটান।" বালক পড়িতে লাগিল, "বঙ্গদেশের উত্তর সীমা, বঙ্গদেশের উত্তর সীমা, বঙ্গদেশের উত্তর সীমা।" তাহার দৃষ্টি কখন ঘরের চালে, কখন গাছে, কখন পাখীর দিকে, কখনও বা বিড়ালের উপরে. কিন্তু মুখে অবিশ্রাম চলিতেছে "বঙ্গদেশের উত্তর সীমা।" অনেকক্ষণ পরে ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বঙ্গদেশের উত্তর সীমা কি?" বালক পুস্তকের দিকে চাহিয়া বলিল, "নেপাল।" তিনি বলিলেন "কেবল 'নেপাল' বলিলে চলিবে না, 'নেপাল, শিকিম ও ভোটান' বলিতে হইবে।" বালক তখন "বঙ্গদেশের উত্তর সীমা" ছাড়িয়া "নেপাল, শিকিম ও ভোটান" আরম্ভ করিল। এইরূপে তাহার পড়া হইল। ভদ্রলোকটি বালকের মাকে বলিলেন, "আপনার ছেলেকে আবার বর্ণ পরিচয় হইতে শিখাইতে আরম্ভ

করিয়া ভাল করিবার চেষ্টা করিতে হয়; কিন্তু তাহাতেও সে ভাল হইবে কি না সন্দেহ, বিশেষতঃ আমার তেমন অবসর নাই।”

এই গল্পটি অতি-রঞ্জিত নহে, এবং বালকদিগের মধ্যে ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। বিদ্যালাভের উপযুক্ত সুযোগ থাকিতেও যাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে না, তাহাদিগের জীবন অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, অধিকাংশ স্থলেই এই মনোযোগের অভাব কারণ-রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার এক দিকে প্রাচুর্য্য আছে, অন্য দিকে তাহার বিলক্ষণ অভাব রহিয়াছে,—সংসারে কেহই সকল বিষয়ে সুখী নহে। ধনীর সন্তানদিগের শিক্ষক, পুস্তক, পাঠাগার প্রভৃতি শিক্ষার ষোল আনা আসবাব আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিক স্থলেই দেখা যায়, এই সকল আসবাব যে পরিমাণে অধিক, শিক্ষায় তাহাদের মনোযোগ সেই পরিমাণে কম। এই সকল বাহ্য আসবাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর মনোযোগ যে স্থলে থাকে, সে স্থলে চমৎকার ফলও পাওয়া যায়,—পার্থিব সম্পদের সঙ্গে মানসিক সম্পদ সম্মিলিত হইয়া মানুষকে সৌন্দর্য্যে ভূষিত করে, এবং মহত্ত্ব-লাভের সুযোগ তাহার নিকটস্থ করিয়া দেয়; কিন্তু এরূপ সুখকর দৃষ্টান্ত এতই বিরল যে ইহাকে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলা যাইতে পারে। আবার যাহাদের বাহ্য আসবাবের সম্পূর্ণ অভাব,—যাহারা আহারের অন্ন, পরিধানের বস্ত্র, এবং পড়ার পুস্তকের জন্য অন্যের গলগ্রহ হয়, অনেক সময়ে বিনা বেতনে আশ্রয়দাতার ভৃত্যগিরি করে, তাহাদের বিলক্ষণ মনোযোগ থাকে, নানারূপ ফরমাইস খাটিয়াও তাহারা নিজের নির্দিষ্ট পড়াটি ভালরূপে শিখিতে পারে। বাহ্য আসবাবের অভাবে তাহাদের যে সকল অসুবিধা রহিয়াছে, একমাত্র মনোযোগের প্রসাদে সে সকলের ক্ষতিপূরণ হইয়া লাভের অঙ্ক দাঁড়ায়। ধনি-সন্তানের বাহ্যাড়ম্বর দেখিয়া যদি দরিদ্র-সন্তানের লোভ জন্মে, তাহা হইলে দরিদ্র-সন্তানের এই মানসিক শ্রেষ্ঠতা দেখিয়া ধনি-সন্তানেরও লোভ হওয়া উচিত। পণ্ডিতেরা বলেন, পার্থিব ধন অপেক্ষা মানসিক সম্পদ উচ্চতর; যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে অমনোযোগী ধনি-সন্তানের লজ্জিত হওয়া উচিত। ধনলাভ দরিদ্র-সন্তানের নিজের আয়ত্ত নহে, সুতরাং এ অভাবের জন্য তাহার নিজের দোষ নাই। কিন্তু মনোযোগ-লাভ সকলেরই [illegible], কেন না ইহা যত্ন-সাপেক্ষ; সুতরাং যা[illegible] মনোযোগ নাই, সে নিজেই এ অভাবের জন্য দোষী।

কেবল লেখা পড়া শিখিতেই কি মনোযোগের প্রয়োজন, এমন নহে। জীবনের সকল কার্য্যেই মনোযোগ চাই, বিনা মনোযোগে কিছুতেই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। এমন দেখা গিয়াছে, ত্রিশ বৎসর বয়সের একজন ভৃত্য নিজে তামাক খাইত, অথচ তাহা সাজিতে জানিত না, পরে মনিবের নিকটে তাহাকে উহা শিখিতে হয়। যখন ভৃত্য নিজের এ ত্রুটি জানিতে পারিয়াছিল, তখন এজন্য

বিলক্ষণ লজ্জিত হইয়াছিল। যাহার যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা মনোযোগের সহিত শিক্ষা না করিলে এক দিন অবশ্যই এইরূপে লজ্জিত হইতে হয়। উঠিতে, বসিতে, চলিতে, কথা কহিতে, প্রত্যেক কার্য্যে মনোযোগের প্রয়োজন। অন্নাহার এবং জল-পান যে এত সহজ এবং প্রীতিকর ব্যাপার, ইহাতেও মনোযোগের একান্ত প্রয়োজন। অনেকে হয় ত একথা শুনিয়া উপহাস করিবেন, কিন্তু একটুকু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, ইহা উপহাসের কথা নহে। সকলেই জানেন, ভাত খাইতে বা জলপান করিতে সময়ে সময়ে 'বিষম' লাগিয়া থাকে; এই বিষম অমনোযোগেরই বিষময় ফল। ইহা এত কষ্টকর ও বিপদজ্জনক যে, ইহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

যাহার মনোযোগ নাই, তাহাকে অন্যমনস্ক বলে। যে এক কায করিবার সময়ে আর এক কাযের কথা ভাবে, সেই অন্যমনস্ক। যে বালক ইতিহাস পড়িবার সময়ে গণিতের কথা ভাবে, গণিত পড়িবার সময়ে সাহিত্যের কথা ভাবে, সাহিত্য পড়িবার সময়ে আহারের কথা ভাবে, আবার আহারের সময়ে খেলার বিষয়ে চিন্তা করে, সে কিছুই শিখিতে ত পারেই না, লাভের মধ্যে পদে পদে নিগ্রহ ভোগ করে।

মনোযোগ-সম্বন্ধে একটা নিয়ম এই যে, যদিও এক সময়ে দুই চারি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলেও, মনোযোগের বিষয় যত অল্প হইবে, তাহার গাঢ়তা তত অধিক হইবে। ঠিক এক সময়ে যদি দশ জনের দশ বিষয়ে কথা শুনি, তাহা হইলে কিছুই মনে থাকিবে না—কিছুই বুঝিতে পারিব না। যদি এইরূপে দুই জনের কথা ঠিক এক সময়ে শুনি, তাহা হইলে ইহার কতক উহার কতক বুঝিতে পারি বটে, কিন্তু যদি এক জনের কথা এক সময়ে শুনি, তাহা হইলেই কেবল তাহার কথা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার সম্ভাবনা। সে বার "শতবদন" উপাধিধারী এক জন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ এদেশে আসিয়াছিলেন; তাঁহার এমন চমৎকার শক্তি যে, দশ জন লোকে একেবারে অর্থ শূন্য অনেক গুলি কথা বলিয়া গেলেও তিনি প্রত্যেকের কথা সম্পূর্ণরূপে মনে রাখিতে, এবং একে একে প্রত্যেকের কথা পুনরাবৃত্তি করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার এই শক্তিকে দৈব-শক্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাধারণতঃ যাহা দেখা যায়, তাহাতে এই কথাই সত্য যে, এক সময়ে এক বিষয়ে মনোযোগ দিলেই তাহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইতে পারে, অনেক বিষয়ে এক সময়ে মনোযোগ দিলে কোনটিই আয়ত্ত হয় না।

এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। শারীরিক শক্তির ন্যায় মানসিক শক্তিরও একটা সীমা আছে, ইহা অসীম নহে। যে এক মোন ওজনের এক খানি পাথর দড়ী দিয়া বাঁধিয়া অনায়াসে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে, ঐরূপ দুই খানি পাথরকে টানিয়া চালাইতে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইবে, আর ঐ রূপ পাঁচ খান পাথরকে বাঁধিয়া প্রাণ পণে টানাটানি করিলেও হয়ত নাড়িতেই

পারিবে না। কিন্তু পাঁচটি পাথর একবারে ধরিয়া টানাটানি না করিয়া যদি একটি একটি করিয়া টানাটানি করে, তাহা হইলে পাঁচটি কেন, ঐ রকম পাঁচ শত পাথর স্থানান্তরিত করাও অসম্ভব হইবে না। এক কলস জল একটি গাছের গোড়ায় ঢালিলে গাছটি বাঁচিতে পারে, জল ঢালার উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে, সুতরাং পরিশ্রম সফল হইতে পারে; কিন্তু এক কলস জল এক শত বৃক্ষের মূলে সেচন করিলে বৃক্ষের উপকার কিছুই হইবে না, কিন্তু শক্তি-ক্ষয় অবধারিত। বিজ্ঞ বিজেতৃগণ একটি দেশ জয় করিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত না হইলে অপরটি আক্রমণ করেন না; যিনি এ বিষয়ে দৃষ্টি না রাখিয়া একবারে সর্ব্বগ্রাস করিতে চান, তাঁহার অধঃপতন অচিরেই হয়।

বাস্তবিক যত প্রকার যোগ আছে, মনোযোগ তাহাদের সকলেরই মূল; এই যোগের যথোচিত সাধন হইলে জ্ঞান-যোগ, আত্ম-যোগ, ব্রহ্ম-যোগ, সকল প্রকার যোগই অনায়াসে সাধিত হইতে পারে।

অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, পৃথিবীতে বিদ্যাবুদ্ধিতে যাঁহারা বড় লোক হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেরই মনোযোগ করিবার শক্তি খুব অধিক পরিমাণে ছিল,—অনেকের জীবনে ইহা তন্ময়তায় পরিণত হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় বড় লোকদিগের জীবন-চরিত রাখিবার রীতি ছিল না, সুতরাং তাঁহাদের জীবনে এ বিষয়ে অধিক উদাহরণ পাইবার উপায় নাই। আমরা অর্জ্জুনের অস্ত্র-শিক্ষা সম্বন্ধে একটি গল্প শুনিয়াছি, এস্থলে তাহাই বলিব। অর্জ্জুন, দুর্য্যোধন প্রভৃতি কুরু-পাণ্ডবীয় বীরগণ বাল্যকালে দ্রোণাচার্য্যের নিকটে অস্ত্র শিক্ষা করিতেন। যেখানে শিক্ষা আছে, সেখানে পরীক্ষাও আছে। এক দিন আচার্য্য ছাত্রদিগের ধনুর্ব্বিদ্যা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া এক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। শিষ্যেরা ভাবিল, গুরুদেব না জানি কোন ভীষণ দৈত্য বা রাক্ষসের সঙ্গে তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে বলেন, এই মনে করিয়া তাহারা সাহসে ও বিক্রমে হৃদয় বাঁধিয়া, যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গুরুর সঙ্গে চলিল। তিনি একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলে দাঁড়াইলেন। ঐ বৃক্ষের উচ্চ শাখায় একটি ক্ষুদ্র পাখী বসিয়াছিল। দ্রোণাচার্য্য ঐ পাখীটি অঙ্গুলিদ্বারা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "বাণদ্বারা এই পাখির গলাটা দ্বিখণ্ড করিতে হইবে।" আজ্ঞামাত্র শিষ্যেরা সকলেই সানন্দে গুরুর আদেশ-পালনে প্রস্তুত হইলেন। তাহা দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য বলিলেন, "অমন করিলে চলিবে না, আমি একে একে তোমাদের লক্ষ্য পরীক্ষা করিব।" তৎপরে তিনি তাহাদের মধ্যে একজনকে বলিলেন, "তুমি লক্ষ্য স্থির কর, কিন্তু বাণ ছাড়িও না।" শিষ্য সেইরূপ করিলে গুরু প্রশ্ন করিলেন, "কি দেখিতেছ?"

শিষ্য। "একটি পাখী দেখিতেছি।"

গুরু। "পাখীটি বর্ণনা কর।"

শিষ্য। "পক্ষীটি ক্ষুদ্র, ইহার বর্ণ সুন্দর, পদ, পক্ষ, চঞ্চু, পুচ্ছ ইত্যাদি আছে।"

এইরূপে আচার্য্য সকল শিষ্যকেই পরীক্ষা করিলেন,—সেই একরূপ প্রশ্ন, একরূপই উত্তর। অবশেষে অর্জ্জুন লক্ষ্য-স্থির করিয়া দাঁড়াইলে দ্রোণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতেছ ?"

অর্জ্জুন। "একটি পাখীর গলা।"

গুরু। "আর কিছু দেখিতে পাইতেছ ?"

অর্জ্জুন। "না—কিছুই না।"

কি চমৎকার তন্ময়তা! আজ যে অর্জ্জুন সহাধ্যায়িদিগকে মনোযোগের প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করিলেন, সেই অর্জ্জুনই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে মৎস্য-চক্র ভেদ করিয়া রাজন্যবর্গের মস্তক অবনত করিবেন, সেই অর্জ্জুনই বাহুবলে কুরু-কুল ধ্বংস করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজ-সিংহাসনে বসাইবেন।

উপরে লিখিত গল্পে কবি-কল্পনা অনেকটা থাকিতে পারে, কিন্তু কবি-কল্পনা থাকিলেও ইহা দ্বারা মনোযোগের প্রয়োজনকে নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকের জীবনে মনোযোগের বিশেষ বিকাশ দেখা যায়। হামিল্টন সাহেব তাঁহার প্রণীত মনোবিজ্ঞান-গ্রন্থে এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রীস-দেশীয় মহাপণ্ডিত সক্রেটিস একজন সৈনিক ছিলেন। কোন যুদ্ধযাত্রার সময়ে এক দিন প্রাতঃকালে তিনি এক স্থানে দাঁড়াইয়া স্থির দৃষ্টিতে এবং নিস্পন্দ ভাবে চিন্তা করিতে থাকেন, সমস্ত দিন রাত্রি এইরূপে চলিয়া যায় এবং পর দিন প্রাতঃকালে তাঁহার চিন্তা-ভঙ্গ হয়। কোন গুরুতর বিষয়ে চিন্তা করিতে হইলেই নাকি তিনি এইরূপে আহার নিদ্রা ভুলিয়া তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতেন। সিরেকিউসের বিখ্যাত পণ্ডিত আর্কিমিডিস্ ভূমিতে অঙ্কপাত করিয়া প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, এমন সময়ে শত্রু-সৈন্য নগর অধিকার করিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলে তিনি অন্য-মনস্ক থাকিয়া বলিলেন, "আমার বৃত্তটা মুছিও না।" পরে যখন ঘাতকের অস্ত্র তাঁহার শরীরে পড়িল, তখন বুঝিলেন শত্রু-সৈন্য নগর অধিকার করিয়াছে। জোসেফ স্কালিগার নামে আর এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত ছাত্রাবস্থায় পারিস নগরে অবস্থান কালে প্রসিদ্ধ সেণ্ট বার্থোলোমিউর হত্যা-ব্যাপারের দিনে হোমরের গ্রন্থ পাঠে এতই আত্ম বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, সেই ভয়ানক শোণিত-পাত এবং তন্মধ্য হইতে তাঁহার পলায়ন ও জীবন রক্ষা, এসব কিছুই তিনি জানিতে পান নাই। কার্ণিয়াডিস্ নামে আর এক জন পণ্ডিত সময়ে সময়ে চিন্তায় এত লীন হইতেন যে, আহারাভাবে তাঁহার মৃত্যু হইবে ভয়ে তাঁহার দাসী বালকের ন্যায় তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিত। ইংরাজ-পণ্ডিত নিউটনও কখন কখন গণিত-বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে আহারের কথা ভুলিয়া যাইতেন। কার্ডেন নামে এক জন পণ্ডিত একবার কোথায় যাইবার জন্য যাত্রা করিয়া এত চিন্তা-নিমগ্ন হইয়াছিলেন যে, কোথায় কি উদ্দেশ্যে যাইতেছেন এবং কোন পথে যাইতে হইবে, এসমস্তই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। গণিত-শাস্ত্রবিৎ

ভিয়েটা কোন বিষয়ে নিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলে, তিনি একেবারে জ্ঞান-শূন্য মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া থাকিতেন, তাঁহার সংজ্ঞামাত্রও থাকিত না। ভাষা-তত্ত্ববিৎ বুডিয়স্ তাঁহার বিবাহ-দিবসে সমস্ত ব্যাপার ভুলিয়া গিয়াছিলেন; তাঁহার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া বন্ধুবর্গ উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং অবশেষে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তিনি সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গ্রন্থ-লিখনে নিবিষ্ট আছেন! আমাদিগের দেশের জ্ঞান-সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-দিগের অনেকে এইরূপ বাহ্য-জ্ঞান-শূন্যতার পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। যদিও এইরূপ বাহ্য-জ্ঞান-পরিশূন্য হওয়া প্রার্থনীয় নহে, তথাপি ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, অমনোযোগ অপেক্ষা এরূপ বাহ্য-জ্ঞান শূন্যতাও শত গুণে প্রশংসনীয়।

উপদেশ মালা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৫

ধৈরয ধরিয়া,
যতন করিয়া,
করিবে সকল কায।
কঠিন বলিয়া
রেখনা ফেলিয়া,—
কাল্ হবে, থাক্ আজ॥
অদ্যকার কায
অদ্যই করিবে,
কাল্ না করিতে পার।
আজ আছে হাতে,
রজনী প্রভাতে
কে জানে কি হবে কার?
পদ্ম-পত্রে জল,
মতন চঞ্চল
অনিত্য জীবন তব;—
থাকিতে জীবন
করহে সাধন
কর্ত্তব্য তোমার সব।

৬

অমূল্য সময়
করিও না ক্ষয়
আমোদ প্রমোদ করি।
যে সময় যায়
ফিরাইয়া তায়
কে রাখিতে পারে ধরি?
পলে পলে ক্ষয়
হ'তেছে সময়;
সুযোগ যেতেছে চলি।

সময়ের কায
সময়ে যে করে,
বুদ্ধিমান্ তারে বলি ॥
অমূল্য সময়
বৃথা কাযে ক্ষয়
যে জন নিয়ত করে,—
নির্ব্বোধ সে জন
কষ্টেতে জীবন
অবশ্য কাটায় পরে।

৭

যে দ্রব্য পরের হয়,—
সে দ্রব্য তোমার নয়;—
পর-দ্রব্যে করিওনা লোভ।
যে দ্রব্য তোমার হয়
অন্যে যদি তাহা লয়,
ভাব মনে তাতে কত ক্ষোভ ॥
পর দ্রব্য পেলে পরে,
আনিও না কভু ঘরে,
দিবে তারে হারায়েছে যার।
যদ্যপি না পাও তারে,
দিবে তবে শিক্ষকেরে;
শিক্ষক ল'বেন খোঁজ তার ॥
হারায়েছ তুমি যাহা,
পেলে হও খুসী তাহা,
তেমতি অপরে খুসী হয়।
ভাল বাস তুমি যাহা,
ভাল বাসে অন্যে তাহা;—
এই কথা জানিবে নিশ্চয় ॥

৮

ভাল বাস তুমি যারে,
ভাল বাসে সে তোমারে;
এই রীতি—জানিবে মরতে।
ভাল বাসা যদি পায়,
শত্রু, মিত্র হ'য়ে যায়;—
ভাল বাসা—এমনি জগতে ॥
ভালবাসা বিনিময়
কর নর নারী'চয়,
ভালবাস শত্রু মিত্র গণে।
ভালবাস সবাকারে,
তোষ সাধু ব্যবহারে;—
আপনার ভাব সর্ব্বজনে ॥
যদি ভাল ব্যবহার
চাও তুমি সবাকার;
ভাল ব্যবহার নিজে কর।
ভাল ব্যবহারে তুষ্ট,
মন্দ ব্যবহারে রুষ্ট,
জানিবে সংসারে নারী নর ॥

(ক্রমশঃ।)

প্রাপ্তগ্রন্থ।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু গ্রন্থাবলি। প্রথম সংখ্যা—সূচনা। বহরমপুর তত্ত্বজিজ্ঞাসু সমাজের জনৈক সভ্য কর্তৃক। মূল্য ৵৹ দুই আনা। ৩২ পৃষ্ঠা।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু সমাজের ইংরাজী নাম থিয়োসোফিক্যাল্ সোসাইটি। হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া আর্য্য-সন্তানেরা আধ্যাত্মিক পিপাসা-নিবৃত্তির জন্য ইউরোপের দিকে সাগ্রহে চাহিতেছেন, এমন সময়ে সুদূর আমেরিকা হইতে একজন মহাপুরুষ আর একজন ধীশক্তি-সম্পন্না রমণী আসিয়া আর্য্যভূমিতে দাঁড়াইয়া বলিলেন "আর্য্য-নন্দনগণ! তোমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্র, তোমাদের যোগ-শাস্ত্র জগতে অতুল, তাই আমরা আর্য্য-নাম-লোলুপ লইয়া সেই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে তোমাদের দেশে আসিলাম, মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষকে মাতৃত্বে বরণ করিলাম, আর তোমরা কি সেই অমূল্য রত্ন-ভাণ্ডার সমুদ্র-জলে নিক্ষেপ করিয়া দরিদ্রের দ্বারে ভিক্ষার্থী হইবে?" ভারতের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরাও এই কথাই বলিতেছিলেন; তবে তাঁহাদের চেহারায় তেমন জাঁকজমক নাই, বিশেষতঃ তাঁহারা নাকি জগতে অদ্বিতীয় স্বার্থপর, সম্মান-প্রয়াসী এবং ধূর্ত্ত, তাই তাঁহাদের কথা আমাদের কানে ভাল লাগে নাই। কিন্তু যখন দেখিলাম স্বয়ং দুই জন শ্বেতকায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগেরই মত সমর্থন করিতেছেন, তখন তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস না করিয়া যাই কোথায়! এই সমাজ কর্ত্তৃক ভারতের অন্য উপকার না হউক, ইহার উত্তেজনায় আর্য্য-সন্তানের মন যে হিন্দু-শাস্ত্রের গবেষণায় নিবিষ্ট হইয়াছে, কেবল এই জন্যই কর্ণেল অল্‌কট্ এবং মাদাম ব্লাভাট্‌স্‌কি হিন্দুমাত্রেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র।

সমালোচ্য গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে তত্ত্বজিজ্ঞাসু সমাজের উদ্দেশ্যটি অতি পরিষ্কার ভাবে বিবৃত হইয়াছে। লেখক লিপি-চাতুর্য্যের দিকে তেমন যত্ন না করিলেও উদ্দেশ্যের নিঃস্বার্থতা এবং হৃদয়ের আবেগ, এই উভয়ের সম্মিলনে ভাষা ওজস্বিনী—সুতরাং হৃদয়-গ্রাহিণী হইয়াছে।

পত্রাষ্টক-কাব্যোত্তর কাব্য। শ্রীচন্দ্রভূষণ মণ্ডল-প্রণীত। কুসুমগ্রাম-নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত মুন্সী মহম্মদ এব্রাহিম সাহেবের আদেশে দেনুড় দারিদ্র-বান্ধব পুস্তকালয় হইতে শ্রীহরিপদ কোঁয়ার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা। ৫০ পৃষ্ঠা।

বহুকাল ধরিয়া আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণ মাতৃভাষার অনাদর করিতেছিলেন, কিন্তু আমাদিগকে এজন্য আর দুঃখ করিতে হইবে না, মাতৃভাষার শুভদিন উপস্থিত। বঙ্গের একদিকে মীর মোসারেফ হোসেন তাঁহার লেখনী-নিঃসৃত অমৃত-সিঞ্চনে বঙ্গ-ভাষাকে স্নিগ্ধ করিতেছেন, অপর দিকে শ্রীযুক্ত মুন্সী মহম্মদ এব্রাহিম সাহেব অর্থ-

দানে দরিদ্রা মাতৃভাষাকে অনুগৃহীত করিতেছেন। আমরা এ দৃশ্য দর্শনে মাতৃভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইতে পারি না। গ্রন্থগত কবিত্ব অপেক্ষা আমরা এই প্রকার জীবন্ত কবিত্বেরই অধিক পক্ষপাতী।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বীরাঙ্গনা কাব্য লিখেন, বাবু রামকুমার নন্দী তাহার উত্তর দেন; আবার বাবু অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্য্য পত্রাষ্টক কাব্য লিখেন, বাবু চন্দ্রভূষণ মণ্ডল তাহার উত্তর দিলেন। এই চারি খানি গ্রন্থেরই ছন্দঃ, প্রণালী, এবং আকৃতি প্রকৃতি এক, কিন্তু গুণের প্রভেদ আকাশ পাতাল। যাহা হউক, যদি চন্দ্রবাবুর এই প্রথম উদ্যম হয়, তবে আমরা আশা করিতে পারি তিনি অনুকরণে কৃতকার্য্য হইবেন। মৃতা সতীর প্রতি মহাদেবের উক্তিটি বেশ হইয়াছে। বোধ হয় গ্রন্থকার বালক, তাই "উৎসর্গ বা কৃতজ্ঞতা স্বীকার" করিতে যাইয়া বাঙ্গলায় সংস্কৃতে একটা অরুচিকর খিঁচুড়ী পাকাইয়াছেন। নমুনা দেখুন;—

"শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীদেবী-শ্রদ্ধাস্পদ প্রিয়ঙ্কর।
মুন্সী মহম্মদ এব্রাহিম দানে দক্ষ দৃঢ়তর॥
অবশ্য তস্য সহাস্য আস্য মাত্র সন্দর্শনে।
পত্রোত্তর মিদং গ্রন্থং সমর্থোঽহং প্রকাশনে॥"

ইত্যাদি। সরল গদ্যে উৎসর্গটি লিখিলে বোধ হয় দাতার বিরক্ত হইবার কোন কারণ ছিল না।

বর্ণপ্রবেশ। প্রথম ভাগ। শ্রীদিনকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য দুই পয়সা। ১৬ পৃষ্ঠা। ইহাতে কেবল স্বর-সংযোগ আছে, ব্যঞ্জন-সংযোগ নাই। অর্থযুক্ত শব্দগুলি লেখক বেশ কৌশলের সহিত সাজাইয়াছেন। এই পুস্তক খানি প্রথম শিক্ষার্থীর হাতে দিবার জন্য আমরা অভিভাবকদিগকে অনুরোধ করি।

উদ্ভ্রান্ত-প্রেমিক বা নবরসের জীবন্ত উচ্ছ্বাস (দৃশ্য কাব্য)। কর্ণধার সম্পাদক শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত—বিরচিত। মূল্য দুই আনা। ২২ পৃষ্ঠা।

কর্ণধারের পাঠকগণ হারাণবাবুর লেখনীর সঙ্গে পরিচিত আছেন। কিন্তু দৃশ্যকাব্যের প্রকৃত বিচারক পাঠক নহেন, দর্শকই ইহার যথাযথ বিচারে সমর্থ। রসে ভরপোর হইলেও ভাঙ্গা ছন্দঃ পাঠের অনুকূল নহে। আর এক কথা। একটি রস বর্ণনার অব্যবহিত পরেই পূর্ণ মাত্রায় আর একটি নূতন বা বিরোধী রসের অবতারণা স্বাভাবিক নহে। মনে করুন করুণ-রসে হৃদয় আপ্লুত হইয়াছে, এমন সময়ে বীর-রসের অবতারণা করিতে হইলে তাহার জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করিতে হইবে, নতুবা ভিজা কাঠ জল হইতে তুলিয়া আগুনে দিবামাত্রই তাহাতে আগুন লাগে না, বরং অনেক সময়ে আগুন নিবিয়া যায়। হারাণবাবু যে এ কথা অবগত নহেন, তাহা বোধ হয় না, তবে তাঁহার গ্রন্থ খানি ক্ষুদ্র বলিয়াই হয়ত রসগুলির পরস্পরের মধ্যে উপযুক্ত অবকাশ রাখিতে পারেন নাই—ঢেউগুলি যেন গায়ে গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে। যাহা হউক, উদ্ভ্রান্ত-প্রেমিক পড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে "শিক্ষা-পরিচরের" বিনিময়ে আমরা নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি পাইতেছি।

১। সাপ্তাহিক।

১। "নববিভাকর সাধারণী"
২। "এডুকেশন গেজেট"
৩। "সুলভ সমাচার ও কুশদহ"
৪। "হিন্দুরঞ্জিকা"
৫। "প্রতিকার" (মুরসিদাবাদ)
৬। "প্রজাবন্ধু" (চন্দন নগর)
৭। "রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ"
৮। "ফরিদপুর হিতৈষিণী"
৯। "যশোহর সম্মিলনী" (A dight paper)
১০। "ঢাকা গেজেট" (A dight paper)
১১। "চারুবার্ত্তা" (সেরপুর—ময়মনসিংহ)
১২। "Calcutta Chronicle"
১৩। "Indian Christian Herald"
১৪। "Indian Messenger"

২। পাক্ষিক।

১। "তত্ত্বকৌমুদী"
২। "অনুসন্ধান"
৩। "শিলচর"
৪। "পরিদর্শক" (শ্রীহট্ট)
৫। "আহম্মদী ও নবরত্ন" (টাঙ্গাইল)।

৩। মাসিক।

১। "ধর্ম্মবন্ধু"
২। "বেদব্যাস"
৩। "কর্ণধার"
৪। "পরীক্ষা"
৫। "ধর্ম্মপ্রচারক" (কাশী)
৬। "সুখসম্বাদ" (হিন্দি মাসিক পত্রিকা—লাহোর)
৭। "সুগৃহিণী" (হিন্দি ঐ শিলং)
৮। "সুকথা" (কুচবিহার)
৯। "দিনাজপুর পত্রিকা"
১০। "শিল্প ও কৃষি পত্রিকা" (তাহেরপুর)

২২ শে বৈশাখের "সঞ্জীবনী" ১ খান ও ১০ ই আষাঢ়ের "ঢাকাপ্রকাশ" ১ খান প্রাপ্ত হইয়াছি।

পুরস্কারের প্রবন্ধ।

[প্রবন্ধ লেখকগণ অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিবেন না। এ বিষয়ে তাঁহাদের সততার উপরেই নির্ভর করা যাইতেছে।]

১। শিক্ষকের জন্য। সৎসঙ্গ।

২। ছাত্রের জন্য। সদালাপ।

৩। মহিলার জন্য। লজ্জা। (আষাঢ় মাসে কোন মহিলা প্রবন্ধ লিখেন নাই। গ্রাহক ও গ্রাহিকাদিগের নিকট সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা "শিক্ষাপরিচর" হইতে কোনরূপ প্রতারণার আশঙ্কা না করেন।)

প্রবন্ধ কেহ ফেরত পাইবেন না।

জ্যৈষ্ঠ মাসের পুরস্কার প্রাপ্ত

(প্রথম ভাগ, ২য় সংখ্যা, ১২৯৬)

১। শিক্ষক—শ্রীনীলকৃষ্ণ ভাট্টাচার্য্য, জাতুয়া উঃ প্রাঃ স্কুল, শ্রীহট্ট ৩৲

২। ছাত্র—শ্রীমহানন্দ কর, গবর্ণমেণ্ট স্কুল; শিলচর ২৲

# শিক্ষা-পরিচর।

১ম ভাগ। | ভাদ্র ১২৯৬ সাল। | ৫ম সংখ্যা।

শিক্ষা, শিক্ষক ও সাহিত্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শিক্ষা ও শিক্ষক সম্বন্ধে আমাদের মতামত ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের বলিবার যাহা আছে তাহা বলিয়া আলোচিত বিষয়টী অদ্য শেষ করিব। এস্থলে, সাহিত্য বলিতে স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থাবলীকে বুঝিতে হইবে। সাহিত্য বলিতে, সচরাচর সমগ্র কাব্য-শাস্ত্র বুঝায়। কাব্য-শাস্ত্র প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—দৃশ্য-কাব্য ও শ্রব্য-কাব্য। শ্রব্য-কাব্য, পদ্যময়—যথা রামায়ণ, মহাভারতাদি; গদ্যময়, কাদম্বরী, হর্ষচরিতাদি। দৃশ্য-কাব্য, নাটক নবেলাদি। নাটক—কালিদাসের শকুন্তলা, ভবভূতির উত্তর-রামচরিত প্রভৃতি; নবেল—বঙ্কিম বাবুর দুর্গেশ-নন্দিনী, রমেশ বাবুর বঙ্গবিজেতা প্রভৃতি।

অধুনাতন বঙ্গ-সাহিত্য প্রায় প্রেমিকের প্রেমোচ্ছ্বাসে বিরহীর হা হুতাসে পূর্ণ থাকে। সে গুলি অবশ্যই সুকুমারমতি বালক বালিকাগণের শিক্ষার বিষয় নহে। নবেল নাটকে আজকাল বঙ্গদেশ ভরা। বালক স্কুল ছাড়িয়া, স্ত্রীলোক ঘরকন্না ছাড়িয়া নবেল নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং, অল্পকাল মধ্যে বঙ্গদেশ নবেল নাটকে ভরিয়া যাইবে, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। নবেল নাটকের প্রতি আমরা বীত-শ্রদ্ধ নহি। বস্তুতঃ, বঙ্কিম বাবুর মত, কিম্বা রমেশ বাবুর মত ক্ষণজন্মা লেখকগণ যদি নবেল নাটক লিখিয়া বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করেন, তাহা হইলে অচিরাৎ বঙ্গ-সাহিত্য বহুমূল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইবে; এবং বঙ্গ-সাহিত্যের ও বঙ্গ-ভাষার গৌরব দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে, ইহা অবশ্যই আমরা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু তোমার মত, অথবা আমার মত যদি নগণ্য লেখকদল গ্রন্থকার নামে পরিচিত হইবার আশায়, বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার ইচ্ছায়, নবেল নাটক লিখিয়া আশার অতিরিক্ত পশার জমকা-

ইতে সাধ করেন, তাহা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের এবং বঙ্গ-ভাষার গৌরব-বৃদ্ধি না হইয়া অগৌরবের আর সীমা থাকিবে না। অস্বাভাবিক ঘটনায় প্রায় নবেল নাটক পরিপূর্ণ থাকে, আপন আপন অসীম ক্ষমতার পরিচয় দিবার জন্যই হউক, অথবা পাঠকবর্গের তুষ্টি সম্পাদনের জন্যই হউক, নবেল-নাটককারগণ নায়ক নায়িকাদের স্ব-কপোল-কল্পিত আদর্শ-চরিত্র গড়িতে গিয়া, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল—ত্রিজগৎ ছাড়া, ন-নর, ন-নারী কিম্ভূত কিমাকার জানোয়ার গড়িয়া বসেন; এবং নবেল নাটকের সৌন্দর্য্যটুকু অস্বাভাবিক ঘটনায় ঢাকিয়া ফেলেন। সেই অস্বাভাবিক চরিত্রের চাক্‌চিক্যে আকৃষ্ট হইয়া, সেই হলকরা কেমিকেল সোণার ভড়ঙ্গে ভুলিয়া গিয়া, স্বল্পমতি পাঠক পাঠিকাগণ গৃহকার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়া, অম্লান বদনে, অতৃপ্ত নয়নে, দিবস যামিনী নবেল নাটক অধ্যয়ন করিয়া অমূল্য সময় বৃথা ক্ষেপণ করে। ইহাতে তাহাদের পরকাল নষ্ট হইতেছে—ইহা তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখে না। এরূপ অনেক বালক দেখা যায়—যাহারা নবেল নাটক পড়িয়া সমস্ত দিবস কাটায়। পাঠ্য পুস্তকে তাহারা তিলার্দ্ধ মনোনিবেশ করিতে পারে না, অথচ নবেল নাটকে তাহাদের এতই মনঃসংযোগ যে নিকট দিয়া মানুষ চলিয়া গেলেও তাহারা জানিতে পারে না। ভাল হউক, মন্দ হউক, সুরুচি পূর্ণ হউক বা কুরুচিপূর্ণ হউক, সুকুমার মতি বালক বালিকাগণের পক্ষে নবেল নাটক অধ্যয়ন করা, আমাদের মতে অযৌক্তিক। নীতিপূর্ণ বা সদুপদেশ-পূর্ণ নবেল নাটক অধ্যয়নে বিশেষ আপত্তি না থাকিলেও, আমরা তরলমতি বালক বালিকাদিগকে নবেল নাটক অধ্যয়ন করিতে বারম্বার নিষেধ করি। তাহার কারণ এই—নবেল নাটক পড়িতে পড়িতে নবেল নাটকের প্রতি এতই অনুরাগ জন্মে যে নবেল নাটক ছাড়িয়া আর কোন বিষয়ে হাত দিতে ইচ্ছা করে না। বাস্তবিক, নবেল নাটকের এরূপ একটী মোহিনী শক্তি আছে যে, একবার হাতে করিলে আরব্ধ পুস্তকখানি শেষ না করিয়া উঠিতে ইচ্ছা হয় না। বাল্যকাল নবেল নাটক পড়িবার সময় নহে। যে বাল্যকালের গুরুতর শিক্ষার উপরে সমস্ত জীবনের ভাবী শুভাশুভ ফল নির্ভর করিতেছে, সেই বাল্যকালের মহামূল্য শিক্ষা যদি নবেল নাটক অধ্যয়নেই পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে বালক বালিকাগণ দ্বারা আপনাদের ও অপরের কি উপকার সংসাধিত হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের মতে, তরলমতি বালক বালিকাগণ নবেল নাটক অধ্যয়ন না করিয়া, যদি সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, যাহাতে তাহারা সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে এবং অন্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয়, এরূপ শিক্ষায় বাল্যকালের বহুমূল্য সময় অতিবাহিত করে, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে জগতের মঙ্গল সংসাধিত হইবে।

আমরা নবেল নাটক সম্বন্ধে অনেক

কথা বলিলাম। বলিবার তাৎপর্য্য এই—সস্তাদরে পুস্তক পাইয়া, আজ কাল বালক বালিকাগণ পাঠ্য পুস্তক ফেলিয়া, বড়ই নবেল নাটক পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার ফলে, অনেক ভাল ভাল ছেলের পরকাল মাটি হইতেছে। এ কথা অপরিণামদর্শী, আপাত-মধুর-সুখ-প্রত্যাশী বালক বালিকাগণ অবশ্যই বুঝিতে পারে না। কিন্তু যাহাতে বালক বালিকাগণ নবেল নাটক পড়িতে না পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা, পিতামাতা, অভিভাবক বা শিক্ষকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। নবেল নাটক পড়িয়া সময় কাটাইলে, বালক বালিকাগণের পরকাল নষ্ট হইবে, বা নবেল নাটক অধ্যয়ন করা বালক বালিকাগণের কর্ত্তব্য নহে, এ কথা তাহাদের নিকটে বলিলে তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। কিন্তু, কথাটী বাস্তবিক হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে। একটু প্রণিধান পূর্ব্বক দেখা উচিত, আজকাল যেরূপ সময় উপস্থিত হইয়াছে—চারিদিকে যেরূপ ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যাইতেছে, তাহাতে নবেল নাটক অধ্যয়ন করিয়া বাল্যকালের বহুমূল্য সময় অতিবাহিত করিলে, বিশেষ সৌভাগ্যশালী ব্যতীত, তোমার ও আমার মত দুরদৃষ্টগণের পক্ষে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমরে দাঁড়াইয়া, কায়-ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাও একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিবে। চির-কণ্টকাবৃত জীবনপথের পথিক হইয়া, বাল্যকালের অমূল্য সময় বৃথা ক্ষেপণ করিলে, ভাবী জীবনের ফলাফল কিরূপ হইবে, ইহা জানিয়া সংসার সমরাঙ্গনে প্রবেশ করা, হে বালক বালিকাগণ! তোমাদের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য।

সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের বেশী কিছু বলিবার নাই। যাহা বলিবার আছে তাহা সকলেই জানে। সুতরাং সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া অনর্থক প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা আমরা অনাবশ্যক মনে করি। দয়া, সরলতা, ন্যায়পরতা, পর-দুঃখ-কাতরতা, উদ্যমশীলতা, কার্য্যতৎপরতা, সাহস, অধ্যবসায়, ধৈর্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ নিচয়—যাহা প্রথম হইতে বালক বালিকাগণের সুকোমল মানসক্ষেত্রে রোপণ করিয়া দিলে তাহাদের ভাবী জীবনে শুভ ফল প্রদান করিবে, সেই সমস্ত পরম-হিতকর সদ্‌গুণনিচয় সাহিত্যের বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য। যাহাতে বালক বালিকাগণের সংজ্ঞান বিস্তার হয়, যাহাতে তাহাদের মন কুসংস্কারাচ্ছন্ন না হইয়া ধর্ম্মের নির্ম্মলালোকে আলোকিত হয়; যাহাতে তাহাদের অন্তঃকরণ হিংসা, দ্বেষ, কপটতা, আত্মম্ভরিতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি নারকীয় বৃত্তিগুলির সংস্পর্শে কলঙ্কিত না হইয়া প্রেম, ভক্তি, দয়া, প্রীতি, সত্যানুরাগ প্রভৃতির প্রস্রবণ হয়; যাহাতে তাহাদের হৃদয়-ক্ষেত্র হইতে পাপরূপ আগাছা সমূহ সমূলোৎপাটিত হইয়া, নন্দনকানন তুল্য সুখশান্তির আকর হয়; যাহাতে তাহাদের ভাবী জীবন বিপদসঙ্কুল না হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হয়; যাহাতে স্বদেশানুরাগ, স্বজাতিপ্রিয়তা ও জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিয়া, তাহাদের মনে পাশ্চাত্য সভ্যতার পরম-হিতকর, অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বদ্ধমূল হয়—

তত্ত্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা সাহিত্য-রচয়িতৃ-দিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

দেশ, কাল, অবস্থা ও পাত্রভেদে শিক্ষা যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন, সাহিত্যও তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন হওয়া উচিত। পাশ্চাত্য সভ্যতার মুকুটস্বরূপ ইংলণ্ড, জার্ম্মেণি, ফ্রান্স ও আমেরিকায় যেরূপ শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রয়োজন অস্মদ্দেশে অবশ্যই সেরূপ শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রয়োজন নাই। শারীরিক ও মানসিক বৈষম্যই এরূপ বিভিন্নতার প্রধান কারণ। যে সূত্র অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেণি ও আমেরিকা সভ্য জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া ভারতকে যদ্যপি উন্নতি শিখরে আরোহণ করিতে হয়, তাহা হইলে ভারতের পক্ষে বড়ই কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিবে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতির জাতীয় চরিত্র বা জাতীয় জীবন যে উপাদানে গঠিত; ভারতের জাতীয় চরিত্র বা জাতীয় জীবন সে উপাদানে গঠিত নহে। সুতরাং, পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শে ভারতকে চলিতে হইলে, ভারত ক্রমোন্নতি শিখরে আরোহণ করিতে অপারগ হইয়া পদে পদে স্খলিত-পদ হইবে—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে, জাতীয় প্রকৃতি এবং জাতীয় সভ্যতার প্রতিকূলে, ভারতকে যদ্যপি বিদেশীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হয়, চড়াইয়ের চাল ছাড়িয়া যদ্যপি খঞ্জনের চাল ধরিতে হয়, তাহা হইলে ভারতের জাতীয় প্রকৃতি, জাতীয় সভ্যতা, বিদেশীয় সভ্যতার সংঘর্ষণে ক্রমে ক্রমে লোপ পাইবে, চড়াইয়ের চাল ভারত ক্রমে ক্রমে ভুলিয়া যাইবে, অথচ, পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে কোনরূপেই সক্ষম হইবে না। সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বা সভ্যতা জাতীয় চরিত্র বা জাতীয় জীবনের অনুরূপ হইয়া থাকে। ইংলণ্ড যাহাকে সভ্যতা বলিবে, ভারত হয়ত তাহাকে সভ্যতা বলিবে না, যেহেতু, ইংলণ্ডের জাতীয় চরিত্র ভারতের জাতীয় চরিত্রের অনুরূপ নহে। জাতীয় চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, যে জাতি অন্য জাতির দোষের ভাগ পরিত্যাগ করিয়া গুণের ভাগ গ্রহণ করে, অন্যে অসভ্য বলিলেও, আমরা সেই জাতিকেই সভ্য বলিব। ভারতের কর্ত্তব্য এই, ভারত জাতীয় গৌরব, জাতীয় চরিত্র বজায় রাখিয়া বিদেশীয় সভ্যতার অসার ভাগ পরিত্যাগ করিয়া সার ভাগ গ্রহণ করে,—তাহা হইলে ভারতের নব-জীবন লাভ হইবে, তাহা হইলে ভারত অনধিক কাল মধ্যে সমুন্নত ও নব-বলে বলীয়ান্ হইবে। ভারতের সাহিত্য ভারতের জাতীয় চরিত্রের অনুরূপ হওয়া কর্ত্তব্য।

সম্পূর্ণ।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়।

যদিও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়, তথাপি বিশ্ব-বিদ্যালয় কাহাকে বলে, ইহার অস্তিত্বের প্রয়োজন কি এবং কোন্ কোন্ বিষয় ইহার কর্ত্তব্যের অন্তর্ভূত, তদ্বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করা উচিত।

বিশ্ব-বিদ্যালয় কি? যে বিদ্যালয়ে বিশ্বের সমস্ত বিদ্যা অধীত হয়। অর্থাৎ মানব-জাতি এ পর্য্যন্ত অন্তর্জ্জগৎ এবং বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে যে সকল বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, যেখানে তৎসমুদায়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হয়, তাহাকেই বিশ্ব-বিদ্যালয় বলা যাইতে পারে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই বিস্তীর্ণ অর্থ গ্রহণ করিলে বুঝা যাইবে, সমস্ত পৃথিবীতে কেবল একটি মাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ই সম্ভব, তবে কলিকাতা, লণ্ডন, ফিলাডেল্ফিয়া প্রভৃতি স্থানে ভিন্ন ভিন্ন শাখা থাকিতে পারে। মানবের সমস্ত ভাষা এবং সমস্ত বিদ্যা ইহাতে অধীত হইবে; যাঁহারা ইহাতে প্রবেশ করিবেন, তাঁহারা দেশবিশেষের বা জাতিবিশেষের সঙ্কীর্ণতা বিস্মৃত হইয়া, প্রকৃতই বিশ্ব-প্রেমে অনুপ্রাণিত হইবেন, প্রচলিত অন্তর্জ্জাতীয় সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন করিবেন, এবং সামাজিক অবিচার, অত্যাচার, যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্ভাবনা সমূলে বিনষ্ট করিয়া মানব-জাতির মধ্যে প্রকৃত ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিবেন। ইহাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত; কিন্তু মানব-সমাজের বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থান্ধতা বা অন্য কোন কারণে এই উদ্দেশ্য এখনও অনেক উচ্চে রহিয়াছে, সুতরাং উপেক্ষিত হইতেছে।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অস্তিত্বের প্রয়োজন কি, তাহা সহজেই অনুমেয়। সকল দেশের সকল জাতিকে এক প্রকার স্বার্থে এবং এক প্রকার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত করিয়া সমানভাবে জ্ঞানের পথে, নীতির পথে, ধর্ম্মের পথে, একপ্রাণতার পথে,—এক কথায়, প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মত এমন সুন্দর কার্য্যকর উপায় আর নাই। বিজ্ঞ, বিবেকবান্, সাবধান লোকের হাতে ইহার নেতৃত্ব থাকিলে যেমন অনায়াসে এই সকল মঙ্গলকর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, অবিজ্ঞ, অবিবেকী, অসাবধান লোকের হাতে ইহার পরিচালনার ভার থাকিলে তদ্বিপরীত ফল ফলিবারই সম্ভাবনা। ফলতঃ কেবল যন্ত্র ভাল হইলে চলিবে না; আশানুরূপ ফল পাইতে হইলে যন্ত্রীকেও ভাল হইতে হইবে। মিস্ত্রী যদি ভাল হয়, তবে অস্ত্রশস্ত্র মন্দ হইলেও সে তাহা সারিয়া লইয়া ভাল কায করিতে পারে; আর মিস্ত্রী যদি মন্দ হয়, তবে ভাল অস্ত্র পাইলেও সে তাহা মন্দ করিয়া ফেলিবে।

মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষাকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—শারীরিক শিক্ষা, মানসিক শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা। এই চতুর্ব্বিধ

শিক্ষাই পূর্ণাদর্শে গঠিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তব্যের অন্তর্ভূত হওয়া উচিত। কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ পূর্ণাদর্শে গঠিত বিশ্ব-বিদ্যালয় একটিও নাই। সর্ব্বত্রই মানসিক শিক্ষার উপরে বিশেষ ঝোঁক; কোথাও আনুষঙ্গিকভাবে যৎকিঞ্চিৎ নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে বটে, কিন্তু শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার ব্যবস্থা কুত্রাপি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রধান দেশ সমূহে কোন কোন স্থানে বাইবেল পড়িবার এবং প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ধর্ম্ম-প্রচারে দীক্ষিত হইবার রীতি থাকিলেও আমরা ইহাকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নামানুরূপ বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক শিক্ষা বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়, ভারতের অপরাপর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ন্যায়, আর্য্যভূমিতে রোপিত বিলাতী চারা। চারার প্রকৃতি মাটির দোষগুণে অনেক স্থলেই পিতৃ-প্রকৃতি হইতে অপকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু উৎকৃষ্ট হইতে প্রায়ই দেখা যায় না। এ স্থলেও তাহাই হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ঠিক বিলাতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মতই চলিতেছে; যদি কোথাও কোন পরিবর্ত্তন, কোন প্রভেদ লক্ষিত হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা দোষের দিকে! যাহা হউক, বিলাতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে ইহার তুলনা অদ্যকার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রধান সদস্য বা চান্‌সেলর স্বয়ং রাজ-প্রতিনিধি বাহাদুর। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্বন্ধে তিনি কতদূর চিন্তা করিয়া থাকেন, সাধারণের তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ্য সংস্রব বৎসরে এক দিন মাত্র, যে দিন সিনেট গৃহে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে সনন্দ প্রদান করা হয়। কিন্তু এ উৎসবে যোগ দিতেও তিনি সকল বার অবসর পান না; তাঁহার অনবসরে তদীয় প্রতিনিধি ভাইস-চান্‌সেলর তাঁহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এই উৎসবের দিনে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নানা বিভাগে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দ একত্র সমবেত হন, এবং স্বয়ং সভাপতি (চান্‌সেলর বা ভাইস চান্‌সেলর) ছাত্রদিগকে একে একে সনন্দ দিয়া সম্মানিত করেন; তৎপরে শিক্ষা বিষয়ে উপদেশ-পূর্ণ একটি বক্তৃতা দ্বারা বিদ্যার্থীদিগকে উৎসাহিত করিয়া উৎসব শেষ করেন।

কিন্তু কেবল সনন্দ-প্রদান এবং বক্তৃতা হইলেই হইল না, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আরও অনেক কায আছে; এজন্য রাজ-প্রতিনিধির অধীনে একটি সিনেট বা অধ্যক্ষ সভা আছে, রাজ-প্রতিনিধি ইহার সভ্যদিগকে নামকরণ প্রণালীতে নিযুক্ত করেন, অর্থাৎ যে বৎসর যাঁহারা সভ্য হইবেন, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর তাঁহাদের নাম বলিয়াছেন। সিণ্ডিকেট নামে আর একটি কার্য্যনির্ব্বাহিকা সভা আছে, সিনেটের সভ্যেরা আপনাদিগের মধ্য হইতে এই কার্য্য-নির্ব্বাহিকা সভার সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। এই সকল সভার বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেজিষ্টার নামে একজন সম্পাদক আছেন,

সভ্যেরা ইহাঁকে নির্ব্বাচিত করেন। এতদ্ব্যতীত শিক্ষাকার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ পরিদর্শন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ডাইরেক্টর ইন্‌স্পেক্টর প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ আছেন।

ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নির্ব্বাচন প্রণালী নাই। আমাদের অসীম-শক্তি গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচন-প্রথার বিশেষ পক্ষপাতী না হইলেও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ইহা প্রবর্ত্তিত করিলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা যায় না। পরন্তু নাম-করণ-প্রথায় যে সকল দোষ অনিবার্য্য, নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলে অনায়াসে সে সকল দোষের পরিহার হইতে পারে। কিন্তু এজন্য গবর্ণমেণ্টকে দোষ দেওয়া যায় না। ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট প্রসন্ন-চিত্ত না হইলেও প্রতিকূল নহেন। দেশের শিক্ষিতগণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নির্ব্বাচন-প্রথার অধিকার পাইবার জন্য যদি আন্দোলন করেন, গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে সে প্রার্থনা যে একেবারেই বিফল হইবে, এ কথা কে বলিল? যে সকল বিভাগে রাজ-নীতি এবং অর্থ-নীতির সংস্রব আছে, সেই সকল বিভাগে নির্ব্বাচন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য যদি সুদূর বিলাতব্যাপী আন্দোলন হইতে পারিতেছে, তাহা হইলে দেশের সমগ্র সৌভাগ্যের মূল-ভিত্তিস্বরূপ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এই হিতকরী প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য আন্দোলন করা কি অসঙ্গত? শিক্ষিত মহোদয়দিগের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ, তাঁহারা এ কথাটা একবার অন্ততঃ চিন্তা করিয়া দেখেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্য্য-কলাপ যথেচ্ছ চালিত হইলে তাঁহাদেরই ভাবী বংশের সর্ব্বনাশ হইতে পারে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিয়মাদির শনৈঃ শনৈঃ পরিবর্ত্তন এবং কার্য্য-কলাপের বিশৃঙ্খলা দেখিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই ভীত হওয়া উচিত।

চতুর্ব্বিধ শিক্ষার মধ্যে শারীরিক শিক্ষা ছাড়িয়া দিলে মানসিক, নৈতিক, এবং আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ শিক্ষা অবশিষ্ট থাকে। বিশ্ব-বিদ্যালয় ইহার মধ্যেও নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা ছাড়িয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত সহজ মানসিক শিক্ষার ভার লইয়াছেন। কিন্তু এই মানসিক শিক্ষাতেও বৎসর বৎসর যে সকল কলঙ্ক বাহির হইতেছে, তাহাতে বলিতে হয়, বিশ্ব-বিদ্যালয় আমাদের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার ভার না লইয়া ভালই করিয়াছেন। আমরা শুনিতে পাই, শিক্ষিত-সমাজে নৈতিক বিশৃঙ্খলা-দর্শনে গবর্ণমেণ্ট ভীত হইয়াছেন, এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নীতি-শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের জন্য উৎসুক হইয়াছেন; কিন্তু বর্ত্তমান প্রণালীতে বর্ত্তমান উপকরণ লইয়া এই সঙ্কল্পে কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন, সে বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।

এই মানসিক শিক্ষার প্রধান কার্য্য দুইটি;—প্রথম পাঠ্য-নির্ব্বাচন, দ্বিতীয় পরীক্ষা-গ্রহণ। আমরা একে একে এই দুই বিষয়ের আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ পাঠ্য-নির্ব্বাচনে কোন্ পরীক্ষার জন্য কিরূপ ব্যুৎপত্তি চাই, ইহাই সর্ব্বাগ্রে দেখা, এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের

নিয়মাবলীতে লিপিবদ্ধ থাকা উচিত। এই ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি মত আছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্ব প্রথম পরীক্ষা প্রবেশিকা বা এণ্ট্র্যান্স, সর্ব্বশেষ পরীক্ষা এম,এ। সকলেই ইচ্ছা করেন ভারতের এম, এ, পরীক্ষা বিলাতের এম, এ, পরীক্ষার সঙ্গে সর্ব্বাংশে তুল্য হউক। কিন্তু প্রবেশিকার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে মত-দ্বৈধ রহিয়াছে। এক পক্ষ বলেন, প্রবেশিকার ব্যুৎপত্তি এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে অন্যান্য পরীক্ষায় পর পর উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে অধিক কষ্ট না হয়। বিদেশী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করা কেমন কঠিন তাহা যাঁহারা বুঝেন না, এমন কয়েক জন অধ্যাপক এই মতের পোষক। আর এক পক্ষ বলেন, যাহারা প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়, তাহাদের অধিকাংশেরই এমন অর্থ-সঙ্গতি নাই যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পর্য্যন্ত তাহারা অধ্যয়ন করে; আবার গবর্ণমেণ্টের নূতন নূতন নিয়মের প্রসাদে চাকুরী-জীবী বাঙ্গালীর অদৃষ্টে এমন হইয়াছে যে, প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করাই কঠিন; সুতরাং প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরাজী লিখিতে, পড়িতে, এবং সামান্যরূপে বুঝিতে পারিলেই হইল, ভাবী কেরাণীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। তাহার পরে যাহার অর্থ-সঙ্গতি এবং বুদ্ধি-প্রাখর্য্য আছে সে বুঝিয়া লইবে। বলা বাহুল্য যে আমরা এই শেষোক্ত মতেরই পোষণ করি।

এই মতদ্বয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করা আমাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য নহে; এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে একটি মত স্থির করুন, এবং সেই মতটি তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীর অঙ্গীভূত করিয়া রাখুন। তাহা না করাতে পরীক্ষকদিগের খামখেয়ালী দিন দিন প্রশ্রয় পাইতেছে, এবং দেশের অশেষ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, অনেক মূল্যবান্ জীবন বৃথা হইয়া যাইতেছে। পরীক্ষকেরা কে কেমন প্রকৃতির লোক, কে কোন্ মতের পোষক, তাহা শিক্ষকেরা কেমন করিয়া বুঝিবেন, ছাত্রেরাইবা কি উপায়ে জানিবে? পরীক্ষকেরা যে ইচ্ছা করিয়া খামখেয়ালী করেন, তাহা বলিতেছি না; তাঁহাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতি এবং প্রবেশিকার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ বশতঃ কাযেই খামখেয়ালী হইয়া উঠে।

বাস্তবিক সকল বিষয়েই মতের একটা স্থিরতা থাকা উচিত, নতুবা সময়ে সময়ে মহা অনিষ্টের সম্ভাবনা। একটা চলিত কথা আছে, "অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ।" গোড়ায় মতের স্থিরতা না থাকিলে কাযেই চিত্ত অব্যবস্থিত হইয়া উঠে, পরিবর্ত্তনের জন্য হস্তক-গুয়ন উপস্থিত হয়। দৃষ্টান্ত-স্থলে ১৮৮৭ এবং ১৮৮৯ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষার কথা স্মরণ করা যাইতে পারে। ১৮৮৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার কয়েক দিন পূর্ব্বে জানা গেল, গণিত, এবং সংস্কৃতের শতকরা সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে, এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার স্বতন্ত্র নিয়ম হইয়াছে। ইহার ফল এই হইল যে, যাহারা নির্ব্বাচন-পরীক্ষায় ভালরূপে উত্তীর্ণ না হইয়াও

পরীক্ষা দিতে গিয়াছিল, তাহারাও উত্তীর্ণ হইয়া গেল,—বোধ হয়, যাহারা নির্ব্বাচন-পরীক্ষায় প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহারা গেলে ও তাহাদের মধ্যে অনেকেই উত্তীর্ণ হইতে পারিত। আবার ১৮৮৯ সালের প্রবেশিকার ফল দেখুন। এবার নির্ব্বাচন-পরীক্ষায় যাহারা সুন্দররূপে উত্তীর্ণ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ও অনেকেই উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই! ১৮৮৭ সালে শতকরা ৬৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিল, এবার শতকরা মোটে ২২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র! পাঠক একবার চিন্তা করিয়া দেখুন ব্যাপারটা কি ভয়ঙ্কর! যদি প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থীর ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে পরীক্ষকদিগের নিশ্চিত মত কিছু থাকিত, তাহা হইলে এমন সর্ব্বনাশ হইত না—সাত হাজার পুরীক্ষার্থীর মধ্যে সাড়ে পাঁচ হাজারই আজ ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিয়া কাঁদিত না! আমরা পাঠ্য-নির্ব্বাচনে তেমনি গুরুতর দোষ দেখিতে পাই না। বাস্তবিক প্রশ্ন-নির্ব্বাচন করা এবং কাগজ দেখা, এই দুইটিই অতি গুরুতর বিষয়, এই দুই কার্য্যের উপরেই বালকের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। পাঠ্য পুস্তক অতি সহজ হইতে পারে, অথচ পরীক্ষক বিদ্যা-দিগ্‌গজ হইলে এমন প্রশ্ন করিয়া বসিতে পারেন যে, তাহা উত্তর করিতে তিনি নিজেও সক্ষম নহেন। সময়ে সময়ে দেখা যায়, প্রবেশিকার জন্য যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার কোন কোন অংশ এক সময়ে এম্, এ, পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট ছিল; তাই বলিয়া এমন মনে করিতে হইবে না যে এম, এ, প্রবেশিকার তুল্য। স্থূলতঃ পরীক্ষা কঠিন বা সহজ হওয়া—এম্, এ, বা প্রবেশিকার উপযোগী হওয়া পাঠ্যের উপর নির্ভর করে না, প্রশ্ন-নির্ব্বাচন করা এবং উত্তরের কাগজ দেখার উপর নির্ভর করে। অতএব পাঠ্য-নির্ব্বাচনে আপাতত সংস্কার হউক বা না হউক, প্রচলিত পরীক্ষা-প্রণালীর সংস্কার যে একান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিয়াছে, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পাঠ্য-নির্ব্বাচনের প্রশ্ন সম্প্রতি চাপা দিয়া রাখিয়া পরীক্ষা-প্রণালী লইয়াই আন্দোলন করিবার আপাততঃ বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা শুনিয়াছি, পরীক্ষক-নিয়োগে নির্ব্বাচন-প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে; কিন্তু কাল যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে সে প্রণালী বিশেষ কার্য্যকরী হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। সাধারণের পছন্দে পরীক্ষক নিযুক্ত হইলে, যে সকল কলঙ্কের কথা শুনা যায়, তাহা অসম্ভব হইত। সাধারণে যাঁহাদিগকে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা যে খামখেয়ালী হইতে পারেন না,—পরীক্ষার সময়ে তাঁহারা বালক পরীক্ষা করিতে যাইতেছেন কি নরবলি দিতে যাইতেছেন, এ কথা যে তাঁহাদের জানা থাকিবার সম্ভাবনা, এ বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ করিবেন না।

বন্দোবস্তের কোন অভাব নাই, অভাব কেবল কার্য্যকুশলতার। প্রত্যেক বিষয়ে একজন করিয়া প্রধান পরীক্ষক আছেন, সম্ভবতঃ তিনিই প্রশ্ন নির্ব্বাচন করেন। ইহাঁদিগের উপরে আবার মডারেটর বা

নিয়ামক আছেন; প্রশ্নগুলি যথাযথ হইল কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখাই নিয়ামকের কার্য্য। কিন্তু প্রশ্ন সম্বন্ধে যে সকল কলঙ্ক বাহির হইয়াছে, নিয়ামক সতর্ক হইয়া আপন কার্য্য করিলে আদৌ তাহা ঘটিতে পারিত কি না সন্দেহ। সে সকল কলঙ্ক কি কি, সংবাদপত্রে তাহার বিশেষ বিবরণ বাহির হইয়াছে। কেহ এমন প্রশ্ন করিয়াছেন, যাহার উত্তর হয় না। অর্থাৎ বালকের বুদ্ধি পরীক্ষা করিতে যাইয়া নিজে পথ হারাইয়া বসিয়াছেন! কেহ বা এমন প্রশ্ন দিয়াছেন যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পুস্তক পড়িলে "তাহার" উত্তর করা যায় না বটে, কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তার প্রণীত পুস্তক পড়িলে অনায়াসে তাহার উত্তর করা যাইতে পারে। এরূপ ব্যবহারে পরীক্ষকের পুস্তক কাট্‌তির বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু পরীক্ষার্থিদিগের সে রকম সুবিধার আশা নাই। কেহ বা প্রশ্ন করিয়াছেন এক রকম, উত্তর চাহিয়াছেন আর এক রকম! উত্তর লিখিবার সময় অতি অল্প, সুতরাং বালকেরা যাহাতে ধান ভানিতে মহীরাবণের পালা আরম্ভ না করে, শিক্ষকের নিকট হইতে এ বিষয়ে তাহারা বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এবার এরূপ উপদেশ যাহারা পায় নাই, বোধ হয় তাহাদেরই অদৃষ্ট প্রসন্ন ছিল। আবার কোন পরীক্ষক সকলই করিয়া [illegible] একটুকু কথা বাদ দিয়াছেন,—বালকেরা সে প্রশ্ন লইয়া কি করিবে, এই কথাটি মাত্র বলিয়া দেওয়া হয় নাই।

এ সকল বৃত্তান্ত পাঠ করিলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মা বাপ কেহ আছে, এমন [illegible] হয় কি? এ সকল কথার কিছু না কিছু সত্য হইলেও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষে তাহা ঘোর কলঙ্কের বিষয়।

প্রশ্ন নির্ব্বাচন ত এইরূপে হইল, তাহার পরে পরীক্ষার কাগজ দেখা।

ইতিপূর্ব্বে প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল দুই কি তিন সপ্তাহের মধ্যেই বাহির হইত; ক্রমে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৎসর বৎসর বৃদ্ধি হওয়াতে পরীক্ষার ফল বাহির করিতে বিলম্ব হইয়া পড়িতে লাগিল। পরীক্ষার ফল-প্রকাশে অতিরিক্ত বিলম্ব হইলে পরীক্ষার্থীদিগের বিশেষ ক্ষতি হয়। প্রথমতঃ অনিশ্চিত অবস্থায় দুশ্চিন্তা-জনিত স্বাস্থ্যনাশ ও আয়ুঃক্ষয়; দ্বিতীয়তঃ পড়া শুনার ব্যাঘাত। এই অনিষ্ট দূর করিবার জন্যই পরীক্ষার্থীর সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষকের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি কি দুর্দ্দৈব যে পরীক্ষার ফল বাহির করিতে বৎসর বৎসর ক্রমেই অধিকতর বিলম্ব হইয়া পড়িতেছে! এবার প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হইতে প্রায় চারি মাস সময় লাগিয়াছে, আমরা ভরসা করি আগামী বারে ছয় মাসের কমে একার্য্য নির্ব্বাহ হইবে না। যদি তাহাই হয়, তবে এই ছয় মাস বিশ্ব-বিদ্যালয়কে ছুটি দিলে ক্ষতি কি? কার্ত্তিক মাস হইতে পড়া আরম্ভ হইয়া চৈত্র মাসে পরীক্ষা শেষ হউক, আর বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ছয় মাস বিশ্ব-বিদ্যালয় নিদ্রিত থাকুক! ফলতঃ পরীক্ষার্থীর সংখ্যানুরূপ পরীক্ষকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলে ফল বাহির হইতে এত অধিক বিলম্ব কেন হইবে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না—বোধ হয় বাহিরের লোক কেহই বুঝিতে পারিবেন না। (ক্রমশঃ)।

সফল অধ্যবসায় ও পাণিনি।

অধুনা অস্মদ্দেশে ক্রমশঃ শিক্ষার উন্নতি হইতেছে, সাধারণে সহজে নানাবিধ কার্য্যকর ও উপাদেয় বিষয় সমূহ, অভ্যাস করায়, দৈনন্দিন অর্থাগমের কত সহজ উপায় সৃষ্ট হইতেছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে, দেশের যাবতীয় অভাব দূর হইতেছে; আমাদের নব্য শিক্ষিত যুবকগণের মুখে সর্ব্বদাই এইরূপ বিবিধ সুখসম্বাদ শ্রুত হওয়া যায়। এ সমস্ত অনেকটা হইতেছে সত্য। কিন্তু বর্ত্তমান কালস্রোতে আমাদের অধ্যবসায়কে যে কতদূরে ভাসাইয়া দিতেছে, আমাদের মনোবৃত্তি যে কীদৃশ ক্ষণভঙ্গুর ও তেজস্বিতাবিহীন হইয়া যাইতেছে, পরীক্ষায় ভগ্ন-মনোরথ শিক্ষার্থিবৃন্দই উহার প্রমাণস্থল। যদি একজন প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিফলপ্রযত্ন হন, অমনি তাঁহার হৃদয়বৃত্তি কক্ষভ্রষ্ট তারকার ন্যায় ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল; কখন "টেলিগ্রাফ অফিসের" মশকগণের সহচর হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কখন "পুলিস লাইনে" নাম লেখাইয়া আশাপথ প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন, কাহার বা উদ্যম ততদূরও উত্থিত হইল না; প্রথম পদস্খলনেই এ জনমের মত কৃতকার্য্যতার আশায় জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া, আপনাকে সংসারের অকর্ম্মণ্য জীববোধে ভিটায় বসিয়াই জীবনের অবশিষ্ট সময়টুকু কাটাইয়া দিলেন। যদি উল্লিখিত ব্যক্তিগণ অবিশ্রান্ত উদ্যোগে বিরত না হন, যদি শুষ্ক হৃদয়কে আশা-সলিলে পরিসিক্ত করিয়া বদ্ধপরিকর হইয়া পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন, তবে তাঁহাদের দ্বারা পরীক্ষা কেন, এমন কি মানব-সাধ্য ক্রিয়া আছে যাহা সম্পাদিত হইতে না পারে? এরূপ শতসহস্র দৃষ্টান্ত ভারতের পুরাবৃত্তে পরিলক্ষিত হইতেছে, উহার একটির উল্লেখ করিয়াই অদ্য আমরা ক্ষান্ত হই।

বৈয়াকরণ মহর্ষি পাণিনি মধ্যভারতের শালাতুর গ্রামে কিঞ্চিদধিক ২৩০০ বর্ষ পূর্ব্বে দাক্ষী নাম্নী কোন দ্বিজ-পত্নীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তদানীং উপবর্ষনামা এক জন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, আপনার যশঃসৌরভে দিঙ্‌মণ্ডল বিভাষিত করিয়া উপদেশালোকে ভারত পবিত্র করিতেছিলেন। নানাদিগ্দেশীয় বিদ্যার্থিবৃন্দ তাঁহার চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করিত। সেই সময় কৌশাম্বীনগরনিবাসী কাত্যায়ন, ও বেতসপুর (বেতিয়া) নিবাসী ব্যাড়ি, এবং পাণিনি এই তিন জন তাঁহার প্রধান ছাত্র ছিলেন। একদা পাণিনি প্রতিপক্ষদের সহ শব্দশাস্ত্রের বিতর্কে পরাস্ত হইয়া সাতিশয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন। লোকালয় তাঁহার নিকট বিষবৎ প্রতীয়মান হইল। গুরু ও সহাধ্যায়ীদের নিকট আর মুখ দেখাইতে সমর্থ হইলেন না। যে শাস্ত্রে পরাভূত হইয়াছেন তদ্বিষয়ক উচ্চতম জ্ঞানলাভের আশায়, দেবাদিদেব শঙ্করের আরাধনার নিমিত্ত পুণ্যসলিলা সরস্বতী নদীবক্ষ আশ্রয় করিলেন। নিদাঘের প্রখর

সূর্য্যতাপ, অথবা শীতকালের হিমরাশি, তাঁহার স্থির অধ্যবসায়কে বিচলিত করিতে পারিল না। ধ্যানমগ্নচিত্তে অভীষ্টদেবের উপাসনায় নিরত রহিলেন। প্রাবৃট্‌প্রবাহ কতবার তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। সবেগকরকাপাতে তাঁহার কেশটীও বিকম্পিত করিতে পারে নাই। যোগীর সাধনা সিদ্ধ হইল। আশুতোষ আর থাকিতে পারিলেন না। বরার্থীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া সমীপে উপনীত হইলেন; এবং ৫৭ সপ্তপঞ্চাশৎ বর্ণাত্মক একটি সূত্রের সঙ্কেত করিলেন। সেই মাহেশ্বর সূত্র গ্রহণ পুরঃসর মহর্ষি পাণিনি সূত্রপাঠ, গণপাঠ, ধাতুপাঠ এবং লিঙ্গানুশাসন, এই চতুর্ধা বিভক্ত ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া গুরু উপবর্ষ পণ্ডিতের পাদপদ্মে উৎসর্গ করিলেন। কাত্যায়ন (১) সেই গ্রন্থের কৌশল গ্রহণপূর্ব্বক অবশিষ্ট পরিপূরণের নিমিত্ত, একখানি বার্ত্তিক রচনা করেন। ব্যাড়ি তাঁহাদের উভয়ের উক্তিতে ন্যায়প্রদর্শন পূর্ব্বক লক্ষ শ্লোকাত্মক একখানি সংগ্রহ গ্রন্থ রচনা করিলেন। অনন্তর চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যকালে মহর্ষি পতঞ্জলি (২) প্রাদুর্ভূত হইয়া, এই পাণিনীয় আগমের পৃথিবী-বিখ্যাত মহাভাষ্য রচনা করেন। ক্রমে এ পর্য্যন্ত অষ্টাবিংশতি জন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সময়ে সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া পাণিনি সূত্রের ব্যাখ্যা, মহাভাষ্যের ব্যাখ্যা, বৃত্তির ব্যাখ্যা, টীকার টীকা, তাহার টীকা, তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করিয়া পাণিনীয় আগমের একটি সমুদ্র সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে, জগতে এমন কোন ভাষা নাই যাহাতে পাণিনি অপেক্ষা বৃহত্তর এবং কৌশলসম্পন্ন ব্যাকরণ আছে। সংস্কৃত ভাষা যে এত দূর প্রসার লাভ করিয়া পৃথিবীর সমুদয় ভাষার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, পাণিনি তাহার অন্যতম কারণ। পাণিনি যদি প্রথম পরাজয়েই অভ্যুদয়াশা ত্যাগ করিয়া গৃহ আশ্রয় করিতেন, তাহা হইলে কি তিনি পৃথিবীর যাবতীয় বিদ্যারসজ্ঞ নরনারীর নিকট পরিচিত হইতে পারিতেন? পৃথিবীতে যত দিন বিদ্যার আদর থাকিবে, যতদিন সর্ব্বাপেক্ষা মাধুর্য্যময়ী সংস্কৃত ভাষার স্বাদগ্রহণে মানবজাতির স্পৃহা রহিবে, ততদিন স্মরণীয়নামা বৈয়াকরণ পাণিনি লোক-স্মৃতি হইতে অন্তর্হিত হইবেন না। অধ্যবসায় গুণে তিনি অমরতা লাভ করিয়াছেন। জগতে অধ্যবসায়কে ধন্য!

(১) ইনি সংহিতাকার কাত্যায়ন ঋষি নহেন, তিনি ইঁহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী।

(২) ইনি যোগদর্শন প্রণেতা পতঞ্জলি নহেন, তিনি ইঁহার বহু পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন।

আশা।

তোমার আশা কি মা? এ ঘোর জাতীয় অধঃপতনের সময়ে সমাজ বিশ্লেষণ-কারী শক্তি-প্রভাবে সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, শ্রেণী শ্রেণীর বিরুদ্ধে, বর্ণ বর্ণের বিরুদ্ধে, প্রতিবেশী প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান; আজ পিতা পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, ভগিনীতে ভগিনীতে, মিত্রে মিত্রে, প্রভু ভৃত্যে, নিয়ত বিবাদ; এ ভয়ানক দুর্দ্দিনে স্বার্থপর স্বল্পবুদ্ধিরা কপটতার সাহায্যে স্বদেশহিতৈষীতার ব্যবসায় করিতেছে; এ ঘোর কলিকালে তোমার অভাগ্য সন্তানগণ শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করতঃ পাপস্রোতঃ প্রবাহিত করিতেছে; এ দারুণ দুঃসময়ে তোমার বাঁচিবার আশা কি মা? ঋষি তপস্বীগণ ক্রমে ক্রমে তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন, দেবগণ তোমার হতভাগ্য সন্তানদিগের উপর আর করুণা-পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না; চারিদিকে মারীভয়ে ও দুর্ভিক্ষে লোকে হাহাকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে; তোমার কর-ভার-প্রপীড়িত পদ-দলিত সন্তানগণ যেন দিশাহারা হইয়া কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিতে পারিতেছে না; এ মুমূর্ষ সময়ে তোমার জীবিতাশা কি মা?

বহুকাল হইল ভরত রাজা তোমার নামকরণ করেন; তোমার 'পর কত কত দেশ, নগরী ও জাতির অভ্যুত্থান এবং পতন হইয়াছে, সে সকল দেশের, সে সকল জাতির আজ হয়ত চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু তুমি এখন পর্য্যন্তও সমস্ত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া জীবিত রহিয়াছ; কিন্তু বল দেখি মা! আর বাঁচিবার আশা তোমার কি আছে? আমার অল্প দিনের জীবনে কিছু পরিবর্ত্তন না হউক ক্ষতি নাই, কিন্তু জানিতে পারিব না কি যে ফিরিয়া আসিয়া আবার তোমাকে মা বলিয়া ডাকিতে পাইব?

যখন যন্ত্রণায় অস্থির হই, তখন ভাবি, —সে উন্মত্ত মুহূর্ত্তে মনে হয় যে, আর সহ্য হয় না, ভারত সাগর ভয়ঙ্কর আকারে সমস্ত ভূমি প্লাবিত করতঃ উত্তাল তরঙ্গ সমূহের ভীষণ প্রবাহে দেশ, নগরী, জনপদ, নিমজ্জিত করিয়া হিমাচলের চরণ বিধৌত করিতে থাকুক, আমাদের সমস্ত যন্ত্রণার চিরাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অস্তিত্ব অনন্তকালের জন্য বিলুপ্ত হউক। সুপ্তোত্থিতের ন্যায় আবার সে চিন্তা পরিত্যাগ করি। শেষে এইটাই ভাবিতে থাকি, মা! তোমার আশা কি?

অনেকে বলিতেছেন, এ সকল সভা, মহাসভা, বিরাট সভা, রাক্ষসী সভা, সমাজ, সমিতি, মহাসমিতি আমাদের উন্নতির পরিচায়ক। যদি তাহা মনে করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তোমার আশা আছে জানিয়া সুখী হইতাম। কিন্তু মা! আমি ত দেখিতেছি, এ সকল বৈদ্যুতিক শক্তিপ্রভাবে শবদেহের অঙ্গ সঞ্চালন মাত্র, জীবন কৈ? আশা কোথায়?

কয় জন লোক দেশের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করিতে শিখিয়াছে, কয় জন লোক বাক্‌পটুতার জঘন্য বিজাতীয় অনুকরণে আপনার অসার বুদ্ধির পরিচয় না দিয়া, প্রকৃত দেশহিতকর কার্য্যে বদ্ধ-পরিকর? বেশী চাই না; এ পঁচিশ কোটী লোকের মধ্যে পঁচিশ জনের নাম কর দেখি, বলিব এখনও আশা আছে, বলিব এত যে দুর্দ্দশা, তবু এখনও চরমাবস্থায় আইসে নাই।

জাতীয় উন্নতি তিনটি কারণে হয়; (১) জাতীয় একতা, (২) জাতীয় বুদ্ধি ও (৩) জাতীয় কর্ম্মকুশলতা। জাতীয় একতা ধর্ম্ম বা স্বার্থ হইতে উৎপন্ন হয়; জাতীয় বুদ্ধি কতকগুলি চিন্তাশীল লোকের দেশহিতৈষিতার ফল; জাতীয় কর্ম্মকুশলতা কেবল শিক্ষা সাপেক্ষ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হয় লোকে ভাল করিয়া স্বার্থপর হউক, অর্থাৎ স্বার্থপরতার ব্যবসায়টা ভাল করিয়া বুঝুক, না হয় লোকে ধার্ম্মিক হউক; যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহারা দেশের জন্য চিন্তা করিতে থাকুন, আর আমাদের যে সকল সৎ শিক্ষার অভাব আছে, তাহার বহুল প্রচার করুন। যত দিন এ সকল না হইবে, ততদিন দেশের উন্নতি দেশের উন্নতি বলিয়া চীৎকার করিলে কিছুই হইবে না, ততদিন রাজপুরুষদিগের কার্য্য কলাপের দোষানুসন্ধান করিলেও কোন ফল হইবে না; মনে রাখা উচিত, বিদেশীয়েরা ভারতবর্ষে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে সমাগত হয় নাই।

জাতীয় মহত্বের যে সকল উপকরণের উল্লেখ করিলাম, ঐ গুলি যদি হয় ও থাকে, তবে সভা সমিতি কর ভালই, না কর বিশেষ ক্ষতি নাই। পূজা করিয়া ঢাক বাজাও ভালই, না বাজাও তাহাতেও পূজা হইবে; কিন্তু পূজা না করিয়া ঢাক বাজাইলে কেবল ঢাক বাজানই হইবে, অধিকন্তু পাড়ার লোক বিরক্ত হইবে।

উপকথা।

৩।—সিংহশাবক।

কোন এক বনে নানা প্রকার জন্তু বাস করিত। তাহাদিগের রাজা, "পশুরাজ" নামে এক সিংহও তথায় বাস করিতেন। "পশুরাজের" "সিংহশাবক" নামে এক পুত্র ছিল। "সিংহশাবক" জন্মাবধি যাবতীয় পশুর নিকট হইতে সম্মান এবং আদর পাইয়াছিল। বিশেষতঃ সে তাহার পিতার একমাত্র পুত্র ছিল। অতএব বিশেষ যত্ন ও আদরে লালিত পালিত হওয়ায় সে আর কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না। মনে করিত যে পৃথিবী মধ্যে সেই সর্ব্বাপেক্ষা বড়।

তাহার পিতা "পশুরাজের" বয়স অধিক হইয়াছিল। অনেক দিবস পর্য্যন্ত সুনামের সহিত পশুদিগকে শাসন করিয়া

অবশেষে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন "বাপু সিংহশাবক"! আমি আর অধিকক্ষণ বাঁচিব না। আমর এই বিস্তীর্ণ বনরাজ্যে এক্ষণে তুমিই একমাত্র রাজা। অতএব যাবদীয় পশু-প্রজাকে তুমি সযত্নে শাসন করিবে। সকল পশুই তোমার অধীনে বাস করিবে। কেহই তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। কিন্তু সাবধান, মনুষ্য নামে এক প্রকার প্রাণী আছে, কখনও তাহাদিগের নিকট যাইও না। তাহারা বড় চতুর এবং বুদ্ধিমান। আমাদিগের ক্ষমতা এবং বল বিক্রম তাহাদের বুদ্ধির নিকট কোনই কার্য্যকারী হয় না। তাহারা বুদ্ধিবলে অনায়াসে আমাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারে। পুত্র! তুমি এখন নাবালক, অতএব সকল বিবেচনা করিয়া চলিবে। শাস্ত্রে বলে যে, যাহার বুদ্ধি আছে তাহারই বল আছে। কিন্তু যাহার বল আছে তাহারই বুদ্ধি আছে, এমত কোন শাস্ত্রে লিখে না। আরও দেখ, বয়সের সহিত বল ক্রমশঃ ক্ষয় হয়, কিন্তু বুদ্ধি ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। অতএব বল অপেক্ষা বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ। তুমি বলবান্ অপেক্ষা বুদ্ধিমানকে বিশেষ আদর ও ভয় করিবে। আমরা সিংহ, পশুদিগের রাজা, আমাদিগের বল আছে সত্য, কিন্তু বুদ্ধি নাই; আমাদিগের অপেক্ষা মনুষ্যদিগের বল অল্প, কিন্তু তথাচ তাহারা পৃথিবীর রাজা, কারণ তাহাদের বুদ্ধি আছে। অতএব তুমি কখনও মনুষ্যদিগের সংস্রবে যাইও না। তাহাদের বুদ্ধির নিকট তোমার বল বিক্রম কোন ফলদায়ী হইবে না। পুত্র! আমার অন্তিম কালের এই উপদেশ বিশেষ স্মরণ রাখিবে এবং তদনুসারে কার্য্য করিবে। যদ্যপি আমার এই উপদেশ অবহেলা কর, তবে বড় বিপদে পড়িবে, নতুবা চিরসুখে রাজত্ব করিয়া কাল কাটাইতে পারিবে।"

বৃদ্ধ বহুদর্শী "পশুরাজ" পুত্রকে উক্তরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

"সিংহশাবক" এক্ষণে বনের রাজা। পিতার উপদেশ স্মরণ করিয়া তাহার হিতে বিপরীত হইল; মনুষ্য দেখিবার জন্য তাহার বড় ঔৎসুক্য হইল। সে মনে করিল "বৃদ্ধ বয়সে পিতা শক্তিহীন হইয়াছিলেন, সেই জন্য বলের প্রশংসা না করিয়া বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু আমি সকল বিষয়ে বলেরই প্রাধান্য দেখিতেছি। তাঁহার উপদেশ কতদূর সত্য জানিতে হইতেছে। অতএব আমি মনুষ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।" এইরূপ স্থির করিয়া "সিংহশাবক" আপন বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য দেখিবার জন্য রওনা হইল। কোথায় মনুষ্য বাস করে তাহা সে অবগত ছিল না, অতএব পথিমধ্যে যাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

এইরূপে কতক দূর গমন করিয়া সে দেখিল যে একটী হস্তী আগমন করিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই! তুমি মনুষ্য দেখিয়াছ?"

হস্তী—"দেখিয়াছি। তাহারা একবার

কৌশলে আমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল; এবং আমার মত শত সহস্র হস্তীকে এক্ষণেও ধরিয়া রাখিয়াছে।"

সিংহশাবক—"মনুষ্যে কি প্রকারে তোমাদিগকে ধরিয়া রাখে?"

হস্তী—"কখন পদে লৌহের শিকল বাঁধিয়া রাখে, কখন তাহা খুলিয়া আমাদের স্কন্ধে উপবেশন করিয়া চালাইয়া লইয়া বেড়ায়।"

সিংহশাবক—"তুমি প্রবল বলশালী, তোমার এক একটা পদ এক একটা বৃক্ষের গুঁড়ীর মত। তুমি তাহাদের বশ্যতা স্বীকার কর কেন?"

হস্তী—"স্বীকার কি আর ইচ্ছায় করি? আমার মস্তকে তাহাদের অঙ্কুশ আঘাতের চিহ্ন দেখ।"

"সিংহশাবক" হস্তীর মস্তকে অঙ্কুশ আঘাতের চিহ্ন দেখিয়া আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থান করিল। হস্তীর ঐ বিবরণ শুনিয়া মনুষ্য দেখিবার ঔৎসুক্য তাহার আরও বাড়িয়া গেল। কতকদূর গমন করিয়া পথিমধ্যে এক দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ উষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। "সিংহশাবক" উষ্ট্রকে মনুষ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিল। উষ্ট্র বলিল "মনুষ্যমাত্রেই বুদ্ধিমান, তাহারা আমাদের নাসিকার মধ্যে ছিদ্র করিয়া তাহাতে রজ্জু বাঁধিয়া পৃষ্ঠে বোঝা চাপাইয়া যথা ইচ্ছা লইয়া বেড়ায়। তাহাদের মধ্যে একজন বালকেও আমার মত বহুতর উষ্ট্রকে শাসনে রাখিতে পারে। তাহাদের বুদ্ধির কথা আর অধিক কি বলিব? এই বনের মধ্যে এমত প্রাণী কেহই নাই যে তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে।"

"সিংহশাবক" আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া পুনরায় প্রস্থান করিল। কতকদূর গমন করিয়া এক ক্ষুদ্রাকার প্রাণীকে দেখিতে পাইল। এই ক্ষুদ্রাকার প্রাণী এক জন মনুষ্য; সূত্রধর ব্যবসায়ী, বনে কাষ্ঠ কাটিবার জন্য আসিয়াছে। সে সিংহশাবককে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া পলায়নের উপক্রম করাতে "সিংহশাবক" উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "ভাই! যাইও না, আমার একটা কথা শুন।"

সূত্রধর বেগতিক দেখিয়া দাঁড়াইল। তখন "সিংহশাবক" নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বন্ধো! তোমার মত প্রাণী আমি কখন দেখি নাই। আমার মনুষ্য দেখিবার বড় ইচ্ছা; তুমি কখন মনুষ্য দেখিয়াছ কি?" সূত্রধর পরিত্রাণের সুযোগ বুঝিয়া বলিল "হাঁ, আমি মনুষ্য দেখিয়াছি, এবং তোমাকেও দেখাইতে পারি। তুমি ক্ষণেক এই স্থানে অবস্থান কর। আমার কার্য্য শেষ হইলে তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইয়া মনুষ্য দেখাইব।"

সূত্রধর যে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়াছিল তদ্দ্বারা সিংহ ধরিবার এক ফাঁদ প্রস্তুত করিল। ঐ ফাঁদ সিংহের সম্মুখে স্থাপন করিয়া বলিল, "বন্ধো! তুমি ইহার মধ্যে প্রবেশ কর; আমি মনুষ্য দেখাইব।" বুদ্ধি বিবেচনা হীন "সিংহশাবক" তন্মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সূত্রধর ফাঁদ আটকাইয়া দিল; "সিংহশাবক" বন্দী হইল।

তখন সূত্রধর বলিল, "ভাই! মনে

কিছু করিও না। আমি নিজে একজন মনুষ্য। তুমি আমার কৌশলে পড়িয়াছ, আমি তোমাকে গৃহে লইয়া যাইয়া বিক্রয় করিব।”

তখন সিংহশাবকের আর মনস্তাপের সীমা থাকিল না। সে নিজের দুর্ব্বুদ্ধিকে অনেক নিন্দা করিল। কিন্তু উপায় নাই। বলশালী পশুরাজ সিংহ হইয়াও ক্ষুদ্রকায় হীনবল মানবের হস্তে ধৃত হইয়া বলিতে লাগিল “হায়! আমি পিতার উপদেশ কেন অবহেলা করিলাম;—এখন বুঝিলাম যে বল অপেক্ষা বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ।”

শিক্ষার আদর্শ।

এই কোলাহলময় সংসারে খাঁটি মাল মেলা ভার, ভেজাল জিনিসের অভাব নাই। খাঁটি মন হাজারে দু চারি জনের পাওয়া যায়, খাঁটি স্বদেশ-হিতৈষিতা লক্ষে এক জনেরও খুঁজিয়া মেলে না। তোমার আমার মত লোকের অভাব পৃথিবীতে কখনও ছিল না, এখনও নাই। তোমার আমার মত লোক প্রতিযুগে প্রতি দেশে প্রতি পরিবারে অনেক জন্মিয়াছে এবং জন্মিতেছে, তাহাতে প্রকৃতির কৃপণতা দেখিলাম না; কিন্তু তোমার আমার মত মানুষ পৃথিবীর পদদলিত ধূলিকণা, পর-পদাহত পিপীলিকা বই তাহাকে আর কি বলিব? তোমার আমার মত লোক সংসারে কত জন্মিয়াছিল, কত মরিয়া গিয়াছে, কত জন্মিতেছে, কত মৃত্যু মুখে পড়িতেছে, কে তাহার সন্ধান লয় বল? তুমি আমি যদিও স্বপ্ন নই, কথার কথা নই, মরুভূমির মরীচিকা নই, তবুও তুমি আমি এই সংসারে এত ছোট, এত নগণ্য, যে আমাদের থাকা না থাকায় জগৎ-সংসারের বড় একটা আসে যায় না। মহাত্মা যিশুখৃষ্ট যে দিন ক্রুশকাষ্ঠে দোলায়মান হইয়া যন্ত্রণাময় মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সে দিন পৃথিবীর মুখ সূর্য্যগ্রহণে আচ্ছন্ন হইয়া সত্য সত্যই অন্ধকার হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না; কিন্তু সেদিন মানবসমাজের মুখ যে গভীর আঁধারে ডুবিয়া পড়িয়াছিল তাহা ঠিক। এক একটা লোকের জন্য পৃথিবী আঁধার হয়, সমাজ অবসাদে ডুবিয়া যায়, বিস্মৃতি তাহাদিগকে ভুলিয়াও ভুলিতে পারে না।

প্রাচীন ভারতের গৌরবরবি বহুদিন অস্তগত, বেদধ্বনি-নিনাদিত সাহিত্যদর্শন-প্রতিশব্দিত ভারত-গিরিগুহা বহু দিন হইতে পেচক পরিপূরিত হইয়াছে, তবু কে বল ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কপিল, পতঞ্জলি, ভাস্কর শঙ্করস্বামীর নাম ও কীর্ত্তিকথা এতদিনেও ভুলিতে পারিয়াছে? যাহাদের জীবন সংসারের কণ্টকময় পথকে মসৃণ ও নিরাপদ করে, যাহাদের আদর্শ পশুভাবাপন্ন মানবপ্রকৃতিকে

অজ্ঞাতবিবর্ত্তনে দেবত্বের পথে লইয়া যায়, যাহাদের উপদেশে মোহান্ধ চক্ষু দর্শন লাভ করে, কঠিন পাষাণময় প্রাণ স্নেহে বিগলিত হয়, তাহাদের পুণ্যময় পবিত্রস্মৃতি তোমার আমার স্মৃতির মত সংসার অতল জলে ডুবাইয়া দিতে পারে না। সকল দেশে সকল যুগে এই শ্রেণীর মহাপুরুষেরা পৃথিবীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করেন—ইহারাই সমাজের আদর্শ, দেশের গৌরব, শিক্ষার প্রধান সহায়। মানুষের জীবনগত কার্য্য যেমন জীবন্তভাবে উপদেশ দেয়, সহস্র বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাযুক্ত সুললিত বক্তৃতা বা সুদীর্ঘ প্রবন্ধেও তাহা হয় না। "আমি যাহা করি তাহা করিও না, কিন্তু আমি যাহা বলি তাহাই কর" এই যে অসার উপদেশবাক্য, ইহার আর পসার নাই। এখন পাঁচ বৎসরের দুগ্ধপোষ্য শিশুও যাহা করিতে দেখে তাহাই করিতে চায়, যাহা বলিতে শুনে তাহার দিকে ফিরেও চায় না। কে না শুনেছ যে মিথ্যা কথা বলা বড় পাপ, পরের দ্রব্যে লোভ করা বড় অন্যায়, কিন্তু কয়জন এই অমূল্য নীতিবাক্য জীবনে পালন করিতেছে? সত্য-প্রিয় সরল-সাধুস্বভাব যিনি, তিনি অকপটে বলিবেন, শুনিতেছি ত সত্য কথা বলাই উচিত, কিন্তু পারিতেছি না এই দুঃখ। বাস্তবিক মানুষের কথা অপেক্ষা আচরণ আমরা এত বেশী পালন করি যে, অপেক্ষাকৃত সুশিক্ষিত হইয়াও সংসর্গ-দোষে আমরা শিক্ষা দীক্ষা ভুলিয়া দিনে দিনে ঘোর অশিক্ষিতের ন্যায় কুক্রিয়াসক্ত হইয়া পড়ি। একদিন যাহাদিগকে দেখিয়া কত আশা, কত উৎসাহের সঙ্গে ভরসা করিয়াছিলাম যে, ইহারা যখন কার্য্যক্ষেত্রে দাঁড়াইবে, তখন বুঝি পৃথিবীর মুখ উজ্জ্বল হইবে, জন্মভূমির দুঃখভার খসিয়া পড়িবে, কিন্তু আজ তাহারা কোথায়? সেই সব মানুষ আছে, কিন্তু সেই সব প্রাণ নাই, সংসারের কঠোর শাসনে তাহাদের জীবনগত কোমলতা শুকাইয়া গিয়াছে! আদর্শ যে কেবল বালককেই পরিচালিত করে বৃদ্ধকে করে না, তাহা গুরুমহাশয়দিগের অতি পাণ্ডিত্যের মধ্যে মহামূর্খতা। আদর্শ প্রবীণকেও সুপথ হইতে কুপথে লইতে পারে, শিক্ষিতকেও সুশিক্ষা হইতে কুশিক্ষায় ফেলিতে পারে। আদর্শ মানব জীবনের আদি, মধ্য, অন্ত,—চিরদিনের সঙ্গের সঙ্গী।

এত কথা বলিলাম কেন, এতক্ষণে তাহাই বলিব। আজ কাল দেশের মধ্যে 'শিক্ষা, শিক্ষা' বলিয়া একটা ভারি আন্দোলন উঠিয়াছে; শিক্ষা-বিভাগের আবশ্যক থাকুক বা না থাকুক, শিক্ষা-পুস্তক লিখিত, মুদ্রিত, সঙ্কলিত, সংগৃহীত ও স্তূপীকৃত হইয়া পুস্তকবিপনিতে নীরবে কীটদষ্ট হইতেছে; পাঠক থাকুক বা না থাকুক (প্রিয় সম্পাদক মহাশয় ক্ষমা করিবেন) শিক্ষা প্রচারের পত্রিকা, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে, সমুদ্রে জল বুদ্বুদের মত নিত্য নূতন অভ্যুদয়, নিত্য নূতন তিরোভাব হইতেছে; শ্রোতা থাকুক না থাকুক, উপদেশ দিবার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, বিদ্যালয়ের অপোগণ্ড শিশু জোটাইয়া বক্তৃতার পর

বক্তৃতা দেওয়া হইতেছে ও সম্বাদপত্র সেই সব দিগ্বিজয়ের বার্ত্তা দেশদেশান্তরে বহন করিতেছে, সর্ব্বোপরি উচ্চশিক্ষার জন্মদাতা পিতৃস্থানীয় গবর্ণমেণ্টও নীতিশিক্ষা কি সে হইবে, তাহারই গবেষণায় ও শিক্ষানীতি সংস্করণের রিপোর্টে যথেষ্ট অর্থ ও সময় ব্যয় করিতেছেন। এ সকলে যে কিছুই হইতেছে না তাহা বলিতেছি না; বলিবার উদ্দেশ্যও তাহা নহে; বলিতেছি এই কথা যে, এত আয়োজন, এত আড়ম্বর সকলই কেন লঘু ক্রিয়ায় পর্য্যবসিত হইতেছে, এত অভ্রভেদী উচ্চচূড়ার আলোড়নে কেবলই কেন ক্ষুদ্র মূষিক প্রসূত হইতেছে? গত পঞ্চাশৎ বৎসরের ইতিহাস পাঠ কর, ইউরোপ, আমেরিকা কি ছিল কি হইয়াছে দেখ! দিনের পর দিন যাইতেছে, পাশ্চাত্য উন্নতি-স্রোত ক্রমেই খরতরবেগে প্রবাহিত হইতেছে, আর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া অবধি কয় জন বিজ্ঞানের কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন? অবশ্য তার্কিকের জন্য ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি ও তর্কের অভাব নাই, কারণ-সমষ্টির অপ্রতুলতা নাই, আমি তাঁহার কথা ধরি না; কিন্তু বাস্তবিক ইহার মৌলিক কারণ কি তাহাই আলোচনা করা উচিত।

আমার ত বোধ হয় যে, আমাদের দেশে যে প্রণালীতে শিক্ষা-কার্য্য চলিতেছে, তাহার মূলেই গোলযোগ, আরম্ভেই উপসংহার নিহিত আছে। তুমি যদি হাত পা বাঁধিয়া একজনকে সাঁতার শিক্ষার জন্য জলে ছাড়িয়া দেও, সে কিছুকাল আছাড়ি পিছাড়ী করিয়া যে ডুবিয়া মরিবে, ইহা নিশ্চয়। কিন্তু সে মৃত্যু কি ছাত্রের দোষে না প্রণালীর দোষে? সাঁতার শিখিতে হইলে হাত পা বাঁধা প্রণালী যেমন মৃত্যুর প্রণালী, শিক্ষার প্রণালী নহে ও হইতে পারে না; আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীও অনেকটা সেইরূপ। "যে গাছ বাড়ে তার একটী পাতা দেখিলেই চেনা যায়"—এই যে একটা গ্রাম্য কথা চলিত আছে, আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর পক্ষে এটী বেশ খাটে। এই প্রণালীর একটী পাতা দেখিয়াই এই শিক্ষা-বৃক্ষের ফুলফলের আভাস পাওয়া যায়। • • •

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিক্ষাটা উপদেশ অপেক্ষা আদর্শের উপর অধিক নির্ভর করে। আমাদের শিক্ষার আদর্শ কোথায়? যখন মিশনারিরা প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষার দ্বার খুলিয়া দিয়া ভারতবাসীর অনন্ত কৃতজ্ঞতা উপার্জ্জন করিলেন ও আজিও করিতেছেন, সেই দিন তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল এবং আজও উদ্দেশ্য আছে—ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার। তখন ভাবিয়াছিলেন উচ্চ শিক্ষায় তাহা হইবে, তাই উচ্চ শিক্ষার উচ্চ মন্দির গাঁথিতেছিলেন; আজ দেখিতেছেন উচ্চ শিক্ষায় তাহা হইতেছে না, তাই স্বহস্তে সেই উচ্চ প্রাসাদ-চূড়া ভাঙ্গিয়া তাহারই ইষ্টক রেণুতে গ্রাম্য মিশনারি পাঠশালা গড়িতেছেন—এই প্রণালীর প্রথম হইতে শেষ উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্যে দিন রাত প্রভেদ! তোমাদিগকে শিক্ষা দিব, কিন্তু শিক্ষার অবশ্যম্ভাবি ফল ও অত্যাবশ্যকীয় সাধন স্বরূপ যে স্বাধীনতা, তাহা দিব না—

সাঁতার শিখিতে বলিব, কিন্তু হাত পা বাঁধিয়া রাখিব! এই আদর্শের উপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না বলিয়া মিশনারি শিক্ষার আর দেশে সেকালের মত আদর নাই। আমাদিগের দেশের যেরূপ অবস্থা, পরাধীন, পরমুখাপেক্ষীভাব, তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় শিক্ষার ভারও অনেক দিন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের হস্তেই থাকিবে এবং আজ পর্য্যন্তও অধিকাংশ স্থলেই গবর্ণমেণ্টই প্রধান শিক্ষাদাতা। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে শিক্ষার আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাও শিক্ষার বিকৃত আদর্শ মাত্র। তাহাতে কোনরূপে কায়ক্লেশে একটা অর্থকরী বৃত্তি মাত্র শিক্ষা হইয়াই উচ্চশিক্ষা পর্য্যবসিত হয়, এবং সেই শিক্ষার অবশ্যম্ভাবি ফলে দেশ কেরাণী, ডেপুটী, উকিল, মোক্তার ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারে পূর্ণ হইতেছে ভিন্ন আর কিছুই হইতেছে না। একে ত শিক্ষার আদর্শের এই নিগ্রহ, তাহার উপর আবার বর্ত্তমান শিক্ষা নীতিহীন শিক্ষা—উপদেশে নীতির অভাব নাই বটে, কিন্তু ধর্ম্মহীন শিক্ষা আর নীতিহীন শিক্ষা একই কথা। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যে ধর্ম্মশিক্ষা ও তদানুসঙ্গিক নীতিশিক্ষা দেওয়া সহজ নহে তাহা জানি, তাহার কথা বলিতেছি না; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যে ধর্ম্ম ও নীতিহীন শিক্ষায় সুশিক্ষা হইতে পারে না—সুতরাং হইতেছে না—তাহাই বলিতেছি। এই শিক্ষা বিভ্রাটের দিনে যাঁহারা শিক্ষানীতি সুগঠিত করিবার জন্য আপনাদের সময়, পরিশ্রম ও অর্থ যুগপৎ ব্যয়িত করিতেছেন, তাঁহারা যে আমাদিগের সমাজের যথার্থ হিতৈষী তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহাদিগের বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি থাকা উচিত যে, শিক্ষার ভিত্তিমূল একটি জীবন্ত আদর্শের উপর স্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য, এবং সেই আদর্শ ধর্ম্ম, নীতি ও স্বাধীনতার মুক্তবায়ুতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

উপদেশমালা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৯

মানব কর্ত্তব্য যাহা, যতনে সাধিবে তাহা;
মনে রেখ—তোমরা মানব।
ধর্ম্ম পথ সদা ধরি, কর্ত্তব্য সাধন করি,
সংসার কাননে ভ্রম সব॥
আসিয়াছ কর্ম্মভূমে, অচেত থেকনা ঘুমে—
শব প্রায়—এ সংসারে কদা।
বহুল অনর্থমূল, আলস্য করি নির্ম্মূল,
কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম কর সদা॥
সহায় হবেন তিনি, জগতের প্রভু যিনি,—
সৎকার্য্যে বিধাতা সহায়।
সরল বিবেক বাণী, বিভুর আদেশ জানি,
বিচরণ কর এ ধরায়।

১০

আপনার মত দেখিবে জগত;
ভাবিবে না কেহ পর।
আপন তোমার, এ বিশ্ব সংসার;
ভাই ভগ্নী—নারী নর॥
একতার তারে, বাঁধা পরস্পরে—
অনন্ত তারকা প্রায়—
থাকিবে সকলে মাতি কুতূহলে,
সংসার-আকাশ-গায়॥
একের তনয়, কেহ পর নয়;
বিবাদ সহিত কার?
এ বিশ্ব ধরণী, সবার জননী;
এক পিতা সবাকার॥

১১

বিদ্যা—অমূল্য ধন,
কর সবে উপার্জ্জন
কায়মনে বালক নিচয়।
বিদ্যা না শিখিলে পরে,
কেহ না আদর করে;—
বিদ্যাহীন কারো পূজ্য নয়॥
চিরকাল পায় দুঃখ,
দেখে না সুখের মুখ;—
বিদ্যাহীন—ঘৃণিত সবার।
থাকে যদি দিব্যরূপ,
ধনে যদি সম ভূপ—
তবু নাই সুখ্যাতি তাহার॥
স্বরাজ্যে রাজার মান,
যথা তথা বিদ্যাবান্
লভে খ্যাতি—যার তার কাছে।
মানবের অগ্রগণ্য,
বিদ্যাবান্ ধন্য ধন্য;
সম তার কয় জন আছে?
নির্ধন যদ্যপি হয়,
তথাপিও সুখী নয়
বিদ্বানের সম—অন্য জন।
বিদ্যাবান্ তুচ্ছ করে
মূর্খ যাহা সমাদরে;—
অর্থ অর্থ—করে না কখন॥
বিদ্বান্ মরিয়া যায়,
সকলে সুযশ গায়;
মৃত্যু পরে নাম থাকে তার।
জ্ঞান-সুধা করি পান,
অন্যে করি জ্ঞান দান—
রেখে যায়—জ্ঞানের ভাণ্ডার॥
নশ্বর হলেও পরে
অমরত্ব লাভ করে
সুকীর্ত্তির ফলে আপনার।
ধরাধামে ধন্য ধন্য,
যশস্বীর অগ্রগণ্য
বিদ্যাবান্—জ্ঞানের আধার॥
কর শিশু! বিদ্যা ধন
কায় মনে উপার্জ্জন,—
যে ধন হরিতে কেহ নারে।
যে ধনের বলে ভবে
রাজার অধিক হবে,—
ধনী, মানী পূজিবে তোমারে।

১২

আকরে যে স্বর্ণ রহে,
সে স্বর্ণ উজ্জ্বল নহে,—
উজ্জ্বল করিতে হয় তারে।
তদ্রূপ করিতে হয়
শিক্ষা দানে বৃত্তিচয়
সমুজ্জ্বল—বিবিধ প্রকারে॥

কুবৃত্তি কর নিস্তেজ,
সুবৃত্তি কর সতেজ,—
তবে হবে সুশিক্ষা তোমার।
সুশিক্ষিত হ'লে পরে
দিব্য জ্ঞান লভে নরে;
দূর হয়—যত কুসংস্কার॥
শিক্ষার প্রশস্ত কাল
একমাত্র বাল্যকাল—
দেহ মন সুকোমল যবে।
সরস বসন্তে হয়
অঙ্কুরিত পুষ্পচয়,
পল্লবিত—তরু, লতা সবে॥
শীতকাল এলে হায়!
হিমানী লাগিলে গায়
লতা, তরু,—রসহীন হয়।
তখন ফুটে না ফুল,
শুকায় তরুর মূল,
পত্রহীন—তরু সমুদয়॥

তেমতি বার্দ্ধক্য কাল,
সুশিক্ষার নহে কাল;
বিফল তখন শিক্ষা দান।
নীরস তরুর মত,
হীন-তেজ বৃত্তি যত
নাহি করে সুফল প্রদান॥
দুর্জ্জয় যৌবনকালে
শিক্ষা-বীজ ছড়াইলে
কোন ফল তাতে নাহি হয়।
কাম, ক্রোধ, রিপুদল,
হয়ে ক্রমে সুপ্রবল
নষ্ট করে—বীজ সমুদয়॥
শিক্ষার প্রশস্ত কালে,
অতএব বাল্যকালে
কর শিশু! শিক্ষা প্রাণপণে।
কুবৃত্তি দমন করি
বিবেক মসাল ধরি
ভ্রম সুখে—সংসার কাননে॥

(ক্রমশঃ)

মন্তব্য।

গ্রাহকদিগের মতামত জানিতে,—যাঁহাদিগের পরিচর্য্যার জন্য শিক্ষা-পরিচরের জন্ম, তাঁহাদিগের উপদেশ ও পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতে, সংক্ষেপতঃ, যাহাতে তাঁহাদিগের প্রকৃত পরিচর্য্যা হইতে পারে, শিক্ষা-পরিচরকে এরূপ ভাবে চালাইতে আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা, এজন্য আমরা শিক্ষা-পরিচরে সংক্ষেপে গ্রাহক মহোদয়দিগের মন্তব্য সময়ে সময়ে প্রকাশ করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত আছি। প্রভুর ইষ্ট-সাধন এবং তুষ্টি-সাধন, এ উভয়ই বিশ্বস্ত ভৃত্যের কর্ত্তব্য; কিন্তু প্রভু স্বয়ং স্নেহশীল হইয়া উপদেশ না দিলে ভৃত্য কখনই প্রকৃত ভাবে কর্ত্তব্য-পালনে সক্ষম হয় না। সুখের বিষয়, পরিচরের গ্রাহকদিগের মধ্যে অনেকেই ইহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখাইতেছেন,—কেহ প্রশংসা করিয়া ইহাকে উৎসাহিত করিতেছেন, কেহবা পরামর্শ দিয়া ইহার প্রকৃত সহায়তা করিতেছেন। যে সকল আশা ভরসা লইয়া পরিচর মাতৃভূমির পরিচর্য্যায় দাঁড়াইয়াছে, গ্রাহকদিগের নিকট হইতে অভাবনীয় সহানুভূতি লাভ করিয়া তাহার সে সকল আশা ভরসা শতগুণে বর্দ্ধিত হইতেছে। যদি জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদ এবং গ্রাহকদিগের অনুগ্রহ অটল থাকে, তবে এই ক্ষুদ্র পরিচর

একদিন বঙ্গীয় শিক্ষক, অভিভাবক, এবং ছাত্রদিগের মধ্যে সহানুভূতি বিস্তার করিয়া একতার বন্ধন-রজ্জু-রূপে পরিণত হইতে পারে, এরূপ আশা করিতে এখন আমাদিগের সাহস হয়।

পরিচরের বর্ত্তমান আয়তন অতি ক্ষুদ্র, সুতরাং সকলের সকল কথা ইহাতে প্রকাশ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব কেবল প্রয়োজনীয় কথাগুলিই সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে আমরা চেষ্টা করিব।

নওগাঁ হাইস্কুলের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র কাব্যরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন;—"আপনি যে উচ্চব্রতে দীক্ষিত, ইহাতে আপনার বিশ্বজনীন অভিপ্রায়কে সহস্র সাধুবাদ। আপনার অভিলাষানুরূপ কার্য্য হইলে পাঠশালার গুরু, এবং উচ্চ ও মধ্যশ্রেণী বিদ্যালয়ের নিম্নতম শিক্ষকগণের হস্তের জড়তা এত দিনে দূর হইবে। যাহাতে প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহারা রচনা অভ্যাস করিতে সমর্থ হন, তদ্বিষয়ে বেশ সুচারু বন্দোবস্ত হইয়াছে।"

নাগরপুর মধ্য ইংরাজী স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত ললিতকৃষ্ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন;—"আপনি দেশের গুরুতম অভাবমোচনের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, ভগবান্ আপনার এই সাধু উদ্যমের সহায় হউন।"

মৌলবি-বাজার মধ্য ইংরাজী স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার এবং শ্রীহট্ট সম্মিলনীর ভূতপূর্ব্ব এজেণ্ট শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন; "বিজ্ঞাপন পাঠ করার পরই 'পরিচরের' প্রতি আমার বিশেষ সহানুভূতি জন্মে * * * আমি কায়-মনো-বাক্যে দয়াময় জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, সর্ব্বদাই এই পত্রিকাখানি এই ভাবে চলিতে থাকুক। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ইহাদ্বারা ভারতের পতিত জাতি শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় যথাবিহিত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিবে।

"এই পত্রিকাখানা সম্বন্ধে আমার দুই একটি কথা বলিবার আছে। আমি ইহাকে শিক্ষা-বিভাগের সম্পত্তি মনে করি, তাই ২। ১টি কথা বলিতে সাহসী হইয়াছি। * * *

"কথাগুলি এই। নির্দ্দিষ্টরূপে স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী নিয়মমত কতকগুলি প্রবন্ধ পরিচরে থাকা উচিত মনে করি। পরিচরের কোন এক ক্ষুদ্র অংশ সর্ব্বদা এই কার্য্যে ব্যয়িত হইলে সেই স্থান টুকুর অপব্যবহার হইবে বলিয়া মনে করি না। আমার ইচ্ছা নিম্নলিখিত ধরণের প্রবন্ধ সকল ইহাতে ক্রমে লিখিত হউক।"

ইহার পরে স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজন ও যুক্তিযুক্ততা, স্ত্রী-শিক্ষার প্রণালী, প্রাচীন ও বর্ত্তমান প্রণালীর সমালোচন, পাঠ্য-প্রণয়ন ও নির্ব্বাচন, গৃহধর্ম্ম, লজ্জা, আদর্শ গৃহিণী, পারিবারিক ব্যবহার, রন্ধনাদি গৃহকার্য্য, ধর্ম্মশিক্ষা, মাতৃশিক্ষা প্রভৃতি স্ত্রী-শিক্ষা-সম্বন্ধে সপ্তদশটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা লেখকের চিন্তা-প্রসূত পত্রখানি পাইয়া সুখী হইয়াছি। পতিত ভারত অভ্যুত্থিত হউক, ইহা আমাদের প্রাণগত কামনা। আমাদের জননী ও ভগিনী, স্ত্রী ও কন্যা জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত না হইলে ভারত জাগিবে না, আমাদের ঘুম ভাঙ্গিবে না, ইহাও আমরা জানি। কিন্তু বিষয়টা বড় কঠিন। যিনি বিনা শিক্ষায় জগতে নারী-জাতির আদর্শ, সেই আর্য্যমহিলার শিক্ষা বিষয়ে উপদেশ দিতে পারেন, এমন লেখক দরিদ্র বাঙ্গালায় ইচ্ছা করিলেই পাওয়া যায় না। যাহা হউক, লেখকের কথা কয়টি আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখিলাম। (ক্রমশঃ।)

বিনিময় প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত আরও দুই-খানি মাসিক পত্রিকার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

১। বামাবোধিনী পত্রিকা (কলিকাতা)

২। শ্রীহট্ট-সুহৃৎ (শ্রীহট্ট)। এই আট পৃষ্ঠা পরিমিত মাসিক পত্রিকাখানির মুল্য বার্ষিক ॥০ আট আনা মাত্র, এবং ইহা নাকি বালকদিগের যত্নে পরিচালিত। আমরা ইহা পাঠে সুখী হইয়াছি। ইহা পড়িলে বালকদিগের উপকার হইবে।

সম্পাদকের আক্ষেপ।

আমরা যখন পুরস্কারের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলাম, তখন আমাদের আশা ছিল, গ্রাহকদিগের মধ্যে অনেকেই "হস্তের জড়তা" দূর করিবার জন্য যত্ন করিবেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের আশা সফল হয় নাই। আমরা চারি মাস পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, পুরস্কার-প্রার্থীর সংখ্যায় হ্রাস বই বৃদ্ধি দেখা গেল না। পরিচর সম্বন্ধে কোন বিষয়ে প্রতারণার সম্ভাবনা নাই বলিয়া গ্রাহকদিগকে বিনীতভাবে বলিলাম, ইহাতেও তাঁহারা পুরস্কারের জন্য আগ্রহ দেখাইলেন না। সুতরাং নিষ্প্রয়োজন বোধে পঞ্চম সংখ্যা হইতে

পুরস্কারের নিয়ম রহিত

করিতে বাধ্য হইলাম। শ্রাবণ মাসের প্রবন্ধের জন্যও পুরস্কার দেওয়া যাইবে, কিন্তু ভাদ্র মাস হইতে আর পুরস্কার দেওয়া যাইবে না, সুতরাং সে জন্য প্রবন্ধও নির্দ্দেশিত হইবে না। কিন্তু পুরস্কারের নিয়ম রহিত করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না, পুরস্কারের জন্য যে অর্থ ব্যয় হইতেছিল, তদ্দ্বারা সমস্ত গ্রাহকের সন্তোষপ্রদ কোন কার্য্য করিতে আমাদের অভিলাষ হইয়াছে। অতএব আগামী আশ্বিন মাস হইতে সময়ে সময়ে শিক্ষা-পরিচরে উপদেশজনক এবং কৌতুকাবহ

ছবি

থাকিবে। এদেশে বর্ত্তমান সময়ে পুস্তকে ছবি দেওয়া যেরূপ ব্যয়সাধ্য, তাহাতে প্রতিমাসে যে ছবি দিতে পারিব, এমন প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না; তবে এ কথা বলিতে পারি যে, সাধ্যসত্ত্বে আমরা ত্রুটি করিব না।

[illegible]] আশ্বিন [ষষ্ঠ সংখ্যা।

(১২৯৬)

আদর্শ হিন্দু-বিধবা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর পুণ্য-নাম-পূত

শিক্ষা-পরিচর

শিক্ষাবিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ,।

সূচী।

কলিকাতা

৯২ নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট; বরাট প্রেসে

শ্রীকিশোরীমোহন সেন দ্বারা মুদ্রিত

এবং

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।৵০। পশ্চাদ্দেয় নাই। ডাক মাশুল লাগে না।

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥" বিষ্ণুশর্ম্মা। "Train up a child in the way he should go; and when he is old he will not depart from it." Eng. Bible.—" The master is the best book, the most natural and efficient channel of communication." D. Stow.—" Too generally words have been communicated without ideas." D. Stow. "Be exact in your thoughts." Lord Reay.—"The child is father of the man." Wordsworth.—"The subject which involves all other subjects, and therefore the subject in which education should culminate, is the Theory and Practice of Education." H. Spencer.—" True education is practicable only by a true philosopher." H. Spencer.—" All breaches of the laws of health are physical sins." H. Spencer.—"What is needed for the rooting out of vices is not legislation so much as education aided of course by example." *Hope.*—" It is the greatest curse of ignorance it knows not how ignorant it is." *Christian Life.* "অনন্ত শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ। যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রং॥ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। "—a sound mind in a sound body." Locke.

গ্রাহকের জ্ঞাতব্য।

১। এই পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৸৴০ এক টাকা দশ আনা। পাঁচ বা ততোধিক গ্রাহক একত্রে লইলে প্রত্যেকের ১৶০ এক টাকা ছয় আনা লাগিবে। মূল্য পরে লইবার নিয়ম নাই। কিন্তু পত্রিকা পাইলেই মূল্য পাঠাইয়া দিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া কোন শিক্ষক পত্র লিখিলে তাঁহার নিকট পত্রিকা প্রেরিত হইবে। ইচ্ছা করিলে তিনি নিজের ছাত্র বা ছাত্রীর জন্যও এইরূপ পত্র লিখিতে পারেন, কিন্তু ইহার মূল্যের জন্য তিনিই দায়ী থাকিবেন।

২। গ্রাহকগণ চিঠিপত্র, প্রশ্নোত্তর বা মূল্য পাঠাইতে নিজ নামের সঙ্গে নিজ নিজ নম্বরের উল্লেখ করিবেন, এবং তিনি শিক্ষক বা ছাত্র হইলে তাহাও লিখিবেন।

৩। চিঠিপত্র, প্রবন্ধ ও মূল্যাদি সমস্তই সম্পাদকের নামে পুঁঠিয়া, "রাজসাহী" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। কলিকাতার গ্রাহকগণ বরাট প্রেসে শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে রসিদ লইয়া তাঁহাকে মূল্য দিতে পারেন।

৪। কেহ বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ পত্র লিখিয়া নিয়মাদি জানিবেন।

৫। গ্রাহকগণ স্ব স্ব নাম, ধাম ও নম্বর স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন।

৬। কাহারও কিছু জানিবার থাকিলে রিটার্ণ পোষ্টকার্ডে পত্র লিখিবেন।

৭। প্রকাশার্থ বা পুরস্কারের জন্য যিনিই যে কোন প্রবন্ধ লিখিবেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক ভাল কালি কলম দিয়া ভাল কাগজের কেবল এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শিক্ষা-পরিচর।

১ম ভাগ। } আশ্বিন ১২৯৬ সাল। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

বিশ্ব-প্রেম।

এ ছার সংসারে, প্রেমের তুফান
যদিনা বহিত হায়!
কি সুখ থাকিত? অসার হইত
সংসার মরুর প্রায়!!

প্রেমামৃত বিনা. জীব সমুদয়—
বারি বিনা মীন মত,—
অকালে মরিত হাহাকার রবে,
লাখে লাখে হায়! কত!!

তাহ'লে কি আর দুঃখ শোকে পূর্ণ—
এ মর জগতে ছার—
কেহ কি থাকিতে করিত বাসনা
বহিয়া যাতনা ভার?

প্রেম-রস আহা! কত মধুময়!
সে রসে বঞ্চিত যেই।
পাষাণ সমান, নীরস জীবন
দিবানিশি বহে সেই॥

বিশ্ব-প্রেম রূপ অনন্ত সাগরে,
মনের আনন্দে ভাসি,—
কীটাণুর প্রায়, দিবানিশি হায়!
খেলিছে জগতবাসী।

সেথা-মনসুখে আছে পিতা মাতা
পুত্র কন্যা বুকে করি।
আছে সতী নারী মনের হরষে
প্রাণ-পতি গলা ধরি॥

সেথা-ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্মীয়, স্বজন—
একত্রে মিলিয়া সবে,—
মনের আনন্দে, বিশ্বপতি প্রেম
গাইছে মধুর রবে।

সেথা হিংসা, দ্বেষ, কলহ, বিবাদ
কভু—না পারে পশিতে।
শুধু, প্রেম-স্রোত বহে অবিরাম
সেথা—দিবসে নিশিতে॥

ওহে জীবগণ! সে প্রেম-সাগরে—
সদা—প্রফুল্ল অন্তর—
বিবাদ ভুলিয়া, জ্ঞাতি, বন্ধু সহ,
ভাস—সুখে নিরন্তর।

হিংসা দ্বেষে পূর্ণ, সে প্রেম-সাগরে
বিরাজে পর্ব্বতমালা;—
অত্যুচ্চ যা'দের শিখরে, শিখরে
পাপগণ করে খেলা।

...নে, কুমতি বচনে,
কভু—সেথা যেওনায়ে।
ত্যজি প্রেম-সুধা, নিবারিতে ক্ষুধা,
বিষ পান করো নারে॥

একদা ভারতে, দেবর্ষি নারদ
সুমধুর ধরি তান,—
প্রতি ঘরে ঘরে, নাচিয়া নাচিয়া,
গাইতেন এই গান।
মধুর সঙ্গীতে হইয়া বিভোর,
ভারতের নারী নর—
প্রেমের সাগরে, আনন্দে ভাসিত—
প্রেমোন্মত্ত—নিরন্তর।
পতি-প্রাণা-সতী সেবিত পতিকে
আরাধ্য দেবতা মত ;—
পতির শুশ্রূষা আছিল সতীর
জীবনের সার ব্রত।
আছিল তৎকালে দাম্পত্য প্রণয়—
সুপবিত্র, স্বার্থহীন,—
প্রেমিক প্রেমিকা, মজি সে প্রণয়ে,
কাটাইত নিশি দিন।
অরধ-অঙ্গিনী, জীবন সঙ্গিনী,
ভাবিত পত্নীকে পতি ;—
সর্ব্ব কার্য্যে তার প্রধান সহায়
থাকিত নিয়ত সতী।
সতীর কামনা পূরাইত পতি,
নিতি নিতি সযতনে ;—
না পারিত যদি পূরাতে কামনা
[illegible] বিষণ্ন মনে।
জন[illegible]ননী পুত্রের মঙ্গল
ভাবিতেন নিশি দিন।
ভক্তি-পরায়ণ, কৃতজ্ঞ সন্তান
শোধিত তাঁদের ঋণ॥

স্নেহ-স্বরূপিনী, গরভ-ধারিণী
পুত্রের মঙ্গল তরে,—
দিতেন জীবন, তৃণের মতন—
তুচ্ছ জ্ঞানে—অকাতরে।
সংস্কারাদি কার্য্য সমাপন করি,
প্রাণসম পুত্রগণে—
গুরুর আলয়ে, দিতেন পাঠায়ে
পিতা মাতা সযতনে।
আগম, পুরাণ অধ্যয়ন করি,
অন্য শিষ্যগণ সহ,—
আনন্দে শুনিত অমৃত সমান—
ধর্ম্মকথা অহরহঃ।
সৎশিক্ষা লভিয়া, সৎসঙ্গে থাকিয়া—
অবশ্য হইত সৎ।
আগাছাও হয়, চন্দন নিকটে
থাকিলে, চন্দনবৎ॥
বেদ প্রতিপাদ্য ক্রিয়া কাণ্ড যত
শিখিত গুরুর কাছে।
সংসার ধরম, গৃহীর করম
শিখিত সবার পাছে॥
গুরু-গৃহে শিক্ষা সমাপন করি
গুরুর দক্ষিণা দিয়া,—
পিতার আলয়ে আসিত ফিরিয়া,
নাচিত পিতার হিয়া।
পিতার আদেশে, ধর্ম্ম সাক্ষী করি,
সাধ্বী, গৃহলক্ষ্মী পারা,—
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের সাধনে,
গ্রহণ করিত দারা।
অচ্ছেদ্য বন্ধনে, পতি পত্নী উভে
বদ্ধ হ'ত পরস্পরে,—
মাধবী লতিকা, সহকার সনে—
বদ্ধ যথা প্রেমভরে।

মনের মালিন্যে ছিঁড়িতনা কভু
সেই—পবিত্র বন্ধন ;
এক বিদ্যমানে, বিবাহ অপরে
করিত না কোন জন ॥
কিন্তু, হায়! যদি অদৃষ্টের দোষে,
বিধবা হইত কেহ,—
অম্লান বদনে, ত্যজি, চিতানলে,
স্বামীর সহিত দেহ ;—
গিয়া, সে অনন্ত সুখের নিলয়—
শান্তিময় স্বর্গধামে ;—
বিহরিত সুখে, মনের আনন্দে,
বসিয়া পতির বামে।
অথবা, থাকিত জীবন্মৃতা হ'য়ে
সাক্ষাৎ দেবীর মত।
জীবনের সুখ দিয়া বিসর্জ্জন
পালিত বৈধব্য ব্রত ॥
পত্নীর বিয়োগে থাকিতেন পতি
নির্লিপ্ত যোগীর মত।
শুদ্ধাচারী হ'য়ে, পালিতেন সদা
পর-উপকার ব্রত ॥
হিন্দু বিধবার, নিস্বার্থ জীবন
ছিল—পবিত্র ভারতে।
ব্যাপৃত তাদের থাকিত জীবন
পর-উপকার ব্রতে ॥
রোগীর শিয়রে বসিয়া নীরবে
অনাহারে, অনিদ্রায়,—
শুশ্রূষা করিত ;— আপনার কষ্ট
কভু না গণিত হায়!
অমৃত বচনে, করিত শীতল,
তাপিত যাদের প্রাণ ;—
শোকে জর জর কাতর হৃদয়ে—
প্রবোধ করিত দান।

পর-সুখে, সুখী; পর-দুঃখে, দুঃখী
থাকিত বিধবা যত।
অতিথি সেবায়, সন্তান পালনে—
থাকিত নিয়ত রত ॥
শত্রু মিত্র ভেদ, ছিল না সে কালে
কভু—বিধবাগণের।
কি শত্রু, কি মিত্র— সকলি সমান
ছিল—নিকটে তাদের ॥
তাহাদের দুঃখে— কি নর, কি নারী—
থাকিত সকলে দুঃখী।
সকলেই ব্যাস্ত, থাকিত তৎকালে,
করিতে তাদিগে সুখী ॥
কি মধুর আহা! ছিল ভ্রাতৃভাব,
পবিত্র এ আর্য্য ধামে!
ভাই ভাই ভাই থাকিত সবাই
বিভোর মধুর প্রেমে!!
বয়ঃ-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের কাছে
আছিল সম্মান-পাত্র।
থাকিত কনিষ্ঠ বয়ঃ-জ্যেষ্ঠ কাছে
বিনীত-মতন ছাত্র ॥
স্নেহ-পরায়ণ বয়ঃ-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
সতত কনিষ্ঠগণে—
সন্তুষ্ট রাখিতে সচেষ্ট থাকিত
অকপট আচরণে।
এক পরিবারে— বদ্ধ আজীবন
থাকিত ভগিনী ভ্রাতা,—
নয়ন-রঞ্জন কুসুম কলিকা
একই স্তবকে যথা।
এ পাপ সংসার— সুখের আকর
আছিল তৎকালে হায়!
সবে—ভাই, ভগ্নী; ছিল এ মধুর
ভ্রাতৃ-ভাব পূর্ণতায়!!

গৃহ-কর্ত্তা যিনি সর্ব্বেসর্ব্বা তিনি;
অপরে অধীন তাঁর।
বেদের মতন করিত গ্রহণ
তাঁহার বচন সার॥
এ ছোট, ও বড়; এ শত্রু, ও মিত্র—
ছিল না কভু তৎকালে,—
ছিল মীন মত, সকলেই যেন
আবদ্ধ একতা জালে।
কিন্তু, বড় দুঃখ; এই কলি যুগে
হেরি সব বিপরীত।
পবিত্র প্রেমের নাহি সে আর
নিঃস্বার্থ বিশুদ্ধ রীত॥
সকলেই যেন আপন আপন
ব্যস্ত স্বার্থ-সিদ্ধিতরে।
অল্প স্বার্থ হেতু অনর্থ বহুল
সকলেই যেন করে॥
এ ছার সংসার হিংসা, ব্যভিচার,
কলহ, বিবাদে ভরা।
বাসের অযোগ্য যেন পাপ-পূর্ণ—
গরলময় এ ধরা॥
জাতীয় গৌরব ভুলিয়া গিয়াছে
ভারত-সন্তানগণ।
বিদেশীয় ভাবে হইয়াছে এবে
উন্মত্ত সবার মন॥
দাম্পত্য প্রেমের সে মধুর ভাব—
নাহি এ ভারতে আর।
রমণীর দাস হইয়া পুরুষ
সেবিছে চরণ তার॥
এক বিদ্যমানে, বিবাহ অপরে
করিছে যুবক যত।
স্বেচ্ছা-পরায়ণ যুবক যুবতী
সর্ব্বত পশুর মত॥

লজ্জা, সরলতা দিয়া বিসর্জ্জন
ভারত রমণী যত।
হইতেছে ক্রমে সভ্যতার ফলে—
ফিরিঙ্গী বিবির মত॥
পিঞ্জর হইতে হইয়া বাহির,
আসিছে আলোকে তারা;—
পুরুষের সঙ্গে, মনের আনন্দে
ভ্রমিছে পরির পারা!
সুরাপানে রত, বেশ্যা-অনুগত
স্বেচ্ছাচারী পুত্রগণ—
পরম-আরাধ্য পিতামাতাগণে
নাহি মানে কদাচন।
পূর্ব্বপুরুষেরা যে ধর্ম্ম মানিত,
সে ধর্ম্ম অসত্য কহে।
তাহাদের মতে পূর্ব্বপুরুষেরা
স্বর্গগামী কেহ নহে॥
দিনে দিনে দিনে নাস্তীকের দল
বাড়িছে—ভারত-ভূমে।
সমাজ বন্ধন দিনে দিনে দিনে
হতেছে শিথিল ক্রমে॥
ভাই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই ঠাঁই—
হইতেছে যথা তথা।
ভাইয়ের দুঃখে ভাই নহে দুঃখী!
অন্য অপরে কা কথা!!
পাশ্চাত্য শিক্ষার বিষময় ফলে—
আর্য্যের আর্য্যত্ব হায়!
অনার্য্য প্রভাবে, দিনে দিনে দিনে,
হতেছে বিলুপ্ত প্রায়॥
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবল তরঙ্গ
কার সাধ্য রোধিবারে?
বালীর বন্ধনে, সমুদ্রের গতি
কে কবে রোধিতে পারে?

জানি সত্য—তবু কার্য্যোদ্ধার হয়
জানিবে—একতা বলে,—
তৃণ রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করা যায়
যেমতি মাতঙ্গ দলে।
ভারত সন্তান, এক-মত হ'য়ে
যদ্যপি সচেষ্ট হয়,—
আর্য্যের আর্য্যত্ব উদ্ধার করিতে
কভু কি সক্ষম নয়?
পাশ্চাত্য শিক্ষার তরঙ্গের হ্রাস
অবশ্য করিতে পারে।
প্রেমের তরঙ্গে ভারত সন্তান
আবার ভাসিতে পারে॥
অতএব ওহে ভারত সন্তান!
মোহ নিদ্রা পরিহর।
আর্য্যের গৌরব উদ্ধার করিতে
হও বদ্ধ-পরিকর॥
প্রেমের তরঙ্গ বহিত যেমতি
পবিত্র ভারত-ভূমে—
বহুক আবার! জাগহে সকলে—
অচেত থেক না ঘুমে।

সাম্য ও বৈষম্য।

সাম্য সাম্য বলিয়া আজ কাল মধ্যে মধ্যে আন্দোলন হইতে দেখা যাইতেছে। ইহা আধুনিক ইংরাজী শিক্ষার ফল। ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে কোন সময়ে সাম্য-বাদ প্রচার হইয়াছিল, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইংরাজী শিক্ষার প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে মহাত্মা বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি যে সকল উপদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা অনেকটা সাম্যবাদীদিগের মতানুযায়ী সত্য বটে, তথাপি তাঁহাদিগের প্রচারের সহিত আধুনিক সাম্যবাদের অনেক প্রভেদ আছে। বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি যে সাম্য মত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধে—তাহার সহিত সমাজ-নীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি আর কোন বিষয়েরই সম্বন্ধ ছিল না। আধুনিক সাম্যবাদে শেষোক্ত বিষয়গুলিরই আলোচনা অধিক পরিমাণে দেখা যায়। এই মত প্রথমে ইউরোপ খণ্ডে ফরাসী পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক বিশেষরূপে প্রচারিত হয়। তাঁহারাই, বিশেষতঃ রুসো, "সমুদায় মনুষ্য সমান" এই মতের বিশেষ সমর্থন করেন এবং ইহার পুষ্টিসাধন করেন। তৎপর মার্কিন দেশে ইহার আলোচনা আরম্ভ হয়। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশেও এই মত এখন বিবেচিত হইতে আরম্ভ হইতেছে। এই মতের বাদ প্রতিবাদ করা, অথবা ইহার ইতিহাস প্রকটন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সাম্য ও বৈষম্যের মোটামুটি অর্থ ও প্রকৃতি কতকগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধারণকে বুঝাইবার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা।

আমরা অনেক সময়ে সাম্য সাম্য বলিয়া থাকি বটে, কিন্তু বিষয়টা প্রকৃত

পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। যে দিকে তাকাই—কি অন্তর্জগতে কি বহির্জগতে—সর্ব্বত্রই দেখি সাম্যের একান্তালীন অভাবঃ—সর্ব্বত্রই ঘোর বৈষম্য বিদ্যমান। ধনীতে নির্ধনে প্রভেদ, পণ্ডিতে মূর্খে প্রভেদ, বলবানে দুর্ব্বলে প্রভেদ, সাম্য কোথাও নাই। জাতিগত প্রভেদ আছে, ধর্ম্মগত প্রভেদ আছে, ভাষাগত প্রভেদ আছে, আচারগত প্রভেদ আছে, মানুষে মানুষে নানারূপ প্রভেদ আছে। তুমি আমি এক অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়া একই বিদ্যালয়ে একই শিক্ষকের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিলাম, কিন্তু কিছু দিন পরে তোমাতে আমাতে আকাশ পাতাল প্রভেদ হইয়া উঠিল। অনেক সময়ে ইহার কারণ আমরা বুঝিতে পারি না, চিন্তা করিয়াও স্থির করিতে পারি না। যমজ বালকদ্বয়কে বাল্যকালে দেখিলে পৃথক্ করা একরূপ অসাধ্য, ইহা অনেকেই দেখিয়াছেন। তাহাদের আকৃতি ত এক রূপ বটেই, তাহাদের কার্য্যপ্রণালীরও অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল, তাহারা আর একরূপ নাই—সংসারের ঘোর আবর্ত্তনে পড়িয়া তাহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হইয়াছে। পৃথিবীর পরিবর্ত্তন অবিরাম চলিতেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীস্থিত সমুদায় বস্তুর—কি সজীব কি নির্জীব—সমুদায়েরই পরিবর্ত্তন অনুক্ষণ হইতেছে। এক মুহূর্ত্তের জন্যও একটি বস্তুকে সমভাবে দেখা যায় না—ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সমভাবে থাকা অসম্ভব কথা। অধিক কি কালিকার "আমি"র সহিত আজিকার "আমি"র প্রভেদ। আগামী দিবসে আজ যেরূপ আছি সেরূপ থাকিব না—হয় উন্নতির দিকে অগ্রসর হইব, না হয় অবনতির পথে ধাবমান হইব।

আমরা সকলেই ঘটনার স্রোতে পড়িয়া বিষম-প্রকৃতিক হইয়া পড়িতেছি। আমরা এই পরিবর্ত্তন অনেক সময়ে অনুভব করিতে যদিও পারি না, কিন্তু পরিবর্ত্তন চলিতেছে। কি সামাজিক জগৎ, কি নৈসর্গিক জগৎ, সর্ব্বত্রই বৈষম্যের রাজত্ব দেখিতে পাই—সাম্য আদৌ দেখিতে পাই না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৈষম্যই জগতের নিয়ম—সাম্য ব্যভিচার মাত্র। বৈষম্য সর্ব্বত্র দৃশ্যমান—সাম্য কবির কল্পনা-সম্ভূত। বৈষম্য যেরূপ জগতের নিয়ম, সেইরূপ বৈষম্যকে সাম্যে পরিণত করিবার চেষ্টা ও প্রবৃত্তিও জগতের নিয়ম। যেখানে বৈষম্য আছে সেইখানেই যাহাতে বৈষম্য দূর হইয়া সাম্য সংস্থাপিত হয় তাহার কার্য্য চলিতেছে। এই নিয়মটির নাম সাম্য-প্রবণতা দেওয়া যাইতে পারে। বৈষম্যের তারতম্য অনুসারে ঐ চেষ্টার—সাম্য প্রবণতার তারতম্য হইয়া থাকে। যদি কোন কারণে বৈষম্য অত্যন্ত বেশী হয়, সেই বৈষম্য দূর করিয়া সাম্য-সংস্থাপনের চেষ্টাও সেই পরিমাণে বলবতী হইয়া থাকে। সামান্য বৈষম্য হইলে তাহা দূর করিবার যে কার্য্য হয়, তাহা আমরা অনেক সময়ে অনুভব করিতে পারি না; কারণ সেই কার্য্য অত্যন্ত ধীরে ধীরে হয়। পক্ষান্তরে বৈষম্য গুরুতর হইলে তাহা দূর করিবার কার্য্যও প্রবল হইয়া

থাকে, সুতরাং তাহা আমরা বিশেষরূপে অনুভব এবং প্রত্যক্ষীভূত করিতে পারি; কারণ সেই সকল কার্য্য অসাধারণ এবং প্রত্যক্ষফলপ্রদ। এই সকল অসাধারণ কার্য্যের সাধারণ নাম বিপ্লব দেওয়া যাইতে পারে। এই বিষয়ে অধিক বলিবার পূর্ব্বে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া এই নিয়ম দুইটি বুঝাইবার চেষ্টা করিব। প্রথমে যে দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইবে, তাহা প্রাকৃতিক জগৎ হইতে। ক্রমে সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয় হইতেও দৃষ্টান্ত দিয়া এই নিয়ম দুইটি বুঝাইতে চেষ্টা করিবার ইচ্ছা রহিল।

১। বায়ু।

বায়ুর চাপ (pressure) আছে তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। যখন বায়ু বহিতে থাকে, তখন এই চাপ আমরা বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারি। এই চাপ পরিমাপ করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র বহু দিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই যন্ত্র ইংরাজীতে ব্যারোমেটার (barometer) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় ইহাকে বায়ুমান যন্ত্র বলা যাইতে পারে। এই যন্ত্রের সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে, বায়ুর চাপ সর্ব্বত্র সমান নহে—কোন স্থানে বেশী, কোন স্থানে কম। সভ্য পৃথিবীর প্রধান সমুদায় স্থানেই বায়ুর চাপ এই যন্ত্র দ্বারা প্রত্যহ পরিমিত হইতেছে এবং আমরা জানিতে পারিতেছি চাপের সমতা নাই, ন্যূনাধিক্য আছে। দিবসের সমুদায় ভাগে কোন এক স্থানে বায়ুর চাপ সমান থাকে না—কোন ভাগে চাপ বৃদ্ধি হয়, কোন ভাগে কমে। সেইরূপ বৎসরের কোন ভাগে চাপের বৃদ্ধি হয়, কোন ভাগে হ্রাস হয়। অতএব এই যন্ত্রের সাহায্যে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, পৃথিবীর যে কোন স্থানই আমরা বিবেচনা করি না কেন, তথায় বায়ুর চাপ সমান থাকে না, নানা কারণে চাপের কমি বেশী হইতেছে। অর্থাৎ প্রকৃতিতে বায়ুর চাপ সম্বন্ধে আমরা সাম্য দেখিতে পাই না, বৈষম্য দেখিতে পাই।

বায়ুর চাপের হ্রাস বৃদ্ধি হয় কেন? এই প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। এই হ্রাস বৃদ্ধির অনেকগুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে উত্তাপই সর্ব্ব প্রধান। যে স্থান উত্তপ্ত, সে স্থানের বায়ু তাহার সংস্পর্শে উত্তপ্ত হয়। বায়ুর ধর্ম্ম এই যে তাহা উত্তপ্ত হইলেই বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সুতরাং লঘু হয়। যেমন কোন পাতলা বস্তু (যথা শোলা) জলের মধ্যে ডুবাইয়া দিলে তাহা ভাসিয়া উপরে উঠে, সেইরূপ বায়ু—সাগরে এই বায়ু লঘু হওয়ায় ভাসিয়া উপরে উঠিয়া যায়; সকলেই দেখিয়াছেন, কোন স্থানে অগ্নি লাগিলে উল্কা প্রভৃতি প্রথমে উপরে উঠিয়া যায়। তাহার কারণ এই যে, অগ্নির সংস্পর্শে উত্তপ্ত বায়ু বিস্তৃত এবং লঘু হইয়া উপরে উঠে; এই লঘু বায়ুর সহিত উল্কাও উপরে উঠিতে থাকে। যে স্থানের বায়ু এইরূপে লঘু হয় এবং উপরে উঠিয়া যায়, তথাকার বায়ুর চাপও কমিতে থাকে। বায়ুর চাপের হ্রাস বৃদ্ধির সমুদায় কারণ বিবৃতরূপে বুঝাইবার স্থান এবং প্রয়োজন বর্ত্তমান প্রবন্ধে নাই।

বায়ুর চাপের বৈষম্য থাকায় বায়ু বহিতে থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি বৈষম্যকে সাম্যে পরিণত করিবার চেষ্টা প্রকৃতির একটি নিয়ম। বায়ুর চাপের বিষমতা-ন্যূনাধিক্য হইলেই, যাহাতে এই ন্যূনাধিক্য দূর হইয়া সাম্য সংস্থাপিত হয়, তাহার কার্য্য হইতে আরম্ভ হয়। যে স্থানের বায়ুর চাপ অধিক সেই স্থানের বায়ু, যে স্থানের বায়ুর চাপ কম সেই স্থানে আসিতে থাকে। তাহার ফল এই হয় যে, পূর্ব্বোক্ত স্থানের বায়ুর চাপ কমে এবং শেষোক্ত স্থানের বায়ুর চাপ বাড়ে। যে পর্য্যন্ত উভয় স্থানের বায়ুর চাপের সমতা না হয়, সে পর্য্যন্ত এই বায়ু প্রবাহ চলিতে থাকে। সকলেই দেখিয়াছেন, কোন স্থানে অগ্নি লাগিলে তথায় চতুর্দ্দিক হইতে বায়ু বেগে বহিতে থাকে, এবং অগ্নির তেজ যত বেশী হয়, বায়ুর বেগও তদনুসারে বেশী হয়। যে স্থানে অগ্নি লাগে, চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুর চাপ হইতে সেই স্থানের বায়ুর চাপের হ্রাসই ইহার একমাত্র কারণ। বায়ুর চাপের সমতা রক্ষার জন্য বায়ুপ্রবাহ অনবরত চলিতেছে। নানা কারণে বায়ুর চাপ সর্ব্বদা অসম হইতেছে, সেই অসমতা দূর করিবার জন্য বায়ুও অনবরত বহিতেছে। আমরা যে স্থানকে নির্ব্বাত বলি, বাস্তব পক্ষে সে স্থান নির্ব্বাত নহে; তথায়ও চাপের অসমতা এবং বায়ুর গতি আছে। এই জন্য প্রাচীন ঋষিরা বায়ুকে সদাগতি বলিয়া গিয়াছেন।

আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে প্রধানতঃ দুইটি বায়ু-প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। শীতকালে উত্তর অথবা উত্তর-পূর্ব্ব দিক হইতে বায়ু বহিতে থাকে, এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে এইরূপ বায়ু প্রবাহের কারণ কি। শীতকালের দিবস রাত্রি অপেক্ষা অনেক ছোট এবং সেই সময়ে সূর্য্যের তাপও প্রখর হয় না। এই কারণে শীতকালে আমাদের দেশ অত্যন্ত শীতল থাকে, কিন্তু আমাদের দক্ষিণস্থ ভারত-সাগর অপেক্ষাকৃত অনেক গরম হয়। সুতরাং ভারত-সাগরের উপরিস্থিত বায়ু-রাশি উত্তাপে পাতলা হইয়া উপরে উঠিতে থাকে, এবং তথাকার বায়ুর চাপও কমিতে থাকে। বায়ুর চাপের এই হ্রাস কমাইয়া সাম্য সংস্থাপনের জন্য আমাদের উত্তরে স্থিত দেশ হইতে এবং আমাদের দেশ হইতে বায়ু দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। উত্তর প্রদেশ হইতে এই বায়ু বহে বলিয়া ইহা অত্যন্ত শীতল। গ্রীষ্মকালে কিন্তু ইহার ঠিক বিপরীত কার্য্য হয়। তখন আমাদের বাঙ্গালা দেশ ভারত-সাগর অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হয়; কারণ সেই সময় আমাদের দেশে দিনমান রাত্রি অপেক্ষা বড় হয়, এবং সূর্য্যের তেজও অত্যন্ত প্রখর হয়। কাজে কাজেই আমাদের দেশের বায়ুর চাপ কমিয়া যায়, এবং দক্ষিণ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। এই বায়ু গরম এবং সমুদ্র জলবাষ্পপূর্ণ। এইরূপ পৃথিবীর যে কোন অংশে হউক না কেন, যে যে প্রধান বায়ু-প্রবাহ প্রচলিত

আছে, তৎসমুদায়েরই এই একই কারণ। সর্ব্বত্রই বায়ু সাম্য রক্ষার জন্য অধিক-চাপ প্রদেশ হইতে অল্প-চাপ প্রদেশের অভিমুখে বহিতে থাকে।

বায়ুর চাপ-বৈষম্যের অবশ্য তারতম্য আছে। কখন চাপের প্রভেদ অত্যন্ত বেশী হয়, কখন কম হয়। যখন চাপের প্রভেদ অত্যন্ত কম, বায়ু তখন অতি ধীরে ধীরে বহিতে থাকে—হয়ত এত ধীরে বহিতে থাকে যে তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। প্রভেদ যত বেশী হয়, বায়ুর গতি এবং বেগও তত বেশী হয়। চাপের বৈষম্যের তারতম্য অনুসারে বায়ুর বেগেরও তারতম্য হইয়া থাকে। যদি কোন কারণে চাপের প্রভেদ অল্প সময় মধ্যে অত্যন্ত বেশী হয়, সেই প্রভেদ দূর করিবার জন্য বায়ুও অত্যন্ত প্রবলবেগে বহিতে থাকে। এইরূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে একটা বিপ্লব উপস্থিত হয়। বায়বীয় এই বিপ্লবের সাধারণ নাম ঝড়। যে দিন ঢাকা অঞ্চলে যে ভয়ানক ঝড় হইয়া প্রভূত ক্ষতিসাধন করিয়াছে, তাহা বোধ করি সকলেরই স্মরণ আছে। সংবাদপত্রে তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই বিবরণে প্রকাশ আছে যে, যে সমুদয় স্থান দিয়া ঝড় বহিয়াছিল, তথায় প্রাতঃকাল হইতে সমুদায় দিবস অসহনীয় গরম হইয়াছিল। এই অসহনীয় গরমে বায়ুর চাপও অতি অল্প সময়ের মধ্যে অবশ্য অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল। ইহা এই ভয়ানক ঝড়ের উৎপত্তির এক প্রধান কারণ। আমরা সাধারণতঃও দেখিতে পাই, যে দিবস গরম অত্যন্ত বেশী হয় সে দিবস বৈকালে বাতাসও বিলক্ষণ উঠে।

আমরা পূর্ব্বে যে বায়ুমান যন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা সম্যক্‌রূপে ব্যবহার করিলে ঝড় আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারা যায় এবং সাবধানও হইতে পারা যায়। ঐ যন্ত্রের দ্বারা পরিমাণ করিয়া যদি দেখা গেল এক স্থানের বায়ুর চাপ হঠাৎ অদূরস্থিত অন্য স্থানের বায়ুর চাপ অপেক্ষা কমিয়া যাইতেছে, তাহা হইলেই একটি ঝড় হইবার আশঙ্কা করা যাইতে পারে। এই কারণে এই যন্ত্র প্রধান প্রধান স্থানে রক্ষিত হয় এবং প্রত্যহ চাপের পরিমাণ লইয়া সাধারণে প্রকাশ করা হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে বোম্বাই সহরের উপকূলে যে ঝড় হইয়া অনেক জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছিল। সেই ঝড়ের আশঙ্কা পদার্থ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বায়ুমান যন্ত্রদ্বারা চাপ পরিমাণ করিয়া ঝড় হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ সকল দেখিতে পাইয়াছিলেন।

প্রহ্লাদের ধর্ম্মব্যাখ্যা।

ভগবদ্ভক্তি ও বিশ্বাসের জ্বলন্ত চিত্র মানব সমাজের নিকট অঙ্কিত করিবার জন্য পৌরাণিকেরা যতগুলি আখ্যায়িকার বর্ণনা করিয়াছেন প্রহ্লাদের সুললিত আখ্যায়িকাই তন্মধ্যে আমার সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও মধুময় বলিয়া বোধ হয়। দৈত্যকুল অহঙ্কারে আস্ফালন করিয়া দেবতার সিংহাসন বিকম্পিত করিতেছে, স্বর্গলোক হইতে প্রীতি পবিত্রতা, সুখ ও শান্তি বিতাড়িত করিয়া সেই পারিজাত কুসুমামোদিত নন্দনবনে পাপের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাতে অসুর-প্রতাপশালী অবিশ্বাসকে বসাইয়াছে—পৃথিবী হইতে পরমেশ্বরের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিবার জন্য দৈত্যরাজ অভিধান হইতে "হরি" শব্দ পর্য্যন্ত উঠাইয়া দিয়াছেন, আপনার ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে আপনি বিভোর হইয়া ভগবানের নাম শুনিবামাত্র হিরণ্যকশিপু বলিয়া উঠিতেছেন—

"পরমেশ্বরসংজ্ঞো হজ্ঞ কিমন্যোমযাবস্থিতে।"

রে মূঢ়! আমি থাকিতে পরমেশ্বর বাচক আর কি থাকিতে পারে—সেই ঘোর অহঙ্কারপূর্ণ উন্মত্ত নাস্তিকতার প্রখর রাজত্বের প্রবল প্রতাপান্বিত হিরণ্যকশিপুর বংশে প্রহ্লাদের জন্ম হইল। এক দিকে নরকের বীভৎস চিত্র দেখাইয়া তৎপার্শ্বে স্বর্গের বিমলজ্যোতি রাখিলে, এক দিকে দগ্ধমরুভূমির উত্তপ্ত বালুকাস্তর সাজাইয়া তাহার পার্শ্বেই স্বাদুশীতল জলধারা ও বৃক্ষচ্ছায়া রাখিলে যেমন হয়, এক দিকে হরি অরি হিরণ্যকশিপু, আর একদিকে ভক্তাদর্শ প্রহ্লাদকে রাখিয়া পৌরাণিক কবি তাহাই দেখাইয়াছেন।

প্রহ্লাদের জীবনকাহিনী, তাহার আশ্চর্য্য ভক্তিলীলা, অচল অটল বিশ্বাস ও পরীক্ষার কথা আমাদের দেশে না শুনিয়াছেন এমন লোক নাই—সে সকল পুরাতন কথা আজ আর লিখিব না। বালক প্রহ্লাদ গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে করিতে অবসর সময়ে গুরু আশ্রমে না থাকিলে কেমন করিয়া সময় কাটাইতেন, মূল আখ্যায়িকা হইতে তাহারই কিয়দংশ পাঠককে উপহার দিতেছি। গুরু যখন আশ্রম হইতে কার্য্যোপলক্ষে দূরে থাকেন, অনধ্যায়কালে সাধারণতঃ ছাত্রগণ যখন কোলাহল ও বাল্যক্রীড়ায় কর্ত্তন করে, প্রহ্লাদ তখন সুযোগ পাইয়া সহাধ্যায়ী দৈত্য বালককে লইয়া আশ্রমের শান্তশীতল তরুতলে বসিয়া মধুর হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন—তাহারই এক দিনের সুললিত উপদেশ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

"শ্রূয়তাং পরমার্থো মে দৈতেয়া দিতিজাত্মজাঃ।
ন চান্যথৈতন্ মন্তব্যং নাত্র লোভাদিকারণম্॥"

হে দৈত্যবালকগণ! আমার কাছে পরমার্থ-কথা শ্রবণ কর। আমি যাহা বলিব তাহা মিথ্যা মনে করিও না এবং গুরু পুরোহিতের মত দক্ষিণাদি পাইবার লোভে পড়িয়াও আমি উপদেশ দিতে আসি নাই। একজন বালকের মুখে এই

মুখবন্ধ শুনিয়া বৃদ্ধেরও কৌতূহল হয়, বালকবৃন্দের ত হইবারই কথা। দলে দলে দৈত্যবালক আসিয়া চারি দিকে ঘেরিয়া বসিল, আবার প্রহ্লাদের অমৃতময়ী কথা আরম্ভ হইল।

জন্ম বাল্যং ততঃ সর্ব্বো জন্তুঃ প্রাপ্নোতি যৌবনম্।
অব্যাহতৈব ভবতি ততোঽনুদিবসং জরা॥
ততশ্চ মৃত্যুমভ্যেতি জন্তু দৈত্যেশ্বরাত্মজাঃ।
প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে চৈতৎ অস্মাকং ভবতাং তথা॥

তোমরা আজ বালক, তাই বলিয়া মনে করিওনা যে এই ধুলাখেলাময় শৈশবই জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। সকলেই জন্মকালে বালকই থাকে, কিন্তু সকলেই কিছু দিন পরে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইহা যেমন প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম, সেইরূপ অব্যাহত প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে আবার যৌবনান্তে সকলকেই জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্য দশায় পতিত হইতে হয়—তাহার পর, হে দৈত্যাত্মজগণ—বার্দ্ধক্যের পর জীবমাত্রকেই মৃত্যুমুখে পড়িতে হইবে, ইহা তোমার আমার সকলেরই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়।

এই বাল্যযৌবনজরামৃত্যুময় জন্ম গ্রহণ করিয়া অলীক সংসার-সুখের আশায় জন্মতিথি হইতে শ্মশানযাত্রা পর্য্যন্ত যে অনিয়ত বেগে কেবলই সুখ সুখ বলিয়া ধাবিত হইতেছে—প্রকৃত সুখ কোথায়? সহস্র সহস্র লোকে যে অনলাভিমুখী পতঙ্গের মত নিশিদিন সুখাভিলাষে ছুটিতেছে, তোমরা কি কেহ সেই সুখ পাইয়াছ? কোথায় পাইবে—

"সমস্তাবস্থকং তাবৎ দুঃখমেবাবগম্যতাম্।"

জানিয়া রাখ যে, এই জীবনের বাল্যযৌবনাদি সমুদায় অবস্থাই দুঃখমূলক, ইহাতে সুখশান্তি নাই।

সে কি কথা? এই যে আমরা সুমিষ্ট লড্ডুক খাইতেছি, সুচারু বসনভূষণ পরিতেছি; আনন্দে নাচিয়া কুঁদিয়া ফিরিতেছি, ইহা যদি সুখ না হয় তবে সুখ আবার কাহাকে বলে? বালকগণের এই গুরুতর আপত্তির উত্তরে প্রহ্লাদ বলিতেছেন,—

ক্ষুৎতৃষ্ণোপশমম্ তদ্বৎ শীতাদ্যুপশমম্ সুখম্।
মন্যতে বালবুদ্ধিত্বাৎ দুঃখমেব হি তৎপুনঃ॥

ভাই! তোমরা যে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উপশমে শীত ও গ্রীষ্মের উপশমে সুখ পাইতেছ বলিয়া ভাবিতেছ, উহা তোমাদের বালকবুদ্ধি বলিয়া সুখ মনে হইতেছে, বাস্তবিক উহাই দুঃখ। কেন যে উহা দুঃখ তাহা পরে বুঝাইতেছি, দুঃখও যে সময়ে সময়ে লোক বিশেষের নিকট সুখ বলিয়া বোধ হয় তাহার দৃষ্টান্ত আগে আলোচনা কর। দেখ—

"অত্যন্তস্তিমিতাঙ্গানাং ব্যায়ামেন সুখৈষিণাম্।
ভ্রান্তিজ্ঞানাবৃতাক্ষানাং প্রহারোঽপি সুখায়তে॥

যাহাকে আমরা ক্লেশকর বেত্রাঘাত ও মুষ্ট্যাঘাত মনে করি, বাতাদি রোগে জড়ীভূত লোকেরা সেই প্রহার সহ্য করাই সুখ বলিয়া মনে করে, এবং মোহ-কলুষিত দৃষ্টি—কামি জন, যাহাকে সাধারণে মৃত্যুবৎ অপমানজনক দুঃখ মনে করে, সেই প্রণয়কুপিত-কামিনীনূপুররণৎকার-চরণ-প্রহারকেও পুষ্প-

বৃষ্টির ন্যায় সুখকর মনে করে। তুমি সুখকর মনে করিলেই সুখকর হয় না, পদার্থ যদি সুখকর না হয় তোমার ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতার জন্য সে সুখকর হইবে কেন? অগ্নির যদি নিজের শীতলতা গুণ না থাকে তুমি ভ্রান্তিবশতঃ তাহাকে শীতল মনে করিয়া তাহাতে হাত দিলে তোমার হাত পুড়িবে না কি? সংসারে আদৌ সুখ নাই, তুমি মনে মনে কল্পনা করিলে ত আর সুখ পাইবে না?

সুখ সজীব ও নির্জীব। কোন দুঃখ নাই নিরবচ্ছিন্ন সুখ, মেঘমুক্ত আকাশের বিমল জ্যোৎস্নার মত, সে এক শ্রেণীর সুখ তাহাতে প্রফুল্লতা আছে, সজীবতা আছে; সে সুখের অধিকারী বুঝিতে পারে যে সে সুখভোগ করিতেছে, যে তাহার সংস্পর্শে আসে সেও বুঝিতে পারে যে লোকটা যথার্থই সুখী। এই শ্রেণীর সুখকে সজীব সুখ বলিতেছি—ইহা জগতে দুর্লভ, সহস্রে এক জনের ভাগ্যেও বুঝি সংঘটন হয় না, ইহা নিরবচ্ছিন্ন মানসিক সুখ। যে সুখের অধিকারী হইয়া মানব হাসিতে হাসিতে মৃত্যুযন্ত্রণাও সাদরে আলিঙ্গন করিতে পারে, ইহা সেই অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক সুখ। কয় জনে ইহার অধিকারী। আর যাহাকে তুমি আমি সুখ বলিয়া মনে করি, যাহার প্রলোভনে কোটি কোটী নরনারী নিত্য সংসারের মরীচিকায় পথভ্রান্ত হইয়া ফিরিতেছে, তাহা দুঃখনিবৃত্তিজনিত মানসিক আরামের বিকৃত অবস্থা মাত্র, ইহা ইন্দ্রিয়ভোগ্য,—রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দ[illegible] অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা শরীর[illegible] দ্বারা উপভোগের বিষয়, সুখনামক নির্জীব অবস্থা মাত্র। ক্ষুৎপিপাসাশান্তিজনিত শীততাপোপশমজনিত, রোগশোকনিবৃত্তিজনিত এই নির্জীব সুখ শরীরের ও প্রাকৃতিক নিয়মের একটা অবশ্যম্ভাবি ফল মাত্র। ইহা চক্রবৎ পরিবর্ত্তন করে, আজ সুখ কাল দুঃখ, ইহাই ইহার প্রকৃতি। যদি এই নির্জীব শারীরিক সুখকেই সুখ মনে করিয়া সংসারকে সুখভূমি ও জীবনকে সুখপাদপ মনে কর, তবে তোমার মত মতিভ্রান্ত আর কে আছে? শরীরই এই শ্রেণীর সুখের ভোক্তা, আধার ও মূল। কিন্তু শরীরে কি সুখ আছে?

ক শরীরমশেষাণাং শ্লেষ্মাদীনাং মহাচয়ঃ।
ক কান্তি শোভা সৌরভ্য কমনীয়াদয়ো গুণাঃ॥

এই শরীর ত অশেষ শ্লেষ্মাদি ক্লেদ কর্দ্দমের সঞ্চিত স্তূপ, ইহাতে কান্তি শোভাদি কমনীয় গুণ কোথায়? তুমি সুরূপ বলিয়া দর্পণে আপনার প্রতিফলিত সৌন্দর্য্য দেখিয়া হাসিয়া আকুল হইতেছ, কিন্তু উহারই অভ্যন্তরে যে গলিত কুষ্ঠের কৃমিকীটপূর্ণ ক্লেদরাশি সঞ্চিত আছে, তাহা কি দেখিতেছ না? মানব শরীর যে সকল উপাদানে গঠিত, যে সকল উপাদানে নিত্য পরিপুষ্ট ও যে সকল উপাদানে চরমে পরিণত হয়, তাহার কোনটিতে শোভা সৌন্দর্য্য আছে বল? কেবল পঞ্চভূতে গঠিত, পঞ্চভূতে পরিপুষ্ট ও পঞ্চভূতে পরিণত—ইহাই মানবশরীরের আদি মধ্য ও অন্ত। এই শরীর লইয়া যদি সুখ হয়, এই—

মাংসাস্থিরক্তপূয়বিণ্মূত্র স্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো নরকে ভবিতাপি সঃ॥

মাংস রক্ত মলমূত্র স্নায়ু মজ্জা ক্লেদপূর্ণ শরীর লইয়া যদি তুমি সুখ বোধ কর, তবে বুঝিব যে নরককুণ্ডই তোমার নিকট প্রিয় পদার্থ।

নির্জীব সুখ শুধু দুঃখনিবৃত্তি হইতেই উদ্ভূত হয়। শীতে থর থর করিয়া কাঁপিতেছ, দাঁতে দাঁতে লাগিতেছে, বুকের রক্ত জমিয়া আসিতেছে, শীততাপে হাত পা ফাটিয়া রুধিরধারা ছুটিতেছে,—এই অসহ্য ক্লেশকে কায়ক্লেশে কোনরূপে নিবারণ করিয়া এক বোঝা গরম কাপড় ঘাড়ে চাপাইয়া শাল বনাতের চোগা চাপকান আঁটিয়া তুমি মনে করিতেছ যে তুমি সুখভোগ করিতেছ! বাস্তবিক উহার মধ্যে সুখ-কর্ত্তৃত্ব নাই, দুঃখনিবারকত্ব মাত্র আছে, উহা সুখ নহে, কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য দুঃখনিবৃত্তি মাত্র। উহাতে যে সুখকর্ত্তৃত্ব নাই, একটী সহজ দৃষ্টান্ত আলোচনা করিয়া দেখ। যদি শীত না থাকিত, কে বল এই কাপড়ের বোঝা বহিতে চাহিত, আর কে বল তখন সেই গরম কাপড়ের বোঝা বহা কষ্টকর মনে না করিত? যে বসন ভূষণ শীতকালে এত প্রিয় বলিয়া, সুখকর বলিয়া, আদরে শরীরে বহন করিতেছ, দেখ গ্রীষ্মকালে একদণ্ড তাহা তোমার ঘাড়ে চাপাইয়া রাখিলে কত না ক্লেশ!

অগ্নেঃ শীতেন তোয়স্য তৃষা ভক্তস্য চ ক্ষুধা।
ক্রিয়তে সুখকর্ত্তৃত্বং তদ্বিলোমস্য চেতরৈঃ॥

আগে শীত আছে বলিয়া বহ্নি সেবন সুখকর, আগে পিপাসা আছে বলিয়া জলপানে আরাম, আগে ক্ষুধা আছে বলিয়া আহারে পরিতোষ—যদি পূর্ব্বগামী শীত, তৃষ্ণা বা ক্ষুধা না থাকিত, অগ্নি, জল ও অন্নের মধ্যে এমন কি আছে যে তোমাকে সুখ দিতে পারিত? শারীরিক সুখ কোন পদার্থ বিশেষের মধ্যে নাই—আহার বিহার, বসনভূষণ যাহা কিছু সংসারের সুখের উপাদান বলিয়া লোকে মনে করে তাহারা সুখকর নহে।

আহার বিহার জনিত সাংসারিক সুখের ত এই দশা। সংসারের আর একটী সুখ আছে। তাহা যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শরীর সংসৃষ্ট নহে কিন্তু তাহাও শরীর সাপেক্ষ বটে। পুত্র কন্যা স্ত্রী পরিজন বন্ধু বান্ধব লইয়া আমরা অনেক সময়ে মনে করি ইহা জীবনের অক্ষয় সুখের ভাণ্ডার! কিন্তু ভাবিয়া দেখ পুত্র কলত্র লইয়া কয়জনে সজীব চিরস্থায়ী সুখের অধিকারী হইয়াছে?

সংসার রোগ শোক জরা মৃত্যুর লীলাভূমি। এখানে জন্মোৎসবের আনন্দ কোলাহল আছে, আবার সেই গৃহেই শোকের পাষাণভেদী আর্ত্তনাদ আছে, এখানে স্বাস্থ্যের উৎফুল্লতা আছে, আবার সেই জীবনেই রোগের দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণার মর্ম্ম বেদনা আছে।

"আজ পুত্রের আলিঙ্গন, কালি তার বিসর্জ্জন, আজ প্রিয়-প্রেমালাপ, কালি বিলাপ কেবল!!"—বাস্তবিক সংসারের এই দশা! এমন কোন্ পরিবার আছে,

যেখানে নিরবচ্ছিন্ন জন্মোৎসবের আনন্দ কোলাহলই উঠিতেছে, শোকের আর্ত্তনাদ নাই; এমন কোন্ শরীর আছে যেখানে অনিয়ত বেগে স্বাস্থ্যের উৎফুল্লতাই আছে, রোগের মলিনতা নাই? আত্মীয় প্রিয় পরিজন লইয়া প্রকৃত সুখ কে পাইয়াছে? বরং—

"যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ॥"

লোকে যতই আপনার প্রিয়ঙ্কর সম্বন্ধ সংসারে স্থাপন করিতে থাকে, ততই তাহার নিজ হৃদয়ে (ভবিষ্যৎ) শোকের কীলক রোপণ করিতে থাকে। বুকের মধ্যে যদি লৌহশলাকা বিদ্ধ হয়, যতক্ষণ তাহা না তুলিয়া ফেলা যায় ততক্ষণ সহসা বেদনা অনুভূত হয় না, অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, যুদ্ধভূমিতে শত শত শলাকা-বিদ্ধ হইয়াও রণবীরেরা সহাস্য-বদনে যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু যখনই সেই শেল তুলিতে যাও, তখনই রুধিরধারা, তখনই মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা, হয়ত শেল দৃঢ় বিদ্ধ হইলে তাহাতেই মৃত্যু! সংসারে পুত্র কলত্রের মমতার সুখও ঠিক এইরূপ। এক একটী পুত্র মিত্র এক একটী শাণিত শেলের মত হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে, সেই শত শত স্নেহের শেল বুকের মধ্যে চালিয়া রাখিয়া সংসারের যুদ্ধ যুঝিতেছি, সহাস্য মুখে সংসারের যন্ত্রণায় ভ্রূকুটি করিতেছি। কিন্তু সর্ব্বজীবচিকিৎসক মৃত্যু আসিয়া যখন প্রাণের সেই চির-পোষিত এক একটী শেল উঠাইতে থাকে, হৃদয় চিরিয়া হৃদয়-নিহিত স্নেহের শল্য দূরে অজ্ঞাত রাজ্যে ফেলিয়া দিতে আরম্ভ করে, ভুক্তভোগী জানেন সে কি যন্ত্রণার ব্যাপার। সংসার সুখের এই পরিণাম, অতএব ভাই! অনন্ত দুঃখাস্পদ এই ভবসমুদ্রের একমাত্র কর্ণধার ভগবানের শরণাগত হও। তাহাই প্রকৃত সুখ, প্রকৃত শান্তি।

কিন্তু তোমাদিগকে এত কথা বলিতেছি কেন? তোমরা বালক, মনে করিতেছ এ সকল কথা তোমাদের জন্য নহে, ইহা কেবলমাত্র অশীতিপরায়ণ বৃদ্ধেরই চিন্তার বিষয়। ইহাই যে জীবনের একটী গুরুতর ভ্রম, তাহা বলিবার জন্যই এত কথা বলিলাম।

মা জানীত বয়ং বালা দেহী দেহেষু শাশ্বতঃ।
জরাযৌবনজন্মাদ্যা ধর্ম্মা দেহস্য নাত্মনঃ॥

মনে করিও না আমরা বালক, এ সকল কথায় আমাদের আবশ্যক কি? জীবাত্মা দেহের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয়রূপে বর্ত্তমান, জরা যৌবন জন্মাদি পরিবর্ত্তন দেহের ধর্ম্ম-মাত্র, আত্মার ধর্ম্ম নহে। আত্মার ও দেহের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এত ঘনিষ্ঠ যে অনেক সময়ে আমরা শরীরকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়া বসি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আত্মা শরীর নহে, চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা শরীরের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গও নহে, তাহা শরীর গৃহের অতীন্দ্রিয় গৃহস্থ, দেহপিঞ্জরের অমর বিহঙ্গম। শরীর জড়, আত্মা জ্যোতির্ম্ময় তৈজস পদার্থ, শরীরের বৃদ্ধি আছে, ক্ষয় আছে, বিনাশ আছে—জন্ম আছে, যৌবন আছে, মৃত্যু আছে, আত্মার তাহা কিছুই নাই। সুতরাং বালকবৃদ্ধ সকলেই যখন আত্মার অধিকারী, তখন আত্মার মঙ্গলা-

মঙ্গলের কথা সকলেরই সমান চিন্তার বিষয়। বালক বৃদ্ধ সকলেই শরীরের অধিকারী বলিয়া আহার নিদ্রা সকলের পক্ষেই যেমন অত্যাবশ্যকীয়, কেবল পরিমাণের তারতম্য ভিন্ন আবশ্যকতার কমি বেশী নাই, সেইরূপ আত্মার অন্ন পান ও সকলের পক্ষেই তুল্যরূপে আবশ্যকীয়, আর বাল্য কাল হইতে এই বিষয়ের শিক্ষা না হইলে ইহার শিক্ষা হয় না।

বালোঽহং তাবদিচ্ছাতো যতিষ্যে শ্রেয়সে যুবা।
যুবাহং বার্দ্ধকে প্রাপ্তে করিষ্যাম্যাত্মনো হিতম্॥
বৃদ্ধোঽহং মম কর্ম্মাণি সমস্তানি ন গোচরে।
কিং করিষ্যামি মন্দাত্মা সমর্থেন ন যৎকৃতম্॥

বাল্যকালে মনে হয় এখন আমি বালক, ধুলাখেলা ছাড়িয়া পরকাল চিন্তা আমার শোভা পায় না; এখন ত যথেচ্ছা বিচরণ করি, যখন যুবা হইব, মানুষ হইব, তখন আত্মহিত চিন্তা করিব। যখন সেই প্রবল প্রবৃত্তি তরঙ্গে ভাসমান যৌবন আসিয়া উপনীত হয়, তখন মনে হয় বৃদ্ধকালে বসিয়া বসিয়া শেষ জীবন আত্ম চিন্তায় কাটাইলেই হইবে, এ সুখের যৌবন কেন বৃথায় কাটাইব? কিন্তু হায়! অব্যাহতগতিতে সেই অবশ্যম্ভাবি বার্দ্ধক্য যখন আসিয়া উপনীত হয়, যৌবনের উদ্যম ও উৎসাহ যখন ফুরাইয়া যায়, ইচ্ছা করিলেও কার্য্যের যখন আর স্ফূর্ত্তি থাকে না, তখন মনে হয় হতভাগা আমি! সারা জীবন শক্তি সামর্থ্য থাকিতে যাহা করি নাই, আজ কেমন করিয়া তাহা করিব? এইরূপে দিন যায়, এইরূপে বাল্য যৌবন যায়, এইরূপে অশ্রু সলিল সিক্ত বার্দ্ধক্যের পর মৃত্যু আসিয়া জীবননাট্যের শেষ যবনিকা টানিয়া দেয়—সব অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায়!!

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গতবারে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনেক পরীক্ষার্থী অনুত্তীর্ণ হওয়াতে এরূপ হইবার কারণানুসন্ধানের জন্য নাকি এক কমিটি বসিয়াছিল, সংপ্রতি তাহার ফল বাহির হইয়াছে। বৎসর ভরিয়া ক্লাসে যে অনুশীলন হয়, তাহা এবং নির্ব্বাচন পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইলে তবে কোন ছাত্র প্রবেশিকায় অধিকার পাইবে। প্রথমটি যদি সন্তোষজনক হয়, কিন্তু বিশেষ প্রতিবন্ধকে যদি কোন বালক নির্ব্বাচন পরীক্ষায় উপস্থিত না হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার ভাগ্যে কি হইবে, এ কথা স্পষ্ট করিয়া বোধ হয় বলা হয় নাই। আর একটি নিয়ম হইয়াছে, যদি কোন বিদ্যালয়ের বালক ক্রমাগতই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অসন্তোষজনক ফল দেখা-

হইতে থাকে, তাহা হইলে সে বিদ্যালয়কে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্র পাঠাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে।

আমরা ভাবিয়াছিলাম এই কমিটি দ্বারা পরীক্ষকদিগের খামখেয়ালি কতকটা সংযত হইবে, পরীক্ষা-নীতির কিয়ৎ পরিমাণে সংশোধন হইবে, অপরীক্ষিত কাগজ ফেরত দিয়া ঐ সকল কাগজ পরীক্ষিত হইয়াছে বলিয়া যাহাতে কোন পরীক্ষক প্রকাশ করিতে না পারেন এরূপ কোন উপায় অবলম্বিত হইবে, আর ভবিষ্যতে কোন পরীক্ষার্থী যাহাতে সংস্কৃতে পরীক্ষা দিয়া গণিতে অনুত্তীর্ণ না হইতে পারে, তাহার উপযুক্ত বিধান বিহিত হইবে। কিন্তু আমরা যতদূর দেখিতেছি, তাহাতে এ সকল বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ কমিটিতে উঠিয়াছিল বলিয়া ত বোধ হইল না। যদি না হইয়া থাকে, তবে বড়ই দুঃখের বিষয়। সাধারণে একবাক্য হইয়া এ সকল বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য অনুরোধ করিতেছে, কিন্তু কমিটির সদস্যগণ সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করিতেছেন না! তাঁহারা জানেন, সাধারণের চিৎকারে কর্ণপাত করিবার তাঁহাদের কোন প্রয়োজন নাই, কারণ তাঁহাদের এ সৌভাগ্য-সম্ভোগে সাধারণের কোন হাত নাই। যদি তাহা থাকিত, তাহা হইলে ১৮৮৯ সালের সুপ্রসিদ্ধ পরীক্ষা-বিড়ম্বনা এরূপ নিরাপদে উদ্ধার পাইত না।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি প্রস্তাব ছিল, সে প্রস্তাবগুলি এই;—

(১) উর্দ্ধতন পরীক্ষাতে যেমন শতকরা কোন নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক দিনে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকিলেই যে কোন ছাত্র পরীক্ষা দিতে পারে, প্রবেশিকা পরীক্ষাতেও সেই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হউক।

(২) প্রতি বৎসর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা স্থিরীকৃত হইয়া গেলে, তিন কি চারি সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষার কাগজ দেখা শেষ হইয়া যাইতে পারে, এরূপ সংখ্যক পরীক্ষক নিযুক্ত করা হউক।

(৩) যে বিষয়ে যত জন পরীক্ষক থাকিবেন, সেই বিষয়ের প্রশ্নগুলি ততভাগে বিভক্ত ও প্রত্যেক ভাগের প্রশ্নগুলির উত্তর এক একখানি স্বতন্ত্র খাতায় লিখিত হইয়া এক এক ভাগ এক এক নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষকের নিকট প্রেরিত হউক।

(৪) বার্ষিক পরীক্ষা ছাড়া বৎসরের মধ্যে প্রতি তিন মাস পরে পরে আরও তিনবার পরীক্ষা হউক। যে ছাত্র নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতরূপে অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়াছে, কোন বিদ্যালয়ে না পড়িলেও কেবল ফিস্ দিয়া এই সকল ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে তাহার অধিকার থাকিবে।

(৫) কোন ছাত্র একবার যে বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হইয়াছে, পুনঃপরীক্ষার সময়ে কেবল সেই বিষয়েই পরীক্ষা দিতে সে বাধ্য হউক।

(৬) কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পরীক্ষায় ক্রমান্বয়ে অকৃতকার্য্য হইলে সেই বিদ্যালয়কে ছাত্র প্রেরণের অধিকার হইতে বঞ্চিত না করিয়া তাহার শিক্ষক-পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা হউক।

আমাদের প্রস্তাবিত এই কথা কয়টি যে দোষ-শূন্য, এ কথা বলিবার সাহস অবশ্যই আমাদের নাই; কিন্তু ইহার দোষগুণ কে বিচার করে? আমরা বুঝিতে পারিতেছি, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এ দুর্দ্দশা দূর করিবার এক-মাত্র উপায় নির্ব্বাচন-প্রথার প্রবর্ত্তন। যত দিন এই প্রথা প্রবর্ত্তিত না হইবে, তত দিন সাধারণের কথা কেবল অরণ্যে রোদনই থাকিবে! বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হিতার্থিগণ! একবার এজন্য লাগিয়া পড়িয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

উপকথা।

৪। একতা।

মানব দেহে বড় গোলমাল বাঁধিয়াছে। হস্ত পদ প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল পেটের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের বিবেচনায় পেট কোন কার্য্যই করে না, কেবল বসিয়া থাকিয়া আহার গ্রহণ করে। এত দিবস সকলে একতা বন্ধনে বাঁধা ছিল, সকলের মধ্যেই ভ্রাতৃভাব ছিল, নির্ব্বিবাদে যথানিয়মে কার্য্য চলিয়া যাইত। হঠাৎ কি কারণে বলিতে পারি না, সেই একতা বন্ধন ছিঁড়িয়াছে, সকল ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়াছে, আর কেহই কাহার ও অধীন থাকিবে না, সকলে স্ব স্ব প্রধান হইবে।

পদ বলিল, "আমি আর পেটের অধীন থাকিব না। সে কোন কার্য্য করে না, অথচ আমাকে সমস্ত দিন খাটিতে খাটিতে হয়রাণ হইতে হয়। আমার ছোট ছোট পুত্র, অঙ্গুলিগুলি বেদনায় কাতর হইয়া পড়ে; পেট তাহাদিগের প্রতি একবার ও তাকায় না। কেন আমি অনর্থক তাহার আহার যোগাইয়া মরি?"

উরু বলিল "পদ ঠিক কথা বলিয়াছে, যত পরিশ্রম সমস্তই আমাদের; পেট কেবল বসিয়া বসিয়া খায়। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আর পেটের জন্য আহার যোগাইব না।"

হস্ত বলিল, "তোমরা সকলে হাঁটিয়া হাঁটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড় সত্য; কিন্তু আমি যাবদীয় জিনিসপত্র আনয়ন করি, তাহাতে আমার কি পরিমাণ পরিশ্রম হয় বুঝিতে পার। একাল পর্য্যন্ত পেটকে আমিই ভরণপোষণ করিয়াছি; এমন কি আহার মুখে তুলিয়া পর্য্যন্ত দিয়াছি। পরের জন্য আমি আর এত ক্লেশ সহ্য করিতে পারি না। আপনার আহার পেট আপনিই সংগ্রহ করিয়া লউন। নতুবা আমার দ্বারা আর তাঁহার কোন উপকার হইবে না।"

বাহু বলিল "হস্তের যে দশা আমারও তাহাই। হস্ত আহার ধারণ করে, আমি উত্তোলন করিয়া তাহা মুখে তুলিয়া দেই। আমি অনুগ্রহ করিয়া আহার তুলিয়া না দিলে পেটের কোনই উপায় নাই।"

মুখ বলিল, "আমার কষ্ট আরও ভয়ানক। আমি ক্ষুদ্রপ্রাণী, পেটের আহার গ্রহণ করার জন্য আমাকে কতবার যে হা করিতে হয় তাহার স্থির নাই। বারবার হা করিতে করিতে আমার চোয়ালের বেদনা হইয়া উঠে, তাহাতেও নিস্তার নাই। আহার অধঃকরণ করিবার সময় এক কষ্ট। পেটের অনুরোধে এই দ্বিবিধ কষ্ট আমাকে ভোগ করিতে হয়। তোমরা সকলে আমার অপেক্ষা বলশালী, আমি ক্ষুদ্রজীবী, আমি আর কত কাল সহ্য করিব।"

এতক্ষণ দন্ত, জিহ্বা প্রভৃতি কোন কথাই বলে নাই। তাহারা সকলে চুপ করিয়া এক কোণে বসিয়া ছিল এবং কে কি বলে তাহাই শুনিতেছিল। জিহ্বা সময় পাইয়া আপন বক্তব্য বিষয় বলিবার জন্য প্রস্তুত হইলে, দন্ত তাহাকে চুপে চুপে কি কি কথা বলিয়া দিল। তখন জিহ্বা বলিতে লাগিল :—

"আমি মুখ অপেক্ষাও ক্ষুদ্রপ্রাণী। পেট যাহা আহার করেন, তাহার রসাস্বাদন আমাকে করিয়া দিতে হয়। ভাল ভাল দ্রব্য আহার করিলে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু সময়ে সময়ে এমন পদার্থও আস্বাদন করিতে হয় যে, তাহার গন্ধে আমাকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অচৈতন্য করিয়া রাখে। তিক্ত, অম্বল, ঝাল প্রভৃতি আস্বাদন করিতে করিতে আমি হয়রাণ হইয়াছি। পূর্ব্বে জল, দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন তরল পদার্থ পেট গ্রহণ করিতেন না, কিন্তু এক্ষণে আবার কি সখ করিয়া কি এক রকম তরল পদার্থ আহার করিতেছেন, তাহার জ্বালায় আমি অস্থির। এইত গেল আমার কষ্ট। দন্ত, ঘায়ের বেদনায় পড়িয়া আছে, কথা কহিতে পারিতেছে না; আমাকে বলিতে বলিয়াছে যে পেট সময়ে সময়ে কঠিন দ্রব্য আহার করায় তাহাদের মধ্যে একটী ভাঙ্গিয়া গিয়া লীলা সম্বরণ করিয়াছে। অন্যান্য সকলেরও গোড়া ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে এবং ভয়ে নড়িতেছে ও কাঁপিতেছে। আমাদের সকলের বিশেষ অনুরোধ, ইহার একটা প্রতিবিধান করিতে হইবে।"

এইরূপে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলে আপন আপন দুঃখ জ্ঞাপন করিলে স্থির হইল যে পেটের আহারের জন্য আর কেহই চেষ্টা করিবে না। পদ আর আহার অন্বেষণে বহির্গত হয় না, হস্ত আহার তুলিয়া দেয় না, মুখ ব্যাদন করে না, দন্তও চর্ব্বণ করিতে অস্বীকার।

পেট মধ্যস্থলে বসিয়া থাকিয়া সমস্ত শুনিল ও আপন মনে হাঁসিতে লাগিল। সে কাহাকেও বুঝাইবার চেষ্টা করিল না। সকলেই রাগান্বিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে, এক্ষণে বুঝাইবার চেষ্টা করাও বৃথা।

এই ভাবে তিন দিবস কাটিয়া গেল। পেটে জল পর্য্যন্ত পড়িল না। দেহ ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিল। পদ ও উরু চলৎশক্তি হীন হইল; হস্ত ও বাহু আর নড়িতে পারে না, অন্যান্য সকলেরও ঐ দশা। তিন দিনের মধ্যেই অনৈক্যের কুফল ফলিতে লাগিল। সকলেই ক্রমশঃ বুঝিতে পারিল যে কার্যটা ভাল হয় নাই।

তখন পেট সময় বুঝিয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল :—

"ভ্রাতৃবর্গ! তোমরা যে কার্য্য করিয়াছ, তজ্জন্য দুঃখিত বা লজ্জিত হইও না। আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হই নাই। পরিণামে ফল যে এইরূপ হইবে, তাহা আমি অগ্রেই জানিতাম। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। আইস, আমরা পুনরায় একত্রিত হই, একতার বন্ধনে বলীয়ান্ হই। মনে ভাবিয়া দেখ, একতার ন্যায় অমূল্য রত্ন আর নাই। একাকী যে কার্য্য করিতে সাহস পর্য্যন্তও হয় না, একতার বলে অনেকে মিলিয়া তাহা অনায়াসে করা যায়। এক একটী তৃণ পৃথক্‌ভাবে কোনই কার্য্যকারী হয় না; কিন্তু তাহাদিগকে একত্রিত করিলে দৃঢ় রজ্জু প্রস্তুত হয়, তদ্দ্বারা মত্ত হস্তীকেও বন্ধন করা যায়। এক এক বিন্দু জল পৃথক্‌ভাবে কোথায় অদৃশ্য হইয়া পড়িয়া থাকে, কিন্তু একত্রিত হইলে তাহারা মহান্ সমুদ্রে পরিণত হয়, তাহাতে মকর কুম্ভীর প্রভৃতি বাস করে। এক একটী বালুকণা ফুৎকারে কোথায় উড়িয়া যায় দেখা যায় না, কিন্তু তাহাদের সমষ্টিতে প্রকাণ্ড মরুভূমি সৃজিত হয়, তাহার মধ্যে পড়িয়া কত লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে। দৃষ্টান্ত আর কত দিব; তোমরা যতদূর সাধ্য সর্ব্বস্থানে একতা স্থাপনের চেষ্টা করিবে। মনে রাখিও যে, অনৈক্যের বহুদোষ; তাহাতে উভয় পক্ষই কষ্ট পায়; এই দেখ, তোমরাও নির্জীব হইয়াছ,—আমিও দুর্ব্বল হইয়াছি। ইহাতে আমাদের কোন পক্ষই লাভবান্ হইতে পারে নাই। অতএব আইস, আমরা পুনরায় সকলে একত্রিত হই, আর কাল বিলম্বের প্রয়োজন নাই।"

এই বলিয়া পেট ক্রমে ক্রমে সকলকে আলিঙ্গন করিল। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলের মধ্যে পূর্ব্ববৎ একতা স্থাপিত হইল। দেহ বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। মানবদেহের গোলমাল চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইল।

মন্তব্য।

সরদহ মধ্য ইংরাজী স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশি-শেখর সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন;—

"আমি মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিতেছি, * * * এই সুবিস্তীর্ণ সংস্কার-মরুতে যদি কিছু শিক্ষনীয় থাকে, যদি কিছু গৌরবের বস্তু থাকে, তবে সেই অতুল অনির্ব্বচনীয় পদার্থই শিক্ষা, এবং শিক্ষা-পরিচরই তাহার একমাত্র পথ-প্রদর্শক।

"আমি প্রায় ১৫ | ১৬ বৎসর শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছি; শিক্ষা-বিভাগের যত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, শিক্ষা-পরিচরের সদৃশ সদ্ভাব-পূর্ণ উপদেশ-গর্ভ ও যথার্থ শিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থ একখানিও আমার দৃষ্টি-

গোচর হয় নাই। অপিচ যে চারিখণ্ড পরিচয় প্রকাশ হইয়াছে, তাহা সমালোচনা করিয়া আমি একেকালে মোহিত হইয়াছি। কেন না, একাধারে গুরুশিষ্যের পক্ষে সমান হিতকর এমন সার-গর্ভ সদুপদেশ-পূর্ণ বিষয় বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে এই অভিনব। সুতরাং শিক্ষা-বিভাগে ইহা যুগান্তর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

" * * তৃতীয় সংখ্যা পরিচয়ের লিখিত শিক্ষকদিগের জন্য বেকেডর্ক কর্তৃক * * যে প্রশ্নগুলি প্রস্তুত হইয়াছিল, * * সেই প্রশ্নগুলি আপনি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করতঃ শিক্ষা-পরিচয়ে প্রকাশ করিয়া, জন-সমাজে শিক্ষক-সম্প্রদায়ের একরূপ জ্ঞান-চক্ষুঃ প্রদান করিয়াছেন। ঐ মূল্যবান্ বাক্যগুলি নিরন্তর আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে।

"সম্প্রতি আমি শিক্ষা-পরিচয়কে আদর্শ করিয়া, যাহাতে সুকুমার-মতি বালক-বালিকা-বৃন্দের প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয়, তদ্বিষয় আপন শিষ্যবর্গকে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক, যথাবিহিত কর্ত্তব্য-পালনে যত্নবান্ হইয়াছি। আমি এতাবৎকাল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা-কার্য্যে যতদূর ফল প্রাপ্ত না হইয়াছি, শিক্ষা-পরিচয় আশ্রয় করিয়া অতি অল্প দিন মধ্যেই আশাতিরিক্ত ফললাভে সমর্থ হইয়াছি।"

পণ্ডিত মহাশয়ের কথা কয়টি পড়িয়া আমাদিগের হৃদয়ে নূতন বলের সঞ্চার হইল।

সিরাজগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :—"পত্রিকাখানির কয়েক খণ্ড আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অতীব আনন্দিত হইয়াছি। * * পত্রিকা নিজগুণে সর্ব্বসাধারণের নিকট সমাদৃত। ভাষার প্রাঞ্জলতা, ভাবের গাম্ভীর্য্য, বিষয়-নির্ব্বাচনের নৈপুণ্য দেখিয়া কাহার না মনোযোগ ইহার দিকে আকৃষ্ট হয়? * * সর্ব্বোপরি সুখের বিষয় এই যে, অকাল-মৃত্যু-সুলভ বঙ্গদেশে ইহা দিন দিন জীর্ণ, শীর্ণ ও মৃতপ্রায় না হইয়া ক্রমশঃ হৃষ্টপুষ্ট-কায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া অর্থাভাবজনিত নিবিড় ঘনাবরণ উন্মোচন করিয়া যথা সময়ে প্রকাশিত হইতেছে। * * শিক্ষা-বিভাগে কিছু দিন কার্য্য করিয়া যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাতে এইমাত্র বলিতে পারি যে, শিক্ষা সম্বন্ধে এইরূপ একখানি পত্রিকার অভাব অনেক দিন হইতে অনুভূত হইতেছিল। বোধ হয় ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, এই পত্রিকার অভ্যুদয়ে ও দক্ষতার সহিত পরিচালনে সেই গুরুতর অভাব এত দিনে মোচন হইতে চলিল। * * অতি মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া শিক্ষা-পরিচয় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সিদ্ধিদাতা ঈশ্বরের নিকট একান্ত প্রার্থনা যে, ইহার জীবনের ব্রত প্রতিপালিত হউক, এবং দেশের আশা ভরসার স্থল বালক-বালিকা ইহা পাঠে তাহাদের জীবন গঠিত করিয়া এই পতিত জাতির পুনরুত্থান সম্পাদন করুক। * * নীতিপ্রদ পৌরাণিক আখ্যায়িকা ও সাধু মহাত্মাদের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী গল্পচ্ছলে লিখিত হইলে বোধ হয় অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালক বালিকাদের বিশেষ উপকার হইতে

পারে।" শেষের পরামর্শটি অবশ্যই মূল্যবান্, কিন্তু পরিচরের আয়তন নিতান্ত ক্ষুদ্র, বিশেষ এ অভাব অন্যান্য সহযোগী অনেক পরিমাণে পূরণ করিতেছেন, তাই এ ত্রুটি। যাহা হউক, সময়ে সময়ে আমরা এ ত্রুটি দূর করিতে যত্ন করিব।

রাজসাহীর অন্তর্গত ভাবনী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন ;—"আপনার 'শিক্ষা-পরিচরের' ক্রমিক উন্নতি দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। * * পুরস্কার-প্রার্থী উপস্থিত না হওয়া সম্পাদকের দুঃখের কথাই বটে, আবার এত অল্পদিনে পুরস্কার-প্রথা উঠাইয়া দেওয়াও সাধারণের দুঃখের বিষয়। * * আমার বোধ হয় অনেকে দোয়াত কলম গোছাইয়া লইতেছিল, এমন সময়ে আপনি আর দিবেন না বলিয়া উঠিলেন। * * ফল কথা, এত শীঘ্র প্রথাটি উঠাইয়া দিলে লোকে প্রকৃত কারণের দিকে লক্ষ্য না করিয়া পত্রিকার অগৌরব-সূচক কারণান্তর কল্পনা করিতে পারে।" পরামর্শটি প্রকৃত সহৃদয়েরই উপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা সহজে নিয়ম পরিবর্ত্তন করি নাই। দোয়াত কলম গোছাইতে যাঁহাদের ছয় মাস যায়, তাঁহারা কত কালে প্রবন্ধ লিখিবেন ? দুর্গাগোবিন্দ বাবু শুনিয়া দুঃখিত হইবেন, এ পর্য্যন্ত একটি মহিলাও প্রবন্ধ পাঠান নাই। শ্রাবণমাসে একটি মাত্র বালক প্রবন্ধ লিখিয়াছে। যাহা হউক, পুরস্কারের উপকারিতা অনেক গ্রাহকই স্বীকার করিতেছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম, এবং নূতন নিয়মে পুরস্কার-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলাম। ইহাতেও যদি ফল না পাই, অগত্যা প্রথাটি রাখা না রাখা তুল্য হইবে। এই প্রথা পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইল, অধিকন্তু মধ্যে মধ্যে ছবি দিব বলিয়া যে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তাহা আর প্রত্যাহার করিলাম না।

পুরস্কার সম্বন্ধে নূতন নিয়ম।

এখন হইতে এই নিয়ম হইল যে ২৫ জন ছাত্র, ১৫ জন শিক্ষক, এবং ৫ জন মহিলা প্রবন্ধ পাঠাইলেই প্রবন্ধ পরীক্ষা করিয়া পুরস্কার দেওয়া যাইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হইলে প্রবন্ধ পরীক্ষা করা যাইবে না। সংখ্যা সম্বন্ধে বার্ষিক পরীক্ষাতেও এই নিয়মই খাটিবে। অধিকন্তু একটি করিয়া যে পুরস্কার আছে, তাহা ভাঙ্গিয়া প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে। শিক্ষকদিগের প্রথম পুরস্কার সাত টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার পাঁচ টাকা, এবং তৃতীয় পুরস্কার তিন টাকা। ছাত্রদিগের প্রথম পুরস্কার পাঁচ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার তিন টাকা, এবং তৃতীয় পুরস্কার দুই টাকা। মহিলাদিগের পুরস্কার ছাত্রিদিগের অনুরূপ। আর আমরা এ সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন করিব না।

আগামী পুরস্কারের প্রবন্ধ।

শিক্ষকদিগের জন্য ... শিষ্টতা।
ছাত্রদিগের জন্য .. একতা।
মহিলাদিগের জন্য ... লজ্জা।

প্রাপ্তগ্রন্থ।

বঙ্গ-রত্ন—দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জীবনী। শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী-ভট্টাচার্য্য—প্রণীত। মূল্য ৵১০ দশ পয়সা মাত্র। ২৮ পৃষ্ঠা।

বঙ্গ-ভূমি চিরদিনই রত্ন-প্রসূ ছিলেন, কিন্তু আমাদের দেশে জীবন-চরিত-লিখন-প্রথা ছিল না বলিয়া সে সকল রত্ন বিস্মৃতি-হ্রদে নিমগ্ন হইয়াছে, কেবল জাতীয় সাহিত্যের সঙ্গে যাঁহাদের নাম সংসৃষ্ট ছিল, তাঁহাদের নামমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। বিলুপ্ত রত্নের উদ্ধার কেহ করিতে পারিবেন না, আমরাও সে আশা করি না; কিন্তু যে সকল রত্নের নামমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, সেইগুলি যথাসাধ্য রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া আমরা হৃদয়ের সহিত অম্বিকা বাবুকে ধন্যবাদ দেই। তিনি বৃন্দাবন দাস সম্বন্ধে বাস্তবিক এবং কাল্পনিক যাহা কিছু শুনিয়াছেন, তাহাই প্রস্তাব-নিবিষ্ট করিয়াছেন; ফলতঃ ইহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমরা আশা করি, বঙ্গীয় পাঠক অম্বিকা বাবুকে উৎসাহিত করিবেন।

পাণ্ডব-বিলাপ কাব্য। শ্রীহরিপদ কোঁয়ার প্রণীত। কুসুমগ্রাম নিবাসী সাহিত্যানুরাগী জমিদার শ্রীযুক্ত মুন্সী মহাম্মদ এব্রাহেম সাহেব ১২৯৫ সালের ৯ই আশ্বিন সর্প-দষ্ট হইয়া জীবনলাভ করেন, এজন্য তিনি ৺ শারদীয় পূজোপলক্ষে দীনদরিদ্র-দিগকে বস্ত্রদান করিয়াছেন, এবং অষ্টাদশ-বর্ষ বয়স্ক লেখকের এই গ্রন্থখানির মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় নিজে দিয়া ইহা বিনা মূল্যে বিতরণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। আমরা এই সদাশয় মুসলমান জমিদারের যতই মহত্বের পরিচয় পাইতেছি, ততই আনন্দিত হইতেছি।

গ্রন্থকার অষ্টাদশবর্ষ-বয়স্ক, এবং গ্রন্থ-লিখনে এই তাঁহার প্রথম উদ্যম। লেখায় লালিত্য আছে, সুতরাং সযত্নে এবং সাবধানে অগ্রসর হইলে ভবিষ্যতে উন্নতিরও আশা আছে।

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের পুরস্কার প্রাপ্ত।

(১ম ভাগ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, ১২৯৬।)

শিক্ষক—শ্রী শ্রীকৃষ্ণ দাস, সরদহ মধ্য ইংরাজী স্কুল, রাজসাহী ৩৲

ছাত্র—শ্রীশরচ্চন্দ্র মিশ্র, পুঠিয়া উচ্চ ইংরাজী স্কুল, রাজসাহী ২৲

শিক্ষক—শ্রীরামনাথ বিশ্বাস, আড়রা কুমের ত্রিপুরা-সুন্দরী মধ্য ইংরাজী স্কুল। পোষ্ট ভাত্রা, টাঙ্গাইল, (শ্রাবণ) ৩৲

দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, কোন মহিলা এ পর্য্যন্ত পুরস্কার-প্রার্থিনী হন নাই। শ্রাবণ মাসে একটী মাত্র বালক পুরস্কারের জন্য প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিল, তাহা পরীক্ষক সমিতির মতে পুরস্কারের উপযুক্ত হয় নাই।

শিক্ষা-পরিচরের অতিরিক্ত।

গর্ব্বিতের শিক্ষালাভ।

রুসিয়ার সম্রাট আলেক্‌জেণ্ডার স্বরাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে করিতে এক দিন একটি ক্ষুদ্র নগরীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি সেই নগরীর বিষয় কিছু জানিতেন না। তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহার শকটের অশ্ব পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইল। এই অবসরে তিনি নগরটি দেখিয়া লইবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন, এবং জাঁকজমকশূন্য একটি সামরিক কোট পরিধান করিয়া নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। তাঁহার শরীরে, তাঁহার উচ্চ পদের কোন চিহ্ন ছিল না। তিনি চলিতে চলিতে রাস্তার শেষভাগে আসিয়া পৌঁছিলেন। তথায় আসিয়া দেখিলেন রাস্তাটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া বাম ও দক্ষিণদিকে গিয়াছে। কোন্ পথে যাইতে হইবে স্থির করিতে না পারিয়া ইতস্তত করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন এক জন সৈনিক পুরুষ একটি বাটীর দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া ধূমপান করিতেছেন। তিনি তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমি কি বলিতে পার কোন রাস্তা দিয়া ক্যালোগা যাইতে হইবে?"

ঐ সৈনিক পুরুষ আপাদমস্তক সমর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া বেজায় গম্ভীরভাবে ধূম্রপান করিতেছিলেন। এক জন সামান্য লোক তাঁহার সহিত কথা বলিতে সাহস করিল, এই দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তিনি সংক্ষেপে উত্তর করিলেন "দক্ষিণ দিকে।"

সম্রাট বলিলেন, "মহাশয়, ক্ষমা করিবেন, আমি আপনাকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।" সৈনিকপুরুষ খুব গর্ব্বিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা?"

সম্রাট বলিলেন, "আমি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।—সৈনিকদিগের মধ্যে আপনার কি পদ?" "আন্দাজ করিয়া বল দেখি" এই বলিয়া সৈনিক পুরুষ সবলে ধূম্রপান করিতে লাগিলেন।

সম্রাট আমোদিত হইয়া বলিলেন, "আপনি কি লেফ্‌টেনেণ্ট? ধূম্রপায়ী গর্ব্বিতভাবে উত্তর করিল "আরো উঠ" "কাপ্তেন" "আরো উঠ" "মেজর?" "এতক্ষণে হইল"।

সম্রাট নত হইয়া সেই মহৎ ব্যক্তিকে সেলাম করিলেন। মেজর বলিলেন, "এক্ষণে আমার পালা; "তুমি কে"? আলেক্‌জেণ্ডার উত্তর দিলেন, "আন্দাজ কর।" "লেফ্‌টেনেণ্ট?" "আরো উঠ।" "কাপ্‌তেন্?" "আরো উঠ।" "মেজর?" "উঠুক" "কর্ণেল?" "আরো।" এইবার ধূম্রপায়ী মুখ হইতে হুঁকা নামাইলেন।

"তবে কি আপনি জেনেরেল?" তাঁহার সেই গম্ভীর মূর্ত্তি আর রহিল না। "তুমি এক্ষণে নিকট আসিতেছ।" মেজর সসম্ভ্রমে টুপিতে হাত দিলেন। "তবে কি আপনি ফিল্‌ড মার্শ্যাল?।" এই সময়ে তাঁহার জাঁকজমকবিশিষ্ট চেহারা একেবারে লোপ পাইতেছিল। যে লোক কিছুকাল পূর্ব্বে এত জাঁকজমক করিতেছিল, সে এক্ষণে একজন পথিকের কথা শুনিয়া ও তাঁহার চক্ষের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল।

আলেক্‌জেণ্ডার বলিলেন, "মেজর মহাশয়! আর একটু উঠিলেই ভাল হয়" "তবে কি আপনি স্বয়ং সম্রাট্!" এই কথা বলিবার সময় ভয়ে ও বিস্ময়ে হস্তস্থিত হুঁকাটি পড়িয়া গেল।

সম্রাট বলিলেন, "হাঁ সেই ব্যক্তি," এবং মেজর মহাশয়ের ব্যবহারের এবং মুখের ভয়ানক পরিবর্ত্তন দেখিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। "প্রভু আমাকে ক্ষমা করুন।" এই বলিয়া মেজর সম্রাটের পদতলে পতিত হইল। আলেক্‌জেণ্ডার বলিলেন, "তুমি কি অপরাধ করিয়াছ যে তোমাকে আমি ক্ষমা করিব? ভাই, তুমি আমার কোন হানি কর নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কোন্ রাস্তা দিয়া যাইব, তাহা তুমি আমাকে বলিয়া দিয়াছ, তাহার জন্য তোমাকে আমি ধন্যবাদ দেই!" কিন্তু মেজর সে শিক্ষাটি ভুলে নাই। ইহার পর যদি কখন কোন লোকের প্রতি গর্ব্বিতভাবে কথা কহিতে তাহার ইচ্ছা হইত, তখনই উপর্য্যুক্ত ঘটনাটি তাহার মনে পড়িত।

উপরি উক্ত গল্পটিতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, যিনি প্রকৃত বড় লোক, তিনি কখন গর্ব্বিত হন না; কিন্তু এক জন ছোট লোক বড় হইলে ভয়ানক গর্ব্বিত হয়।

এই সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে, যথা,—

অগাধ জলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ।
গণ্ডূষ জলমাত্রেন সফরী ফর্‌ফরায়তে॥

শ্রীআশুতোষ নাথ রায়।

কাশিমবাজার।

অনন্ত মিলন।

নিবিছে চাঁদের আলো—
আঁধারে নিবিছে তারা,
আঁখি দুটি ধীরে ধীরে
হইতেছে জ্যোতিহারা!

বিমলিন আঁখি পাশে
তবু সে মুখানি ভাসে!
সহসা ছুটিয়া আসে
শেষ, ক্লান্ত অশ্রুধারা!

নয়ন মুদিয়া যায়
হৃদয়ে জাগে সে মুখ—!
যতক্ষণ শেষ শ্বাসে
কাঁপে শ্রান্ত-ক্লান্ত বুক।
চেতনা মিলায়ে যায়
আত্মায় থাকে সে মিশে,
যায় বা নরকে ঘোর
অথবা স্বর্গের দেশে!

কি মধুর আকর্ষণ!
দুই হৃদি—দুই প্রাণ
গলিয়া মিশিয়া হয়
একটিতে অবসান!
সুখে দুঃখে একাকার
মরণে বিশ্লেষ নাই।
এমনি মিলনে আহা
মিলিয়াছি দুজনাই!

শ্রীকিশোরীলাল গুপ্ত।

রজনীযোগে ঈশ্বরদর্শন।

(১)

রজনীর মোহময় মন্ত্রমন্ত্র বলে
সমগ্র পৃথিবী এবে ঘুমে অচেতন;
দিবসের কোলাহল নিদ্রার পরশে
করিয়াছে দূর দূর-দেশে পলায়ন!

(২)

শ্যামাঙ্গিনি! ভালবাসি স্বজনী তোমায়,—
তোমার অমৃত কোলে লুকাতে মস্তক;
এলে তুমি দুঃখ তাপ সকলি লুকায়,
অমৃতময়ের তুমি পথ প্রদর্শক!

(৩)

দিবসে প্রাণীর স্রোতে জন-কোলাহলে
পথিক হৃদয় মম ছুটিয়া বেড়ায়;
বিশাল বিশ্বের মাঝে শান্তি নাহি মিলে,
অশান্তি-সমুদ্রে পড়ি করে হায় হায়!

(৪)

কিন্তু প্রিয়সখি, তব শুভ আগমনে
না থাকে সে হট্যগোল, সে অশান্তি আর;
না থাকে সে দুঃখ জালা; প্রিয় সন্দর্শনে
এ হৃদয় লভে শান্তি চরণে তাঁহার।

(৫)

আজি প্রসাদে তোমার
নিস্তব্ধতা-মহাসিন্ধু-মাঝারে একেলা
প্রফুল্ল হৃদয়ে আমি রোয়েছি জাগিয়া;
প্রাণেশের প্রেমালোক ফুটিয়া হৃদয়ে
বিষাদের তমোরাশি ফেলেছে ঠেলিয়া!

(৬)

নিস্তব্ধতা নিজ রাজ্য কোরেছে বিস্তার,
সে রাজ্যের নাহি অন্ত, নাহি তার সীমা;
শুনিতেছি প্রাণেশের নিস্তব্ধ সংগীত,
হেরিতেছি অনন্তের অনন্ত মহিমা!

(৭)

কি রূপ হেরিনু আজ নয়ন মোহিল ;
কি গান শুনিনু আজ তুষিল শ্রবণ ;
কি প্রেম অমৃতধারা হৃদয়ে বহিল ;
কি পুণ্যের আলো মাঝে মগ্ন হ'ল মন !

(৮)

আজিরে হইল মম সার্থক জীবন,
পিয়ে সুখে প্রাণেশের প্রেমামৃত ধার ;
হ'ল প্রেম-পারিজাত-সৌরভে আকুল,
মরুভূমি সম শুষ্ক হৃদয় আমার !

(৯)

বরিষ বিহগ আজি মধুর সংগীতধারা,
প্রাণেশের প্রেমগীতে হৃদয় হ'য়েছে ভোর ;
প্রশান্ত কিরণরাশি বরিষ সুধাংশু তারা,
সহস্র সুধাংশু আজ ভাতিছে হৃদয়ে মোর।

(১০)

পোহায়োনা বিভাবরী তব অন্ধকারে
পেয়েছি যে দিব্য চক্ষু, করি নিরীক্ষণ
সে নেত্রে প্রাণেশ মূর্ত্তি; তাঁরি প্রেমালোকে
হোক্ চির সমুজ্জ্বল পাপীর জীবন !

শ্রীমনোমোহন করগুপ্ত।

শৈল দর্শন।

নিসর্গ সৌন্দর্য্যময়
স্বভাবের কার্য্যচয়
নিরখি নয়নে,
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হেন
ভাবি চিন্তা-জড় মন
নীরবে নির্জ্জনে,
নভঃস্পর্শি-কলেবর
হিমশুভ্র ধরাধর
পিঙ্গলব্রততী,
বেষ্টিত হইয়া কায়
যোগী যেন শোভা পায়
গম্ভীর মুরতি,
প্রকৃতি পূজার তরে
তীরুতরু বায়ু ভরে
কুসুম অঞ্জলি,

সঁপে সুরনদী নীরে
প্রবাহিনী ধীরে ধীরে
নিতেছে সাগরে,
কোথাও শিখর ভ্রমে
জলধর সসম্ভ্রমে
করিলে গর্জ্জন,
নাচিয়া উঠিছে শিখী
হৃদয় সখারে দেখি
করে প্রত্যুদ্গম,
প্রসূন সৌরভ সহ
মৃদু মন্দ গন্ধবহ
অম্বুকণবাহী,
বহে, উপত্যকা দেশে
তড়াগে নলিনী হেঁসে
ডাকিছে ভ্রমরে,

অধিক্যভারূঢ় যত
ফলভরে অবনত
শ্যামজম্বু তরু,
আতিথেয় দেহখানি
কাক আদি পাখিগণে
দিয়াছে বিতরি,
কুরঙ্গ বিশ্বস্তমনে
প্রিয়া সহ আলাপনে
চরিছে সন্তত,
স্বাধীন বনের পাখী
অমিয়া হৃদয়ে মাখী
গায় নিজ মনে,

তাহারাই দিতে তান
নির্ঝর সলিলে যেন,
হ'তেছে ঝঙ্কার,
প্রেমিক গজেন্দ্র সুখে
দিতেছে করেণু মুখে
মৃণাল তুলিয়া,
অভিনব কুসুমিতা
ভাবিনী বাসন্তীলতা
সময় বুঝিয়া,
সহকার তরুবরে
সাদরে আশ্রয় করে
রয়েছে মাতিয়া।

শ্রীশরচ্চন্দ্র কাব্যরত্ন।

কার সৃষ্টি ?

এ ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড ! শিল্প কি অদ্ভুত !
জান কি পাঠক ইহা, কাহ'তে সম্ভূত ?
ঈশ্বর তাঁহার নাম জগতের পতি,
এসো করপুটে করি তাঁহারে প্রণতি।

আকাশে নক্ষত্রমালা ভূরুহ ভূতলে।
জান কি পাঠক কার সৃষ্টি এ সকলে ?
ঈশ্বর তাঁহার নাম দয়ার সাগর,
যেন সদা থাকে তাঁহে মোদের অন্তর।

আহা কি সুন্দররূপ চন্দ্রমা গগনে !
বিরাজে তারকা মাঝে জুড়ায় নয়নে।
কার সৃষ্টি তুমি তা কি জানরে পাঠক !
ঈশ্বর তাঁহার নাম ব্রহ্মাণ্ড পালক।

সতত বহিছে বায়ু জগতের প্রাণ,
ভূত শ্রেষ্ঠ কার সৃষ্টি করহে ব্যাখ্যান ?
ঈশ্বর তাঁহার নাম অনন্ত শকতি,
সতত তাঁহারে যেন করি হে ভকতি।

সাক্ষাৎ জীবনরূপ জীবন নির্ম্মল,
কার সৃষ্টি রে পাঠক জান যদি বল।
ঈশ্বর তাঁহার নাম বিশ্বের শরণ,
এসো তাঁরে সমর্পণ করি প্রাণ মন।

এই যে অনল দেখ অভাবে যাহার,
অসম্ভব বেঁচে থাকা, জান সৃষ্টি কার ?
ঈশ্বর তাঁহার নাম তিনি বিশ্বধাম,
এসো ভাই তাঁরে করি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম।

কাহার আজ্ঞায় রবি আলোক বিতরে,
জান কে সৃজিল ইহা আমাদের তরে ?
ঈশ্বর তাঁহার নাম বড় দয়াময়,
কি শক্তি আমার বর্ণি তাঁর গুণচয়।

শালিক ষষ্টিক আদি ধান্য অতি হিত,
কে স্বজিল রে পাঠক জান কি নিশ্চিত?
ঈশ্বর তাঁহার নাম, করুণা-নিধান।
থাকুক তাঁহাতে মম সদা মন প্রাণ॥

আম, জাম, নারিকেল, গুবাক, তেঁতুল,
কার স্বষ্ট এ সকল, শোভায় অতুল?
ঈশ্বর তাঁহার নাম অনাদি নিধন,
তাঁহাতে মোদের যেন রহে প্রাণ মন।

শেফালি, বকুল, যুঁই, উদ্যানের শোভা,
কমল, কুমুদ, চাপা, জবা মনোলোভা,
মল্লিকা, মালতী, কেয়া, কদম্ব, মাধবী,
এ সব রচিল ভাই, জান কোন্ কবি?

সাগর, তড়াগ, নদী, হ্রদ মনোহর,
বিজন কানন, গিরি, ঔষধি নিকর,
গহ্বর, পর্ব্বত-শৃঙ্গ, নিকুঞ্জ বল্লরী,
কার স্বষ্ট এ সকল, বল সত্য করি॥

ঈশ্বর তাঁহার নাম বড় দয়াবান্,
জলে স্থলে ঘটে পটে সদা বিদ্যমান,
জ্যোতির্ম্ময়, নিরাকার, ব্রহ্ম সনাতন,
এসো ভাই এসো, সঁপি তাঁহে প্রাণ মন।

শ্রীভগবচ্চন্দ্র দাস।

বৃদ্ধ ভিক্ষাজীবী।

(১)
শুক্লবর্ণ কেশরাজি, বয়সে প্রবীণ
জীর্ণ অঙ্গ প্রতি অঙ্গ বসন বিহীন,
বসে এক ভিক্ষা-জীবি বিষণ্ন অন্তরে,
সাগ্রহে সুধানু আমি নিরখি তাহারে।

(২)
বহিছে প্রবল, খর শীতল পবন,
কি হেতু কুটীরে নিজ না করি গমন
বসিয়ে রয়েছ হেথা; ওহে বৃদ্ধবর?
শুনি বৃদ্ধ মৃদুস্বরে করিল উত্তর:—

(৩)
"বিশাল জগতে নাহি আলয় আমার,
লইব আশ্রয় আমি, প্রভো! গর্ভে যার,
স্বাস্থ্যকর অগ্নিকুণ্ড নাহি মম তরে,
সে জন্য বসিয়ে আছি পথের উপরে।

(৪)
"যৌবনে (স্মরিতে দুঃখে বুক ফেটে যায়!)
ছিনু আমি তব মত হৃষ্ট; কিন্তু হায়!
কেবল ব্যসনে করি সে কাল কর্ত্তন,
এখন ভুগিছি দুঃখ নিরয় মতন।

(৫)
"ভাবিনি তখন আমি যৌবন গরবে,
করি শ্রম ভবে কিছু শিখিতে যে হবে,
ভেবেছিনু খেলা ভিন্ন নাহি কিছু আর—
খেলিয়ে খেলিয়ে হ'ব ভব-নদী পার।

(৬)
"এখন হয়েছি বৃদ্ধ নাহি অহঙ্কার,
যষ্টি ভিন্ন চলিবার নাহি অধিকার,
একাকী ভ্রমিয়ে মরি আপনার পথে,
প্রতিদিন করি ভিক্ষা উদর পূরিতে।

(৭)
"বৃথায় জীবন পূর্ব্বে করেছি চালিত,
হ'য়েছি সে জন্য ঘোর বিপদে পতিত,
ভাবি তাই করি এবে অজস্র ক্রন্দন,
বার্দ্ধক্যে ধবল শির কম্পে অনুক্ষণ।"

(৮)
সাধের যৌবন ভাই কাটিয়ে হেলায়
পড়'না ভিখারী মত বিপন্ন দশায়,
উদ্যমে সর্ব্বদা কর জ্ঞান উপার্জ্জন
অবশ্য অবশ্য সুখে যাপিবে জীবন।

শ্রীদিনকান্ত চক্রবর্ত্তী।

শিক্ষা-পরিচর।

১ম ভাগ। | কার্ত্তিক ১২৯৬ সাল। | ৭ম সংখ্যা।

আত্ম-জিজ্ঞাসা।

মহাজনেরা বলেন আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলেই জগতের অধিকাংশ তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করা যায়, অতি অল্প বিষয়ের জন্যই পরের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হয়। অবশ্য অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেই কথাটা বলা হইয়া থাকে। অন্তর্জগতের গতিবিধি যে আপনি পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া অন্যের নিকট জানিয়া লইয়া সেই জ্ঞান কণ্ঠস্থ করিতে যায়, তাহার কথা, তাহার চেষ্টা, তাহার ফল স্বতন্ত্র। যে সম্মুখের সুশীতল নির্ম্মল-সলিলা স্রোতস্বতীর তীরে বসিয়া জলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কথা পরের মুখে শুনিয়া একবিন্দুও জলপান না করিয়া কেবল কণ্ঠস্থ করিতে থাকে, যে জলপান করিলে পিপাসার শান্তি হয়, তাহার কথা, আর তুমি, আমি যে নিত্য জলপান করিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি আমাদিগের কথা, স্বতন্ত্র হইবে না কেন? এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে সাধ হইল, আমিও আত্ম-জিজ্ঞাসা করিব, যদি চুপি চুপি আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারি, কেন তবে ঘরের কথা পরকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের মূর্খতা নিজেই প্রকাশ করিব? যেমন ইচ্ছা তেমনি সংকল্প, যেমন প্রতিজ্ঞা তেমনি কার্য্য—আত্ম-জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার মত লোকের আবার জিজ্ঞাসা করার মত একটা কি আছে? আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, দরিদ্রাদপি দরিদ্র, নগণ্যাদপি নগণ্য—আমি আবার একটা লোক, আমার আবার একটা আত্ম-জিজ্ঞাসার মত কথা আছে? যারা রাজা রাজড়া, তারা ভাবিতে পারে এবং আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারে—এই অতুল ধন জন মান, এই হস্ত্যশ্ব-রথপদাতি, এই কুসুমদাম-সজ্জিত লতা-মণ্ডপ-শোভিত প্রমোদ সিংহাসন, এ সব লইয়া কি করিবে? যারা বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ পণ্ডিত, যাদের জ্ঞানালোকে পৃথিবীর সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত ঝলসিয়া উঠিতেছে, যাদের যশঃসৌরভে দিগন্ত ভরিয়া

যাইতেছে, তাহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারে, এত আলোকে জগতকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিতেছি, কিন্তু আমরা আলোকে না আঁধারে? আর যারা শূর বীর, বাহুবলে পৃথিবীর দেশ দেশান্তরে বিজয়-স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া মানব-শোণিত-কর্দ্দমিত বসুন্ধরায় অসি হস্তে ভ্রমণ করিতেছে, বরং তাহারাও একদিন জিজ্ঞাসা করিতে পারে, এই যে এত যুদ্ধ যুঝিলাম, এত নর-হত্যায় পৃথিবী কঙ্কালময় করিলাম, জীবন তুচ্ছ করিয়া মৃত্যু মাথার উপর নিয়ত দোদুল্যমান রাখিয়া এত কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিলাম, এ সব কয় দিন থাকিবে? আর আমি—না রাজ্য, না পাণ্ডিত্য, না বীরত্ব—আমার কি আছে যে অন্ধকার কোণে মুখ লুকাইয়া গোপনে গোপনে আপনাআপনি জিজ্ঞাসা করিব? কি জিজ্ঞাসা করিব—কয়টা কথাই বা আমার জিজ্ঞাসার মত আছে? আদার ব্যাপারী আমি, জাহাজের কথায় আমার কি হইবে? দীর্ঘ পথেরও অন্ত আছে, সমুদ্রেরও সীমা আছে, বুঝিবা অপার অনন্ত আকাশেরও একটা শেষ আছে—কিন্তু চিন্তার বুঝিবা অন্ত নাই! মনে করিলাম মহাজনেরা বলিয়াছেন আত্ম-জিজ্ঞাসাই উন্নতির মূল, একবার আত্ম-জিজ্ঞাসাই করিয়া দেখিব—কিন্তু কই এত কথা ভাবিয়া ফেলিলাম, এখনও ত জিজ্ঞাসার মত একটা কথা পাইলাম না?

রাজ্য নাই—রাজ্য কি সকলের ভাগ্যেই ঘটে? যদি জগতে সকলেই রাজ্য পাইত, তবে প্রজা পাইত কোথায়? জগতের কোটী কোটী নরনারীর মধ্যে রাজা কয়জন—আমার মত প্রজাই ত সব। পাণ্ডিত্য নাই—কয় জন বল পাণ্ডিত্যলাভে ধন্য হইয়াছে, জগতে আমার মত মুর্খই যে বেশী! বীরত্ব নাই—নাই বলিয়া সময়ে সময়ে দুঃখ হয়, কিন্তু পৃথিবী ত আমার মত অবীর সন্তানই বেশী প্রতিপালন করিতেছে? রাজ্য নাই, পাণ্ডিত্য নাই, বীরত্ব নাই, তাহার সুখ নাই দুঃখও নাই—তাহাতে আর পরিবেদনা কি? কিন্তু আমার কি আপনার বলিতে কিছুই নাই? শিশির বিন্দুতে প্রলয়তরঙ্গায়িত মহাসাগরের আস্ফালন নাই, কিন্তু তাহার ক্ষুদ্রত্বের মধ্যেও সৌন্দর্য্যের জ্যোতিঃ নাই কি? বালুকাকণার মধ্যে হিমালয়ের অভ্রভেদী দেবতাত্মা ধবলগিরির উচ্চতা, অলঙ্ঘনীয়তা, কঠিনতা নাই বলিয়া তাহার পরপদ-নিপীড়িত ক্ষুদ্র শরীরের মধ্যে কি জিজ্ঞাসার কথা কিছুই নাই! ভাবিতে ভাবিতে ভাবনা বাড়িয়া যায়, নাই নাই করিতে করিতেই জিজ্ঞাসার কথা বাহির হইয়া পড়ে। আমার ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে রাজা, পণ্ডিত বা বীরের বৃহত্ত্ব নাই, ক্ষতি নাই; ইহার মধ্যে ক্ষুদ্রত্বের উপযোগী কি আছে; আমি তাহারই কথাই জিজ্ঞাসা করিব? বড় ঘরের বড় কথা—অতি গোপনে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, অতি গোপনে চাপিয়া রাখিতে হয়! আমার ক্ষুদ্র ঘরের ক্ষুদ্র কথা, পিপীলিকার ভ্রমণবৃত্তান্ত, ইহা দশজনের সাক্ষাতেই বা জিজ্ঞাসা করিলাম তাহাতে ক্ষতি কি? বড় হউক আর ছোট হউক, যখন জিজ্ঞাসার মত একটা

কথা পাইয়াছি, আর কথাটা শুনিবার জন্য পাঠক পাঠিকা, তোমরাও উৎকর্ণ হইয়া এই দীর্ঘ মুখবন্ধ শুনিয়া আসিতেছ, তখন আর তোমাদিগকে লুকাইব না, দশজনের সাক্ষাতেই জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু মনে রাখিও, আমার কথাটা ছোট হউক আর বড় হউক, তাহা আমার আপনার ঘরের কথা, আপনি জিজ্ঞাসা করিব আপনি উত্তর দিব,—ইহার সঙ্গে তোমাদের বিন্দুবিসর্গও সম্বন্ধ নাই, হাঁ না করিবার ঘুণাক্ষরেতে ক্ষমতা নাই—আমার আপন ঘরের কথা, চুপি চুপি আপনাআপনিই জিজ্ঞাসা করিতাম, আপনাআপনিই উত্তর প্রত্যুত্তর, পূর্ব্ব পক্ষ মীমাংসা সমাধা করিতাম, তোমরা মাথা কুটিয়াও শুনিতে বা জানিতে পাইতে না—কেবল সম্পাদক দাদার হাত ছাড়াইতে না পারিয়া এই দশের মাঝে ঘরের কথা টানিয়া বাহির করিতেছি। যদি ইহাতে নারাজ হও, জানিয়া রাখ, আমি তোমার জন্য এ প্রবন্ধ লিখিতেছি না।

কথাটা এই যে—আমি কে? ও হরি! তাইত কথাটাত খুব সহজ কথা হইল না? কথাটা ছোট, অতি মধুমাখা কথা আ-মি, জ্ঞানাবধি কতবার বলিতেছি, প্রতিদিন কতবার বলিতেছি, দশ জন লোকের মুখেও কতবার শুনিতেছি; বোধ হয় যেন জন্ম হইতে আজ পর্য্যন্ত যত কথা যতবার বলিয়াছি তার মধ্যে ফিরাইয়া ঘুরাইয়া, কখন কর্ত্তা, কখন কর্ম্ম, কখন সম্বন্ধ, কখন অধিকরণে নানা ছাঁদে নানা ভাবে এই ছোট খাট কথাটাই বেশী বলিয়াছি, আর যত কথা শুনিয়াছি তাহার মধ্যেও যেন মনে হইতেছে এই কথাটাই খুব বেশী! আ—মি, কথাটা বুঝি বড়ই মধুময়, নহিলে এই ছোট কথাটা বলিয়া বলিয়া, শুনিয়া শুনিয়া জীবনের অধিকাংশ মূল্যবান সময় কাটাইতেছি কেন? আর আমিই না হয় মূর্খ, জগতের রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, কেহইত এই কথাটা ভুলিতেছে না? আমি রাজা, আর আমার রাজ্য, বিনা যুদ্ধে আমি তোমাকে সূচ্যগ্র ভূমিও দিব কেন? এই আমি আর আমার করিয়াই ত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী মারামারি কাটাকাটি করিয়া ধনে বংশে নির্ম্মূল হইল, সেই সমুদ্র কল্লোল-বিজয়ী সেনা কোলাহল নীরব নিস্তব্ধ, সেই শত বীরত্বের উচ্চক্ষেত্র "ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র" জনহীন প্রান্তর, আর অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর মধ্যে সাত জন মাত্র সেই যুদ্ধ জয়ের পর রুধির প্লাবিত সমরক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে আমরা করিলাম কি? আবার আ-মি! আমার ছেলে রাজা হবে, আমি রাজমাতা হয়ে একাধিপত্য করিব; রাম আমার নয়,—সে শূর হউক, বীর হউক, সে কেন বনে না যাইবে, তাহার জন্য আমার এত কি মাথা ব্যথা;—কৈকেয়ী বিষম কোট করিয়া রোষাগারে বৃদ্ধ অপরিণামদর্শী স্ত্রৈণ দশরথকে ফাঁদে আটকাইয়া ধরিয়াছে, একটা মুখের কথা বলিলেই সব গোল চুকিয়া যায়—তোমার অসঙ্গত প্রস্তাবে কর্ণপাত করিতে পারি না, বলিলেই হয় তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলাম না; কিন্তু হরি হরি! ঐ আ-মি! "আমার" প্রতিজ্ঞা যে লঙ্ঘন হয়! দশরথ পারি-

লেন না, অযোধ্যা আঁধার হইল, বাল্মীকির কীর্ত্তিমাখা করুণগানে অযোধ্যার রামবনবাস-কাহিনী পৃথিবীর দেশ হইতে দেশান্তরে ছাইয়া পড়িতে লাগিল, রাম বনে চলিয়া গেলেন! আমার ছেলে রাজা হবে, আমি রাজমাতা হব, এই কৈকেয়ীর আমি—আর আমার সত্যলঙ্ঘন হয়, এই দশরথের আমি, এই দুইটা ভয়ানক "আমি" মিলিয়া ফল হইল,—রাম বনবাস, অযোধ্যা আঁধার, সীতা হরণ, সমুদ্র বন্ধন, সবংশে রাক্ষসবংশ নিপাত! কথাটা দেখিতেছি খুব সহজই জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিয়াছি! ভাবিলাম খুব ছোট, সকলেই বলে, সকলেই শুনে, এত পরিচিত এত ব্যবহৃত, অবশ্য সহজ হওয়াই সম্ভব—এখন দেখিতেছি কথাটা তুলিয়া ভাল করি নাই!

আ—মি! কথাটা কতবার বলিয়াছি, কতবার শুনিয়াছি, কিন্তু আজ যেমন কঠিন লাগিতেছে, এমন ত কখনও লাগে নাই! যখন বেশ ধীর প্রশান্ত মনে আপন "খোস মেজাজে" থাকি, তখন ভাবি আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার পরিবার, আমার ধন জন মান, যেন পৃথিবীটা সুধু আমার জন্য, আর আমি পৃথিবীর জন্য। কিন্তু বাস্তবিক আমার বলিবার কতটুকু অধিকার আছে না আছে, তাহা কখনও ভাবিয়া বুঝা পড়া করিয়া দেখা হয় নাই। যেমন জন্মাবধি "আমি আমি" বলিতেছি, শুনিতেছি, অথচ আজ সেই কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া ভাবিয়া মরিতেছি আমি কে? ঠিক তেমনি বুঝ বোঝা পড়া না করিয়াই জন্মাবধি "আমার আমার" বলিতেছি আর শুনিতেছি, কিন্তু বাস্তবিক ঐরূপ বলিবার দাবি দাওয়া কতদূর, তাহার পরীক্ষা কখনও করা হয় নাই। আমি, আমাকে, আমা হইতে, আমার, আমাতে—কর্ত্তা, কর্ম্ম, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ আর অধিকরণ লইয়া এই ক্ষুদ্র আমি কথাটার ডালপালায় এত ছাইয়া পড়িয়াছে যে, একেবারে সবগুলির উত্তর দেওয়া কঠিন। রাম আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, পণ্ডিত মশাই! শ্যাম আমাকে মারিয়াছে! থাম—কথা খুব সহজ নহে, "আমাকে মারিয়াছে"—আরে "আমাকে" মারিতে পারা যায় কি না, তাহারই আগে একটা মীমাংসা হউক। পণ্ডিত মহাশয় ভাবিয়া আকুল, অথচ নির্ব্বোধ রাম ততই কাঁদিতেছে আর বলিতেছে "শ্যাম আমাকে মারিয়াছে"। টিপি টিপি শ্রাবণের ধারা পড়িতেছে, সূচীভেদ্য আঁধারে গ্রাম নগর ঢাকিয়া পড়িয়াছে, পথশ্রান্ত মতিভ্রান্ত অসহায় পথিক সমুদয় দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর গৃহদ্বারে ভিজিতে ভিজিতে, কাঁপিতে কাঁপিতে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া অতি করুণস্বরে বলিতেছে মশাই গো! আমাকে একটুখানি আশ্রয় দিন! দাঁড়াও—কথাটা খুব সহজে বলিয়া ফেলিলে, কিন্তু আদৌ "আমাকে" আশ্রয় দেওয়া যায় কি না তাহার একটা মীমাংসা হউক—"আমি" নিরাশ্রয় কি না, "আমার" আশ্রয়ের আদৌ আবশ্যক আছে কি না, "আমাকে" আদৌ আশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে কি না, "আমা" হইতে সেই আশ্রয় হয় কি না এবং "আমাতে" সে ক্ষমতা আছে কি না, এতগুলির মীমাংসা

না করিয়াই কেমন করিয়া উত্তর দিব? পথিক দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে—আর গৃহস্বামী ভাবিতেছেন! তবেই দেখ, এই "আমি" কথা আর তার শাখা প্রশাখার একটা মীমাংসার উপর কত কাণ্ড কারখানা নির্ভর করিতেছে! যদি এখন কথাটার মীমাংসা না হইল, সাহারার বালুকাস্তর গণিয়া কি জ্ঞান লাভ হইবে, অথবা প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতার পরিমাপ কণ্ঠস্থ করিয়াই বা কি পুরুষার্থ পাইবে? কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম, কথাটা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। পাঠক পাঠিকা! কথাটার গুরুত্ব যদি বুঝিয়া থাক, তোমরাও আত্ম-জিজ্ঞাসা কর! ইহার উত্তরের উপর যে শিক্ষা নির্ভর করে, তাহাই মানবজীবনের প্রকৃত শিক্ষা। ক্রমশঃ।

বিজ্ঞান।

উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার পক্ষে বিজ্ঞান যে একটী প্রধান সহায়, তাহাতে আর বোধ হয় মত ভেদ নাই। এই বিজ্ঞান-বলেই কত কত অদ্ভুত ব্যাপার আমরা প্রত্যহ অবলোকন করিয়া থাকি, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। রেলগাড়িই বল, বাষ্পীয় পোতই বল, টেলিগ্রাফই বল, ব্যোমযানই বল, ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার-প্রকরণই বল, আর যাহাই বল, সমুদয়ই বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। এত গেল বড় বড় কথা। আমরা দৈনিক বহির্জগতান্তর্গত যাহা দেখি বা ব্যবহার করি, তাহার কিছুই বৈজ্ঞানিক নিয়মের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু আমরা তাহাদের কারণ অনুসন্ধান করি না বলিয়াই তাহারা আমাদের নিকট ততটা আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হয় না। আমরা যখন তাহাদের কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিব যে তাহারাও প্রাকৃতিক নিয়মাধীন, এবং নিতান্ত সহজ উপায়ে তাহারা প্রস্তুত হয় না, কিম্বা সহজে তাহাদিগকে পাওয়া যায় না, তখন আমরা তাহাদের গুরুত্ব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব। অন্যান্য পদার্থ দূরে থাকৃ, যে জল আমরা প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করি ও সামান্য জিনিস বলিয়া যত ইচ্ছা নষ্ট করি, তাহাও যে দুইটী বাষ্পের সমষ্টি এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নিয়মাধীন, এরূপ হয়ত আমরা মনেও করি না। আমাদের প্রাণস্বরূপ বাতাস, ও যে কয়েকটী গ্যাসের মিশ্রণ, তাহাও জানি না। রন্ধনাদি কার্য্য যে রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাধীন "উত্তাপের" নিয়মান্তর্গত, তাহাত আমাদের মনে ধারণাও হয় না।

ধোপার কায দেখিলে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, ইহাও কি আবার বৈজ্ঞানিক নিয়মাধীন? কিন্তু বাস্তবিকই ধোপার কায প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রাসায়নিক ক্রিয়ার বশবর্ত্তী। ক্ষার (কলাগাছ পোড়ান

এক মত ছাই) কিম্বা সাবান দিয়া কাপড় কাচা ইত্যাদি কায দূরে থাক্, ধোপারা যে প্রকারে শেষে নীল জল দিয়া কাপড় পরিষ্কার করে ও শুকায়, তাহাও পূর্ব্বোক্ত নিয়মাধীন। সকলেই জানেন যে ধোপারা ঘাসযুক্ত স্থানের উপর কাপড় শুকাইতে দিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাতে নীল জল ছড়াইয়া দেয়। ইহার অর্থ এই যে, কাপড়ের নীচের ঘাস ও মৃত্তিকা হইতে অম্লজান গ্যাস উত্থিত এবং ভিজা কাপড় দ্বারা ঘনীভূত হইয়া নীল জলের সহিত তাহার রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হয় ও নীল, সামান্য ময়লা ইত্যাদি শীঘ্রই বিদূরিত করে। কে জানে যে এই সামান্য কাযের মধ্যেও আবার রাসায়নিক প্রক্রিয়া আছে? আর একটী উদাহরণ দিয়া আমরা এই কথাটি পরিষ্কার করিব। সকলেই জানেন যে ঘর্ম্মাক্ত শরীরে বাতাস লাগিলে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হয়। ইহার কারণ এই যে বাতাস ঘর্ম্মাক্ত স্থানে লাগিয়া ক্রমে অল্প অল্প করিয়া ঘর্ম্মকে বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণত করে ও শীঘ্র শীঘ্রই বহন করিয়া লইয়া যায় এবং তদ্দ্বারা সেই স্থানের তাপের ন্যূনতা হয়, সুতরাং ঠাণ্ডা বোধ হয়।

খুঁজিতে গেলে এইরূপ প্রায় সমুদয় কাযই বৈজ্ঞানিক নিয়মাবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, যে সকল বাহ্যিক (অনেক সময়ে আভ্যন্তরিকও) প্রক্রিয়াদি আমরা দেখি, তাহার সমুদয়ই নিঃসংশয়রূপে বৈজ্ঞানিক নিয়মাধীন। তবে কেহ বা পদার্থ বিজ্ঞানের, কেহ বা রসায়নের, কেহ বা অন্যরূপ বিজ্ঞানের নিয়মাধীন। বিজ্ঞান অনেক ভাগে বিভক্ত, যথা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব, ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক-বিভাগ মধ্যে প্রথম দুইটীই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, ইহাদের কার্য্যকারিতা আমরা সর্ব্বক্ষণই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। পদার্থ-বিদ্যাও আবার কয়েকভাগে বিভক্ত, যথা, (১) উত্তাপ, (২) আলোক, (৩) শব্দ, (৪) তাড়িত, (৫) চুম্বক। আমরা প্রথমে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সাধারণ জ্ঞান যাহা কিছু মোটামুটি আবশ্যক ও বক্তব্য, তাহা শেষ করিয়া উত্তাপ হইতে আরম্ভ করত ক্রমশঃ অন্যান্য গুলিও বুঝাইতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বিজ্ঞান চক্ষে দেখিতে গেলে প্রায় কাযেই অল্প বিস্তর বৈজ্ঞানিক কারণ অনুভূত হইবে। সুতরাং সকলেরই অন্ততঃ বিজ্ঞানসূত্র ও মোটামুটি বৈজ্ঞানিক নিয়মাদি জ্ঞাত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

বর্ত্তমান বিজ্ঞান চর্চ্চার ভাবটা ইউরোপ হইতে এ দেশে আসিয়াছে। কিন্তু ইউরোপের সঙ্গে সংস্রব হইবার পূর্ব্বে ভারতে বিজ্ঞানের অবস্থা কিরূপ ছিল, আর্য্য-সভ্যতাকে বিজ্ঞান কতদূর সাহায্য করিয়াছিল, বোধ করি বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আধুনিকদিগের মধ্যে অনেকেই বলেন যে হিন্দুদের মনোবিজ্ঞান ভিন্ন বহির্জগৎ সম্বন্ধীয় অন্য কোনরূপ বিজ্ঞান ছিল না। কিন্তু বোধ হয় এই মত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, এখন যতটা বিজ্ঞানের পুষ্টতা ও চর্চ্চা হইয়াছে, পুরাকালে হয়ত ততটা ছিল না। চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রধানতঃ শরীরতত্ত্ব ও রসায়ন শাস্ত্রের নিয়মগুলি নিহিত থাকায় উহা একটী বিজ্ঞানরূপে পরিগণিত হইয়াছে। হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রে যে সমুদয় রোগ, ঔষধ ও ব্যবস্থা বিবৃত আছে, তাহা শুনিলে নিশ্চয়ই অবাক্ হইতে হয়। একটু স্থির-ভাবে বিবেচনা করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সমুদয় রোগনির্ণয় ও তাহার ঔষধ আবিষ্কার করা সময় সাপেক্ষ;—হয় অল্প দিনে, না হয় বেশী দিনে ইহারা নির্ণীত এবং আবিষ্কৃত হই-য়াছে। যদি অল্প দিনেই আবিষ্কৃত হইয়াছে ধরা যায়, তাহা হইলে যি বা যাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি বা তাঁহারা নিশ্চয়ই দেবতা তুল্য ও অত্যন্ত বিজ্ঞান-বিশারদ ছিলেন এবং অত্যল্প পরীক্ষাদি দ্বারাই রোগ ও ঔষধাদি নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আর যদি বেশী দিনেই আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ঔষধাদি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। প্রথমোক্ত বিষয়টী বলিতে গেলে দৈব ব্যাপার, আর দ্বিতীয়টী পরীক্ষাপ্রাপ্ত এবং মনুষ্যের অদ্ভুত বুদ্ধির পরিচায়ক। চিকিৎসা শাস্ত্রের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়াই পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে উহা স্বয়ং মহাদেব কৃত। দেব-শক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছু নাই। কিন্তু চিকিৎসা-শাস্ত্র যদি মানব-বুদ্ধির পরীক্ষা-লব্ধ হয়, তাহা হইলে সে বিষয় অবশ্য আমাদের আলোচ্য।

বিজ্ঞান-জ্ঞান শূন্য হইয়া কোনরূপ বৈজ্ঞানিক রহস্য পরীক্ষা করা যে কতদূর সুকঠিন, হয়ত অসম্ভব, তাহা সহজেই অনুমেয়। যত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য রোগ ও ঔষধ চিকিৎসা শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, তাহার অনেক রোগ ও ঔষধ এখন একে-বারেই পাওয়া যায় না, বা আমরা তাহা জানি না, হয়ত ঐরূপ রোগে কেহ কাহাকে আক্রান্ত হইতে কোন দিন শুনিও নাই।

উৎকট উৎকট বা শুনিতে পাওয়া যায় না, এমত রোগ প্রত্যহই দৃষ্টিগোচর হওয়া অসম্ভব। হয়ত ২। ৪ শতের মধ্যে ২। ১টী মাত্র ঘটে। আর যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সে সময়ের লোকেরা সচরাচর এখনকার লোকের মত রোগগ্রস্ত হইতেন না। ইহা বংশ-পরম্পরা তুলনা দ্বারা জানিতে পারা যায়। ঐরূপ রোগ ও তদু-পযুক্ত ঔষধ নির্ণয় করিতে যে কত পরীক্ষা করিতে হয়, তাহা আর পাঠককে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। বিজ্ঞান সাহায্যেই কত কত কষ্টসাধ্য পরীক্ষাদি করিতে হয়, তাহার পর আবার বিজ্ঞান-জ্ঞান শূন্য হইলে যে কি হয় তাহা বলা যায় না। হয়ত হাত আন্দাজি একটী রোগ ও তৎপ্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কার করিতেই ২। ৪ শত পরীক্ষা করিতে হয়। ইহাতে যে কত সময়ের ও কত রোগীর দরকার হয়, এবং এইরূপে প্রত্যেক রোগ ও তাহার প্রতিষেধক ঔষধ নির্ণয় করা যে কি ব্যাপার,

তাহা সহজেই বোধগম্য। সোজাসুজি বলিতে গেলে আমরা বলিব যে ইহা এক-রূপ অসাধ্য ও অসম্ভব।

অতএব আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহা হইতে এই মীমাংসা করা যাইতে পারে যে, পুরাকালের চিকিৎসা-শাস্ত্র-প্রণয়ন-কর্ত্তারা বিজ্ঞান শাস্ত্রে বিশেষ-পারদর্শী ছিলেন। তাহা না হইলে বিজ্ঞান-জ্ঞান-শূন্য পরীক্ষাদি দ্বারা এই শাস্ত্রের এতদূর উন্নতি হইতে পারিত না। বোধ হয় মোসলমানদের অত্যাচারে আমাদের বিজ্ঞান-সম্ভূত অনেক জিনিস নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অস্ত্র-চিকিৎসা-শাস্ত্র এখনও আছে, কিন্তু ব্যবহার না থাকায় বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমরা রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাতন পুস্তক পাঠে জানিতে পাই যে, অমুক এক মাসের পথ এক দিনে গিয়াছিল, অমুক নিমেষ মধ্যে স্বর্গ হইতে রথে চড়িয়া নামিয়া আসিয়াছিল, অমুক রথে চড়িয়া স্বর্গে গিয়াছিল ইত্যাদি। এই সমুদয় বিবরণ অতি রঞ্জিত হইলেও বোধ হয় এটী স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক ভাব তখনকার লোকদিগের (গ্রন্থ প্রণেতাদিগের, নায়কদিগের নহে) মনে যখন ধারণা হইয়াছিল, তখন সম্ভবতঃ অল্প বিস্তর বৈজ্ঞানিক ব্যাপার এই সমুদয় বিবরণ মধ্যে নিহিত আছে। তাহা না হইলে এইরূপ ভাব সমুদয় কখনই মনে উদয় হইতে পারে না। অর্জ্জুনের লক্ষ্য-ভেদ বোধ হয় চুম্বকের নিয়মাধীন। তাহা না হইলে কিরূপে শূন্য-মার্গে মৎস্য (সম্ভবতঃ লৌহ মৎস্য) রাখা যাইতে পারে? হয়ত বলিবেন এই ব্যাপারটী দৈববলে হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেবতার উপর বা দৈববলের উপর আমাদের কোন হাত নাই এবং সেই সমুদয় কার্য্যের বৈজ্ঞানিক বা অন্য কোনরূপ অর্থ করি, তাহারও সাধ্য নাই, সুতরাং প্রস্তুতও নই। বোধ হয় কোন উপায়ে চুম্বক ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল এবং তদ্দ্বারা লৌহ-মৎস্য আকৃষ্ট ও তীর দ্বারা জোরে বিদ্ধ হওয়ায় নীচে খসিয়া পড়িয়াছিল। ঠাকুর ইত্যাদিও শূন্য-মার্গে ঝুলাইয়া রাখিবার অনেক কথা শুনা গিয়াছে। ইহা দেখিতে আশ্চর্য্যজনক বোধ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। লৌহ-আসনস্থিত (লৌহ না হইলে হইতে পারে না) ঠাকুর চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ঝুলিয়া থাকে। বুজরুকি দেখাইবার নিমিত্ত কেহ কেহ এইরূপ করে। মেঘনাদের মেঘের আড়ালে থাকিয়া যুদ্ধকরা বৈজ্ঞানিক মতে বলিতে গেলে ব্যোমযানে বা তদনুরূপ কোন যানে থাকিয়া যুদ্ধকরা ব্যতীত সম্ভবতঃ আর কোন সদর্থ করা যায় না।

শাল্ব, রুক্মিণী-নন্দন প্রদ্যুম্নের যুদ্ধার্থ আগমন সহ্য করিতে না পারিয়া "রোষমদে মত্ত হইয়া কামগ-সৌভযান হইতে অবরোহণ করত প্রদ্যুম্নের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিল," বনপর্ব্ব, ১৭ অধ্যায়; অর্জ্জুন "ইন্দ্রপ্রিয় দিব্য পুরীতে" প্রবেশ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে "সহস্র সহস্র কামগ-দেব-বিমান অবস্থিত আছে ও অযুত অযুত কামগ-দেব-বিমান

গমনাগমন করিতেছে," বনপর্ব্ব, ৪৩ অধ্যায় ; এবং "ধীমান্ কুরুনন্দন সাতিশয় হৃষ্ট চিত্তে আদিত্য-সদৃশ প্রভা-বিশিষ্ট অদ্ভুত-কার্য্য দিব্যরথে আরোহণ করিয়া উর্দ্ধে গমন করিলেন," বনপর্ব্ব, ৪১ অধ্যায়। এই বিবরণগুলি সমগ্র পড়িলে বোধ হয় "কামগ-সৌভ-যান," কামগ-দেব বিমান," কিম্বা "দিব্যরথ" অর্থ সামান্য রথ না হইয়া ব্যোমযান অথবা তদনুরূপ শূন্য-মার্গে উড়িতে সক্ষম কোন যান হইবে। আবার দেখুন, "বিদর্ভ দেশে গমনকালে সেই সকল অশ্বশ্রেষ্ঠ বাহুক (রাজা নল বাহুক নামে অভিহিত অযোধ্যা-পতি ঋতু-পর্ণের সারথি) কর্ত্তৃক বিধিবৎ প্রযোজিত হইয়া রথীকে মুগ্ধপ্রায় করতঃ শূন্যে উত্থিত হইল। অযোধ্যাপতি শ্রীমান ঋতুপর্ণ বায়ুতুল্য-বেগশালী সেই অশ্বদিগকে তাদৃশ-রূপে রথ বহন করিতে দেখিয়া পরম বিস্ময়া-ন্বিত হইলেন, "বনপর্ব্ব, ৭১ অধ্যায়; এবং "নল রাজা আকাশ-গামী পক্ষীর আকাশ গমনের ন্যায় নদী, সরোবর, বন ও শৈল সকল অচিরকালেই অতিক্রম করিতে লাগিলেন," বনপর্ব্ব, ৭২ অধ্যায়। এই সমুদয় বিবরণ অতি রঞ্জিত হইলেও ইহা-দের মধ্যে যে কিঞ্চিৎ সত্য অন্তর্নিবিষ্ট আছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। এ গুলি ছাড়া পুরাকালে রথে চড়িয়া শূন্য-মার্গে যুদ্ধ বা গতায়াত করিবার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই সমুদয় বিবরণ কি একেবারেই মিথ্যা? "ব্যোমযানং বিমানং ইত্যমরঃ।" অমরসিংহ বিক্রমা-দিত্যের সময়ের লোক। অতএব দেখা যাইতেছে যে ব্যোমযান অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। বোধ হয় পুরাকালীন লোকেরা ব্যোম-যানকে অভিলষিত দিকে চালাইবার কল কৌশল ইত্যাদি জানিতেন, কিন্তু আমরা এমনই বিজ্ঞানবিৎ যে এত দিনের পরিশ্রমেও ব্যোমযানকে আয়ত্ত করিতে পারিলাম না। ২।১ হাজার ফিট উপরে উঠিলেই বা বাতাসের গতি অনুসারে এক আধ ক্রোশ গেলেই চতুর্দ্দিক হইতে প্রশংসা-স্রোত আসিয়া আমাদিগকে ডুবা-ইয়া দেয়, সুতরাং আমরা মনে করি আর কি, মার্ দিয়া কেল্লা।

"আগ্নেয় অস্ত্র সমূহ ও গুলিকোৎ-ক্ষেপক যন্ত্র," বন পর্ব্ব, ১৭ অধ্যায় ; "যখন অর্জ্জুন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন যে কত-ক্ষণে দেবরাজের রথ আসিবে, যে রথে অশনি, নির্ঘাত ও মহামেঘসদৃশ নিঃস্বন-কারী বায়ুস্ফোটক চক্রযুক্ত পাষাণাদি গো-লক নিক্ষেপক যন্ত্র (স্থাপিত রহিয়াছে)" বনপর্ব্ব, ৪২ অধ্যায়। "নালীক (বন্দুক বা কামান) দুই প্রকার, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র। ছিদ্রমূল তির্য্যক্ ও উর্দ্ধ এবং পাঁচ বিতস্তি প্রমাণ ; মূলাগ্রে লক্ষ্যভেদী তিলবিন্দুযুক্ত ; সুকাষ্ঠোপাঙ্গ বুধ্ন (নিম্নভাগ) ও মধ্যাঙ্গুলির মত (মোটা) ছিদ্র ; অন্তে অগ্নিচূর্ণ (বারুদ), ধারণপাত্র এবং শলাকা সংযুক্ত ; ইহাকেই লঘু নালীক (বন্দুক) কহে ; এবং পত্তিসাদি-দিগের (যোদ্ধাবিশেষ) দ্বারা ব্যবহৃত হয়। নিম্নভাগ ত্বক্‌সার (মোটা), ছিদ্র স্থূল এবং তদনুরূপ দীর্ঘ ও বৃহৎ গোল হইলে সেই-রূপ দূরভেদী হয়। ইহাকেই বৃহন্নালীক

(কামান) বলে এবং তাহা কাষ্ঠবুধ্ন বিবর্জ্জিত, শকটোপরি বহনীয় প্রযুত ও বিজয়প্রদ,'' ইতি শুক্রনীতি।

আগ্নেয় অস্ত্র সমূহ, গুলিকোৎক্ষেপক এবং পাষাণাদি গোলক নিক্ষেপক যন্ত্রাদির অর্থ কামান, বন্দুক বা ঐরূপ কোন যন্ত্র হইবে। প্রাচীন হিন্দুরা বন্দুক, কামান, বারুদ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রকরণ জানিতেন, তাহার প্রমাণ শুক্রনীতিতে অনেক পাওয়া যায়।

বেক্‌ম্যান বলেন, তাঁহারও সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে ভারতবর্ষেই বারুদ, বন্দুক ও কামান আবিষ্কৃত হয়; এবং ঐ সমুদয় জিনিস সেরানেস জাতি কর্ত্তৃক আফ্রিকা হইতে ইউরোপে আনীত ও তথায় তাহাদের উন্নতি সাধিত হয়। তিনি আরও বলেন, ১৭৯৮ খ্রীঃ মুসোঁ ল্যাঙ্গলস্ প্রমাণ করেন যে আরবীয়েরা হিন্দুদের নিকট হইতে বারুদ প্রস্তুত-প্রকরণ জ্ঞাত হয় এবং ভারতবর্ষীয়েরা বারুদের ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল হইতেই জানিত। বারুদ ব্যবহার বেদে নিষিদ্ধ আছে। বারুদ ৬৯০ খ্রীঃ মক্কার যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়, ইত্যাদি। (বেক্‌ম্যান্‌স্ হিষ্টারি অব ইনভেন্‌সন্‌স্, ২য় খণ্ড, ৫০৫ পৃষ্ঠা)। প্রাচীন হিন্দুদিগের রসায়নে এবং ঔষধ প্রস্তুত করণোপযোগী মৃণ্ময় পাত্র নির্ম্মাণে দক্ষতা, শব্দকল্পদ্রুমে কেবল "অর্কঃ, নির্যাস বিশেষঃ আরক্ ইতি আরবীয় ভাষা'' ইত্যাদি দেখিলেই তাঁহাদিগের আশ্চর্য্য বিজ্ঞান-জ্ঞান-সমুদয় অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস তাঁহার শাসনকালে কাশী অঞ্চলে কতকগুলি মুদ্রাঙ্কন সরঞ্জাম প্রাপ্ত হন এবং সেই সমুদয় সরঞ্জাম মেজর্ রূবেক পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, ঐ সমুদয় জিনিস নিশ্চয়ই হিন্দুদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হইত, মুসলমানদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হইবার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রাচীন হিন্দুরা যে ইজিপ্‌সিয়ান, ফিনিসিয়ান, সিরিয়ান, চাইনিজ এবং অন্যান্য দেশবাসিদিগের সহিত বাণিজ্য ব্যবসায়াদি করিতেন ও নৌ-বিজ্ঞানে তাঁহাদিগের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, তাহারও প্রমাণ মহাভারত, সভাপর্ব্ব দিগ্বিজয় পর্ব্বাধ্যায়, রঘুবংশ ৪র্থ সর্গ, বরাহ পুরাণ ২য় ভাগ, যাজ্ঞবল্ক্য, মনু, হিরোডোটাস্, গ্রিন্, উলকিন্‌সন্, লিড্‌লে, ম্যাল্‌কম, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ ও আর আর বড় বড় পুরাতত্ত্ববিৎ হইতে আমরা নিঃসংশয়রূপে জানিতে পাই। সমুদ্র-বক্ষে জাহাজ বা নৌকা চালাইয়া যাওয়া কিছু সহজ ব্যাপার নহে। সমুদ্রে যাইতে হইলে দিক্‌নির্ণয় করা চাই, সমুদ্র গর্ভস্থ অদৃশ্য শৈলাদির জ্ঞান থাকা চাই, এবং কেবল বাতাসের উপর নির্ভর না করিয়া অভিলষিত দিকে জাহাজকে চালাইবার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদির জ্ঞানও থাকা চাই। বলিতে পারেন পূর্ব্বে দিক্‌নির্ণয় নক্ষত্রাদি দ্বারা চলিত। কিন্তু সমুদ্রে দিক্‌নির্ণয়ে নক্ষত্র দ্বারা সর্ব্বদা স্থির সিদ্ধান্ত হওয়াও সুকঠিন। রয়াল আসিয়াটিক সোসাইটির ৯নং জোরনালে লিখিত আছে যে, ম্যাল্‌কম সাহেব বলেন প্রাচীন হিন্দুরা সমুদ্রে গমনোপযোগী জাহাজ বা নৌকা-বিজ্ঞানাভিমানী ইউরোপীয়দিগের

অপেক্ষাও যে বেশ কৌশলের সহিত নির্ম্মাণ করিতে জানিতেন তাহার আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক ইহাতেও প্রমাণ হইতেছে যে প্রাচীন হিন্দুরা নৌ-বিজ্ঞানেও পারদর্শী ছিলেন। আধুনিকদিগের মধ্যে বোধ হয়, অনেকেরই বিশ্বাস যে, কাঁচের ব্যবহার প্রাচীন হিন্দুরা জানিতেন না। কিন্তু এ বিশ্বাসও নিতান্ত ভ্রম পরিপূর্ণ। আমরা দেখিতে পাই যে, আয়ুর্ব্বেদের প্রধান প্রধান কতকগুলি ঔষধ যথা—মকরধ্বজ, স্বর্ণসিন্দূর, রসসিন্দূর প্রভৃতি কাচকূপী (বোতল) ব্যতীত প্রস্তুত হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বকালে কেবল কাচ কেন অত্যন্ত তাপসহ কাচ পাত্রের ব্যবহার ছিল। পাঠকদিগের সুবিধার জন্য ও প্রস্তাব বাহুল্যভয়ে সংস্কৃত শ্লোক কিম্বা ইংরাজী উদ্ধৃত না করিয়া তাহাদের কেবল অনুবাদ বা ভাব দেওয়া হইল।

অতএব এই সমুদয় বিষয় বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয় পূর্ব্বকালের লোকেরাও বিজ্ঞানবিৎ ছিলেন। তবে বলিতে পারেন যে বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি না থাকিলেই যে মোটামুটী বিজ্ঞান-সম্মত কার্য্যাদি করিতে পারা যায় না তাহা নহে। অবশ্য এটা স্বীকার্য্য যে, যে ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি চালায় বা বৈজ্ঞানিক নিয়মাধীনে কার্য্যাদি করে, হয়ত সে ব্যক্তি তাহার মর্ম্ম বুঝে না। কিন্তু তাই বলিয়া কি যিনি ঐ যন্ত্র বা নিয়মাদি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহার অস্তিত্ব ও প্রগাঢ় বুদ্ধিমত্তা অস্বীকার করিব? আমরা এরূপ বলিতেছি না যে পূর্ব্বকালের প্রায় লোকেরই বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি ছিল। আমাদের এই মাত্র প্রমাণ করা উদ্দেশ্য যে পুরাকালেও বিজ্ঞান ছিল। প্রাচীন হিন্দুরা কোনরূপ রীতিমত বিজ্ঞান-শাস্ত্র না রাখিয়া গেলেও তাঁহাদিগের বিজ্ঞান-শাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞান সমুদয় অন্যান্য শাস্ত্রে এবং সাহিত্যাদিতে কৌশলের সহিত সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়া যাওয়ার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

আজকাল বেদপুরাণাদি ও শাস্ত্রোক্ত অতি সামান্য কার্য্যেরও বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক অর্থের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যে কতদূর যুক্তিসঙ্গত এবং বেদ ইত্যাদি প্রণেতা মহাভাগদিগের যে কতদূর অভিপ্রেত, তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, প্রত্যেক স্থলে না হয় কোন কোন স্থলে যে বৈজ্ঞানিক কিম্বা আধ্যাত্মিক অর্থ বেশ যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। পুরাণাদির আগাগোড়া বৈজ্ঞানিক কিম্বা আধ্যাত্মিক অর্থ করা, আর খৃষ্টান গোঁড়া পাদ্রি মহাশয়দিগের ইলিয়া ও ওডেশীতে সম্পূর্ণ বাইবেল অন্তর্নিহিত দেখা, উভয়ই সমান। দুইই বাড়াবাড়ি।

হইতে পারে পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিক অর্থ সমুদয় সাধারণতঃ দেখিতে গেলে উষ্ণতানিবন্ধন বিকৃত-মস্তিষ্ক-নিঃসৃত কল্পনার বৃথা জল্পনা মাত্র। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অতি প্রাচীন কাল হইতেই আছে এবং তদ্বিষয়ে আর কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই। এগুলিছাড়া সকলেই জানেন যে

আজ অমুক তিথি, সুতরাং অমুক জিনিসটা খাইতে নাই। ইহাতে যে শারীরতত্ত্বের সহিত পদার্থ বিদ্যার ও রাসায়নিক নিয়মাবলীর যোগ আছে, তাহাও নিঃসংশয়। আর ঐ সমুদয় জিনিসের গুণাগুণও যে প্রাচীন হিন্দুরা জানিতেন না, তাহাই বা কে অস্বীকার করিবে? একাদশী করা একটী বিজ্ঞান-সম্মত কায। কাঁসার পাত্রে অম্ল কিম্বা নারিকেল জল খাইতে নাই, দুধে লবণ খাইতে নাই, ইত্যাদি সকলেরই মূলে বিজ্ঞান আছে। সমুদয়ই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নিয়মাধীন। তাম্র পাত্রে রাঁধিয়া খাইতে নাই। কারণ, উহাতে রাঁধিলে জিনিস বিষাক্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সেই জন্যই বড় বড় তাম্রপাত্র (ডেগ্) কলাই করা হয়। শুনা গিয়াছে যে ঐ পাত্রের কলাই উঠিয়া যাওয়া সত্বেও অসতর্কভাবে রাঁধিয়া ভোজন করায় কয়েকটী বড় বড় লোক অকালে মারা গিয়াছেন। এই জন্যই হিন্দুদিগের মধ্যে তাম্রপাত্রে রাঁধিয়া খাইবার প্রথা বহু পূর্ব্বকাল হইতেই প্রচলিত নাই। সকলেই জানেন যে হিন্দু দেব দেবীর মন্দিরের চূড়ার উপর লৌহ-ত্রিশূল পোঁতা থাকে। কারণ, বজ্র পতিত হইয়া সচরাচর লৌহদ্বারা আকৃষ্ট হয়, সুতরাং মন্দির ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা অনেকটা কমিয়া যায়। এগুলি কি বৈজ্ঞানিক-জ্ঞান পরিচায়ক নহে? তৈল মাখিয়া স্নান করা কি বৈজ্ঞানিক কায নহে? জলে বায়ু দমন করিয়া শরীর স্নিগ্ধ করে। তৈলে স্নিগ্ধ করে, গায়ের দুর্গন্ধ নষ্ট করে, এবং শরীর হইতে তৈলবৎ উপকারী পদার্থ বেশী বাহির হইতে দেয় না। প্রাতঃকালে উঠানে গোবর-জল ছড়ান ও ঘর গোবর দেওয়া ইত্যাদি অতি সামান্য কাযও কি বিজ্ঞান-সম্মত নহে? গোবর একটী উৎকৃষ্ট সুলভ দুর্গন্ধনাশক জিনিস। এ সমস্ত ব্যতীত ব্রাহ্মণের প্রত্যূষে শয্যা হইতে উত্থান, প্রাতঃস্নান, ও পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া আহ্নিক পূজাদি প্রাত্যহিক শাস্ত্রসম্মত প্রায় কাযই এবং মৃত্যুর পর ক্রিয়াদি একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে প্রাচীন হিন্দুরা কত গভীর বিজ্ঞানবিৎ ছিলেন। এগুলি ছাড়া প্রাচীন হিন্দুদিগের বিজ্ঞান-জ্ঞান-পরিচায়ক অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, এই সমুদয় বিষয় নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বিজ্ঞান-জ্ঞান অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত থাকায় হিন্দুদিগের অস্থিতে-অস্থিতে তাহা বসিয়া গিয়াছিল। এবং তন্নিবন্ধনই বোধ হয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রখর স্রোতের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ইহা তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ নূতন বলিয়া বোধ হইত না। সুতরাং তাঁহারা বিজ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব সমুদয় জানিতেও তত ব্যগ্র হইতেন না। বোধ হয় এইরূপে বিজ্ঞান-চর্চ্চা অনেকটা কমিয়া আইসে, এবং সেই জন্যই বিজ্ঞানের উন্নতি-পথে কণ্টক রোপিত হয়। এক্ষণে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান-প্রভাবে প্রায় সমুদয় বিষয়েরই বৈজ্ঞানিক নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে লোকের মন ধাবিত হইতেছে।

বিজ্ঞান-শিক্ষা এবং তাহার উন্নতি

সাধন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ও আনুষঙ্গিক পরীক্ষাদির উপর নির্ভর করে। এই সমুদয় পরীক্ষা ও যন্ত্রাদি ব্যয় এবং সময় সাপেক্ষ। মুসলমানদিগের অত্যাচারে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদি করা দূরে থাকুক, লিখিত অন্যান্য পুস্তকগুলিই সম্পূর্ণরূপে রক্ষা হয় নাই। হিন্দু মনোবিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদির এত উন্নতির এবং পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করার কারণ বোধ হয় যে, মতিমান্ হিন্দুরা নির্জ্জন স্থানে কিম্বা পর্ব্বত গুহাদিতে বাস করিতেন এবং তথায় দর্শনাদির বিশেষ চর্চ্চা করিতেন। কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞান ইত্যাদির উন্নতি সাধন এইরূপ নির্জ্জনে হওয়া অসম্ভব, এবং সেই জন্য বোধ হয় আমরা এগুলিতে বিশেষ পশ্চাৎ-পদ। যাঁহারা বেদ, পুরাণ, মনোবিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা শাস্ত্রাদি অতি গুরুতর দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থ সমুদয় প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যে পদার্থ বা জড়বিজ্ঞান বুঝিতেন না, ইহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না।

শিক্ষার কালগত পার্থক্য।

বর্ত্তমান কালে তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি কৃতবিদ্য-সমাজে প্রাচীন প্রথা স্বপ্নদর্শনের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। স্থলবিশেষে আবর্ত্তিত মস্তিষ্ক যুবকগণ আশ্চর্য্য সভ্যতা এবং অভিনব বিচিত্র জ্ঞানের প্রভাবে প্রাচীন প্রথাকে অসার-যুক্তিবিহীনরূপে প্রতিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মুখকমল-বিনিঃসৃত এক একটি মাত্র অমৃতময় তরুণ বাক্য অবলম্বন করিয়া, প্রাচীন কালের যাবতীয় সদ্‌বস্তুকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিতেও অনেক মহাত্মা প্রস্তুত। এ অবস্থায় বাঙ্গালীর সর্ব্বস্ব ধন প্রাচীন প্রথার উত্থাপন কেন? আমরা এ প্রশ্নের অন্যবিধ উত্তর দিতে সম্মত নহি, তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, বিস্তৃত ভারতভূমি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যাইবে, নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যেও যাঁহারা পরিণত এবং স্থির-মস্তিষ্ক; ধীর ও শান্ত, সত্যবাদী এবং প্রকৃত অপক্ষপাতী, তাঁহারা প্রাচীন প্রথার যথার্থ মর্য্যাদা গ্রহণে সক্ষম, এবং এই শ্রেণীর অভিভাবকের শিশুগণও ইহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া অসুখী হইবে না।

পূর্ব্বকালে প্রাণ, ধন এবং পরলোক-চিন্তেপ্সু বুদ্ধিমান অধ্যয়নার্থীগণ কার্য্যের গুরু লাঘব, কর্ম্মফল, অনুবন্ধ এবং দেশ, কাল ও যুক্তিমূলে ভবিষ্যতের শুভাশুভ বিচার করিয়া, আপনার পাঠ্যগ্রন্থ আপনি নির্ব্বাচন করিয়া লইতেন। অপরের দ্বারা বিশেষ বিবেচনার সহিত পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইলেও, তাহা সম্পূর্ণ কল্যাণকর হওয়া অসম্ভব। কেন না যুগপৎ বহু প্রকৃতির সাম্য হইতে পারে না। এজন্য তৎকালে অধুনাতন কালের ন্যায় ক্ষীরাব্ধ

শিশুর হস্তে দর্শন বিজ্ঞানের সন্মান বৃদ্ধি করিবার প্রথা ছিল না। সে সময় শিশুগণ পিতার মুখে তৎকালোচিত অবশ্য-জ্ঞাতব্যের অনেকাংশ আয়ত্ত করিয়া লইতে পারিতেন। অতঃপর পিতার আন্তরিক পরিশ্রমের ফলে, বালকের অন্তরে ক্রমে হিতাহিত জ্ঞানের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইত, কিন্তু তখনও বোধ হয় তাহার বর্ণজ্ঞান হয় নাই। এইরূপে সহজেই বালক বিনীত হইত, এবং হিতাহিত জ্ঞানের দ্বারা ক্রমে সকল বিষয়েই চিন্তা করিবার ক্ষমতা পাইত। যখন পূর্ব্বকালের শিশু এই অবস্থায় উপনীত, তুলনা করিয়া দেখিলে, সে বয়সে এখনকার অনেক বালক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নাসা কর্ণের শোভা সম্বর্দ্ধনে সমর্থ। এইরূপে কিঞ্চিৎ জ্ঞানের বিকাশ হইলে, বয়স্থ শিশু আপন পাঠ্য এবং অধ্যাপক মনোনীত করিয়া, পিতার আদেশ লইয়া অধ্যয়নে নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু এখন নবীন জ্ঞান এবং বিদেশীয় সভ্যতার পূর্ণ প্রাদুর্ভাবের সময় কোন মূর্খ অভিভাবক আপন স্নেহের শিশুকে এত দীর্ঘকাল বিদ্যালয়ে না দিয়া স্থির থাকিতে পারেন? বালকের প্রকৃতি-জ্ঞানে যাঁহারা অনভিজ্ঞ, তাঁহারাই সেই বালকের পাঠ্য নির্ব্বাচক, আবার তত্তুল্য সম্প্রদায় বিশেষ আবার তাহার শিক্ষক নিযুক্ত থাকাতে, বর্ত্তমান কালে যদিও অস্মদ্দেশীয় বালকগণ তীব্র মেধা শক্তি এবং অসাধারণ পরিশ্রম প্রভাবে অতি অল্প কালেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন বটে, কিন্তু কিছু দিন পর অনুসন্ধান করিলে, বুঝিতে পারা যাইবে যে, "বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীত পুস্তকই অনেকের নিকট স্বপ্ন দৃষ্টের ন্যায় উপলব্ধ হইতেছে"।

পূর্ব্বকালের নিয়ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল, ছাত্রের বয়স, পাঠ্য নির্ব্বাচন, শিক্ষক এবং শিক্ষাকার্য্য সমুদয়ই সে সময়ে স্বতন্ত্র ছিল। অধিক বয়সে পাঠে নিযুক্ত হইত বলিয়া, পঠদ্দশাতেও কেহ শীঘ্র অব্যাহতি পাইতেন না, নয় বৎসর, অষ্টাদশ বৎসর, এমন কি কেহ বা ষট্ত্রিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত নিয়ত গুরু-শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিতেন। অতঃপর গুরুর অনুজ্ঞাক্রমে পাঠ সমাধা হইলে পুনঃ পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। এ কথায় অনেকে হয়ত বলিতে পারেন, "এখন অনেকের জীবনই ৩৬। ৩৭ বৎসরে শেষ হইয়া যায়"। কথাটা বড় মিথ্যা নয় বটে, কিন্তু বুদ্ধিমান অভিভাবকের এ কথা উত্থাপন করিতে লজ্জিত হওয়া উচিত। বালকগণের এরূপ অল্পায়ু হওয়ার কারণরূপে আমরা পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকগণকেই প্রধানতঃ নির্দ্দেশ করি। বালকের অদূরগামিনী বিবেচনা-শক্তি প্রভাবে সে নিজের হিত অন্বেষণ করিতে কদাচ সম্পূর্ণ সক্ষম হইতে পারে না। পিতামাতাই তাহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ শুভাশুভের একমাত্র বিধাতা। অপরিণত-মস্তিষ্ক শিশুর আবার স্বাধীনতা হরণ করিলে কি দোষ হয়, আমরা ত বুঝিয়া উঠিতে পারি না, এখনকার অভিভাবকগণ পাপের সুদূরে অবস্থিত, তাই তাঁহারা বালকের স্বাধীনতা হরণ করিয়া পাপ সঞ্চয় করিতে বড়ই নারাজ। আমরা বলি, বালক বয়স্থ

হউক, বিদ্যালয়ের শীর্ষ-দেশে উন্নীত হউক, তথাপি সে বালক, তাহাকে স্বাধীনতা প্রদান যত দোষাবহ, স্বাধীনতা হরণ তত ভয়ানক নহে। প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে অভিভাবকগণ সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন, অজ্ঞান-প্রণোদিত হইয়া স্বাধীনতা পরিচালন করিলে বালকগণ কোন্ বিপদকে আলিঙ্গন করিতে না পারে?

পূর্ব্বকালের পিতামাতাগণ আপন আপন পুত্রের প্রতি কেবল কর্কশ ব্যবহার করিতেন কি কেবল মধুর ব্যবহারেই তাঁহারা শিশুদিগের পূজা করিতেন তাহা আমরা বলিতে ইচ্ছা করি না, তবে এই আমাদের বক্তব্য যে, পিতামাতার দৃষ্টি তাহাদের প্রতি সর্ব্বদা প্রখর থাকিত, ভয়ে ভালবাসায় বালক ও পিতামাতা, ভিন্ন বুঝিত না।

পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিক্রমে বালক বয়স ও কিঞ্চিৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, স্থির চিত্তে শাস্ত্র, এবং গুরু মনোনীত করিতেন। যে শাস্ত্র যশস্বী এবং ধীর পুরুষগণের সেবিত, যাহা অর্থ-বহুল, আপ্তগণের পূজিত, যাহা উত্তম, মধ্যম ও অধম বুদ্ধি শিষ্যের সুখবোধ্য, যাহা পুনরুক্তার্থ দোষ বর্জ্জিত, যাহা আর্ষ এবং যাহাতে সূত্র, ভাষ্য ও সংগ্রহের ক্রম অতি সুন্দর, সুবিন্যস্ত পরিচ্ছেদ, প্রাচীন শব্দে গ্রথিত, যাহা শ্রুতিকটুত্বহীন, উচ্চারণ-কষ্ট বিরহিত, যাহা প্রায়োভিহিত, যাহা ক্রমাগতার্থ এবং অর্থতত্ত্ব বিনিশ্চয়ে প্রধান; সংগতার্থ, অসঙ্কুল প্রকরণ, আশু প্রবোধজনক, লক্ষণ এবং উদাহরণবিশিষ্ট, সেই শাস্ত্র পাঠার্থে পূজনীয়। এবম্বিধ শাস্ত্র নির্ম্মল আদিত্যের ন্যায় বালকের অজ্ঞানান্ধকার ক্ষিপ্র বিনাশে সমর্থ হয়।

বর্ত্তমান সময়ে খাতিরে প্রায় সব চলিতেছে, বিদ্যালয়ের কর্ত্তাগণ যে পুস্তক প্রণয়ন করিবেন, তাহাই সসম্মানে পাঠ্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিবে। সে বিষয়ের তন্ন তন্ন করিয়া দোষগুণ বিচার করা হয় কি না, সে বিষয়ে আমাদের অনেকটা সন্দেহ থাকিয়া যায়। অধিকাংশ স্থলেই এই প্রকারে পাঠ্য মনোনীত হইয়া থাকে, কিন্তু পড়িবার সময় ইহারও আদ্যন্ত শেষ করিতে হয় না, কোনখানির অর্দ্ধাংশ, কোন পুস্তকের এক তৃতীয়াংশ, কোন পুস্তক বা ২। ৪ পাত পড়িয়াই শেষ করিতে হয়। ইহাতে ছাত্রের সুবিধা অবশ্যই হয় না, অভিভাবকও পুস্তকের মূল্য দিতে দিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠেন।

অনন্তর গুরু-পরীক্ষা। অভীপ্সিত বিষয়ে কাহার জ্ঞান নির্ম্মল, কে শাস্ত্রার্থ-বিন্যাসে তৎপর, সর্ব্বকর্ম্মে সুনিপুণ, অনুকূল স্বভাব, শুচি এবং বহু শাস্ত্রাদিবিশিষ্ট, সর্ব্বেন্দ্রিয়-সম্পন্ন, প্রকৃতিজ্ঞ, প্রতিপত্তিশালী, পর্য্যবদাতবিদ্য, অনসূয়ক, অকোপন স্বভাব, ক্লেশক্ষম, জ্ঞাপন সমর্থ এবং শিষ্য-বৎসল, এই সকল সম্পদ্ দেখিয়া গুরু মনোনয়ন করা হইত। এতাদৃশ গুরু সুক্ষেত্রে আর্ত্তব-মেঘ প্রভাবে শস্য গুণের ন্যায় শিষ্যকে শীঘ্র সদ্গুণ বিভূষিত করিয়া তুলিতেন।

বর্ত্তমানে এ প্রথা নাই, উপাধিধারী শিক্ষক, যদি বিলাসিতায় মূর্ত্তিমান অবয়ব

স্বরূপ হয়েন; তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই; কেবল অধ্যাপকের পবিত্র আসনে উপবিষ্ট মাত্র দর্শনে, তাঁহার বাক্য পঞ্চম-বেদস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার গোপনীয় চরিত্র ঘৃণিত হউক, তিনি ধূর্ত্ত, প্রতারক, দুর্নীতিপর যাহাই কেন হউন না —অধ্যাপনায় তাঁহার পারদর্শিতা থাকুক বা না থাকুক, কিছু দেখিবার পদ্ধতি প্রায় নাই। যদিও কখন ভাগ্যক্রমে ইহাঁদের প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়, কিন্তু তাহাতেও তত সুফল হয় না, এক স্থান হইতে স্থানান্তরিত হইলেন, একটী বিদ্যালয়ের সর্ব্বনাশ করিয়া আর একটীতে হস্তক্ষেপ করিলেন। প্রকৃত পক্ষে শিক্ষকের কার্য্য বালকদের অনুকরণীয় হওয়া চাই, কেবলমাত্র মৌখিক বা পুস্তকগত উপদেশ সকলের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। শিক্ষক নির্ব্বাচনকালে তাঁহার গুপ্ত চরিত্র বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্যের অতিরিক্ত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। অনুপযুক্ত শিক্ষক কখনই এ সমাজে আসন পাইবার অধিকারী নহেন।

অতঃপর শিষ্য। শিষ্যের পূর্ব্বকালে বড় কষ্ট ছিল। বিনা কষ্টে বিদ্যা লাভ হয় না সত্য, কিন্তু পূর্ব্বতন কালে ছাত্রদের এত কষ্ট পাইতে হইত যে, স্মরণ করিয়া অনেক সময় অশ্রুবেগ সম্বরণ করা দুরূহ হইয়া উঠে। কিন্তু তাহা না হইলে ভারতে ব্যাস, বশিষ্ট, পরাশর প্রভৃতি মহর্ষিগণের আবির্ভাব হইত কি না সন্দেহ। এই কষ্টের ফলেই ব্যাস বশিষ্ট প্রভৃতি আর্য্যঋষিগণের গৌরব-আবহমান কাল সমান চলিয়া আসিতেছে। তেমনি অনন্ত সম্মানের সহিত তাঁহারা জগতে শত্রু মিত্রের নিকট সমান পূজা পাইয়াছেন—রাজা তাঁহাদের প্রভাবে তটস্থ—পাপী তাঁহাদের নামে কম্পপ্রায়,—জ্ঞানী এবং সাধু তাঁহাদের দর্শনে এক হৃদয়ে আনন্দ রাখিবার স্থান পাইতেন না। এমন শিক্ষালাভ করিতে হইলে কত সময় লাগে, কত কষ্ট পাইতে হয়, এই সমুদয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে পাঠের কষ্টকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা হয়। কর্ম্মের অনুরূপ ফল চির দিন চলিয়া আসিতেছে, এখনও তাহাই আছে। এখন সুখের বিদ্যা, পরিণামের ফলও তদনুরূপ।

প্রাচীন কালের প্রশান্ত, আর্য্যপ্রকৃতি, অক্ষুদ্রকর্ম্মা, ঋজুচক্ষু, ঋজুমুখ, ঋজুনাস, তনু রক্ত এবং বিশদ জিহ্ব, অবিকৃত দন্তৌষ্ঠ, অমিন্মিন, ধৃতিমান, মেধাবী, বিতর্ক এবং স্মৃতিসম্পন্ন, উদারচেতাঃ তত্ত্বাভিনিবেশী, অহীনাঙ্গ, অব্যাপন্নেন্দ্রিয়, অনুদ্ধত, অর্থতত্ত্বভাবক, অব্যসনী, অকোপন, এবং শীল, শৌচ, আচার, অনুরাগ, দাক্ষ্য ও দাক্ষিণ্যাদিগুণযুক্ত, অধ্যয়নাভিকাম, অর্থবিজ্ঞানে অনন্যকার্য্য, অলুব্ধ, অনলস, আচার্য্যশাসনেতৎপর, এবং গুরু অনুরক্ত শিষ্য, সুশিষ্যের মর্য্যাদা পাইতেন।

বর্ত্তমান সময়ে ছাত্র সম্বন্ধে এরূপ কোন নিয়ম নাই, মানুষের আকার হইলেই হইল, স্কুলে যাও, মাসে মাসে নির্দ্দিষ্ট বেতন দাও, পড়াইতে আপত্তি নাই। ভাল হয় তোমার হইবে, মন্দ হয় তোমার হইবে—সে জন্য দায়ী কেহ হইবে না, কিন্তু বেতন

দেওয়া চাই। এইরূপ নিয়ম প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত; কেবল বাঙ্গালী ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা চতুষ্পাঠীতে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন নাই, কিন্তু সতেজ জ্ঞানে বঞ্চিত না হইলে, এতদিন তাঁহারাই কি এবম্বিধরূপে পূর্ব্ব সংস্কারকে মার্জ্জিত করিতে ক্ষান্ত হইতেন? যাক, আমরা ভাল মন্দ বলিতে উদ্যত হই নাই, সুতরাং পাঠকই এ সমালোচনার ভার স্বয়ং লইবেন। তবে আমরা বলি, ছাত্রদের জন্য একটী পরীক্ষক সমিতি থাকা আবশ্যক, বিদ্যালয়ে প্রবেশকালে, অপক্ষপাতে তাহাদের অধীত পুস্তক এবং স্বভাবের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া, তাহারা যে বিভাগে অধ্যয়নের উপযুক্ত হইবে, সেই বিভাগে যাইবার জন্য তাহাদিগকে উপদেশ করিয়া দিতে হইবে। এইরূপ হইলে, অনর্থক স্কুলের বেতন ও পুঞ্জ পুঞ্জ পুস্তক ক্রয়ের দায়ে অভিভাবককে বিব্রত হইতে হয় না, এবং ছাত্রেরও একেবারে পরকালের সর্ব্বনাশ হইতে পায় না।

অতঃপর গুরু শিষ্যে সত্যতা,—অগ্নি এবং পূজনীয় বেদমন্ত্র ও ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে সাক্ষী করিয়া যথাবিধানে গুরু সন্নিধানে উপনীত শিষ্য, গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইবেন। "বৎস! তুমি আমাকে পিতার ন্যায়—অগ্নির ন্যায়—রাজার ন্যায়—দেবতার ন্যায়—ভর্ত্তার ন্যায় সম্মান করিবে, আমার বাক্যে তোমার কিছুমাত্র অকার্য্য থাকিবে না, কেবলমাত্র রাজদ্বিষ্ট কর্ম্ম, প্রাণহরকর্ম্ম, এবং বিপুল অধর্ম্মজনক কর্ম্ম এবং আমি যদি অনর্থপ্রযুক্ত কোন কর্ম্ম আদেশ করি, তাহা তুমি বিবেচনা করিবে। ব্রহ্মচারী, শ্মশ্রুধারী, সত্যবাদী, অমাংসাশী, অমধ্যসেবী, নির্ম্মৎসর ও অশস্ত্রধারী হইবে, তোমার সমুদয় আমাতে অর্পিত থাকিবে, তুমি সর্ব্বদা আমার প্রিয় এবং হিতে নিযুক্ত থাকিবে; সমুৎসুকচিত্তে অবহিত এবং অনন্যমনা হইয়া, বিনীতভাবে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনাপর অনসূয়ক হইয়া, আমার অনুজ্ঞাক্রমে বিচরণ করিবে। আমার অনুজ্ঞাতে অথবা অননুজ্ঞাতেও যদি কখন বিচরণ কর, তাহা হইলে প্রথমতঃ আমার প্রয়োজনসিদ্ধি বিষয়ে যথাশক্তি যত্ন করিবে। ঐহিকে কর্ম্মসিদ্ধি, অর্থসিদ্ধি এবং যশোলাভ ও পরলোকে স্বর্গকামনা করিয়া, তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রাণীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিবে। মনে মনেও কখন পরস্ত্রী গমন করিবে না, এবং কোন প্রকারে পরস্ব অপহরণ করিবে না। নিভৃত স্থানে বেশ ও পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিবে, সর্ব্বদা সত্য ধর্ম্ম্য, শর্ম্ম্য, ধন্য, হিত এবং মিত বাক্য বলিবে" ইত্যাদি। শিষ্যের প্রতি এবম্বিধ উপদেশান্তে নিজেও অগ্নি এবং বেদ সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিবেন, "আমি ও যদি তুমি সম্যক্ বর্ত্তমান থাকিলে, অন্যথাচরণ করি, তাহা হইলে পাপভাগী হইব এবং আমার বিদ্যা স্ফূর্ত্তি পাইবে না। অন্যথাচরণে তোমারও এই দশা হইবে।"

বর্ত্তমান কালের অধ্যাপক এরূপ একটী কথা ছাত্রের নিকট বলিতে সাহস পান কি? পিতা পুত্রের ভাব ছাড়িয়া, গুরুশিষ্যের অনেক স্থলে বয়স্য ভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে। নতুবা শিক্ষক মহাশয়দিগের

মর্য্যাদা থাকেনা কি? যাহা হউক, আমরা এ ব্যাপারে ছাত্রের সম্পূর্ণ দোষ দিতে পারি না, শিক্ষকের প্রশ্রয় ব্যতীত যথেচ্ছা দুর্ব্বিনীত ব্যবহার করিতে ছাত্র কখনই সাহস পায় না। ২।১টী ছাত্র স্বভাবতঃ উদ্ধত স্বভাব হইলেও শিক্ষকের স্নিগ্ধ গম্ভীর তর্জ্জন বাক্যে ক্রমে বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা এবং আপনার কর্ত্তব্যে অভিজ্ঞ হইয়া উঠে। এই ক্ষেত্রে যদি শিক্ষকের প্রশ্রয় পায়, তাহা হইলে শিক্ষক মহাশয়দিগের মাথায় চড়িতে ছাড়িবে কেন?

অনেকে হয়ত বলিবেন, "পূর্ব্বকালে ব্যায়াম শিক্ষার পদ্ধতি ছিল না, বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদিগকে এ শিক্ষার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।" আমরা এ কথার আদর করিতে পারি না। পূর্ব্বকালে ব্যায়াম শিক্ষার পদ্ধতি একেবারে ছিল না, একথা অগ্রাহ্য। ছিল বটে, তবে প্রণালীগত পার্থক্য বিস্তর। এখনকার ব্যায়াম শিক্ষার মূল হস্ত পদাদি অঙ্গ সঞ্চালন মাত্র, পূর্ব্বকালে অন্য একটী কর্ম্মশিক্ষা ব্যায়াম শিক্ষার মূলে নিহিত ছিল। কোন দিন গুরুর ধেনু লইয়া শিষ্য বনে চলিলেন, কোন দিন যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণার্থ বনে বনে বৃক্ষে বৃক্ষে বেড়াইয়া, গুরু-কার্য্য উদ্ধার করিয়া আসিলেন, কোন দিন বা গুরুর শস্যক্ষেত্রের আবশ্যকীয় কার্য্য আদেশানুসারে সম্পন্ন করিয়া আসিলেন। এ সমুদয় কি ব্যায়াম পদ বাচ্য নহে? ব্যায়ামের কার্য্যত ইহাতে হইতই, অধিকন্তু ভবিষ্যতের জন্য অনেক নূতন বিষয়ে জ্ঞান জন্মিত।

এখন পাঠকবর্গকে জিজ্ঞাসা করি, কোন কালের শিক্ষাপ্রণালীর আপনারা পক্ষপাতী? আমরা ইহার ভাল মন্দ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই, সুতরাং নিজের মতামত প্রকাশের প্রয়োজনও নাই, আপনারাই বিবেচনা করিয়া অহিতাংশ পরিত্যাগ এবং হিতাংশ গ্রহণ করুন।

গুরু ও শিষ্য—প্রাচীন ও আধুনিক।

আজকাল বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে যেমন সুবিধাকর রীতি প্রচলিত হইয়াছে, পুরাকালে তেমন ছিল না। এক্ষণে বিদ্যালয়ের যেপ্রকার বাহুল্য, সেকালে তদ্রূপ ছিল না। এখনকার অধিকাংশ শিক্ষক কোট পেণ্টালুন ইত্যাদি সভ্যতা বিকাশক পরিচ্ছদে গাত্রাবরণ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সংসাধন মানসে নিয়মিত সময়ে বিদ্যামন্দিরে প্রবিষ্ট হন। কোন কোন শিক্ষক মহাশয় যদিও বা দুর্ভাগ্যবশতঃ কোট পেণ্টালুনের ভার বহনে অসমর্থ, তথাপি যাঁহার যেরূপ যুটিয়া উঠে পরিচ্ছদের উপরে একটু তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ত্রুটি করেন না। পাঠশালার অবস্থাও ঠিক তদুপযোগী। গৃহটি পাকা হওয়া আবশ্যক, এমন কি গৃহের পাকা বন্দোবস্ত না হইলে গবর্ণমেণ্টও

সময় সময় সাহায্যদানে সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন। শিক্ষক মহাশয়ের বসিবার আসন চেয়ার, সম্মুখে সুসজ্জিত ত্রিপদ বা চতুষ্পদ টেবিল, ছাত্রদিগের আসন বেঞ্চ, আবার পুস্তকাদি রাখিবার জন্য লম্বা টেবিল। দেয়ালের গায় সময় নির্দ্ধারক যন্ত্র লম্বমান থাকিয়া বিজ্ঞানের বিস্ময়কর মহিমা বিঘোষণ ক্রমে অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে কর্ত্তব্য কার্য্যের সময় বলিয়া দিতেছে, উপরে পাখা দুলিতেছে। এদিকে বিদ্যালয়ে যাইবার সময় সমুপস্থিত। ছাত্রগণ অশেষবিধ বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হইতে লাগিলেন, তাড়াতাড়ি চিরুণী প্রহারে চুলগুলিকে সতর্ক করিয়া লইলেন, কেহ কেহ বা গাড়ী ঘোড়া বা পাল্কী আরোহণে, কেহ বা পদব্রজে বুকে ঘড়ি দুলাইয়া, তাম্বূল-রাগে অধর-পল্লব সুরঞ্জিত করিয়া নবাবের মত বিদ্যালয়ে গমন করিলেন। এমন কি কোন কোন মহাত্মার পকেটে চুরট ইত্যাদি ধুম-পানের সরঞ্জামও দৃষ্ট হয়। শিক্ষক মহাশয় চেয়ারে বসিয়া (হয়ত টেবিলের উপর পাদদ্বয় উঠাইয়া দিয়া) পাঠ্য পুস্তক হাতে লইয়া পাঠ করিতেছেন, কেহ বা ঘুমাইতেছেন, আর শিষ্যদিগকে যথোপযুক্ত উপদেশ দিতেছেন। ছাত্রগণ মধ্যে কেহ কেহ প্রগাঢ় মনোযোগ সহকারে উপদেশ বাক্য আয়ত্ত করিয়া লইতেছেন, কেহ বা বাজে গল্প করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার এবং পিতামাতার অর্থ ব্যয়ের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া লইতেছেন। এইক্ষণে, একবার সে কালের অধ্যাপক এবং শিষ্যদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবেক যে, শিক্ষকগণের পরিচ্ছদের পারিপাট্য একেবারেই নাই—একমাত্র গেরুয়া কৌপীনই অনেকের লজ্জা নিবারণের প্রধান উপকরণ, আবার কেহ কেহ বা উলঙ্গাবস্থায়ই অবস্থান করিতেছেন। শিষ্যগণও সর্ব্বতোভাবে অধ্যাপক মহোদয়ের অনুগামী। উপাধ্যায়গণ ঋষি তপস্বী, যৎসামান্য পর্ণকুটীরে অথবা বৃক্ষতলে বাস করিতেছেন। বিদ্যাশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র স্থানের বন্দোবস্ত নাই, অধ্যাপকের আবাসই অধ্যাপনার স্থলরূপে পরিগণিত। অধ্যাপক মৃত্তিকাবেদীতে পবিত্র কুশাসনে উপবিষ্ট আছেন, অন্তেবাসিগণ চতুর্দ্দিকে সামান্য আসনে বসিয়া উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছেন।

তখনকার বিদ্যা ছিল জ্ঞানকরী, আর বর্ত্তমান সময়ের বিদ্যা অর্থকরী; তখন যিনি যাহা শিক্ষা করিতেন তাহা একেবারে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন, অধীত-শাস্ত্রালোচনা সময়ে কাহাকেও কোন গ্রন্থের সহায়তা লাভ জন্য প্রয়াস পাইতে হইত না। বর্ত্তমান সময়ের অনেক কৃতী লোককেও শাস্ত্রবিবাদ সময়ে গ্রন্থের সাহায্য প্রার্থনা করিতে দেখা যায়; যেন তেন প্রকারে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য, তাহাতে পুস্তকগত জ্ঞানই বদ্ধমূল হইবার কথা। এখন স্কুল কলেজে যাও, দেখিতে পাইবে, অধ্যাপক মহাশয় উপদেশ দিতেছেন, এমন সময় হটাৎ তিনি থামিয়া গেলেন; জিজ্ঞাসা কর, তিনি তোমাকে অম্লান-বদনে উত্তর দিবেন "আমি আর পড়িয়া আসি নাই"। তখনকার কোন অধ্যাপককে এরূপ উত্তর

দিতে শুনিয়াছ কি? সে কালে অধ্যয়ন সময়ে যদি কোন শিষ্য মুখে মুখে টীকা টিপ্পনী সহ সমগ্র শাস্ত্রপাঠে অসমর্থ হইতেন, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং কালী কলম ও তাল পত্রাদি সংগ্রহ করিয়া লইতেন এবং উপদেশ বাক্যগুলিকে গ্রন্থাকারে লিখিয়া লইতেন; কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত সমগ্র শাস্ত্র তাঁহার কণ্ঠস্থ না হইত এবং তিনি অধীত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হইতেন, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি ছাত্রাবস্থায়ই থাকিতেন। বর্ত্তমান সময়েও যদি বিদ্যাশিক্ষার মূলে অর্থলালসা প্রবলা না থাকিত, তবে কখনও অধ্যাপক মহাশয়কে অধ্যাপনা কালে এত ব্যতিব্যস্ত হইতে দেখা যাইত না।

অধুনা ছাত্রদিগকে মুদ্রিত পুস্তক পাঠ করিতে হয়। পুস্তক-লিখন-জনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। আবার প্রত্যেক পুস্তকের ব্যাখ্যাও পুস্তকাকারে মুদ্রিত আছে, তাহাও ক্রয় করা আবশ্যক, যদি কোনও অভিভাবক দরিদ্রতা নিবন্ধন অর্থের অনাটন দেখাইয়া আপনার অধীন বালককে ব্যাখ্যাপুস্তক লিখিয়া লইতে অনুমতি করেন, বালক অমনি উত্তর করিবে "ব্যাখ্যা হাতে লিখিয়া পড়িতে গেলে সময়ে পোষায় না।" আহা! ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়!! ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ রাশি রাশি গ্রন্থ হাতে কলমে লিখিয়া লইতেন, তাহাতেও অধ্যয়ন এবং গুরু সেবার জন্য প্রচুর সময় পাইতেন। আর আজ তাঁহাদের পরবর্ত্তী ছাত্রগণ দুই একখানা বহি লিখিয়া লইতে সময় পাইতেছেন না। তবে কি সত্য সত্যই সময়ের অল্পতা ঘটিয়াছে? না, কখনও না, আজ কালও গ্রাম্য চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ কর, দেখিবে, সেখানে ছাত্রগণ মুদ্রিত পুস্তককে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছেন, তাঁহারা স্বয়ং তালপত্র আহরণ ও কালী কলম প্রস্তুত করিয়া স্বচ্ছন্দে আপন আপন পাঠ্য পুস্তক লিখিয়া পাঠ করিতেছেন। যদি সময়ের অল্পতাই সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের কুলায় কি প্রকারে? এখনকার ছাত্রদিগের জন্য দোকানে কালী কলম কাগজ প্রস্তুত রহিয়াছে, কিন্তু সময় নাই!! ইহা কি আমাদের ছাত্র বন্ধুদের অলসতার বিষময় ফল নহে? সহোদর দুইটি ভ্রাতার ছাত্র জীবন তুলনা কর, দেখিবে কত দূর পার্থক্য রহিয়াছে। জ্যেষ্ঠ টোলে সংস্কৃত পড়েন, তাঁহার কোন সাজ সজ্জা নাই। উপাধ্যায়ের আলয়ে থাকেন, যখন যাহা জোটে তাহাই খাইতেছেন, পাঠ্য পুস্তকগুলি লিখিয়া লিখিয়া পড়িতেছেন, উপাধ্যায়ের শিশু-কন্যাগুলিকে কোলে করিয়া বেড়াইতেছেন, অধ্যাপককে তামাক সাজিয়া দিতেছেন ইত্যাদি। বেশ নিরীহ ভাব, মনের সুখে সবল শরীরে কালাতিপাত করিতেছেন। কনিষ্ঠ স্কুলে পড়েন, তাঁহার পুস্তকের ব্যয় দূরে রাখ, জুতা মোজা আয়না চিরুণী ইত্যাদির বাহুল্য ব্যয় কত—বাবুর দুগ্ধ, বিশেষ আলোর বন্দোবস্ত, না হইলেই চলে না। ও দিকে জ্যেষ্ঠ বেগুনসিদ্ধ ভাত খাইয়া বাঁশপাতা জ্বালাইয়া আলোতে পাঠাভ্যাস করিতেছেন, এ দিকে কনিষ্ঠের ল্যাম্পে চিমনী না থাকিলে চসমার দর-

কার। জ্যেষ্ঠকে একটি পয়সাও দিতে হয় না, কনিষ্ঠের মাসিক বৃত্তি পাঠাইতে এক দিন বিলম্ব হইলে তো আর রক্ষা নাই—পত্রের উপর পত্র আসিতে লাগিল। বাবু তেলে বেগুণে জ্বলিয়া লিখিতেছেন;—"শীঘ্র টাকা পাঠাও, অন্যথা স্থানান্তরে চলিয়া যাইব", ইত্যাদি বাক্য পাঠ করিয়া পিতা মাতা ভয়ে আড়ষ্ট, ধার কর্জ্জ করিয়া টাকা পাঠাইতে লাগিলেন, বাবু একটু শীতল হইলেন। কালে ভাই দুইটি বাড়ী আসিলেন। কনিষ্ঠ সহরবাসী, বেশ কথা কহিতে শিখিয়াছেন, চালাক চতুর হইয়াছেন, জ্যেষ্ঠ ভাইটি যেন কনিষ্ঠের কাছে একেবারে বোকা; অহঙ্কারের গন্ধও ইহাঁর শরীরে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

এখনকার ছাত্রদিগের গুরুভক্তি নিতান্ত কম। বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রগণ শিক্ষকদিগকে বেতন দিয়া থাকেন, সে জন্য অনেকে মনে করেন শিক্ষকগণ তাঁহাদের ভৃত্য—শিক্ষকগণ রীতিমত তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতে বাধ্য। পক্ষান্তরে কোন কোন শিক্ষক মহোদয়ও মনে করেন, তাঁহাকে পয়সার কাজ করিতে হয়, সুতরাং যেমন পয়সা তেমন কাজ—যত গুড় তত মিষ্ট। কিন্তু তখনকার ছাত্রগণের গুরুভক্তি অতীব প্রবলা ছিল। তাঁহারা শিক্ষককে কোন বেতন দিতেন না, কেবল কায়িক শ্রমে গুরুর সেবা শুশ্রূষা করিতে চেষ্টিত থাকিতেন। তাহারা মনে করিতেন, গুরুকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তিনি অবশ্যই দয়া করিবেন। আবার অধ্যাপকও মনে করিতেন, শিষ্যকে যথাশক্তি শিক্ষা না দিলে ভয়ানক প্রত্যবায় আছে। ভবিষ্যপুরাণোক্ত অনন্ত মাহাত্ম্যে গোদাবরী তটবাসী পণ্ডিতবর বিদ্যাপতির আখ্যায়িকাই ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ।

এখনকার ছাত্রজীবন যত সুবিধাজনক, পুরাকালে তদ্রূপ ছিল না। এখনকার ছাত্রদিগের কেবল পাঠের চিন্তা করিলেই যথেষ্ট, তখনকার ছাত্রগণকে পাঠের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক চিন্তাও অনেক পরিমানে করিতে হইত। এখনকার ছাত্র বাবু—বিলাসের ছবি, তখনকার ছাত্র ব্রহ্মচারী। কষ্ট-সহিষ্ণু, নিষ্ঠাবান্, ভোগবিলাস-বিরহিত, সংযতেন্দ্রিয় এবং ভক্তিশীল হওয়াই ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের মুখ্য উদ্দেশ্য। তখনকার ছাত্রদিগের জন্য ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবশ্য-কর্ত্তব্য ছিল, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন না করিলে কেহ ছাত্র হইতে পারিতেন না। ব্রহ্মচারিগণ কোন প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার, তাম্বুল চর্ব্বন ইত্যাদি করিতে পারিতেন না। আমরা এখন সে কালের ছাত্র ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য কার্য্যের একটুকু আলোচনা করিয়া দেখি, তাঁহাদের ছাত্রজীবন কিরূপ ভাবে চালিত হইত। অধ্যাপক শয়ন করিলে পর শিষ্যগণ শয়ন করিতেন, আবার সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালেই জাগ্রত হইয়া যথাবিহিত প্রাতঃকৃত্য সমাপন করতঃ গুরুর পূজার জন্য পুষ্পচয়ন, যজ্ঞের জন্য কুশ ও সমিধ্ ইত্যাদি আহরণ করিতেন, সমস্ত দিন ভিক্ষা করিতেন, ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য গুরু-পদে অর্পণ করিতেন, গুরু ইচ্ছা পূর্ব্বক যাহা দিতেন, তাহাই সাদরে আহার করিয়া সন্তুষ্ট হৃদয়ে

গুরুসেবা করিতেন। সাংসারিক কার্য্যে গুরুকে যথাশক্তি সহায়তা করিতেন; গুরু কর্ত্তৃক যে কার্য্য করিবার জন্য আদিষ্ট হইতেন, বিনা আপত্তিতে তাহাই সম্পাদন করিতে যত্নবান্ হইতেন। গুরুর গো চরাইতেন এবং কৃষি কার্য্যও করিতেন। গুরু অবসর সময়ে শিষ্যকে শাস্ত্র সম্বন্ধীয় উপদেশ দিতেন, শিষ্যগণ অবনত মস্তকে সে উপদেশ গুলিকে আপন আপন অন্তরে নিহিত করিয়া রাখিতেন। শিষ্যদিগের গুরুসেবা যেন শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ-রূপে নির্দ্ধারিত ছিল। গুরু সন্তুষ্ট থাকিলে শিষ্যগণ আর কিছুরই চিন্তা করিতেন না।

ছাত্রদিগকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অধীন করিয়া রাখাতে যে সুফল ফলিত তাহা বর্ণনাতীত। শিশুকাল হইতে ক্রমশঃ অভ্যাস বশতঃ পরিণত বয়সে তাঁহারা সুস্থ ও সবল শরীরে দিনপাত করিতে সমর্থ হইতেন। এ কালের ছাত্রদিগের মত তাঁহারা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেন না, অথবা রোগে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যুবা-কালেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেন না।

পণ্ডিতবর বিষ্ণুশর্ম্মা বলিয়া গিয়াছেন "স্বভাবই সমুদয় গুণের শিরোমণি।" কথাটি বড়ই মূল্যবান্। অনেক পদস্থ এবং ভাষাবিৎ লোককেও চরিত্র-হীনতার দোষে অকালে জীব-লীলা সংবরণ করিতে এবং কারাগারে পাপীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে দেখা গিয়াছে। যদি ব্রহ্মচর্য্যব্রত আজ পর্য্যন্ত ছাত্র সমাজে অবশ্য-পালনীয় বলিয়া পরি-রক্ষিত থাকিত, তাহা হইলে কি কখনও এরূপ কথা শুনা যাইত? এখন চরিত্র সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। পূর্ব্বকালীয় ছাত্রগণ কঠোর নিয়মের বশবর্ত্তী থাকিতেন বলিয়া শৈশ-বাবস্থা হইতেই তাঁহাদের চরিত্র সুগঠিত হইয়া উঠিত; উত্তরকালে যখন তাঁহারা সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেন, তখন তাঁহারা বিপুল যশের সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। আজ কাল বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের চরিত্র হীনতা সম্বন্ধে যত কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সে কালে ইহার শতাংশও ছিল কি না সন্দেহ স্থল। তখন ছাত্রদিগকে "কষাঘাত" "দণ্ডায়মান" "হাঁটুপাতিয়া বসান" ইত্যাদি শাস্তি দেওয়া হইত না। অধ্যাপকের রোষ-কষায়িত দৃষ্টিপাতই শিষ্যদিগের ভীতির আকর ছিল। আমাদের দেশীয় চতু-ষ্পাঠীতে এখনও সে নিয়ম কতক পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। স্কুলে ছাত্রদিগকে যত প্রকারে শারীরিক দণ্ড ভোগ করিতে হয়, চতুষ্পাঠীতে তাহার নাম গন্ধও নাই। তবে কি বলিতে হইবে যে, স্কুলের ছাত্র সকলেই চরিত্র হীন এবং টোলের ছাত্র সকলেই চরিত্রবান্? তাহা কখনই নহে। টোলেও কতকটা আছে বই কি, তবে স্কুলে এবং টোলে শাসন প্রণালীও সম্পূর্ণ পৃথক্। যাহাকে কোন দিন তুমি বলা হয় নাই, তাহাকে যদি তুই বলা যায়, তবেই তাহার যথেষ্ট শাস্তি ভোগ হইয়া থাকে; আর যাহাকে সর্ব্বদা তিরস্কার করা যায়, তাহাকে দু চারি ঘা মারিলেও কোন ফলোদয় হয় না। বিশেষতঃ যিনি যে

মন্ত্রে দীক্ষিত, তিনি সেই মন্ত্র প্রয়োগেই পটু। আমরা প্রহার খাইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি বা সহপাঠীকে প্রহার লাভ করিতে দেখিয়াছি, সুতরাং অধ্যাপনা কালে শিষ্যের কোন ত্রুটি দেখিলে তাহাকে কায়িক শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত হই না। চতুষ্পাঠীতে শিক্ষিত পণ্ডিত মহাশয়গণ কখনও অধ্যয়ন কালে মারপিট দেখেন নাই, সুতরাং শিষ্যের দোষ দেখিলে তাঁহারা শিষ্যকে শুধু মিষ্ট বাক্য প্রয়োগেই সৎপথে আনয়ন করিতে যত্নবান্ হয়েন। যে সকল প্রবেশিকা স্কুলে প্রাগুক্ত পণ্ডিতগণ নিযুক্ত আছেন, সেখানে গেলেই ইহার সন্তোষজনক প্রমাণ উপলব্ধি হইবেক। আবার পোড়া কালেরও এমনি মাহাত্ম্য যে, মাষ্টারবাবু মারেন, বা অন্য রকম কঠিন শাস্তি দেন, তাই ছাত্রগণ তাঁহার ভয়ে জড়সড়; কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের জন্য ভয় মাত্র নাই! সেই নিরীহ ভদ্রলোকদিগকে তাঁহারা আমলেই আনেন না! পণ্ডিত মহাশয় যেন ঢাকের বাঁয়া! কেহ হয়তঃ বলিবেন, স্কুলের ছেলেগুলি একটু বেশী পরিমাণে বিলাসী বলিয়া গর্হিত দোষটাও তাহাদের দ্বারাই অধিক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগকে বেত না দিলে বশে রাখা যায় না। একথাও আমরা অবনত মস্তকে স্বীকার করি, কিন্তু তথাপি বলি, আমাদের মতে, মিষ্ট কথায় যত শাস্তি দেওয়া যায়, আর কিছুতেই তেমন নহে। দস্যু রত্নাকরকেও তো মিষ্ট কথায়ই সৎপথে আনা হইয়াছিল। কোন কোন মাষ্টারবাবুকে সময়ে সময়ে ছাত্রকে কষাঘাত করিয়া ভয়ানক বিপন্নাবস্থায় পড়িতে দেখা গিয়াছে। এস্থলে ইহাও বলা উচিত যে, সেকালে ছাত্রদিগকে সম্পূর্ণরূপে উপাধ্যায়ের হস্তে সমর্পণ করা হইত, সুতরাং শিষ্যের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য শিক্ষকই দায়ী থাকিতেন। একালে ছাত্রদিগকে পাঁচ ঘণ্টাকাল মাত্র শিক্ষকের সঙ্গে থাকিতে হয়, সুতরাং তাহাতে শিক্ষক ততটা দায়ী নহেন; চরিত্র গঠন সম্বন্ধে অভিভাবকগণই সমধিক দায়ী। তাঁহারা যদি আপন আপন বালকদিগকে ছাত্র জীবনে বাবু না সাজাইয়া সাধারণ বেশ ভূষায় একটু কাঙ্গাল বেশে রাখেন, এবং পরিহিত বস্ত্রের কেতা ও চাল চলন সম্বন্ধে সর্ব্বদা মনোযোগ দেন, তাহা হইলে অনেকটা সারিয়া যাইতে পারে।

উপসংহারে প্রত্যেক অভিভাবক এবং শিক্ষক মহোদয়ের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে, যাহাতে আমাদের উন্নতির অবলম্বন ছাত্রগণ চরিত্রবান্, কষ্টসহিষ্ণু, বিলাসিতা-বিবর্জ্জিত, এবং অধ্যবসায় শীল হইতে পারেন, তৎপ্রতি সকলেই বিশেষ মনোযোগ রাখেন। মানব সমাজ বড়ই অনুকরণ প্রিয়, তাহাতে ছাত্রগণ বয়সের অল্পতা নিবন্ধন এবং বুদ্ধিবৃত্তির অপরিপক্কতা প্রযুক্ত ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে না, যাহা দেখে তাহাই অনুকরণ করিয়া বসে। বিশেষতঃ শিক্ষকের স্বভাব ছাত্রের হৃদয়-দর্পণে অধিক পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আমার ছাত্র জীবনের চারি জন শিক্ষকের চারিটি কথা বলিতেছি,

এবং আমি কর্ত্তব্যের অনুরোধে যাহা বলিব তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট গললগ্নীকৃত বাসে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। প্রথম যাঁহার কথা বলিতেছি, তিনি লোকসমাজে সুশিক্ষিত এবং সদুপদেষ্টা বলিয়া প্রখ্যাত, কিন্তু তিনি অধিক পরিমাণে সুরা পান করিতেন, এবং উপদেশ কালে বলিতেন, "প্রিয় ছাত্রগণ। তোমরা আমাকে লক্ষ্য না করিয়া আমার কথামত কার্য্য করিও।" কিন্তু বলিতে লজ্জা ও দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ছাত্রগণ মধ্যে কেহ কেহ এমন সুরাপায়ী হইয়া উঠিল যে, শীঘ্রই তাহাদিগকে অধ্যয়ন ত্যাগ ও ঘৃণিত পথে বিচরণ করিতে হইল। দ্বিতীয়তঃ যাঁহার কথা বলিতেছি, ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধিধারী। যখন কুমিল্লার ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এল্, এস্, আলেকজাণ্ডর সাহেব স্বদেশে চলিয়া যান, তিনি এক আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে, জেলা স্কুলের সমুদয় শিক্ষক ও ছাত্রগণকে তাঁহার বাংলার দ্বারে যাইয়া বিদায়-সূচক মঙ্গল ধ্বনি করিতে হইবে। তখন মাননীয় শিক্ষক মহাশয় আমাদিগকে বলিলেন, "তোমরা আগামী কল্য বেশ ভালরূপে সাজসজ্জা করিয়া মাথায় সীতা কাটিয়া আসিবা"। আমরা বলিলাম সীতা কাটিলে হয়তঃ আমাদের অভিভাবক রাগ করিতে পারেন, তিনি প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "আজ কালের দিনেও কি এমন অভিভাবক আছেন যে, সীতা কাটিতে নিষেধ করেন"? তখন আপন অভিভাবকের মূল্য বুঝিলাম, সেই হইতে মাথায় সীতার রেখা বদ্ধমূল হইল। তৃতীয়তঃ যাঁহার কথা বলিতেছি, তিনি "ষ্টুডেণ্টসিপ্" পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, ত্রিপুরা ইন্‌ষ্টিটিউসনের প্রধান শিক্ষকের পদে আসিলেন। গলায় তিন লহরী তুলসীমালা, ওদিকে বোতলে বোতলে ব্রাণ্ডি উড়াইয়া দেন, অহরহ চুরট মুখে লাগিয়াই রহিয়াছে। যে দিন হইতে তিনি কুমিল্লায় পদার্পণ করিলেন, অধিক নহে, হয়তঃ তাহার সপ্তাহ কাল পরেই ছাত্রদের পকেট চুরটে পূর্ণ হইয়া গেল, সন্ধ্যার পরে দ্বিতীয় খদ্যোতিকা জ্বলিতে লাগিল। চতুর্থতঃ যাঁহার কথা বলিতেছি, তিনি এম, এ, উপাধিধারী, স্বদেশবৎসল, কুমিল্লা জেলাস্কুলের হেড্‌মাষ্টারের পদে আইসেন। তিনি ছাত্রদিগকে দেশী জিনিস ব্যবহার করিতে বলিলেন, এবং নিজেও তাহা ব্যবহার করিতেন। দেখিতে দেখিতে ছাত্রগণ দেশী কাপড়, বাঁশের ছাতা, বাঁশের লাঠী ব্যবহার করিতে লাগিলেন, দালানের বারেন্দায় ছাতার স্থান হয় না। কুমিল্লার রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষ সমূহে তাঁহার পবিত্র নাম খোদিত হইতে লাগিল, কিন্তু অল্পকাল পরেই উন্নীত হইয়া তিনি স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

বোধ হয় ছাত্রগণের অনুকরণ প্রিয়তার যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন সকলের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, সকলেই যেন ছাত্রদিগের প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। ছাত্র বন্ধুদের নিকটও আমার বক্তব্য যে, তাঁহারাও যেন ছাত্র নামের কলঙ্ক দূরীকরণে সকলে যত্নবান্ হয়েন। এমন পবিত্র নামে কালিমা পড়িলে বস্তুতই হৃদয়ে দারুণ ব্যথা লাগে।

৺শিক্ষা-পরিচর।

১ম ভাগ। } অগ্রহায়ণ ১২৯৬ সাল। { ৮ম সংখ্যা।

ভাষা-বিবেক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

দেবদাস। সুশীল! আর যে কয়টা অক্ষর আছে, আজ সে সবগুলি শিখিয়া ফেল, ইহার পর শিখিবার আরও অনেক আছে।

সুশীল। যে আজ্ঞা, এখন মনে থাকিলেই শিখিতে পারি। এ পর্য্যন্ত যাহা শিখিয়াছি, সবগুলিইত মনে আছে।

দে। তুমি 'জল' শিখিয়াছ; 'গরম জল' কেমন করিয়া লিখিতে হয়?

সু। 'গ' জানি না।

দে। এই দেখ, (শ্লেটে লিখিয়া) এইরূপে 'গরম' লিখিতে হয়।

সু। প্রথমটাইত 'গ'? শিখিলাম।

দে। বলিতে পার, জল কাপড় দিয়া বাঁধা যায় না কেন?

সু। তা কেমন করিয়া বাঁধা যাইবে? জল যে তরল জিনিস, কাপড়ের ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

দে। 'তরল' জান? (শ্লেটে 'তরল' লিখিয়া) বল দেখি এটা কি?

সু। প্রথম অক্ষরটা জানি না; এটা কি 'ত'?

দে। হাঁ, এইটা 'ত'।

সু। তবে 'তরল' শিখিলাম।

দে। জল তরল; আর কোন তরল জিনিসের নাম জান?

সু। জানি বই কি, দুধ তরল।

দে। বলিতে পার, দুধ জ্বাল দিলে কি রকম হয়?

সু। জানি বই কি, গাঢ় হয়।

দে। 'গাঢ়' জান?

সু। গা, ঢ়, না জানি না, তবে 'গ' জানি।

দে। (শ্লেটে লিখিয়া) এই দেখ 'গাঢ়'।

সু। এইত গ দেখিতেছি।

দে। গ এর ডাইন দিকে যে একটা

টান দেখিতেছ, ইহাকে 'আকার' বলে; গ এর ডাইন দিকে আকার থাকিলে 'গা' হয়, আর শেষের অক্ষরটা 'ঢ়'।

সু। 'গাঢ়' শিখিলাম। আচ্ছা, এই আকার কি অন্য কোন অক্ষরের সঙ্গে থাকিতে পারে না?

দে। হাঁ, পারে বৈ কি। মনে কর, যদি কএর ডাইন দিকে এই আকার থাকে, তাহা হইলে 'কা' হইবে।

সু। তবে এইরূপে 'খা', 'টা', 'শা' হইতে পারে?

দে। হাঁ অবশ্য হইতে পারে।

সু। এত বেশ সঙ্কেত দেখি!

দে। আরও কত সঙ্কেত দেখিতে পাইবে, লেখা পড়া আগা গোড়াই সঙ্কেত। তুমি রং চিন?

সু। চিনি, রং দিয়া প্রতিমা চিত্র করে।

দে। (শ্লেটে 'রং' এবং 'রঙ' লিখিয়া) এই দেখ, এই দুই রকমে রং লেখা যায়।

সু। একটা কথা আবার দুই রকম কেন? দুইটাতেই দেখিতেছি র আছে তার পরে দুইটা দুই রকম।

দে। দুই কথাতে র এর পর দুইটা স্বতন্ত্র অক্ষর আছে; প্রথমটাতে র এর পর অনুস্বার, আর দ্বিতীয়টাতে র এর পর ঙ আছে।

সু। আচ্ছা দ্বিতীয়টা বুঝিলাম, কিন্তু প্রথমটাতে র অনুস্বার না বলিয়া রং বলেন কেন?

দে। অনুস্বারের উচ্চারণ ঙ এর মত।

সু। তবে ঙ এবং অনুস্বারের প্রভেদ কি?

দে। বেশ প্রশ্ন করিয়াছ। বলিতেছি মনে রাখ, ভুলিও না। ঙ এর স্বতন্ত্র উচ্চারণ হইতে পারে, কিন্তু আর একটা অক্ষর আগে না থাকিলে অনুস্বারের উচ্চারণ হয় না, যেমন কং, শং।

সু। বুঝিলাম। আর কি বলুন!

দে। মঠ অবশ্যই চিন। (শ্লেটে লিখিয়া) এই দেখ, এইরূপে মঠ লিখিতে হয়।

সু। ম ত জানিই, ঠ শিখিলাম।

দে। (শ্লেটে 'পথ' কথাটা লিখিয়া) এইরূপে 'পথ' লিখিতে হয়।

সু। প জানা আছে, থ শিখিলাম।

দে। (শ্লেটে 'ভয়' শব্দটি লিখিয়া) এইরূপে ভয় লিখিতে হয়।

সু। ইহার ত একটাও জানি না। প্রথমটা বুঝি ভ, আর শেষেরটা—ওটা কি?

দে। ওটার নাম অন্তঃস্থ য়।

সু। ভ আর অন্তঃস্থ য়, ভয়। তবে কি আরও অ আছে?

দে। হাঁ আছে, আর একটা স্বরের অ আছে।

সু। কোন্ কথাটায় স্বরের অ লাগে?

দে। 'অরহর' লিখিতে স্বরের অ লাগে। (শ্লেটে 'অরহর' শব্দটি লিখিয়া) এই দেখ অরহর।

সু। প্রথমটা বুঝি স্বরের অ? তার পরে র, তার পরে এটা কি?

দে। এটা হ।

সু। স্বরের অ, র, হ, র, অরহর, শিখিলাম।

দে। (শ্লেটে 'লাউ' শব্দটি লিখিয়া) এইরূপে লাউ লিখিতে হয়।

সু। প্রথমটা ত ল, তার ডাইন দিকে আকার আছে, তবে লা হইল, যেমন গা হইয়া থাকে। তার পরে ওটা কি?

দে। ওটা হ্রস্ব উ।

সু। লা আর হ্রস্ব উ, লাউ। আবার বুঝি ইহার একটা দীর্ঘও আছে?

দে। হাঁ আছে। ঊষা লিখিতে দীর্ঘ ঊ লাগে। (শ্লেটে 'ঊষা' শব্দ লিখিয়া) এই দেখ ঊষা।

সু। বুঝিলাম, দীর্ঘ ঊ, আর মূর্দ্ধণ্য ষ এর ডাইনদিকে আকার, ঊষা। ঊষা কাহাকে বলে?

দে। প্রাতঃকালের প্রথম কালটাকে ঊষা বলে। ডগা চিন?

সু। লাউর ডগা? তা চিনি বই কি? ড, গা, গা ত জানি, ড টা দেখাইয়া দেন।

দে। (শ্লেটে ড লিখিয়া) এই দেখ ড।

সু। চিনিলাম। আর কি বলুন।

দে। (শ্লেটে 'গাছ' শব্দটি লিখিয়া) এইরূপে গাছ লিখিতে হয়।

সু। বুঝিলাম; প্রথমটাত গা জানাই আছে, তার পরেরটা ছ, কেমন তাই না?

দে। হাঁ তাই বটে। (শ্লেটে 'চড়ই' শব্দটি লিখিয়া) এইরূপে চড়ই লিখিতে হয়।

সু। আমি শিখিয়াছি। ড় আর হ্রস্ব ই ত আগেই জানিতাম; এখন চ শিখিলাম।

দে। (শ্লেটে 'ঢাল' শব্দটি লিখিয়া) এই রকমে ঢাল লিখিতে হয়।

সু। ঢা আর ল, ঢাল।

দে। ঢা একটা অক্ষর নয়, ঢএ আকার দেওয়াতে ঢা হইয়াছে, যেমন আগে গা শিখিয়াছ।

সু। তাই কি? ঢ এর ডাইন দিকে আকার দিলে ঢা হয়, আর ল ত জানাই আছে। ঢ শিখিলাম।

দে। ডাইন দিকে আকার না বলিয়া কেবল ঢএ আকার, গএ আকার প্রভৃতি বলিলেই হইবে। ডাইন দিকে যে টানটি থাকে, তাহাই আকার; ঐ টান অন্য দিকে থাকিলে আকার হয় না।

সু। বুঝিলাম, ডাইন দিকে টান থাকিলেই তাহাকে আকার বলিতে হইবে।

দে। হাঁ তাই। (শ্লেটে 'ঋণ' শব্দটি লিখিয়া) এইরূপে ঋণ লিখিতে হয়।

সু। শেষেরটা ত মূর্দ্ধন্য ণ, প্রথমটা বুঝি ঋ।

দে। হাঁ প্রথমটা ঋ। (শ্লেটে 'এলাচ' শব্দ লিখিয়া) এইরূপে এলাচ লিখিতে হয়।

সু। এখন ত সবই সহজ বোধ হইতেছে। প্রথমটা অবশ্যই এ, তাহার পরে লএ আকার আর চ, এলাচ।

দে। বেশ হইয়াছে। (শ্লেটে 'ওল' লিখিয়া) এই দেখ ওল লিখিলাম।

সু। ও আর ল, ওল। এত আরও সহজ।

দে। (শ্লেটে 'গঁদ' লিখিয়া) এই দেখ গঁদ লিখিলাম।

সু। গ আর দ। গঁ এর উপরে ওটা কি?

দে। ওটা একটা অক্ষর, উহার নাম চন্দ্রবিন্দু। উহা থাকাতেই গঁ উচ্চারণ হই-তেছে, তাহা না হইলে শুধু গ হইত। আগে যে অনুস্বার শিখিয়াছ, সেইরূপ চন্দ্রবিন্দুও অন্য অক্ষরের সঙ্গে থাকে, ইহার স্বতন্ত্র ব্যবহার হয় না।

সু। স্বতন্ত্র ব্যবহার হয় না, অন্য অক্ষরের সঙ্গে থাকে, এরকম কি আরও অক্ষর আছে নাকি?

দে। হাঁ এ রকম আরও একটা অক্ষর আছে, তাহার নাম বিসর্গ।

সু। দেখি বিসর্গ কেমন?

দে। (শ্লেটে 'যশঃ' শব্দ লিখিয়া) পড় দেখি এটা কি?

সু। অন্তঃস্থ য আর তালব্য শ, আর শ এর পর ওটা কি?

দে। ঐটাই বিসর্গ।

সু। অনুস্বার এবং চন্দ্রবিন্দু দিলে অক্ষ-রের উচ্চারণ বদলিয়া যায় দেখিয়াছি, বিসর্গ থাকাতে ত শএর কোন পরিবর্ত্তন হইল না?

দে। বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় না, কেবল শটার উচ্চারণ একটুকু জোরে করিতে হইবে, যথা, যশঃ। কিন্তু সকল সময়ে জোরও লাগে না। এ সব পরে বুঝিবে।

সু। আর কতটা অক্ষর আছে?

দে। আর দুইটা অক্ষর আছে, ঐ এবং ঞ।

সু। ঐ দুইটা দেখাইয়া দেন, আমার শিখা হইয়াছে।

দে। (শ্লেটে লিখিয়া) এই দেখ ঐ, আর এইটা ঞ।

সু। আচ্ছা শিখিলাম। এখন খাইতে যাই।

দেবদাস। সুশীল! আইস, আজ আমি তোমায় পরীক্ষা করিব।

সুশীল। পরীক্ষা আবার কি—কেমন করিয়া করিবেন?

দে। তুমি যে সকল অক্ষর শিখিয়াছ, তাহা তোমার মনে আছে কি না, তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব।

সু। এই কথা! আচ্ছা জিজ্ঞাসা করুন, আমার সব মনে আছে।

দে। মনে থাকিলেই ভাল। আচ্ছা, যতগুলি অক্ষর শিখিয়াছ, একে একে বলিয়া যাও দেখি?

সু। তা আর কঠিন কি? এই দেখুন বলিতেছি,—— ক, ল, ম, দন্ত্য স, ষ, র, বর্গীয় জ, ল———

দে। হইল না, তুমি ল দুইবার বলিয়াছ।

সু। ইহাতেও কি দোষ হয়?

দে। হাঁ, অবশ্যই দোষ হয়। আচ্ছা বল দেখি, এই ঘরে এখন কয় জন লোক আছে?

সু। আপনি আর আমি এই দুই জন আছি।

দে। কেন, তুমি, আমি, আর তুমি, এই কথা বলিলে দোষ কি?

সু। আমার কথা যে আপনি দুইবার বলিতেছেন? আমরা দুইজন আছি, কিন্ত

আপনি যে রকম এক জনের কথা দুই বার বলিতেছেন, তাহাতে বোধ হয় যেন তিন জন লোক এ ঘরে আছি, কিন্তু দুই জনের অধিক ত নাই ?

দে। এই রকম ল অক্ষরটাকে দুই বার বলিলে অক্ষরের সংখ্যা দেখিতে পঞ্চাশের অধিক হইয়া পড়িবে, কিন্তু ল যে একটা আছে সেই একটাই থাকিবে, দশবার বলিলেও একটার বেশী দুইটা হইবে না।

সু। তাইত! তবেত এ গুলি মনে রাখা বড়ই কঠিন দেখিতেছি! আমার বোধ হইতেছে এ গোলমাল ছাড়াইতে পারিব না, অক্ষর গুলির নাম বলিতে গেলেই এই রকম গোলমাল হইয়া যাইবে।

দে। হাঁ, তুমি যে রকমে শিখিয়াছ, ঠিক সেই রকমে বলিতে গেলে গোলমাল হই-বারই কথা বটে, কিন্তু আমি একটি সঙ্কেত বলিয়া দিতেছি, সেই রকমে মনে রাখিলে গোলমাল হইবে না। (শ্লেটে লিখিয়া) অক্ষরগুলি এই রকমে মুখস্থ কর;——

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ

ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ
ড় ঢ় য় ং ঃ ঁ

যে রকমে লিখিয়া দিলাম, ঠিক এই রকমে পড়িয়া কণ্ঠস্থ করিয়া রাখ, তাহা হইলে আর গোলমাল হইবে না।

সু। ইহা ছাড়া আর কোন রকম অক্ষর নাইত ?

দে। আরও কয়েকটা অক্ষর আছে, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় তাহাদের বিশেষ কোন দরকার নাই, সুতরাং এখন তাহা না শিখিলেও চলিবে।

সু। (অক্ষরগুলি পড়িয়া) পণ্ডিত মহাশয়! আপনার একটা ভুল হইয়াছে, আপনি ব অক্ষরটি দুইবার লিখিয়াছেন।

দে। ওটা ভুল হয় নাই, ইহারা প্রকৃতই দুইটা অক্ষর, তবে বাঙ্গালা ভাষায় তাহাদের আকৃতি এবং উচ্চারণ একই রকম।

সু। আকৃতি এবং উচ্চারণ যদি একই রকম হয়, তবে আবার অক্ষর দুইটা হইল কৈ ?

দে। সে সব কথা এখন তুমি বুঝিবে না, যেমন করিয়া লিখিয়া দিলাম, আজ-কার মত অক্ষরগুলি ঠিক সেই রকমে ভাল করিয়া মুখস্থ কর, এগুলি মুখস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত নূতন পড়া দিব না।

সু। আচ্ছা, আজ এই গুলিই মুখস্থ করি।

শিক্ষক কে?

কে অস্বীকার করিবেন যে সামান্য হইতে মহতের সূচনা হয়? একটি বীজ ভূতলে পতিত হইল এবং মৃত্তিকা স্পর্শে পরিপুষ্ট হইয়া তেজের সাহায্যে অঙ্কুর উৎপাদনে সমর্থ হইল। অচিরে তাহা হইতে সুরম্য অঙ্কুর বিনির্গত হইল। ক্রমে কাণ্ড, শাখা ও প্রশাখায় প্রকাণ্ড কলেবর বৃক্ষ নামে অভিহিত এবং ফল-পুষ্পে সুশোভিত হইল। উহার এক একটি বীজ হইতেও এবম্বিধ এক একটি বৃক্ষ সঞ্জাত হইতে পারে। ঐরূপে একই বীজ যে শত শত অথবা সহস্র সহস্র বৃক্ষেরও উৎপাদক হইতে পারে, তাহাও অসম্ভবপর নহে। তখন উহাকে অবলোকন করিলে অতি তুচ্ছ সামান্য বীজ বলিয়া ভাবিতে, হয়ত অকর্ম্মণ্য বিবেচনায় অবজ্ঞা করিতে, এমন কি, তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেও সঙ্কুচিত হইতে না; কিন্তু উহাই আজ জগতে মহৎ বলিয়া পরিচিত ও সমাদৃত হইল।

যখন একটি তুচ্ছ বীজ-কণিকা হইতে অগণিত বৃক্ষ-বৃন্দ জাত হইয়া জগতের অসংখ্য প্রকার হিতসাধনে সমর্থ হইল, তখন এক একটি বালক যে লক্ষ লক্ষ লোকেরও সুখ-সম্পাদন-হেতু হইবে, তাহাও অসম্ভাবিত নহে। এ নিমিত্ত বালকদিগকে নির্ব্বোধ অথবা পাঠাভ্যাসে অমনোযোগী বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন না করা শিক্ষকের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সহজে বুঝিতে পারে না, কিম্বা কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদনে বিরত থাকে দেখিয়া যাহারে ঘৃণা করিতেছ, হয়ত সেই কোন সুশিক্ষকের প্রযত্নে শিক্ষিত হইয়া সমাজে একটি চন্দ্র বা নক্ষত্ররূপে পরিগণিত হইবে। এরূপ ঘটনা বিরল নহে, সচরাচর উহার বহুল উদাহরণ অবলোকন করিতে পাওয়া যায়।

জগৎ অনন্ত, ঈশ্বরও অনন্ত; অনন্ত জগতের সর্ব্বত্রই অনন্ত ঈশ্বরের অপরিসীম, অতুলনীয় ও অনন্ত শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। জগৎ অনন্ত, কিন্তু কার্য্য সান্ত, কার্য্য মাত্রেরই এক একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, সে সীমা অতিক্রম করিলেই গোল বাঁধিয়া যায়। ফলে কোথাও তাহার বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয় না। যেমন নিদাঘের গ্রীষ্মাতিশয্য শীতে, অথবা শীতের প্রবল শীত-যন্ত্রণা নিদাঘে অনুভূত হইতে দেখা যায় না, তদ্রূপ মানবের মানসিক বৃত্তিগুলিও যৌবন সময়ে বিকসিত হয়, বাল্যে অথবা বার্দ্ধক্যে স্ফুটিত হইতে পারে না। অসাময়িক চেষ্টায় অপরিপক্ক বৃত্তি-বৃন্দ ঈষৎ স্ফুরিত হইয়াই নির্জীব হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহা আর যথা সময়েও সম্যক্ বিকাশাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। তন্নিমিত্ত মানসিক বৃত্তি সুপ্রকাশিত হইবার সময়, উপায় ও ক্রম বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত থাকা শিক্ষকের একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ মানসিক বৃত্তি পরম্পরার বিকাশ সম্পাদন করাই প্রাথমিক শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। যাঁহার মানসিক বৃত্তি-নিচয় যথোচিতরূপে বিকশিত হয় নাই, কিম্বা

যিনি স্বয়ং ঐ গুলির যথাযথরূপ ব্যবহার অপরিজ্ঞাত রহিয়াছেন, তিনি কখনও অপরের মানসিক বৃত্তি বিকশিত করিতে সক্ষম হন না, সুতরাং তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষাকে সাঙ্গ শিক্ষাও বলা যাইতে পারে না। সাঙ্গ শিক্ষা দানই সঙ্গত, তাহাই আদরণীয়, তাহাই প্রার্থনীয়, তাহাই সমাজের হিতকারী, সুতরাং শিক্ষকের কর্ত্তব্য। যিনি কর্ত্তব্য প্রতিপালনে কদাচ ঔদাসীন্য প্রকাশ না করেন, তিনিই স্বীয় ছাত্রগণের উন্নতি-সোপান স্বরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। প্রত্যুত উত্তরোত্তর ছাত্রের উন্নতি সাধন পূর্ব্বক সমাজে আদৃত ও প্রভূত যশস্বী হইয়া থাকেন।

যদিও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মানবের ভিন্ন ভিন্ন মানসিক বৃত্তি বিকশিত হইতে দেখা যায়, তথাপি শৈশবকালাবধিই যে মানসিক বৃত্তি বিকাশোন্মুখ হইতে থাকে, তাহা কোন্ সুবিবেচক ব্যক্তি অনুভব করিতে না পারেন? অতএব যার যে বৃত্তি যে সময়ে স্ফুরিত হইবে, সে সময়ে তাহার সে বৃত্তিকে সমধিক বলবতী করিবার চেষ্টা করা উচিত। অন্যথা শিক্ষা-রাজ্যে কত বিভ্রাট, শিক্ষকের কত তাড়না, কত প্রহার, কত নৃশংস ব্যবহার! নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণা ভোগ করিবার নিমিত্তই যেন ছাত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হায়! এটি কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়? যে বালকের সাহস, বুদ্ধিচাতুর্য্য ও সহাস্য মুখ সন্দর্শন করিয়া হৃদয় আহ্লাদে নৃত্য করিত, শোকাতুরার শোক দূরে অপসারিত হইত, এক্ষণে সে মুখ দর্শনেই দর্শকের হৃদয়ে ঘোর বিষাদ-কালিমা ছড়াইয়া পড়িল।

বালকের মন সুনির্ম্মল স্বচ্ছ দর্পণ অথবা ঈষৎ বাতান্দোলিত তরঙ্গায়িত স্ফটিক জল। জলে যখন তরঙ্গ সমুৎপন্ন হইতে থাকে, তখন কখনও অপরিষ্কার হয় না; পরে ক্রমশঃ চতুঃপার্শ্বস্থ আবর্জনাদি সংযুক্ত হইয়া বিমল জল অস্বচ্ছ হইয়া যায়। কিন্তু তরঙ্গের নিবৃত্তি হইলে যেমন জল আর ঘোলা হইবার আশঙ্কা থাকে না, মানবের মনের গতিও তদ্রূপ। বিশেষতঃ বালকের মন স্বভাবতঃ কোমল ও অতি চঞ্চল। এ অবস্থায় কিঞ্চিৎ প্রণিধান পূর্ব্বক বালকদিগকে স্ববশে রাখিয়া বিকাশোন্মুখ বৃত্তিগুলির উদ্দীপনা করিয়া দেওয়া বিধেয়। তাহা হইলে অতি সহজে বালকেরা স্ব স্ব মানসিক বৃত্তির পূর্ণতা লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারিবে। অতএব তাহাদের রীত্যনুসারে পরিচালিত হইবার চেষ্টা করা শিক্ষকের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। যিনি শিক্ষা-কার্য্যে যত পটুতা প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন, তিনি অবশ্যই তত অধিক পরিমাণে ছেলেদের স্বভাবানুসারে পরিচালিত হইতেছেন, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। শিক্ষক মধ্যে যিনি উক্ত প্রকার নিয়ম-প্রতিপালনে অক্ষম, তিনি কদাপি ছাত্রের প্রণয়-ভাজন হইতে সক্ষম হন না। সুতরাং তাঁহা দ্বারা বালকের সুশিক্ষা-লাভের প্রত্যাশা করাও আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক কামনা মাত্র।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, যুবকের সহিত বৃদ্ধের, চৌরের সহিত সাধুর ও দরিদ্রের সহিত ধনীর কদাপি প্রকৃত সদ্ভাব সংঘটিত হয় না। কারণ, যুবক

যাহা ভাল বাসে, বৃদ্ধের তাহা অসহ্য; চোরে যাহা করে, সাধুর পক্ষে তাহা অকর্ত্তব্য; এবং দরিদ্রের অভাব ধনীর কদাচ ভাল লাগে না। কুত্রচিৎ স্থূল দৃষ্টিতে সাধু ও চোরে, অর্থাৎ মানসিক অসমতায় বন্ধুত্ব সম্ভাবিত বলিয়া অনুমিত হইতে পারে বটে, কিন্তু যদি তাহাদের বাহিক স্বভাবের বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আভ্যন্তরিক স্বভাবের পর্য্যালোচনা কর, তবে নিশ্চয় দেখিবে যে, হয় চৌর সাধুর সংসর্গে ক্রমশঃ সৎ হইয়া সাধুর সমভূমে উন্নীত হইয়াছে, নয় সাধু চৌরের প্ররোচনায় কলুষিত হইয়া অধোগামী হইয়াছে। এ নিমিত্ত শিক্ষক ন্যায়-তৎপর হইয়া যতদূর সম্ভব ছাত্রের মানসিক ভাবের সমতা রক্ষা করিয়া চলিবেন। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, ছাত্রের স্বভাবানুসারে পরিচালিত হইতে, এবং স্বভাবের সমতা রক্ষা করিতে যাইয়া বালকত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে, আমরা এমত বলিতেছি না। তবে আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, শিক্ষককেও সৎস্বভাবাপন্ন ও সচেষ্ট হইতে হইবে। তাহা হইলে বালকেরা স্বতঃ শিক্ষকের বশীভূত হইবে, এবং তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ প্রাণপণে যত্ন করিতেও সঙ্কুচিত হইবে না। এজন্য ছাত্রদের নিকট হিতকারী ও প্রীতি-ভাজনরূপে পরিচিত হওয়া শিক্ষকের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ছাত্রেরা যখন শিক্ষককে হিতকারী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারে, তখন তাঁহাকে স্বভাবতঃ ভক্তি করিতে থাকে, এবং তদ্বাক্য প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায় স্বীয় হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করে। এক জনের হিতকারী রূপে পরিচিত হওয়া সহজ কথা; কিন্তু বিভিন্ন প্রকৃতি শত শত ব্যক্তির হিতকারী রূপে পরিগণিত হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার, সন্দেহ নাই। এ নিমিত্ত শিক্ষককে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গুণে অলঙ্কৃত থাকিতে হয়। সে গুণগুলি এই;——অপক্ষপাতিত্ব, ন্যায়পরতা, সদনুষ্ঠান, প্রেমিকতা, সরলতা, কর্ত্তব্য-তৎপরতা, অনলসতা, অনৌদাসীন্য, অসদ্বাসনা-পরিত্যাগ, দৃঢ়তা, আত্মবশ্যতা, বিদ্যানুরাগ, সত্যবাদিতা ও জিতেন্দ্রিয়তা।

এতদ্ব্যতীত অধ্যাপনায় নিরত থাকা ও একান্ত যত্ন করা, উপদেষ্টব্য বিষয়ে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি, ছাত্রের স্বভাব, চরিত্র ও ক্ষমতা নির্ণয়ে দক্ষতা, দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় শিক্ষার তারতম্য ভেদ, প্রচলিত সহজ শব্দের যথারীতি যথাস্থানে সন্নিবেশ, এবং শরীর-বিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েও সবিশেষ জ্ঞান থাকা উচিত।

শিক্ষকের কর্ত্তব্য প্রতিপালনে যাহা যাহা আবশ্যক, ইতিপূর্ব্বে তাহার নামোল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

অপক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা শিক্ষকের পক্ষে সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। কেন না, তদ্দর্শনে অতি সহজে বালকেরা দ্রবীভূত হইয়া পড়ে। তাহা করিতে হইলে ন্যায়পরতার প্রয়োজন। ন্যায়পরতাবিহীন হইলে কুত্রাপি যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে সক্ষম

হওয়া যায় না; সুতরাং নিরপেক্ষতাও রক্ষা করিতে পারা যায় না। এই সঙ্গে সঙ্গে সদনুষ্ঠানেরও প্রয়োজন; শিক্ষকের দৃষ্টান্তদর্শনে ছাত্রদেরও সদনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য বলিয়া ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায়। অনুরাগ হৃদয়ের একটি শ্রেষ্ঠতম বৃত্তি; উহা ব্যতীত কেহ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না, অথবা রত হইলেও সুফল দেখাইতে পারে না। আবার প্রেমিকতা না থাকিলে অনুরাগের সজীবতা ঘটে না, অতএব শিক্ষকের পক্ষে প্রেমিকতা একটি উপাদেয় সামগ্রী সন্দেহ নাই। এজন্য শিক্ষককেও প্রেমিক হইতে হইবে, তদ্দর্শনে বালকেরাও প্রেমিক হইতে চেষ্টিত হইবে। কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, মানসিক বৃত্তিগুলি অলক্ষিতরূপে পরস্পর পরস্পরের সাহায্যাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে।

সরল ব্যবহার ও ছাত্রকে স্ববশে রাখার একটি উপায়। যেমন একপক্ষে সরল ব্যবহার কর্ত্তব্য, তেমনি অপর পক্ষে কর্ত্তব্য-তৎপরতা, অনৌদাসীন্য-প্রকাশ, অসদ্বাসনা-পরিত্যাগ ও দৃঢ়তা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা, সরল ব্যবহারে ছাত্রের স্বভাবে স্বাভাবিক-ঋজুতা প্রবর্ত্তিত হয়। কর্ত্তব্য-তৎপরতা দ্বারা কৃতকার্য্যে দক্ষতা লাভ হয় এবং অনৌদাসীন্য প্রকাশে কর্ত্তব্য-তৎপরতা বৃত্তি বদ্ধমূল হয়।

একটুকু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, অসদ্বাসনা পরিত্যাগ ভিন্ন মানব হৃদয়ে সদ্বাসনার সঞ্চার হয় না। এ নিমিত্ত সর্ব্বদা অসদ্বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদিচ্ছার পরিপোষক হইতে হইবে। আবার দৃঢ়তা ঐ সকলের মূলভিত্তি স্বরূপ। যেহেতু দৃঢ়তা ব্যতীত কোনও বিষয়ে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারা যায় না। অতএব উল্লিখিত গুণ-সংশ্লিষ্ট হওয়া শিক্ষকের অত্যাবশ্যক, তাহার সন্দেহ নাই। অন্যথা ছাত্রগণ শিক্ষকের অবাধ্য হইয়া পড়ে। অবশীভূত ছাত্রকে শিক্ষাদান করা যে কত কষ্টকর, কত বিপজ্জনক, তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন।

এতন্নিমিত্ত শিক্ষককে অনলস ও আত্মবশ হইতে হইবে। আত্মবশ না হইলে অনলস হওয়া যায় না; অলস ব্যক্তি কখনও মনঃসংযোগ পূর্ব্বক কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, কিম্বা দীর্ঘকালব্যাপী কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং পাঁচ ঘণ্টা কাল শিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। এ নিমিত্ত মনের অস্থিরতায় পুনঃ পুনঃ স্বভাবের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে থাকে; তদবস্থায় উপদেশ দানে নিজের অথবা ছাত্রের কাহারও সুখ বোধ হয় না, প্রকারান্তরে বিরক্তি প্রকাশের লক্ষণ লক্ষিত হয়। তখন ছাত্রেরা অবসর পাইয়া স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে বিষয়ান্তরে প্রবৃত্ত হইতে থাকে। কেহ বিবাদ, কেহ গোলমাল, কেহ বা আমোদ প্রমোদ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। একবার আমোদ প্রমোদে মন লিপ্ত হইলে সহজে তাহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিতে পারা যায় না। তাহাতে আবার সর্ব্বদা এরূপ সুযোগ ঘটিলে উত্তরোত্তর পাঠাভ্যাসে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া ছাত্রেরা এত শিথিল

প্রবত্ব হয় যে, তখন অলস, অকর্ম্মণ্য ও নির্ব্বোধ বলিয়াই সাধারণ-সমীপে বিবেচিত হয়। এটি কি শিক্ষককৃত পাপের ফল নহে? শিক্ষকের অবজ্ঞায়, অমনোযোগিতায়, অনুপযুক্ততায় ছাত্র আজীবন কষ্টভোগে অতিবাহিত করে, কদাপি সুখ ভোগের অধিকারী হইতে পারে না। শিক্ষকতায় কত বিপদ, কত আশঙ্কা, কত দায়িত্ব! তবু কতজন সামান্য লাভের প্রত্যাশায়, স্বার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেছেন, সমাজের আদর্শস্থানীয় শিক্ষক বলিয়া জগতে পরিচয় দিতেছেন, অথচ নিজকে নিজে সুশিক্ষিত করিতে চেষ্টা করেন না! প্রাকৃতিক নিয়ম এই, উৎপাদকের গুণ যেরূপ হয় উৎপন্ন বস্তুর গুণও তদনুরূপই হইয়া থাকে। শিক্ষা সম্বন্ধেও তাহাই দেখা যায়, শিক্ষকের অধিকাংশ গুণই ছাত্রে প্রবর্ত্তিত হয়। তবেই, যিনি নিজে শিক্ষায় পূর্ণতা লাভে অসমর্থ হইয়াছেন, তিনি কি ছাত্রকে সাঙ্গশিক্ষা দান করিতে সমর্থ হইতে পারেন? পাঠকবর্গই একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, এরূপ শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষা-দান-বাসনা পরিত্যাগ করা ন্যায়সঙ্গত কি না।

যখন এক অলসতায় ছাত্রগণের আজীবন কষ্টভোগের কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন শিক্ষকের এক একটি গুণের অভাব যে ছাত্রের এক একটি দুঃখের মূলীভূত হেতু হইবে, তাহা কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারিবেন?

শিক্ষা-রাজ্য চির-বিস্তৃত; আজীবন শিক্ষা করিলেও শিক্ষার নিবৃত্তি হয় না। তন্মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা দান অতীব কঠিন সাধনা; এ সাধনা সিদ্ধ করাই শিক্ষক-জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য। এজন্য প্রচীন আর্য্যমহর্ষিরা বলিয়া গিয়াছেন যে, কাহারও কোনও সাধনা সিদ্ধ করিতে হইলে অগ্রে সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইতে হইবে; তৎপর সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইতে হয়। অন্যথা কোন বিষয় কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। অতএব শিক্ষকের সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হওয়া সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। তৎপর বিদ্যানুরাগী হওয়ার সবিশেষ আবশ্যক। কারণ যাহার যে কার্য্যে অনুরাগ নাই, সে কদাপি সে কার্য্যে অন্যের অনুরাগাকর্ষণ করিতে পারে না।

উপসংহার কালে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে মহাত্মা শিক্ষা-কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিয়া নিজের দায়িত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন, স্ব পদোচিত গুণসম্পন্ন হইয়া শিক্ষা-ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, ফলতঃ যিনি "সামান্য হইতেও মহত্তের সূচনা হয়," এই বাক্য মূলমন্ত্র জানিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে শিক্ষা-দানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনিই শিক্ষক।

ভাষার বিশুদ্ধতা-রক্ষা।

মানবের প্রধান শক্তি ভাষাতে নিহিত। জ্ঞান-প্রভাবে মনুষ্য জীব-জগতে শ্রেষ্ঠ, ভাষা সেই জ্ঞানের ভাণ্ডার। যে জ্ঞানের উপরে মানুষের সুখ, দুঃখ, উন্নতি, অবনতি নির্ভর করিতেছে, তাহা সর্ব্ব-প্রযত্নে রক্ষণীয়, সন্দেহ নাই; সুতরাং মানব-সমাজের বহু যুগ-সঞ্চিত জ্ঞানকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে এবং ভবিষ্যতে বহু যুগের জন্য নূতন জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইলে সর্ব্বপ্রযত্নে ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বিবিধ দেশীয় বিবিধ জাতির অবস্থা পরস্পর তুলনা করিলে দেখা যায়, যে জাতির ভাষা যত উন্নত, সে জাতি তত উন্নত। ভাষা উন্নত হইলে জাতি উন্নত হয়, কি জাতি উন্নত হইলে ভাষা উন্নত হয়, ঠিক করিয়া বলা বড় কঠিন। আমাদের বোধ হয়, ইহাদের উন্নতি পরস্পর সাহায্য-সাপেক্ষ। কোন জাতি বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে, অথচ তাহাদের ভাষা নিতান্ত অপকৃষ্ট রহিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখ, ইংরাজ জাতির ভাষা গ্রীক, লাটিন, কেল্‌টিক্, ফরাসী, ডেনিস, সাক্সন, প্রভৃতি কতকগুলি ভাষার মিশ্রিত একটি খিঁচুড়ি বিশেষ; কিন্তু উন্নতি-শীল ইংরাজ জাতি সেই তালি দেওয়া ভাষাকে ঘষিয়া, মাজিয়া, পিটিয়া, চৌরস করিয়া এমন সুন্দর করিয়া লইয়াছে যে, জীবিত ভাষাদিগের মধ্যে ইংরাজী ভাষাকে আজ কাল সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিতে হয়। আবার কোন জাতি একটি উৎকৃষ্ট ভাষাকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছে, অথচ তাহারা অপকৃষ্ট রহিয়াছে, এমন দৃষ্টান্তও অতি বিরল। যে সকল ভারতীয় অনার্য্য জাতি আর্য্য-বশ্যতা গ্রহণ করিয়া আর্য্য-ভাষাকে মাতৃ-ভাষার পদে বরণ করিয়া আর্য্য-সমাজে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহারা প্রথমে যে নিতান্ত হীনাবস্থ ছিল, ইহা কতকটা নিশ্চিত; কিন্তু এখন বিশেষরূপে প্রণিধান না করিলে প্রকৃত আর্য্যদিগের সঙ্গে তাহাদিগের জাতি-গত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না—মানসিক শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ বুঝা যায় না। আমেরিকার নিগ্রো-জাতীয় ক্রীত দাসগণ ঘোর অসভ্য ছিল; কিন্তু আজ কাল তাহাদিগের মাতৃ-ভাষা ইংরাজী, এবং তাহাদিগের মধ্যে অনেকে মানসিক শক্তিতে ইংরাজের সমকক্ষ। এস্থলে উন্নত ইংরাজী ভাষা যে একটি নিকৃষ্ট জাতিকে উন্নত করিতেছে, তাহা কে অস্বীকার করিবেন?

ভাষা উন্নত হইলে, জাতি কেন উন্নত হয়, এ স্থলে তাহার কারণ আমরা অনুসন্ধান করিতেছি না; কিন্তু ইহা যে একটি প্রত্যক্ষ বিষয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এ হেন ভাষার মঙ্গল সাধনে স্বজাতি-বৎসল ব্যক্তি মাত্রেরই যত্ন করা একান্ত কর্ত্তব্য, যাঁহার যে শক্তি আছে, তাহাই ইহাতে প্রয়োগ করা উচিত,—যাঁহার যে সম্পদ

আছে, তাহাই দিয়া মাতৃ-ভাষাকে অলঙ্কৃত করা কর্ত্তব্য। ভাষার সমৃদ্ধির উপকরণ প্রধানতঃ দুইটি; প্রথম, ব্যক্তিগত প্রতিভা, দ্বিতীয়, জাতি-গত উৎসাহ। ঈশ্বর প্রসাদে বঙ্গে প্রতিভাশালী লেখকের বিশেষ অভাব ছিল না, কিন্তু দুঃখের বিষয়, উৎসাহের অভাবে তাঁহাদের অনেকে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছেন! ইহা বাঙ্গালী জাতির প্রশংসার কথা নহে, বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আশার কথাও নহে।

উন্নত ভাষার অনেক গুণ থাকা চাই; তন্মধ্যে দুইটি গুণ অপরিহার্য্য,—যে ভাষায় ইহার একটির অভাব আছে, সে ভাষাকে কদাচ উন্নত বলা যাইতে পারে না। ইহাদের একটি এই যে, মানবের মনে যত প্রকার ভাবের উদয় হইতে পারে, ভাষা তৎসমস্ত প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে। দ্বিতীয় গুণ এই যে, ভাষার যে শব্দটি যে ভাব এক সময়ে প্রকাশ করে, সেই শব্দটি সেই ভাব চিরদিন প্রকাশ করিতে থাকিবে। আজ সূর্য্য বলিতে যাহা বুঝিতেছি, শত বৎসর পরে যদি জল বলিতে তাহাই বুঝি, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ সাহিত্য জগতে কি বিষম বিভ্রাট ঘটে! কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, যে সংস্কৃত ভাষা জগতে অতুল সমৃদ্ধিশালিনী, বঙ্গভাষা তাহারই প্রতিভায় দীপ্তিশালিনী—তাহারই অব্যবহিত উত্তরাধিকারিণী, সুতরাং এ দুই সম্পদে বঙ্গভাষা দরিদ্র নহে।

আজকাল বঙ্গ ভাষার উন্নতির দিন। উন্নতিতে পুরাতনের পরিবর্ত্তন এবং নূতনের আহরণ অবশ্যম্ভাবী। এ সময়ে বাঙ্গালার প্রতিভাশালী লেখকদিগের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজীতে যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, আজ তাহা সাধারণের বোধগম্য করিতে হইলে তাহাকে আবার বর্ত্তমান ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত করিতে হয়। যদি বাঙ্গালী লেখকেরা এখন হইতে সাবধান না হন, তাহা হইলে বঙ্গভাষারও এই দুর্দ্দশা হইবে,—আজ যে গ্রন্থ বাঙ্গালায় সর্ব্বজনবোধ্য, কিছু দিন পরে হয় তাহা অব্যবহার্য্য-বোধে পরিত্যক্ত হইবে, না হয় তাহাকে বাঙ্গালীর ভাবী ভাষায় অনুবাদিত করিতে হইবে।

বঙ্গভাষার এই দুর্গতিকে দূরে রাখিবার দুইটি উপায় আছে। এই উপায় দুইটি বঙ্গভাষী সকলে অবলম্বন করিলেই বিশেষ মঙ্গল, নিতান্ত পক্ষে বঙ্গভাষার লেখকেরা যদি উহা অবলম্বন করেন, তাহা হইলেও কতকটা রক্ষা। প্রথম উপায় এই, নূতন আহৃত উপকরণ আস্ত বিদেশী পোষাকে না লইয়া, কেবল ভাবমাত্র গ্রহণপূর্ব্বক দেশী পোষাকে তাহাকে সাজাইয়া মাতৃভাষার সম্পদ করিয়া লওয়া। জননী সংস্কৃত ভাষার প্রসাদে এ কার্য্য বিশেষ কঠিন নহে, তাঁহার ভাণ্ডারে অসীম উপকরণ সংগৃহীত রহিয়াছে, কিছু কষ্ট স্বীকার করিয়া ধাতু প্রত্যয়গুলি যুড়িয়া লইলেই হইল। শ্রদ্ধেয় অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় এই প্রথা অবলম্বনে মাতৃভাষাকে কিরূপ সমৃদ্ধিশালিনী করিয়াছেন, তাঁহার পাঠকের নিকট অবিদিত নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ কাল অনেকে সে প্রথা ভাল

বাসিলেও তাহার জন্য কিছুমাত্র কষ্ট স্বীকার করেন না, তাই আমরা বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে বিজাতি, বিদেশী, অপরিচিত এক একটা শব্দ দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া যাই, বিদেশী ভাষায় ব্যুৎপত্তি না থাকিলে তাহার কিছুই বুঝিতে পারি না। হংস-পরিবৃত বকের সঙ্গে এরূপ শব্দের তুলনা করিলে তাহা যথাযথ হয় না;—সুখাদ্য মুড়ির সঙ্গে লোহার কলাই থাকিলে যেমন অসুখ হইতে পারে, এইরূপ শব্দ দর্শনে আমাদের সেইরূপ অসুখ হয়। লেখকেরা একটি সহজ কথা নিয়ত মনে রাখিলেই এ দোষের পরিহার করিতে পারেন। তাঁহারা লিখিবার সময় যদি এই কথাটা মনে রাখেন যে, তাঁহারা যাহা লিখিতেছেন, তাহার পাঠক বাঙ্গালা ভিন্ন অপর কোন ভাষা জানেন না, তাহা হইলে এ দোষ আপনা হইতেই ঘুচিয়া যায়।

ভাষার এই অবিশুদ্ধতার জন্য সাময়িক ও সংবাদপত্রের সম্পাদকেরাই বিশেষ দায়ী। তাঁহারা প্রবন্ধ লিখিবার সময়ে প্রায়ই ভাষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন না, "যেন তেন প্রকারেণ" মনের ভাবটা প্রকাশ করিতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। তাঁহাদের জানা উচিত, বিদেশী ভাষা জানেন না, এমন লক্ষ লক্ষ পাঠক তাঁহাদিগের লেখা পড়িতেছে, এবং তাহাই যথা-প্রাপ্ত অবস্থায় উদরস্থ করিয়া ভাবী মিলিত বঙ্গভাষার গোড়া পত্তন করিতেছে। যেখানে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না, সেখানে অবশ্যই লেখককে বিশেষ পুরস্কার দিতেছে, কিন্তু আমরা তাহার অংশী নহি, সুতরাং সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্যও নাই।

নূতনের আহরণ সম্বন্ধে যেরূপ, পুরাতনের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধেও সেইরূপ সাবধান থাকিতে হইবে। ইহা বেশী কঠিন নহে, এবং ইহাতে বিশেষ প্রতিভারও প্রয়োজন নাই; কিন্তু তথাপি এ বিষয়ে লেখকদিগকে সচরাচর সতর্কতা শূন্য দেখিতে পাইয়া আমরা ব্যথিত হই। যে স্থলে পরিবর্ত্তন না করিলে চলে না, অথবা যে স্থলে পরিবর্ত্তন করিলে বিশেষ লাভ আছে, আমরা সে স্থলে পরিবর্ত্তনের বিরোধী নহি; কিন্তু যে স্থলে পরিবর্ত্তন নিষ্প্রয়োজন, অথবা পরিবর্ত্তনে লাভ না হইয়া ক্ষতি হয়, আমরা সে স্থলে পরিবর্ত্তন দেখিলে দুঃখিত হই। বঙ্গভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীব লিঙ্গ শব্দের বিশেষণ প্রায়ই পুংলিঙ্গেরই মতন ব্যবহৃত হয়, এ নিয়ম এক প্রকার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এখন তাহা বঙ্গ ভাষার একটি অঙ্গ। "কথাটি বড় সারবান্" "রেশমী বস্ত্র বড় মূল্যবান্," ইত্যাদি কথা সংস্কৃতানুমোদিত না হইলেও বাঙ্গালায় সাধু-সম্মত। "জলন্ত চিতা," "ফুটন্ত কুসুম" প্রভৃতিও কাল-মাহাত্ম্য এবং ব্যবহার-গুণে বঙ্গ ভাষার সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আজ কাল আবার অনেক সময়ে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণের নিরর্থক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে "মনোহারিণী তৈল", "বাতনাশিনী রস" প্রভৃতি যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। আমরা দেখিয়াছিলাম, কলি-

কাতায় একটি পাঠশালা ছিল (এখন আছে কি না জানি না), তাহার নাম "ছাত্র-বোধিনী বিদ্যালয়"। যেখানে ছাত্র বিদ্যালাভ করিবে, তাহার নামেই ব্যাকরণের এইরূপ পিণ্ড-প্রয়োগ! আর সেই অর্দ্ধ-দোকানদার অর্দ্ধ-শিক্ষক গুরু মহাশয়কেইবা কি বলিব? কবি বলিয়া পরিচিত একজন সুপ্রসিদ্ধ কবির ভ্রাতা যখন লিখিতেছেন, "জ্বালাময়ী চীৎকারের দূর প্রতিধ্বনি," তখন আর অন্যকে কি বলিব? ব্যাকরণের একেবারে মুণ্ড-পাত করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা না করিলে সাহিত্য-ব্যবসায়ীর হাত হইতে বিশেষণের এরূপ ব্যবহার অসম্ভব। বঙ্গভাষার বর্ত্তমান অবস্থায় হঠাৎ স্ত্রীলিঙ্গ-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণের এরূপ আদর কেন হইয়া উঠিল, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। ইহা আদিরস-প্রধান বঙ্গীয় সাহিত্যের অন্যতর ফল নহে ত?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাঁহারা বিদেশীয় ভাব মাতৃভাষায় অনুবাদ করেন, তাঁহারা মাতৃভাষার পরম হিতকারী। কিন্তু তাঁহাদিগকেও বিশেষ সাবধান না হইলে প্রকারান্তরে মাতৃভাষার ক্ষতির সম্ভাবনা। একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। ইংরাজীতে জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী বলিয়া একটি কথা আছে, কথায় কথায় মিলাইয়া বাঙ্গালায় তাহার অনুবাদ করিতে গেলে "মিলিত-ধনব্যবসায়ি-দল" বা "মিলিত-ধনব্যবসায়" বলিতে হয়। কিন্তু আজ কাল "যৌথকারবার" নামে একটা কথা বাঙ্গালার অনেক সংবাদ পত্রে ব্যবহৃত হইতেছে। ইংরাজীতে কথাটা যেরূপ আছে, তাহা শুনিলেই অর্থ প্রতীত হয়। বাঙ্গালায় "মিলিত ধন" "সমেত ধন" "মিলিতাংশ" বা "সমেতাংশ" বিশেষণটি ব্যবহার করিলেও ঐরূপ অর্থ প্রতীত হইতে পারে। যৌথ শব্দটা অল্পাক্ষর হইলেও তেমন সহজ নহে, বিশেষ ইহা প্রকৃত কথার নিকট দিয়াও যাইতেছে না। যৌথ শব্দটা যূথ শব্দ হইতে উৎপন্ন; যূথ শব্দের অর্থ পশুর দল। এখন দেখুন, অর্থটা প্রকৃত পথ ছাড়িয়া কত দূরে যাইয়া পড়িতেছে। কোথায় মনুষ্যগণ পরস্পরের ধন মিলিত করিয়া একযোগে ব্যবসায় চালাইবে, আর কোথায় পশুর দলের পক্ষে কারবার চালাইবার কথা। বালক এবং অসভ্য ভাষা-জ্ঞানে বঞ্চিত, তাই কতক হাউমাউ করিয়া, কতক হাত পা নাড়িয়া, কতক অশ্রু হাস্য প্রভৃতি দেখাইয়া কোন প্রকারে মনের ভাব ব্যক্ত করে; কিন্তু একটি উন্নত ভাষা যাহার হস্তে যন্ত্র-স্বরূপ রহিয়াছে, তাহাকেও কি ভাব প্রকাশের জন্য বালক বা অসভ্যের প্রথা অবলম্বন করিতে হইবে? সত্য বটে, ভাষা যতই উন্নত হউক না কেন, সে কখনও ভাবের সঙ্গে দৌড়িতে পারিবে না; কিন্তু তথাপি যে স্থলে ভাষা ভাব প্রকাশে সমর্থ, সে স্থলে তাহাকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে।

এপ্রস্তাবে যে বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা অতীব গুরুতর; আমরা আশা করি বঙ্গ-সাহিত্যের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেই কথাটি চিন্তা করিবেন।

আধুনিক শিক্ষা ও বর্ত্তমান লেখক।

বাতুলতাচ্ছন্ন রোগীর ন্যায় বর্ত্তমান লেখক মহোদয়গণ যে প্রস্তাবই লেখেন না কেন, তাহাতেই আধুনিক শিক্ষার অবতারণা করেন। এই প্রকার অবতরিণা করিবার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যই কেবল মাত্র আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্ত বি এ, এম এ, উপাধি-ধারী যুবকদিগের কুৎসা করা। বিশেষতঃ বর্ত্তমান লেখকদিগের মধ্যে যে সকল মহোদয়গণ বহু আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ও ঐরূপ হেয় উপাধি (তাঁহাদের প্রাজ্ঞ মতে) গ্রহণে অসমর্থ, সুতরাং নৈরাশ্য-সাগরে ভাসমান হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছেন, তাঁহারাই অবশেষে বি এ, এম এর স্কন্ধে ভর করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধুয়াই এই যে, আজ কাল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রাপ্ত বি এ, এম এ.গণ কিছু মাত্র লেখা পড়া শিখেন না। ফলতঃ বি এ, এম এ তাঁহাদের চক্ষের কুটাস্বরূপ। এমন কি তাঁহারা উপাধি প্রাপ্ত বলিতেও ঘৃণা বোধ করেন; এবং উপাধিগ্রস্ত বলিয়া পরগ্লানিরূপ কুৎসিত ও অপ্রীতিকর কার্য্যেই শান্তি লাভ করেন। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রের নিকট স্বতঃই প্রতীয়মান হইবে যে, নৈরাশ্য-প্রণোদিত হইয়াই তাঁহারা এই রূপ লিখিতে সুখানুভব করেন। কিন্তু হায়! যত দিন না লোকের মানসিক অধঃপতন হয়, ততদিন এরূপ হওয়া সম্ভবে না। নিজের এ ভয়াবহ অধঃপতনের পরিচয়-দানে এত আগ্রহ-প্রকাশ কেন?* আধুনিক বি এ, এম এ, যে আশানুযায়ী শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন না, তাহা স্বয়ং বেদব্যাস আসিয়া বলিলেও আমরা তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে অক্ষম। কিন্তু তাই বলিয়াই যে আমরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর পক্ষপাতী, তাহা মনে করা ভ্রম। আমরা ইহাও স্বীকার করি না যে, আধুনিক শিক্ষিত যুবকগণ আশাতীত ফল প্রাপ্ত হন। অধুনাতন শিক্ষা-প্রণালীর দোষেই আমাদের যত দুর্দ্দশা, তদ্ভিন্ন যুবকদিগের কোন দোষ দিতে পারা যায় না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদের মতে ভাল নয়। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিমাত্রেই মিণ্টনের প্রস্তাবিত শিক্ষা-প্রণালীর দোষ কীর্ত্তন করেন, এবং স্বাধীন দেশসমূহে কুত্রাপি সে প্রণালী প্রচলিত নাই। মিণ্টনের মতে ছাত্রজীবনে যত প্রকার বিদ্যালাভ ও যত প্রকার শাস্ত্র আয়ত্ত করা যায় ততই ভাল। একটি মাত্র বিষয় সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে পারদর্শিতা লাভ করা তাঁহার মতে পরিশ্রম নষ্ট ও বহুমূল্য সময় ক্ষয় মাত্র। আমরা এ সুধীবাক্যের পোষকতা করিতে অপারগ। নিরূপিত কালমধ্যে কোন এক বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিলে পরে স্বেচ্ছামত অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানলাভ করিতে তত কষ্ট বোধ হয় না, এবং সহজেই কার্য্যসিদ্ধও হয়।

সকল প্রকার শিক্ষাতেই নিম্নলিখিত বিষয় কয়টি বিচার্য্য;—(১) ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্বাভাবিক রুচি বা অনুরাগ, (২) মনোযোগ; (৩) কার্য্যে

* লেখকের মহত্ব এই যে তিনি স্বয়ং উপাধি-গ্রস্ত নহেন। শিঃ পঃ সঃ।

অভ্যাস, (৪) কর্ত্তব্য জ্ঞান, (৫) উপদেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি, (৬) ভবিষ্যৎ-সুখের আশা, (৭) শারীরিক সুস্থতা ও তন্নিমিত্ত উৎসাহ।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আজ কাল যে প্রণালীতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, তাহাতে এই সমুদয় স্বাভাবিক নিয়ম পদে দলিত হইতেছে। শিক্ষা-বিষয়ক এই নিয়মগুলি শিক্ষা-কার্য্যে প্রয়োগ করিলেই শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। যাহাতে ইহারই উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন, বর্ত্তমান লেখকগণের তাহারই চেষ্টা করা উচিত; তদ্ভিন্ন অনর্থক নিরপরাধী ছাত্রদিগের গ্লানি করিয়া ফল কি? কেবল গলাবাজিই সার। ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের নিয়ম প্রতিপালনে বাধ্য। ভাল মন্দ বিচার করিবার তাহাদের অধিকার নাই। যাহাতে নিয়মগুলি ভাল হয়, শিক্ষা কার্য্য সুনিয়মে চলে তৎপ্রতি বয়ঃপ্রাপ্ত শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই লক্ষ্য রাখা উচিত।

ক্রমে আমরা উপরোক্ত বিষয় কয়টির যথাসাধ্য আলোচনা করিয়া দেখি।

(১) সমুদয় বিষয় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই জানা যাইবে যে, মনুষ্যভেদে প্রকৃতিভেদ, প্রকৃতি ভেদে রুচি ভেদ। আমার যে বিষয়ে রুচি আছে, তোমার তাহাতে অরুচি: আবার তোমার যাহাতে রুচি আছে, আমার তাহাতে নাই। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে অনুরাগ। যাহার যে বিষয়ে স্বাভাবিক রুচি, তাহা পাঠে তাহার বিশেষ আনন্দ বোধ হয়। আনন্দ বোধ হয় বলিয়াই স্বাভাবিক নিয়মবলে সে বিষয়ে তাহার মনোনিবেশ হয়, এবং অল্প বা বিনা আয়াসেই শিক্ষিতব্য বিষয় নিজের আয়ত্ত করিতে পারে। কাহার বা অঙ্কশাস্ত্রে রুচি আছে। সে অল্প কাল মধ্যেই উহা নিজ আয়ত্ত করিয়া পণ্ডিত-সমাজে আদৃত হয়। আর যাহার তাহা নাই, তাহার পক্ষে অঙ্কশাস্ত্র বড়ই কঠিন বোধ হয়; কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা না থাকিলে শিক্ষা করা দূরে থাকুক, এককালে সে উহা বর্জ্জনই করিত। বাধ্যবাধকতা থাকে বলিয়াই অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিক্ষা করিতে বাধ্য হয়। পরে দিনে দিনে যে একটুকু অভ্যাস জন্মে, তাহারই গুণে যাহা কিছু শিক্ষা করে, নচেৎ শিক্ষা এক প্রকার অসম্ভবই হইত। দৃষ্টান্ত দেওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। প্রত্যহ শত সহস্র জ্বলন্ত উদাহরণ আমরা নিজেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ স্বাভাবিক নিয়মটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেন। উপেক্ষা করেন বলিয়াই আজ লোকে আধুনিক শিক্ষা-প্রাপ্ত যুবকদিগকে দোষ দিতে পারিতেছেন। প্রকৃত পক্ষে যুবকগণ নিরপরাধী। স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ-সুখের আশ্রয় ও উদর-পূর্ত্তির একমাত্র উপায় জ্ঞানে লোকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ানুমোদিত শিক্ষা-প্রাপ্ত হইবার জন্য এত ব্যগ্র। প্রাচীন কালে যখন আজ কালের মত অন্নচিন্তা ছিল না, স্বাধীন রুচি ছিল, তখন আমাদের দেশ কত শিক্ষিত লোকে পরিপূর্ণ ছিল, তাহার ইয়ত্তা কে করে? রাজ্যচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রকার স্বাধীনতার লোপ কি আক্ষেপের বিষয়!

(২) শিক্ষার প্রধান সহকারী মনোযোগ। মনোযোগ ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। সুখাশা-প্রণোদিত হইয়া লোকে বিষয় বিশেষে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে; মনোযোগ সেই অনুরাগেরই বশবর্ত্তী। বিষয়ান্তরে মন গেলে শিক্ষার প্রচুর ব্যাঘাত জন্মে; এমন কি শিক্ষাই হয় না। মন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, কোন বিষয়েই লিপ্ত হয় না। মনোযোগের উপর স্মৃতিশক্তির প্রাখর্য্য নির্ভর করে। যাহার মনোযোগ নাই তাহার কিছু মাত্র স্মরণ থাকে না। দুইটি বন্ধু একটি মনোহর গল্পে বিভোর; এমন সময় তাহাদের অনতিদূরে একটি ঘড়ি বাজিল, অথচ তাহাদের উভয়ের মধ্যে কেহই তাহা শুনিতে পাইল না। ইহার কারণ কি? বন্ধুদ্বয় গল্পে এতই মনোযোগ দিয়াছিল যে তাহারা ঘড়ির শব্দের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে নাই। ঘড়ি বাজা অবশ্যই তাহারা শুনিয়াছে; কারণ তৎকালে তাহাদের কর্ণরোধ হইয়াছিল না। অনবধানবশতঃই ঘড়ি বাজা তাহাদের স্মরণ নাই। মনোযোগ কতক পরিমাণে অভ্যাসের উপরও নির্ভর করে। যদিও কোন কোন বিষয় উপস্থিত সময়ে তত আনন্দদায়ক না হউক, কিন্তু অভ্যাসবশতঃ তাহাতে মনঃসংযোগ করিতে পারিলে তাহাতেই পরে আনন্দানুভব হয়। এই গেল আনন্দপক্ষে মনোযোগ। অপর দিকে দুঃখ-সংশ্রবেও মনোযোগ জন্মে; কিন্তু তাহারও গর্ভে সুখ ও আনন্দ নিহিত থাকে। প্রহার ভয়ে লোকে কোন কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে বাধ্য হয়। এখানে দুঃখের অভাবই সুখ। মনোযোগ না দিলে দুঃখ পাইতে হইবে, এই ভয়ে দুঃখ পরিহার করিবার জন্যই মনোযোগ দেয়। দুঃখ না থাকাকেই স্থল বিশেষে সুখ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ মনোযোগ ক্ষণস্থায়ী। বাধ্যবাধকতার অভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ইহারও অভাব দৃষ্ট হয়। ছাত্রগণ যতক্ষণ শিক্ষক মহাশয়ের বেত্র সমক্ষে উপস্থিত, ততক্ষণই তাহারা একান্ত মনোযোগী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। হস্তাধিক ব্যবধানে অবস্থিত হইতে না হইতেই তাহাদের আনন্দদায়িনী ক্রীড়ার বশবর্ত্তী হয়, এবং পড়া শুনার কথা একেবারেই ভুলিয়া যায়। প্রত্যহ ইহার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট বিষয় সমুদয়ের প্রতিও কষ্ট পরিহার করিবার উদ্দেশেই অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকি। যেমন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হস্ত হইতে কোন প্রকারে নিষ্কৃতি পাই, অমনি আমোদের অন্বেষণে ব্যস্ত হই। পিঞ্জর-মুক্ত শুকের ন্যায় আমরা একবার মুক্তিলাভ করিলেই সুখের দাস হই, আর পড়া শুনায় মন বসে না। কিসে সুখ, কিসে সুখ বলিয়া ব্যস্ত হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞান হারাইয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ একবারেই রোধ করি। এ সমুদয় অনর্থের মূলই বিশ্ব-বিদ্যালয়। পরাজিত জাতির এরূপ অধোগতি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথানুসারে এক সময়ে আমাদিগকে নানা বিষয় অধ্যয়ন করিতে হয়। মনোযোগ ব্যতীত শিক্ষা অসম্ভব বলিয়াই মনকে নানা বিষয়ে বিভক্ত

করিতে হয়, কোনটিতেই নিপুণভাবে মনো-নিবেশ করিতে পারা যায় না, সুতরাং বিফল মনস্কামও হইতে হয়।

(৩) অভ্যাস ও শিক্ষার আর একটি প্রধান সহায়। প্রত্যহ নিরূপিতরূপে কোন কার্য্য করিতে থাকিলে তাহাতে অভ্যাস জন্মে। প্রথমে যাহা কঠিন বলিয়া বোধ হয়, পরে অভ্যাসের গুণে তাহা অতি সহজ বোধ হয়। অভ্যাসবলে হয় না, এমন কায নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অভ্যাসকে দ্বিতীয় স্বভাব বলা যায়। আমরা অনেক সময় নানা প্রকার কসলৎ দেখিয়া থাকি, সে সকল কেবল অভ্যাসের বলেই হইয়া থাকে। অভ্যাস না থাকায় কার্য্যকালে অনেকে প্রভূত কষ্ট পাইয়া থাকেন। অতএব যাহাতে কার্য্যে অভ্যাস জন্মে, তাহার উপায় দেখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বিশ্ব-বিদ্যালয় কেবল এই নিয়মটির কথঞ্চিৎ প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

(৪) কর্ত্তব্যজ্ঞান। এই কর্ত্তব্যজ্ঞান নীতিমার্গ-প্রস্থিত। কর্ত্তব্য কার্য্যে অব-হেলা প্রদর্শনে স্বয়ং নীতি-বিগর্হিত কার্য্য করিলাম বলিয়া যে মানসিক একটি উদ্বেগ জন্মে, সেই উদ্বেগই কর্ত্তব্য প্রতিপালনের প্রণোদক। নীতি-বহির্ভূত কর্ম্মে পাপও স্পর্শে। কেহই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইতে চাহে না। এটি মনুষ্যের স্বভাব। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই এ জ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কর্ত্তব্য-জ্ঞান আছে বলিয়াই মনুষ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দেখিও যেন এ জ্ঞান হারাইয়া পশুত্বে পতিত হইও না। পূর্ব্বকালে যখন আর্য্যধর্ম্ম অপ্রতিহত ছিল, তখন এই কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখা-ইতে পারিয়াছেন বলিয়াই পূর্ব্বপুরুষগণ এত উন্নত ছিলেন। ক্রমে কর্ত্তব্য-জ্ঞানের হ্রাসের সহিত আমাদের অধঃপতন হই-তেছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে প্রথম হইতে কিছু কিছু নীতি-শিক্ষা দিলে, আজ কর্ত্তব্যজ্ঞানের এত অভাব দৃষ্ট হইত না। যাহাতে আমাদের হৃদয়ে কর্ত্তব্যজ্ঞান বদ্ধ-মূল হয়, তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা উচিত।

(৫) শিক্ষাদাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি না থাকিলে তাঁহার কথায় আস্থা জন্মিবার ব্যাঘাত ঘটে। মনুষ্যপ্রকৃতি এরূপ যে শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্রের প্রলাপ বাক্যও সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়। অপর পক্ষে অশ্রদ্ধা ও অভক্তিতে বিষম অনর্থ ঘটে, সত্য কথাও মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। শিক্ষাদাতাও যাহাতে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারেন, তৎপ্রতি তাঁহারই লক্ষ্য রাখা উচিত। সতত একত্র বাস ও পরস্পর প্রতি পরস্পরের সদ্ব্যবহারই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার মূল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষক ও ছাত্র মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপনের পথ প্রায় রুদ্ধ হইতে চলিল। এক এক শ্রেণীতে যেরূপ ছাত্রসংখ্যা, তাহাতে ছাত্র শিক্ষকে পরিচয় হওয়াই দুরূহ। প্রাচীন কালে শিক্ষক ছাত্রকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন, ছাত্র ও শিক্ষককে পিতৃতুল্য সম্মান করিত। হায়! আজ সেই অনির্ব্ব-চনীয় ভাবের একবারেই অভাব। ইহা কি শিক্ষার পক্ষে কণ্টকস্বরূপ হয় নাই। বর্ত্ত-মান শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত থাকিলে এ কণ্টক উদ্ধারের উপায় কি?

(৬) ভবিষ্যৎ-সুখের আশায় লোকে বর্ত্তমানে কষ্টও স্বীকার করিয়া থাকে। রোগ-মুক্ত হইয়া সুস্থ শরীর ধারণ করিবার আশায় জীবনসংহারক বিষও লোকে পান করে। আশু বিরক্তিকর পাঠও ভবিষ্যৎ-সুখের আশায় লোকে অভ্যাস করিয়া থাকে। কিন্তু হতভাগ্য পরাজিত জাতির সুখের আশা কোথায়? প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া, বহু পরিশ্রম করিয়া, শরীর ধ্বংস করিয়া ভবিষ্যৎ সুখের আশায় যুবকগণ কতই কষ্ট স্বীকার করে, কিন্তু সুখ কোথায়? শিক্ষার এক প্রকার শেষ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবা মাত্র হা অন্ন, হা অন্ন করিয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতে হয়। এত পরিশ্রমের কি এই শেষ? পার্থিব সুখের জন্য সকলেই ব্যস্ত। অর্থ-ব্যতীত সে সুখ মিলে না। কত অর্থ ব্যয় করিয়া, কত পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া লোকে বি এ, এম এ উপাধি প্রাপ্ত হয়, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু পরিণাম কি? পরিণাম—কুড়ি টাকার চাকুরির জন্য দশ টাকার টিকিট খরচ, উপরন্তু পায়ে ধরা। আজও যৎকিঞ্চিৎ ভবিষ্যতের সুখের আশা আছে বলিয়া অদ্যাবধিও লোকে ইংরাজি শিক্ষা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। দুদিন পরে সংস্কৃত ও ইংরাজির একই দশা ঘটিবে।

(৭) শরীর মনে নিকট সম্বন্ধ। শরীর ভাল না থাকিলে মন ভাল থাকে না, মন ভাল না থাকিলে কার্য্যে উৎসাহ জন্মে না, এবং উৎসাহ ব্যতীত কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পদ্ধতি অনুসারে অতি অল্প কালমধ্যে নানা প্রকার বিষয় শিক্ষা করিতে হয়। অত্যধিক পরিশ্রম ব্যতিরেকে সফল-মনস্কাম হওয়া যায় না। অত্যধিক পরিশ্রমে শরীর নষ্ট হয়। যুবকগণ এইরূপে পাঠ্যাবস্থায় শরীর নাশ করিয়া বিদ্যাভ্যাস করে। অবশেষে শরীর ধ্বংসজনিত মানসিক অসুস্থতা-নিবন্ধন উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া চিরকাল দুঃখে কালাতিপাত করে। পাঠাবস্থায় যাহা কিছু শিক্ষা করে, পরে অনভ্যাস বশতঃ তাহাও ভুলিয়া যায়। কাযেই লোকে তাহাদিগকে দোষ দেয়। কিন্তু যথার্থ বিচার করিতে হইলে যুবকদিগের কোন অংশেই দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

অভিভাবকের কর্ম্ম।

আজি কালি অনেকেই অল্প বয়সে পুত্রের পিতা হইতেছেন, কিন্তু কি প্রকারে পুত্রকে পালন করিতে হয় তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। যে বিষয়ের উপর পুত্রের ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখ নির্ভর করে, তাহা বড় সামান্য কথা নহে। ইহা একবার সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত। কি প্রকারে পালিত হইলে পুত্র ভবিষ্যতে সুখে কাল কাটাইতে সক্ষম হইবে, ইহা ভাবিবার বিষয় সন্দেহ নাই।

সাধারণতঃ বালকদিগের অভিভাবকগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। অভিভাবক মাত্রেই যে এই দুই শ্রেণীর কোন একটির অন্তর্ব্বর্ত্তী তাহা বলিতেছি না। ইহার মধ্যে এক শ্রেণীস্থ অভিভাবকগণ মনে করেন যে বালকগণকে তাড়না করিলেই বুঝি তাহারা সর্ব্ব কর্ম্মে পারদর্শী হইবে, ইহা তাঁহাদের বিষম ভুল। সর্ব্বদা তাড়না করিলে বালকগণ কদাচই আদিষ্ট কার্য্য করে না, বরং মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হয়। বালক পড়া শুনা করিতেছে না দেখিয়া তাহাকে যৎপরোনাস্তি প্রহার ও ভৎর্সনা করিলাম। মনে করিলাম বুঝি বালক আমার এইবার শোধরাইল; কিন্তু না, তাহা নহে। যদিও কখন কখন বালকদিগকে আদিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহারা উহা এত অসন্তোষকররূপে সম্পন্ন করে যে অভিভাবক মনে মনে সাতিশয় বিরক্ত হন। বালকগণকে সর্ব্বদা "টিক্ টিক্" করিলে যে তাহারা শোধরায় না, বরং একবারে জন্মের মত বিগ্‌ড়াইয়া যায়, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। আমার এক খুল্লতাত পুত্র অতি শৈশব অবস্থায় কলিকাতায় আনীত হয়। আমার খুড়া মহাশয় নিজে বেশ লেখা পড়া জানেন এবং পুত্রকেও তদনুরূপ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল, সুতরাং কলিকাতায় আনিয়াই তাহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। এই ভর্ত্তি হওয়াই তাহার কাল হইল। পূর্ব্বে সে গ্রামে থাকিতে গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিত, এক্ষণে তাহার সে সুযোগ গেল—সকালে বিকালে মাষ্টার আসিয়া পড়াইয়া যায়, সুতরাং আর খেলিবার সময় পায় না, অথবা সময় পাইলেও সঙ্গী পায় না। কারণ কলিকাতার ছেলেরা বাটীর বাহিরে প্রায় খেলা করে না। ইহার ফল হইল এই যে, সে কাওরা, বাগ্‌দী প্রভৃতি নীচ জাতীয় ছেলেদের সহিত খেলা করিতে আরম্ভ করিল। প্রহার ও ভৎর্সনা পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল, এই সময় তাহার কিছু বাড়াবাড়ি হইল। ক্রমে সেও বাটী হইতে পলাইতে আরম্ভ করিল। তিন চারি দিন পরে তাহাকে খুঁজিয়া আনিতে হইত। এইরূপে সে মদ, গাঁজা প্রভৃতি খাইতে শিখিয়াছে, এক্ষণে যাত্রা করিয়া বেড়ায়।

উপরে যাহা বলিলাম, তাহা সত্য ঘটনা। সকলেই দেখিবেন যে নিরবচ্ছিন্ন প্রহার দ্বারা বিষময় ফল লাভ হইয়াছে। আমি এস্থলে এমন বলিতেছি না যে, প্রহার ও ভৎর্সনা একবারেই করিবে না; তাহাতে ছেলে "নাই" পাইয়া উঠে। শাস্ত্রে যে "অতি" শব্দ দোষাবহ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা সকল সময়ে সকল বিষয়েই প্রযোজ্য।

অপর শ্রেণীর অভিভাবকগণ পুত্রকে সর্ব্বদাই আদর দিয়া থাকেন। পুত্রের লেখা পড়া হউক না হউক সে বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি নাই, কিন্তু পুত্রকে শিক্ষক বা অন্য কেহ কিছু বলিলে ইহা তাঁহাদের প্রাণে সহ্য হইবে না। আমি এক সময় কোন স্কুলে উপস্থিত ছিলাম; দেখিলাম এক ব্যক্তি সেই স্কুলের কোন

শিক্ষককে বলিতেছেন, "মহাশয়, আমার একটি মাত্র পুত্র, আমি উহাকে বড় ভাল বাসি, আপনি উহাকে মারিবেন না ; লেখা পড়া না করে নাই করিবে।" অনেকে মনে করিবেন, আমি ইহা মিথ্যা বলিতেছি, কিন্তু ইহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। আমি ইহা স্বকর্ণে শুনিয়াছি। এই সমস্ত অভিভাবকগণ যে নিতান্ত অর্ব্বাচীন, তাহা সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। সন্তান আদরের সামগ্রী বটে, কিন্তু যে আদর পুত্রের ভাবি মঙ্গলের হানি করে, তাহা আদর নহে—পুত্রের মাথা খাওয়া মাত্র। যতদিন বাঁচিলাম, বড় জোর না হয় পুত্রকে তত দিন কোন কষ্ট করিতে হইল না ; কিন্তু আমি মরিলে পুত্রের কি হইবে ? এই শ্রেণীর লোকগণ ইহা একবারও ভাবেন না। অতুল বিষয় রাখিয়া গেলেও দুই দিনে উড়িয়া যাইতে পারে, তাহার পর ছেলের কি হইবে ? • •

অতএব দেখা যাইতেছে, এই দুই শ্রেণীস্থ অভিভাবকগণেরই কার্য্য প্রণালী দূষণীয়। প্রথম শ্রেণীস্থ অভিভাবকগণের সদিচ্ছা বটে, কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে যে উপায় অবলম্বন করেন, তাহা অতি অপ্রশস্ত। এ উপায়ে কখনও কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই এবং পারিবেন না। যে উপায় ছেলেদিগকে একবারে বিগড়াইয়া দেয়, এমন কি, পিতামাতার উপর সাতিশয় বিরূপ করিয়া তুলে, সে উপায় কখনই অনুমোদনীয় নহে। দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ লোকগণকে কি বলিব! তাঁহাদের সর্ব্বথা ইচ্ছা, পুত্রকে উৎসন্ন দেওয়া। প্রথম শ্রেণীস্থ অভিভাবকগণের ইচ্ছা অতি সৎ, এ বিষয়ে তাঁহারা প্রশংসনীয়ই বটেন; কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিভাবকগণের পুত্রের মঙ্গল কামনা ত নাই, বরঞ্চ তাঁহারা জানিয়া শুনিয়া পুত্রের মহা অনিষ্ট করিয়া বসেন।

শুধু শাসনের বা ঢালাও আদরের কর্ম্ম নহে। ছেলে রীতিমত মানুষ করিতে হইলে এ দুইয়ের সংমিশ্রণ আবশ্যক। যেখানে কেবল শাসন, কিছুমাত্র আদর নাই, সেখানে ছেলে জন্মেরমত বিগড়াইয়া যায়; আবার যেখানে খালি আদর, একটুও শাসন নাই, সেখানে ছেলে একবারে পিতামাতার মাথায় চড়িয়া বসে, মনে করে আর আমায় পায় কে? আমি ত এখন একপ্রকার স্বাধীন। অতএব পুত্র মানুষ করিতে হইলে আদরও চাই—শাসনও চাই। দুই ই আবশ্যক। পড়িবার সময় শাসনে থাকিয়া পড়িবে, আদরের সময় আদর পাইবে, ইহাই নিয়ম। এইপ্রকার না হইলে কোন উদ্দেশ্যই সফল হইবে না। "না মারিলে ছেলে বিগ্‌ড়ে" এই বাক্যের এরূপ উদ্দেশ্য নয় যে, ছেলেদিগকে সর্ব্বদা প্রহার না করিলে ছেলে পিলে মানুষ হইবে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অযথা আদর দিলে ছেলে খারাপ হইয়া যায়; সুতরাং মধ্যে মধ্যে শাসন আবশ্যক। নিরবচ্ছিন্ন আদর বা নিরবচ্ছিন্ন শাসন, এই দুইয়ের একটিও সুফলপ্রদ নহে। ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত।

আর একটি কথা আমি বলিতে ভুলি-

য়াছি। বালকগণের বাল্য জীবন যেমন হইবে, ভবিষ্যৎ জীবনও তদ্রূপ হইবে। বাল্যকালে তাহাদের মনোবৃত্তি যে ভাবে গঠিত হইবে, উত্তরকালেও তাহা ঠিক সেই প্রকার থাকিবে। কোন প্রকারে ইহার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। বাল্য-জীবন সুখকর বা কষ্টকর হইলে ভবিষ্যৎ জীবনও নিশ্চয় সুখকর বা কষ্টকর হইবে।

একজন সুবিখ্যাত দার্শনিক বলিয়াছেন, "পরিণত জীবনের সুখ প্রধানতঃ বাল্য-জীবনের প্রীতিকর স্মৃতিদ্বারা গঠিত হয়। শিক্ষা-প্রবণ বাল্যকাল সাধারণতঃ সুখ দুঃখের স্মৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে বড় পটু। একই সুখের ব্যাপার যদি বাল্যে এবং যৌবনে ঘটে, বৃদ্ধকালে তাহা স্মরণ করিতে তুল্যরূপ প্রীতি পাওয়া যাইবে না। অতএব দেখা যাইতেছে, বাল্যকালীয় সুখের যেন একটি অতিরিক্ত উপকারিতা আছে। বাল্যকালে নিরবচ্ছিন্ন আমোদ-শূন্য কঠোরতার সহিত প্রতিপালিত হইলে সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনটা যেন একেবারে দলিয়া যায়, পরবর্ত্তী কালে হাজার সুখ সৌভাগ্য পাইলেও আর সে ক্ষতি পূরণ হয় না।"

সন্তান লালন পালন করিতে হইলে, পিতা মাতার কি প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক, এবং তাহা না করিলে ভবিষ্যতে কত অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, ইহাতে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ তাঁহার পিতার নিকট হইতে শৈশবকালে যে প্রকার শিক্ষা পাইয়াছিলেন, আজীবন তাঁহার মনোবৃত্তি সেই প্রকারে চালিত হইয়াছিল। যাঁহারা তাঁহার আত্মচরিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি যে সকল বিষয় মিল্ লিখিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায়েরই অঙ্কুর তাঁহার পিতা শৈশবকালে তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্রে রোপণ করিয়াছিলেন। কালে সেই বীজ বৃক্ষাদিরূপে পরিণত হইয়াছিল।

উপদেশ মালা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১৩

অনন্ত অসীম-জ্ঞানের সাগর
সম্মুখে তোমার আছে বিদ্যমান;—
অমৃত সুমান-স্বচ্ছ নিরমল—
কর যত পার জ্ঞান-সুধা পান।

জ্ঞান-সাগরের এক বিন্দু বারি
পরশ করিয়া হ'ওনা বিরত;
আকণ্ঠ পূরিয়া কর জ্ঞান পান,—
জ্ঞানের সাগরে ভাস মীন মত।

জ্ঞানামৃত পান কর নিশি দিন;
জ্ঞানের পিপাসা অনন্ত অপার,
যতই করিবে জ্ঞান-সুধা পান,
ততই বাড়িবে পিপাসা তোমার।

১৪

পর-উপকারে সাধুর জীবন,
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ বিদ্যমান;
চন্দন পাদপ অই যে শোভন—
পর-উপকারে উহার পরাণ।

কাঠুরিয়া করে কুঠার আঘাত
সুযশঃ শরীরে—কৃতঘ্নের প্রায়;
তবুও না করি ছায়ার ব্যাঘাত,
বিমল সৌরভ বিতরে তাহায়!

নিস্বার্থোপকার কে করে এমন
চন্দন তরুর মত এ জগতে?
পর হিত তরে আপন জীবন
পারে কি মানব দিতে এ মরতে?

১৫

ত্যাগ কর বৃথা অহঙ্কার—
অহঙ্কার সর্ব্ব দুঃখ-মূল।
অহঙ্কারী ঘৃণিত সবার—
ধনে, মানে—যদিও অতুল।

তুমি ধনী, এত অহঙ্কার
কেন কর?—অর্থের কারণ?
জোয়ারের জল আসে যায়
পুনঃ হয়—পূর্ব্বের মতন!

হে মুষিক! হইয়াছ মুনি।
ভাব মনে—কি দশা তখন
নিয়তির চক্র-বিবর্ত্তনে
পুনঃ হবে মুষিক যখন!

ফলভরে অবনত তরু,
দেখ দেখ—বিনীত কেমন!
অহঙ্কার না আছে উহার,
মুক্ত হস্ত প্রার্থীর কারণ।

তুমি ধনী, যদি পার হও
ফলবান্ অই তরু মত;—
ত্যাগ করি বৃথা অহঙ্কার
পর-উপকারে হও রত।

১৬

জন্মভূমি পুণ্যভূমি
স্বর্গাদপি গরীয়সী—
ধরা মাঝে শোভে, যথা
তারা মাঝে শোভে শশী।

সেই জন্মভূমি তরে
স্বদেশ-প্রেমিক যারা
দেয় প্রাণ অকাতরে,
ত্যজি পুত্র-কন্যা-দারা।

তোমরা ভারত-বাসি!
স্বদেশের দুঃখ হেরি,
কেমনে নিশ্চিন্ত ভাবে—
আছ বল, চুপ করি?

জাগ হে ভারত-বাসি!
মোহ-নিদ্রা পরিহর;
ভারতের দুঃখ দূর
এক প্রাণ হ'য়ে কর।

১৭

যতো ধর্ম্মস্ততো জয়, এ কথা অসত্য নয়;
জানিবে নিশ্চয় নারী নর।
পাপের হইবে ক্ষয়, ধর্ম্মের হইবে জয়,
আজি কিম্বা দশ দিন পর॥
ধর্ম্ম-বলে বলী যেই, নির্ভীক হৃদয় সেই;
শমনে কি ভয় আছে তার?
ধর্ম্মালোকে আলোকিত, চিত্ত সদা পুলকিত
সুখ শান্তি আয়ত্ত তাহার॥

পাপ করি বড় হায়! যে জন হইতে চায়—
তার সম মূর্খ কোন্ জন?
পাপে যবে হবে ভারী অবশ্য ডুবিবে তরী,
ভ্রমে তাহা—ভাবে না কখন!!

১৮

অকারণে হ'লে ব্যয় তারে বলে অপব্যয়;
অপব্যয়ী হ'লে লক্ষ্মী ছাড়ে।
ভোগ বিলাসের তরে অপব্যয় যেই করে—
তার অর্থ—কভু নাহি বাড়ে॥
ভোগ বিলাসিতা হায়! জ্বলন্ত অনল প্রায়
উপভোগে সাম্য নাহি হয়।
অনলে ঢালিলে ঘৃত নাহি হয় নির্ব্বাপিত;
সমধিক জ্বলিবে নিশ্চয়॥
অতএব নারী নর, অপব্যয় ত্যাগ কর;
কর ব্যয় আবশ্যক মত।
ভোগ বিলাসিতা তরে অপব্যয় নাহি ক'রে,
পর হিত সাধ অবিরত॥

১৯

মহাকাল ফল, দেখিতে সুন্দর—
ভুল না তা' দেখি নর।
না করি পরীক্ষা চাক্-চিক্যে ভুলি
করিও না সমাদর॥
মহাকাল মত, উপরে সুন্দর—
অন্তরে গরল ভরা।
এ পাপ সংসারে, আছে নারী নর
পরি-পূর্ণ করি ধরা॥
না জানি স্বভাব, তাহাদের সঙ্গে—
বন্ধুত্ব যে জন করে।
নির্ব্বোধ সে জন নির্ব্বুদ্ধি কারণ
অবশ্য কাঁদিয়া মরে॥

২০

স্বাস্থ্য-সর্ব্বসুখ মূল, এ কথায় নাহি ভুল;
স্বাস্থ্য হানি দুঃখের কারণ।
স্বাস্থ্য-সুখ নাহি যার, কোন্ সুখ আছে তার?
তুল্য তার জীবন মরণ॥
তুমি ধনী স্বাস্থ্যহীন, কাঁদিতেছ নিশিদিন,
শান্তি বিনা—সকরুণ স্বরে।
চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় হইয়াছে এবে হেয়,
যদিও প্রচুর আছে ঘরে॥
আর ঐ কৃষিজীবী, মুষ্টিমেয় অন্ন-ভোজী
পরিশ্রমে কর্কশ শরীর।
পত্র-বিনির্ম্মিত ঘরে, সামান্য বিচালি পরে
নিদ্রা যায় কেমন গভীর!!
সুবর্ণ পালঙ্কে হায়! স্প্রিং আটা বিছানায়
নাহি নিদ্রা, হে ধনী তোমার।
ভাবিছ কত কি ছাই, এ ধরায় শান্তি নাই,
অন্ত নাই বুঝি যাতনার॥
কারে তুমি সুখী বল? ওহে নরনারী দল!
উভয়ের দশা ভাব মনে।
স্বাস্থ্যবিনা এবে মরে; নিদ্রা যায় অন্যে ঘরে
কি খাবে জাগিয়া নাহি গণে॥

২১

উপকার কভু কার, যদি না করিতে পার—
অপকার করিওনা কদা।
ভ্রাতৃভাবে সবে মিলে থাকিবে এ ধরাতলে—
পরস্পর নির্ব্বিবাদে সদা॥
স্বার্থ সাধনের তরে অপকার যেই করে,
তার সুখ হয় না মরতে।
স্বার্থপর বলি তারে সর্ব্ব লোকে নিন্দা করে;
স্বার্থপর ঘৃণিত জগতে॥
হিংসা, দ্বেষ, কপটতা, জুয়াচুরি, নিষ্ঠুরতা
দিও না হৃদয়ে কভু স্থান।
শুদ্ধ দেহ, শুদ্ধ মনে, সদা সাধু আচরণে
এ জীবন কর অবসান॥

শিক্ষা-পরিচর।

১ম ভাগ। | পৌষ ১২৯৬ সাল। | ৯ম সংখ্যা।

সামাজিক উন্নতি।

আমরা জগতে যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, তাহা মনুষ্যের নানা প্রকার উপকারে আইসে। কিন্তু মানুষ সহজে সেই সকল বস্তুর উপকারিতা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সকল দ্রব্যেরই কতকগুলি গুণ সহজে বুঝা যায়; যথা, বর্ণ, বিস্তৃতি, কাঠিন্য, মৃদুতা, ইত্যাদি। আবার কতকগুলি গুণ বস্তুর মধ্যে এমন গোপনভাবে থাকে যে, তাহা বুঝিয়া লওয়া অতিশয় পরিশ্রমের কার্য্য; যথা, বস্তুর রূপান্তর বা অন্যান্য বস্তুর সহিত সংযোগ হইলে যে সকল গুণ হয়। আমরা এক্ষণে যত প্রকার দ্রব্যের গুণ জানিতে পারিয়াছি, আদিম মনুষ্যগণ তাহা কখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতেন না। আমরা সচরাচর যে সকল বস্তু নানা প্রকারে ব্যবহার করিয়া থাকি, ঐ সকল বস্তুর ঐ গুণগুলি অবগত হইতে মনুষ্যজাতির কত পুরুষ লাগিয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে?

আদিম মনুষ্যগণের প্রকৃত ইতিহাস অত্যন্ত দুর্লভ। কিন্তু ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাঁহাদিগের অবস্থা তেমন সুখের ছিল না। জড় জগতের যে সকল গুণ জানিতে পারিয়া প্রবীণ আধুনিকেরা আজ প্রকৃতিকে একরূপ দাসী করিয়া লইয়া নানা প্রকার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়াছেন, সেকালে নব্য প্রাচীনেরা বিজ্ঞানের অভাবে আপনাদিগকে প্রকৃতির ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র বোধে জড় প্রকৃতির নানা মূর্ত্তিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন। প্রকৃতির ভীষণ অনিষ্টকর রূপ সকলের ভয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা জড়সড় হইয়া থাকিতেন।—মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড রবি; দশদিক কম্পিতকারী বহমান পবন; বজ্রনিক্ষেপকারী মেঘগর্জ্জন; হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ, প্রকাণ্ড বনরাজিসমাচ্ছন্ন, অন্ধকারের নিবাসভূত, গগনবিদারী পর্ব্বতসঙ্ঘ; উত্তাল তরঙ্গিত, খরস্রোতপ্রবাহিত, মকরালয় নদ; সর্ব্বভুক্ অগ্নি—ইহারা প্রশান্ত হউক, প্রশান্ত হউক; আমরা ইহাদের

সুন্দর প্রশান্ত মূর্ত্তি একবার নয়ন ভরিয়া দেখি; ইহারা যাহাতে আমাদিগের অনিষ্ট না করিয়া কেবল উপকারে আইসে তাহাই হউক; ইহাই প্রাচীনেরা নিয়ত প্রার্থনা করিতেন। প্রকৃতির নিকট তাঁহারা যে সকল অনুগ্রহভিক্ষা বা স্তুতি করিতেন, তাহা অদ্য বালকের অশেষ জিজ্ঞাসা এবং সহজ লব্ধ উত্তরের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। বাস্তবিক ঐ প্রকৃতিপূজার মধ্যেই আধুনিক বিজ্ঞান সকলের মূল নিহিত রহিয়াছে। মনুষ্য যে দিন প্রকৃতিকে দেবতা জ্ঞানে তাহার শরণাপন্ন হইল, তাহার গুণের আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই দিনই মনুষ্য প্রকৃতির চা'ল চলন বুঝিবার অর্থাৎ বিজ্ঞানের পথে দাঁড়াইল।

পুরাবৃত্ত পাঠে জানিতে পারা যায়, আজ যে লৌহ আমাদের প্রাত্যাহিক ব্যবহারের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই লৌহের অতি সাধারণ গুণসকলও পূর্ব্বকালে মনুষ্যজাতির নিকট প্রকাশ ছিল না। সে সময়ে লোকে পাথর দিয়া অস্ত্রের কার্য্য করিত। লৌহ অত্যন্ত কঠিন, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, সুতরাং অস্ত্র ত হইতেই পারে; কিন্তু উহার আরও অনেক আশ্চর্য্য গুণ আছে যাহা তত সহজে জানিবার উপায় নাই; কে সহজে মনে করিতে পারে যে, যে লৌহ কেবল যেন কাটিবার ও রক্তপাত করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই আবার রূপান্তরিত হইয়া রক্তকে পোষণ করে? আবার এই লৌহের এই রক্ত পোষণ করতা গুণ বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বে মনুষ্যকে আরও কত বৎসর কত গুণ জানিতে হইয়াছিল? আজ মনুষ্যজাতি লৌহের রহস্য বুঝিতে পারিয়া কত সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইতেছে, কিন্তু ইহাদিগের আদিপুরুষগণ এই সামান্য বস্তুটির গুণ না জানাতে কত কষ্টে থাকিত। যেমন লৌহ সম্বন্ধে, তেমনি অন্যান্য বস্তুতেও দেখিতে পাইবে। জল একটি সামান্য পদার্থ এবং উহাদ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ হয়, ইহা মনুষ্য অতি আদিম কাল হইতেই অবগত আছে;—কারণ তাহা না হইলে মনুষ্যের জীবন ধারণ সম্ভবপর হইত না। কিন্তু এখন এই জলে কল চলে এবং তজ্জন্য আমাদের কত সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি পাইয়াছে!—আবার দেখ চিরকাল মনুষ্য বিদ্যুৎকে অতি ভয়ের চক্ষে দেখিয়াছে। বজ্রাঘাতকে মনুষ্য যত ভয় করে তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু বিজ্ঞানচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে আজ বজ্রের কি দুর্দ্দশা ঘটিআছে! বিদ্যুৎ আমাদের সংবাদ বহিয়া লইয়া যাইতেছে, ক্ষণপ্রভা এখন স্থিরপ্রভা হইয়া আমাদিগের বড় বড় সহরের উদ্যান সকল আলোকিত করিয়া দিতেছে, এবং যে বিদ্যুৎ বজ্ররূপে পুরাকালে ইন্দ্রের হাতে কেবল বিনাশ করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইত, তাহা আজ সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের হস্তে উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে লোককে আঘাত করিয়া—বিনাশ করিতেছে না—পীড়ার উপশম করিয়া দিতেছে।

অতএব দেখ যে দ্রব্যের আমরা

কোনই উপকারিতা দেখিতে পাই না, অথবা কেবল অপকারিতা মাত্রই দেখিতে পাই, জ্ঞান-বলে পণ্ডিতেরা তাহারই মধ্যে কত সুখের উপকরণ বাহির করিতেছেন! আবার এখনকার লোকেরাই যে পৃথিবীর সমস্ত সুখ-ভোগ করিতে পারিতেছে তাহাও নহে। আদিম মনুষ্যজাতির তুলনায় আমরা যেমন অনেক বিষয়ে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, তেমনি ইহাও নিশ্চয়-রূপে বলা যাইতে পারে যে, আমাদিগের পরবর্ত্তী মানুষেরা আরও নূতন নূতন অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া তাহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা সমধিক বাড়াইবে। এখনও আমাদের মধ্যে কত কষ্টের কারণ রহিয়াছে—যাহার আমরা প্রতিবিধান করিতে পারি নাই। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান দিন দিন আমাদের শারীরিক দুঃখ দূর করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছে— তাহার দৌড় কি পর্য্যন্ত, তাহা কে সীমা করিতে পারে?

তথাপি মনুষ্যজাতির সুখের পথে বিস্তর কণ্টক। মনুষ্যজাতির সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু সকলে কোন্ সে সুখের ভাগী হইতে পায়? "কারও দুধে গুড়, কারও শাকে বালি" ইহা কি আমরা অহরহ দেখিতে পাইতেছি না? কেহ রাজ-অট্টালিকায় বিহার করিতেছে, আবার কেহ কি সারাদিন খাটিয়া খালি গায়ে, খালি পেটে, মাঘের শীতে, গাছ তলায় রাত্রি যাপন করিতেছে না? কেহ আপন ক্ষুধার্ত্ত সন্তানের মৃত্যুদশা দর্শন করিতে না পারিয়া এক মুষ্টি অন্ন চুরি করিয়া রাজার বিচারে কারাগারে যাইতেছে, আবার কেহ কি অর্থলোভে পরের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া রাজদরবারে সম্মানিত—রাজা, রায় বাহাদুর, কে-সি-এস্-আই—হইতেছে না? দরিদ্র প্রজা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, সন্তানকে পুষ্টিকর আহার না দিয়া, আবশ্যক মত শীতবস্ত্র না দিয়াও গবর্ণমেণ্টকে কর দিতেছে, আর গবর্ণমেণ্ট কি সেই কর প্রজার হিতের জন্য ব্যয় না করিয়া কেবল খাম-খেয়ালীতে—বর্ম্মার যুদ্ধে, দিল্লীর দরবারে—উড়াইয়া দিতেছেন না?

আছে, আমাদিগের অনেক দুঃখ এখনও আছে। বরং আদিম জাতি সকল আমাদিগের অপেক্ষা অল্প সংখ্যা এক সঙ্গে বাস করিত, তাহাদিগের সচরাচর অল্প লোকের সঙ্গেই কারবার করিতে হইত, সুতরাং সামাজিক বিশৃঙ্খলতাও কম ঘটিত। আর এখন সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক একত্রে বাস করে বলিয়া পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ সকল বিষয়ে রক্ষা করিয়া চলা ক্রমেই কঠিন হইতেছে, সামাজিক বিশৃঙ্খলাও অনেক ঘটিয়া উঠিতেছে। অথচ তাহা দূর করিবার উপায় জানে না বলিয়া সমাজ তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারিতেছে না। "ছিদ্রেষনর্থা বহুলি ভবন্তি"—একটা ছিদ্র পাইলেই অনেক অনর্থ আসিয়া যোটে। সমাজের এক দোষ হইতে বহু দোষ উৎপন্ন হইতেছে। একটা দোষ দূর করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বিত হইতেছে, অজ্ঞতা বশতঃ সেই উপায়ই

অনেক অনিষ্টের মূল হইয়া দাঁড়াইতেছে। সুতরাং রাজা বৎসর বৎসর নূতন নূতন আইন করিয়াও সমাজকে সুখী করিতে পারিতেছেন না।

বাস্তবিক সমাজ-তত্ত্ব এখনও লোকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। যে সকল রহস্যের উপর সমাজের শুভাশুভ নির্ভর করে, তাহা এখনও মনুষ্যজাতি সম্পূর্ণ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই। অথচ প্রত্যেক সমাজের ইতিহাস অনুসন্ধান কর, দেখিবে ব্যবস্থাতাগণ আপনাদিগকে অভ্রান্ত এবং সর্ব্বতত্ত্বদর্শী, ঈশ্বর প্রেরিত এবং ঈশ্বরানুগৃহীত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, অথবা তাঁহাদের শিষ্যগণ তদ্রূপ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কৃত ব্যবস্থা দ্বারা সমাজের সাময়িক উন্নতি সম্পাদন হইয়াছে, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে। কারণ, তাঁহারা তৎকালের লোকের মধ্যে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন এবং মনুষ্যের উন্নতির জন্য যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা, অথবা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ আপন আপন চেষ্টায় সকলে বাহির করিয়া লইতে পারিত বলিয়া অনুমান করা যায় না। কিন্তু তাঁহাদিগের ব্যবস্থা সকল সর্ব্বতত্ত্বদর্শিত্ব দোষে দুষ্ট হওয়ায়, দীর্ঘকাল লইয়া বিবেচনা করিতে গেলে, তদ্দ্বারা সামাজিক উন্নতির বিশেষ বিঘ্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ হইবে। কারণ মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বতত্ত্বদর্শিত্বের ভান করা একটা বিড়ম্বনা মাত্র। জগৎ অনন্ত, জ্ঞান অনন্ত। এই অনন্ত-বিষয়-সঙ্কুল অনন্ত-জ্ঞানসমুদ্রের উপকূলে দাঁড়াইয়া দুর্ব্বল মনুষ্য তীরবর্ত্তী উপলখণ্ড মাত্র আহরণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকে, সাগরের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া, আপনাকে নিরাপদে রাখিয়া, রত্নোদ্ধার করা কয় জনের সাধ্য হইয়াছে? অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের তুলনায়, সৃষ্টিকাল হইতে মনুষ্যজাতি কয়টি মাত্র সত্যরত্ন উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছে? এই মুষ্টিমেয় সত্য-রত্নের অধিপতি হইয়াই যে মনুষ্য সদর্পে "সনাতন" ধর্ম্ম প্রচার করিতে বসেন, ইহা কি ঘোর পরিতাপের, কলঙ্কের বিষয় নহে?

সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের একটা খেদ-জনক লক্ষণ এই যে, তাঁহারা বিশ্বাস করেন মনুষ্যসমাজ ক্রমে উন্নতির পথ হইতে সরিয়া অবনতির পথে যাইতেছে। যে সমাজে এইরূপ বিশ্বাস দৃঢ়সংস্থাপিত সে সমাজের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যুত যে সমাজ মনুষ্যের ক্রমিক উন্নতিতে আস্থা করিয়া তাহারই অনুকূল ব্যবস্থা অবলম্বনে চলিতে থাকে, তাহার সৌভাগ্য ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

মনুষ্যজাতির জ্ঞান-সমষ্টি ক্রমেই বাড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার আচার ব্যবহারেরও পরিবর্দ্ধন, পরিবর্ত্তন হওয়া চাই। যাহার পা নাই সে চলাচল করিতে হইলে যে উপায় অবলম্বন করিবে, যাহার পা আছে তাহার পক্ষেও চলাচলের সেই উপায় মাত্র ব্যবস্থা করিলে যেমন হাস্য-জনক হয়, তেমনি মনুষ্য সমাজের পক্ষে সনাতন আচার ব্যবহার এবং বিশ্বাস নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হাস্যজনক।

সমাজে রক্ষণশীল বা সনাতন সম্প্রদায়ের লোকের অভাব কোন কালেই ছিল না। কিন্তু সমাজ চিরদিনই তাঁহাদিগের বাধা না মানিয়া চলিয়াছে, প্রাচীন মত নূতন সময়ের উপযোগী হয় না। সমাজ ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ক্রমেই পরিবর্ত্তিত আচারগুলি আবার পুরাণ হইয়া সনাতন হইয়া বসিয়াছে।

কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ হওয়া অসম্ভব বলিয়া সমাজও কোন কালেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে নাই। সুতরাং সামাজিক বিশৃঙ্খলতাও কখন দূর হইতে পারিতেছে না। ভাই, মনুষ্য! গর্ব্ব করিও না। বিনয়ের সহিত আপনার এবং পূর্ব্বপুরুষগণের অজ্ঞতার বিষয় দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, ভক্তিভাবে সর্ব্বতত্ত্বময়ী প্রকৃতির সমীপে মস্তক অবনত করিয়া, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া মানিয়া, জ্ঞান শিক্ষা কর, শ্রেষ্ঠ রত্নরাজি দিয়া তাঁহার উপাসনা কর, আপনার শ্রেষ্ঠ বৃত্তি সকলের দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা কর—যদি কালে তিনি প্রসন্ন হইয়া তোমার বহু পরবর্ত্তী কোন বংশধরকে যথার্থ জ্ঞান দান করেন। যতদিন সে দিন না আইসে ততদিন যখন যে জ্ঞান লাভ করিবে, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে থাকিবে, যদি তাহাতে তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি লোপ করিতে হয়, তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না।

সৌভাগ্যক্রমে প্রকৃতি আমাদের মনে ইহার বীজ রোপণ করিয়া দিয়াছেন। আত্মসুখের ও আত্মরক্ষার চেষ্টা সকলেরই প্রধান ধর্ম্ম এবং তৎপরেই মনুষ্য আপন আত্মীয় স্বগণকে বাঁচাইতে, সুখী করিতে ব্যগ্র হয়। মনুষ্য মনুষ্যের দুঃখ উদাসীনের ন্যায় দেখিতে পারে না। তুমি বুনিয়াদি ধনী, তোমারও রক্তমাংসের শরীর; অমুক দরিদ্র, উহারও তাই। তুমি বিনা ক্লেশে, বিনা পরিশ্রমে অমুকের ঘরে জন্মিয়াছ বলিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য-ভোগ করিতেছ, আর ঐ দরিদ্র তাহার পিতার সন্তান বলিয়া অন্নাভাবে মরিতেছে—উহার অপরাধ? ঐ দরিদ্র ব্যক্তি, আজ তুমি যে সমাজে বিনা পরিশ্রমে, বিনা মনুষ্যত্বে বড়, সেই সমাজে ঘোরতর শ্রম করিয়াও পেটের ভাত যোটাইতে না পারিয়া নানা প্রকার পাপে লিপ্ত হইতেছে,—ও কি ছোট লোক! পশু! কিন্তু ভাই, বিবেচনা করিয়া দেখ, ঐ ব্যক্তি যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তখন উহার গায়ে ত "পশুত্ব" লেখা ছিল না! সমাজ উহার আত্মরক্ষার জন্য কি বিধান করিয়াছে, উহার শিক্ষার জন্য উহাকে পশু হইতে ভাল করিবার জন্য কি বিধান করিয়াছে? একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, উহার অবস্থায় তুমি পড়িলে হয়ত তুমিও উহার মত পশু হইতে। ইহাতে কি তোমার মনুষ্যত্বের গৌরবের লাঘব হয় না? ইহা কি ভাবিয়া তোমার দুঃখ হয় না, তোমার কি ইহা ভাবিয়া লজ্জা হয় না যে, ঐ যে দরিদ্র পশুর ন্যায় আচরণ করিতেছে, তুমিও উহার সহিত একজাতীয় প্রাণী? অনেক ছোট লোকের পুত্র কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিলেই আপন পিতার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত

হয়। কিন্তু তোমার ত সেরূপ অস্বীকার করিবার যো নাই। প্রকৃতি মার্কা মারিয়া দিয়াছে, তুমি কোন রূপেই তাহা লোপ করিতে পারিবে না। তুমি যতই কেন গলাবাজি কর না—তোমাকে উহারই ভ্রাতা বলিয়া সকলে চিনিবে। আবার দেখ, আজ ঐ দরিদ্র যে দুঃখ ভোগ করিতেছে, কা'ল সেই দুঃখ তোমাকে আসিয়া স্পর্শ করিতে কতক্ষণ? তোমার প্রতিবেশীর চালে আগুন লাগিলে তোমার কি নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকা শোভা পায়? আরও ভাবিয়া দেখ, দেশে অতুল ধন সম্পত্তি থাকিতে ঐ দরিদ্র অনাহারে মরিতেই বা চাহিবে কেন? তাহার আত্মরক্ষার চেষ্টা বলবতী রহিয়াছে, শরীরে বল আছে, তাহার সমান অবস্থার লোকেরও অপ্রতুল নাই। যদি তাহারা দলবদ্ধ হইয়া লাঠিহাতে তোমার এই সুখের ভাগী হইতে কৃতসঙ্কল্প হয়? পেটের দায়ে লোকে কি না করিতে পারে? বিখ্যাত ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব এই পেটের দায়েই হইয়াছিল। দরিদ্রের উদরে যে অগ্নি জ্বলিয়া ছিল, সেই অগ্নিতে রাজা রাজ্য ধনী পণ্ডিত সকলে পুড়িয়া ছারখার হইয়াছিল,—সেই অগ্নি নিবাইতে সমস্ত ইউরোপের রাজশক্তি একত্রিত হইয়া বহু রক্তপাত করিয়াছেন— কিন্তু নিবাইতে পারিয়াছেন বলিয়া সকলে এখনও বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। সামাজিক দুঃখ ও বিশৃঙ্খলতা কাহারই ঔদাসীন্যের বিষয় নহে।

তাই আমরা কাজেও দেখিতে পাই, অতি প্রাচীন কাল হইতে সামাজিক উন্নতি সাধনের জন্য, সকলের সুখস্বচ্ছন্দতার বিধান করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে। ধর্ম্ম ধনীদিগকে শিখাইয়াছে—দরিদ্রকে ভরণ করিলে স্বর্গ হয়। রাজা দরিদ্রের পোষণের নিমিত্ত নানা সময়ে নানা চেষ্টা করিয়াছেন। গৃহস্থ ভিক্ষা দিয়া দরিদ্রের অন্ন যোগাইয়াছে। দেশের ধন সম্পত্তি যাহাতে সকলেই আপন কর্ম্মানুসারে ভোগ করিতে পারে, তাহারও চেষ্টা সময়ে সময়ে না হইয়াছে এমন নহে। কিন্তু তাহাতে কি ফল হইয়াছে? দরিদ্র শ্রেণীর অবস্থার বিশেষ উন্নতি দেখিতে পাওয়া সুকঠিন।

ইহার কারণ এই ভিন্ন আর কি হইতে পারে যে, সামাজিক ব্যাধি-নিবারণ জন্য যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে উহার ঔষধ নয়? আমরা যে পর্য্যন্ত না সমাজ সম্বন্ধে আরও অধিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিব, সে পর্য্যন্ত সমাজের এই সকল দুঃখ দূর করিয়া উঠিতে পারিবার কোন সম্ভাবনা নাই। সমাজের উৎপত্তি, উন্নতি, স্থিতি কি কি নিয়মে হইয়া থাকে; এবং সমাজ উৎসন্নে যাইবা যায় কি কারণে, ইহা প্রথমে উত্তমরূপে অবগত হইলে সামাজিক অশুভ নিবারণের উপায় সহজেই আবিষ্কার হইবার কথা।

কিন্তু সমাজ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এক একটি সমাজ সহস্র সহস্র বৎসর হইল সূচিত হইয়াছে। এই দীর্ঘকালে প্রত্যেক সমাজেরই একটা কার্য্যপ্রণালী জন্মিয়া গিয়াছে।

মনুষ্য জন্মাবধি যে সমাজে লালিত পালিত হইয়াছে, শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে, নানারূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, তাহার প্রতি স্বতঃই প্রগাঢ় ভক্তিমান্ হইয়া থাকে। সমাজের কার্য্যপ্রণালী বা সংস্কার সকলকে আদর্শ-জ্ঞানে কার্য্য করিয়া থাকে; বাল্যাবধি যে অভ্যাস হইয়া যায় তাহা ছাড়িতে পারে না—তাহাদিগের প্রকৃতিও অনেকটা তদ্‌-স্বরূপ হইয়া যায়। সমাজের যে সকল গুরুতর অমঙ্গল দিন দিন নয়নপথে পতিত হইতেছে, তাহা যে সমাজের অমুক অমুক সংস্কারের ফলে হইতেছে, ইহা সহজে লোকের ধারণাই হয় না। তাহারা জ্ঞান করিয়া থাকে, এখনকার লোকগুলাই খারাপ হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই সমাজে এত পাপ ঘুটিয়াছে। সমাজ সম্বন্ধে কাহারই পক্ষ-পাতশূন্য হইয়া চলিবার যো নাই। সকলেই কোন না কোন সংস্কারের দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন, সেই সেই সংস্কারের উপ-কারিতাসূচক প্রমাণ সকলই তাঁহাদিগের চক্ষে পড়ে, বিরুদ্ধ প্রমাণগুলা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না। সুতরাং যাহার যে-রূপ সংস্কার জন্মিয়াছে তাহা দূর হওয়া বড়ই কঠিন, এবং তাহার সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানত ঐ সংস্কার দ্বারা রঞ্জিত হইয়া যাইবে। আবার সামাজিক দৃশ্য সকল কত জটিল! কোন একটি বিষয় দেখিতে হইলে তাহা অন্যান্য বিষয়ের সহিত সংস্রব ছাড়াইয়া দেখিবার যো নাই। পরন্তু সামাজিক বিষয়ের পরীক্ষা দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। যে সংস্কারটি অদ্য সমাজে নূতন প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা 'সু কি কু এটি স্থির করিবার পক্ষে অনেক বিঘ্ন রহিয়াছে। প্রথমতঃ দেখ, সেই এক সংস্কারকে অন্যান্য সহস্র সংস্কারের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হইবে। তার পর দেখ, ঐ সংস্কারের ফল কিছু তখন তখনই ফলিতে থাকিবে না। হয়ত আপাততঃ সংস্কারটি কেবল সুফলই প্রসব করিল—হয়ত তাহার ফলে সহস্র ক্ষুধাতুর নিয়মিতরূপে অন্ন পাইতে লাগিল। কিন্তু "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং"! শত বৎসর অপেক্ষা কর, দেখিবে ক্ষুধাতুরের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। ক্ষুধাতুরকে অন্ন দান করিয়া আর কুলাইবার সাধ্য নাই। কুবেরের ভাণ্ডার উহাতে নিযুক্ত করিয়া দেও, তাহাতেও কুলাইবে না। দেখিবে ক্ষুধাতুর যেন রক্তবীজের ঝাড়।

এইরূপ নানা কারণে সমাজের উন্নতি যথার্থরূপে হইতে পারে না। সমাজ বিজ্ঞান এখনও অনেকের নিকট উপহাসের বিষয় মাত্র। কিন্তু সমাজের বিশৃঙ্খলতার যে প্রতিবিধান হইতে পারে, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। শিক্ষিত দলে এমন লোক অতি অল্পই দেখিতে পাইবে, যিনি সামাজিক ব্যাধি নিবারণের একটা না একটা উপায় বলিয়া দিবেন। তবে এই উপায় বিজ্ঞান দ্বারা আবিষ্কৃত হইবে কি অজ্ঞান দ্বারা আবিষ্কৃত হইবে, ইহা লইয়াই যত গণ্ডগোল!

যাহা হউক মনুষ্য সমাজের উন্নতি বিষয়ে নিরাশ হইবার কোন কথা নাই। বিজ্ঞান বলে পৃথিবী ইন্দ্রের অমরাপুরী হইয়াছে, বিজ্ঞানই মনুষ্যজাতিকে অমরা-বাসী তুল্য করিবে। মনুষ্য জগতের

প্রত্যেক বস্তুর সহিত আপনার সম্বন্ধ যতই বিশিষ্টরূপে বুঝিতে শিখিবে, ততই নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বিবাদে, জীবন ধারণ তাহার পক্ষে সুলভ হইয়া আসিবে। সুতরাং সমাজের প্রকৃত উন্নতি প্রত্যেক মনুষ্যের শিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে। প্রত্যেক মনুষ্য যেরূপ ভাবে শিক্ষিত হইবে, সেরূপ কর্ম্মঠ হইবে, তাহার চরিত্র যে ছাঁদে গঠিত হইবে, মনুষ্য সমষ্টি বা সমাজের রীতিনীতি প্রকৃতিও তদনুরূপ হইবে। আবার ইহাও চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয় যে, প্রত্যেকেরই শিক্ষা এবং কর্ম্ম-প্রবৃত্তি অনেক পরিমাণে সমাজের হাতে। মনুষ্য যে ভাবেই কেন শিক্ষা প্রাপ্ত হউক না, তাহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে শিক্ষাদাতা সমাজের সংস্কার বা ছায়া দেখা যাইবে। সুতরাং সমাজ এবং শিক্ষা ইহারা উভয়ে উভয়ের মুখাপ্রেক্ষী। ফলতঃ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সংস্কার কতক পরিমাণে বদলাইতে না পারিলে মনুষ্য জাতির প্রকৃত কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা নাই। কর্ম্মানুযায়ী সুফল পাইবার আশা নাই।*

---

* এইখানে সম্পাদক মহাশয়ের সহিত আমার মিল হইবার সম্ভাবনা নাই। অন্ততঃ তিনি কার্য্যতঃ বলিবেন কথাটা হিন্দুসমাজের পক্ষে খাটে না; তাই দুইটা কথা বলিতে হইতেছে। হিন্দুসমাজ যে অনাঘ্রাত পুষ্প নয়, ইহা সম্পাদক মহাশয়ের পক্ষে স্বীকার করা কঠিন হইবে না। অন্যান্য সমাজের সহিত তুলনায় ইহার বাহ্যিক অবস্থা যে অতিশয় শোচনীয়, ইহাও তাঁহার অস্বীকার্য্য হইবে না। আবার হিন্দুসমাজ যে এত দিন হিন্দুগণকে সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষা দেয় নাই, ইহাই বা তিনি না মানিবেন কি বলিয়া? আর যে সকল বাল্যবিবাহী, প্রেতপুরুষ পিণ্ড-সংস্থান প্রয়াসী, অশুদ্ধোচ্চারিত সংস্কৃতশ্লোকপাঠী, গৌরীদান সাহায্য প্রার্থী, শত শত ব্রাহ্মণকুলতিলক শারদীয় পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতের নগরে নগরে বেড়াইয়া হিন্দুসমাজের সুপ্রসব ঘোষণা করিতেছে, তাহারাই যে মনুষ্য জীবনের আদর্শ, ইহাই বা সম্পাদক মহাশয় কোন্ লাজে বলিবেন? তবুও কি বলিবেন, সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে আর্য্যসন্তান যেরূপে শিক্ষিত হইত, যে আচার অবলম্বনে চলিত, তাহাই পুনঃস্থাপিত করিতে হইবে? কেন, মহাশয়, সে স্বপ্ন আবার কেন? একবার ত দেখা হইয়াছে! তখন মুসলমান আসিয়াছিল, যবন আসিয়াছিল, এ-ও-তা হইয়াছিল—? এখন কি ইংরাজেরা আইসে নাই, রেল, ষ্টীমার, ঘোর প্রতিযোগিতা (struggle for existence) উপস্থিত হয় নাই? সম্পাদক মহাশয় কি ভুলিয়া গিয়াছেন, যে সমাজ তৈয়ার হয় না, জন্মে? জিজ্ঞাসা করি হিন্দু সমাজের বয়ঃক্রম আর কত হইবে? পাকা চুল কি আবার কাঁচা হয়, পড়া দাঁত উঠে?—

কচ।

স্বর্গপুরের সিংহাসন লইয়া বহু কাল যাবৎ দেবদৈত্যে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। বিজয়-লক্ষ্মী কোন পক্ষকেই অচলভাবে আশ্রয় করিতেছেন না, সুতরাং বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, অবিরত যুদ্ধ চলিতেছে। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ বীরোচিত কার্য্যে জীবন-লীলা সাঙ্গ করিতেছে; কিন্তু অসুর পক্ষীয় সেনাগণ মরিয়াও মরে না। অসুর-গুরু শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী-মন্ত্র-বলে মৃত সৈন্যগণকে পুনর্জ্জীবিত করেন—তাহাদের সৈন্যবল ক্ষীণ হয় না। দেবপক্ষীয় সৈন্যগণ আর পুনর্জ্জীবিত হয় না। দিন দিন সৈন্যক্ষয় পাইতেছে, শত্রু লয় পাইতেছে না, ভাবিয়া দেবগণ আকুল।

একদা দেবগণ একান্তে বসিয়া দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্য হইতে সঞ্জীবনী মন্ত্র আহরণ জন্য পরামর্শ করিলেন। সুমন্ত্রণা-কুশল দেব-গুরু বৃহস্পতি দেবগণের প্রস্তাব যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়া স্বমত প্রকাশ করিলেন, এবং আপন তনয় শ্রীমান্ কচকে এই দুরূহ কার্য্য সংসাধন জন্য বৃষপর্ব্ব-পুরে প্রেরণ করিতে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

প্রথমতঃ দেবগণের হিতসাধন, দ্বিতীয়তঃ পিতৃ আজ্ঞা পালন, এমতাবস্থায় সুচরিত্র কৃত-বিদ্য শ্রীমান কচ শত্রু-সঙ্কুল স্থানে যাইতে আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। তিনি অবিলম্বে বৃষপর্ব্ব-পুরে যাত্রা করিলেন। পণ্ডিত শ্রীমান্ কচ অবগত আছেন, উপাধ্যায় শুক্রাচার্য্যের দেবযানী নাম্নী এক মাত্র কন্যা আছেন, পিতা দুহিতাকে আপন প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন, দেবযানীর চিত্ত বিনোদন করিতে পারিলে অচিরে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। কচ, বৃষপর্ব্বপুরে অধ্যাপক শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে উপনীত হইয়া, তাঁহাকে যথারীতি অভিবাদনপূর্ব্বক আপন পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন। শুক্রা-চার্য্য প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহস্পতির নন্দনকে আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কচ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আমি আপনার নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতে মানস করিয়া আসিয়াছি, অনুকম্পা পুরঃসর আমার বাসনা পূর্ণ করিলে কৃতার্থম্মন্য হইব"। শুক্রা-চার্য্য কচকে শত্রু-পুত্র ভাবিয়া কোন দ্বিধা-ভাব গ্রহণ করিলেন না, সরল চিত্তে "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। কচ যথাবিধি প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন ও পশ্চাতে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, এবং অশেষ প্রকার যত্নে দেবযানীর সেবায় রত রহিলেন। দেবযানী যখন যে অভিমতি প্রকাশ করেন, কচ, নিতান্ত কষ্ট-সাধ্য হইলেও তাহা সম্পাদন করিতে ত্রুটি করেন না। সরলা শ্রীমতী দেবযানী কচের পরিচর্য্যায় পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইলেন, এবং অবিরত একমনে কচের মঙ্গল কামনায় নিবিষ্টচিত্ত রহিলেন। এ দিকে কচের পরীক্ষার সময় সমুপস্থিত। অধ্যাপক শুক্রাচার্য্য প্রিয়-ছাত্রকে গোচারণে নিযুক্ত করিলেন। দেব-

গুরু বৃহস্পতির পুত্র, অথচ নিজে সুপণ্ডিত তথাপি কচের মনে কণামাত্র অভিমান উপজাত হইল না, তিনি চিরন্তন অভ্যাস-বলে অম্লান বদনে অবশ্য-কর্ত্তব্য জ্ঞানে উপাধ্যায়ের গো চরাইতে লাগিলেন। সুশীল কচ যথারীতি প্রতিনিয়ত গোচরাইতেছেন, এত দিনে দৈত্যগণ তাঁহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইল, এবং স্বজাতীয় স্বভাব-গুণে তাঁহার অন্তর-নিহিত ভাব পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিল। তখন তাহারা মনে করিল, কচকে নিহত করিতে না পারিলে কোনমতেই তাহাদের বিপদ-বারণ সঞ্জীবনী-মন্ত্র রক্ষা করিবার আর উপায় নাই। অতএব তাহারা তীক্ষ্ণধার অস্ত্রে কচকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া অস্থি মাংস হিংস্র জন্তুকে খাওয়াইয়া ফেলিল। সন্ধ্যা হইয়াছে, গোগণ ঘরে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু কচ আর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। তখন দেবযানীর মনে বিষম বাজিল, তিনি কচের নানা প্রকার অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া একেবারে ম্রিয়মানা হইলেন। আত্মীয় জনের অনিষ্ট চিন্তা স্বতঃই মনে উদিত হইয়া থাকে, সুতরাং এ সময়ে দেবযানীর এবম্বিধ চিত্ত-বিকার জন্মিবার বৈচিত্র কি? দেবযানী পিতৃ-সমীপে আপন মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলেন, এবং কচ বিহনে তিনি জীবন ধারণে অসমর্থা হইবেন, ইহাও প্রকাশ করিলেন। সন্তান-বৎসল পিতা ধ্যানযোগে কচের অনুসন্ধান করিলেন, কচের বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া সঞ্জীবনী মন্ত্র দ্বারা কচকে পুনর্জীবিত করিলেন, এবং কন্যার অনুরোধে ছাত্রকে গোচারণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন,—সে দিন হইতে কচের রাখালী ঘুচিল।

কিয়দ্দিবসানন্তর দেবযানী দেবারাধনা করিতে মনন করিলেন, এবং প্রিয়পাত্র কচকে তদুপযোগী পুষ্প আহরণ জন্য পাঠাইলেন। কচ উদ্যানে পুষ্প চয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে দিতি-সুতগণ কচকে পুনর্জীবিত দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইল, এবং অগোণেই তাহারা বুঝিতে পারিল যে, কুল-গুরু শুক্রাচার্য্য মহাশয় কচকে পুনরায় জীবন প্রদান করিয়াছেন। এবার তাহারা কচকে তিল প্রমাণ ক্ষুদ্র অংশে কর্ত্তন করিল, এবং ঘৃতপক্ক ও সুরা সহ মিশ্রিত করিয়া গুরুদেবের উদরসাৎ করাইয়া দিল।

এ দিকে কচের প্রত্যাগমনের উপযুক্ত সময় অতিবাহিত হইয়া গেল দেখিয়া দেবযানী অধীরা হইয়া উঠিলেন, কচের অনিষ্টপাতাশঙ্কায় আত্মহারা হইয়া গেলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে পিতৃস্থানে সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিলেন। ধীমান্ শুক্রাচার্য্য কন্যাকে নানাবিধ সান্ত্বনা-বাক্য-প্রয়োগে প্রবোধ দিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কচগত-প্রাণা দেবযানী কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না। কচকে পাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ পিতৃ সন্নিধানে তিনি আবদার করিতে লাগিলেন। প্রজ্ঞাবান্ শুক্রাচার্য্য ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন কচ তাঁহারই উদরে সুরা-সহ অবস্থান করিতেছেন। এবার দৈত্য-গুরু বিষম বিভ্রাটে পড়িলেন! কচের নাশে একে ব্রহ্মবধ, দ্বিতীয়তঃ একমাত্র কন্যার জীবন সংশয়,

তৃতীয়তঃ উপাধ্যায় নামে কলঙ্ক, অবশেষে আত্মনাশ। তিনি এখন বুঝিতে পারিলেন, কেবল সুরার প্রসাদে এই অনর্থ ঘটিয়াছে। যদি সুরা-পানে তাঁহার আসক্তি না থাকিত, তবে কচ কস্মিন্‌কালেও তাঁহার উদরস্থ হইতে পারিতেন না, এবং তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিতে আত্মপ্রাণ-নাশের, কারণও হইত না। তিনি তখনই সুরার প্রতি ঘোরতর অভিশাপ প্রদান করিলেন, সুরাকে অস্পৃশ্য পদার্থভুক্ত করিলেন, এবং গর্ভস্থ কচকে সঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষা করাইয়া বলিলেন, "বৎস কচ! আমি নিজ উদর চিরিয়া তোমাকে বাহির করিতেছি, তুমি মদ্দত্ত সঞ্জীবনী মন্ত্রে আমাকে পুনর্জীবিত করিবে।" কচ গুরুকে পুনর্জীবিত করিতে প্রতিশ্রুত হইলে পর অধ্যাপক আপন উদর চিরিয়া কচকে বহিষ্কৃত করিলেন এবং কচও গুরুদত্ত মন্ত্রে গুরুকে পুনর্জীবিত করিলেন।

কালক্রমে কচ স্বদেশে প্রতিগমন করিবার জন্য গুরুর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, এবং তথা হইতে কৃতকার্য্য হইয়া দেবযানী সমীপে উপস্থিত হইলেন। কচের বিদায়-সূচক বাক্যে দেবযানীর বক্ষে যেন শেলবিদ্ধ হইল; দেবযানীর অন্তরের স্থিরতা প্রস্থান করিল। দেবযানী সাশ্রু-লোচনে বলিল "এতকাল আমরা একত্র বসতি করিয়াছি, বিশেষতঃ আমি তোমাকে মনোমধ্যে পতিরূপে গ্রহণ করিয়াছি, এখন আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাইবে? যাইতে হয় অগ্রে আমাকে পত্নীত্বে গ্রহণ কর, পশ্চাৎ যাহা অভিরুচি হয় করিও"। কচ যদিও যুবা পুরুষ, তথাপি যৌবন-সুলভ চিত্ত-চাঞ্চল্য তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে নাই—ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-প্রভাবে তিনি যুবা হইলেও প্রবীণ; সুতরাং স্থিরভাবে ধীর নম্র বচনে কহিলেন "ভদ্রে! তুমি যে প্রস্তাব করিলে, তাহা নিতান্ত অলৌকিক, তোমার জঘন্য রুচি-ব্যঞ্জক প্রস্তাবে আমি কখনও সম্মতি প্রদান করিতে পারিব না। দেখ, তুমি আমার গুরু কন্যা, সুতরাং পূজনীয়া ভগিনী; বিশেষতঃ তুমি যে শুক্রাচার্য্য হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আমি তাঁহারই গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি; অতএব তুমি আমার জ্যেষ্ঠা সহোদরা। এমতাবস্থায় আমার প্রতি তোমার এবম্বিধ বাক্য-প্রয়োগ করা কেবল আমাকে বিড়ম্বনা দেওয়া মাত্র; আমি তোমার নিকট অতি বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি প্রীত-মনে আমাকে স্বদেশ গমনে বিদায়-দানে বাধিত কর।" দেবযানী অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, অনেক প্রলোভন দেখাইলেন, কিন্তু কচ কিছুতেই টলিবার লোক নহেন; তিনি কোন মতেই দেবযানীর ঘৃণিত প্রস্তাবে এক-মত হইলেন না। তখন দেবযানী ক্রোধে অধীরা হইয়া বলিলেন, "আমি স্ত্রী হইয়া উপযাচিকার ন্যায় তোমাকে এত বলিলাম, তবু তুমি আমাকে উপেক্ষা করিলে, অতএব আমি অভিসম্পাত করিতেছি, তুমি আমার পিতৃ-স্থানে যত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ, সে সকলই ব্যর্থ হইবে। অভিসম্পাত শুনিয়া কচ বলিলেন, "আমি এতক্ষণ তোমাকে মিষ্ট বাক্যেই প্রবোধ দিতেছিলাম, কিন্তু তুমি

অথবা আমায় শাপ-গ্রস্ত করিলে, এখন তোমাকে বলিতেছি, তুমি সামান্য ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তিনী হইয়া আপন সম্মান রাখিতে পার নাই, ব্রাহ্মণ-তনয়া হইয়া স্বেচ্ছাচারিণীর ন্যায় ব্যবহার করিতে সমুদ্যতা হইয়াছ, অতএব ক্ষত্রিয় তোমার ভর্ত্তা হইবেক, কোনও ব্রাহ্মণ-তনয় তোমাকে স্ত্রীত্বে গ্রহণ করিবেন না। অতঃপর সমস্ত বিষয় আচার্য্য শুক্রের শ্রুতি-গোচর হইলে তিনি কচের প্রতি সমধিক সন্তুষ্ট হইয়া কচকে বর প্রদান করিলেন, "তুমি আমার নিকট যে সকল বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ, তাহা তুমি যাহাকে শিক্ষা দিবে, তোমার সেই শিষ্যই তদ্দ্বারা ফলবান্ হইবেক।" কচ গুরুকে হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে প্রণাম পূর্ব্বক আপনার স্বার্থ-সিদ্ধি করিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রতিগমন করিলেন।

উপরের লিখিত আখ্যায়িকা হইতে আমরা কি কি উপদেশ পাইলাম, এইক্ষণে ইহাই সমালোচ্য। প্রথম উপাধ্যায় শুক্রাচার্য্য হইতে (১) উদারতা, (২) উপাধ্যায়ের কর্ত্তব্য, (৩) ক্ষমা, এবং (৪) মদিরার অপকারিতা, এই কয়টি বিষয়ে প্রত্যক্ষ শিক্ষা পাওয়া যায়। (১) নবাগত কচ যৎকালে আচার্য্যকে আপনার পরিচয় দিলেন, তখনই তিনি ইচ্ছা করিলে ধ্যান-যোগে কচের মনোভাব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেন, কিন্তু কচ যখন শিক্ষার্থী বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, তখন তাঁহার আর সন্দিহান হইবার কোন কথাই রহিল না। অধ্যাপক বিশদরূপে অবগত আছেন, শত্রু-পুত্র হইলেও শিষ্য দ্বারা গুরুর কোন অপকার অনুষ্ঠিত হইবে না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ছাত্ররূপে গ্রহণ করিলেন, এবং যে মন্ত্র-বলে দেবতাদিগের সঙ্গে সর্ব্বদা প্রতিযোগিতা চালাইতেছিলেন, অসঙ্কুচিত চিত্তে সেই মন্ত্র পর্য্যন্ত শত্রুপক্ষাশ্রিত ব্রাহ্মণ-তনয়কে শিখাইয়া দিলেন। যদি উপাধ্যায়ের মনে বিন্দুমাত্রও কুটিলতা স্থান পাইত, তবে কি তিনি সেই অমূল্য ধন সঞ্জীবনী মন্ত্র কচকে শিক্ষা দিতেন? ঠেকা পক্ষে না হয় দেবযানীকে সেই মন্ত্রে দীক্ষিতা করিলেও তিনি কচকে বাঁচাইতে পারিতেন। কিন্তু অধ্যাপক জানেন, তাঁহার শিষ্য ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-প্রভাবে সমস্ত রিপুকে পরাজয় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার মনে কখনও কোন বিদ্বেষ-ভাব জন্মিতে পারে না, সুতরাং তিনি কচকে সঞ্জীবনী মন্ত্র শিখাইতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

(২) অধ্যাপক, ছাত্রকে যেরূপ বিদ্যা শিক্ষা দিবেন, তদ্রূপ ছাত্রের চরিত্র গঠন, লালন পালন এবং ভাবী জীবনে যাহাতে কোন প্রকার অভাবে পড়িতে না হয়, সে সমস্তই তাঁহার চিন্তা করিতে হইবে। তদন্যথা দৈত্যগণ কচকে নিহত করিলে পর, তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য আচার্য্যের ততটা ব্যতিব্যস্ত হইবার কথা ছিল না, এবং পরিশেষে আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইতেন না।

(৩) দৈত্যগণ বারম্বার তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে নিধন করাতে তিনি স্বয়ং বহুল

ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যাকেও অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে, তথাপি তিনি দৈত্যদিগকে কোন বিশেষ ক্রোধপূর্ণ বাক্যে ভর্ৎসনা করেন নাই, বরং শিষ্টাচারে মিষ্ট বাক্যে কচের সহিত সখ্য-ভাব স্থাপনের জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। আচার্য্য ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে দৈত্যকুল ছারখার করিতে পারিতেন। আবার যখন দেবযানী নির্দ্দোষ কচকে অভিশপ্ত করিলেন, তখনও তিনি যথেষ্ট ক্ষমা গুণের পরিচয় দিলেন।

(১৪) যে শুক্রাচার্য্য বিদ্যাবুদ্ধিতে অদ্বিতীয়, যিনি মন্ত্রণা-বিষয়ে বৃহস্পতির সমকক্ষ, সেই শুক্রাচার্য্যও সুরার জ্বালায় অস্থির! প্রাণ হারাইতে প্রস্তুত!! যে দিন শুক্রাচার্য্য সুরার প্রতি ঘৃণিত ভাব প্রদর্শন করেন, সে দিন হইতে যদি সর্ব্বসাধারণে সুরাকে বিষ-দৃষ্টিতে দেখিতেন, কেহ মদিরার মোহিনী মায়ায় বিমোহিত না হইতেন, তবে কি এত অনর্থ ঘটিত? তবে কি পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী বাবুকে শায়িতাবস্থায় কলিকির আগুনে অঙ্গ দগ্ধ করিতে দেখিতাম? তবে কি তিনকড়ি ও শুদ্ধবোধ প্রভৃতি অসংখ্য যুবককে অকালে প্রাণ হারাইতে দেখিতাম? লোক যতই কৃতী হউক না কেন, নেশার বশীভূত হইলেই তাহার সকল বিদ্যা বুদ্ধিতে এক দিন না এক দিন অবশ্যই ছাই পড়িবে; যদি তাহা না হইত, তবে কি অশীতিবর্ষীয় ধার্ম্মিকপ্রবরকে গঞ্জিকা অথবা অহিফেণের জ্বালায় উন্মাদাবস্থায় দিন পাত করিতে দেখিতাম? তবে কি শিক্ষিত লোককে গণিকালয়ে প্রাণ হারাইতে দেখিতাম? যদি আমাদের বর্ত্তমান কালের শিক্ষকের চরিত্রে নমস্য শুক্রাচার্য্যের প্রতিভা প্রতিফলিত হইতে দেখিতাম, তবে কি আমাদের এত দুর্দ্দশা ঘটিত? তবে কি আমাদের অবস্থা দৈনন্দিন উন্নীত হইত না? বলিতে লজ্জায় ও ঘৃণায় হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কোন কোন শিক্ষকের হীনচরিত্রের কথা শুনিয়া আপাদমস্তক ঘৃণায় ও ক্ষোভে বিকম্পিত হয়!! শিক্ষাবিভাগে অসদাচরণ দেখিলে মনে যে কি এক ভাবের উদয় হয়, পাঠকমাত্রেই তাহা অনুমান করিতে পারেন। যত দিন না নীচমনা নর-পিশাচদিগকে পবিত্র দেবাসন হইতে বিতাড়িত করা যাইবেক, ততদিন মঙ্গলের আশা কোথায়? ততদিন ভাবী সুখের উপায় সুদূর পরাহত!! যে ইন্দ্রিয়ের দাস, স্বার্থই যাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, যে ভাই, বন্ধু, এমন কি, জন্মদাতা পিতারও ভালবাসা হইতে বঞ্চিত, এমন নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোক দ্বারা কখনও শিক্ষা কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার আশা করা যায় না। যে রক্ষক, সেই যখন ভক্ষক, যে ছাত্রগণের চরিত্র গঠন করিবে, সেই যখন তদ্বিপরীতে তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা ইত্যাদি অবলীলাক্রমে শিক্ষা দিতেছে, তখন আবার কল্যাণ কামনা কেন? কুরুচিসম্পন্ন লোককে শিক্ষকের পদে রাখিলে কি কখনও মঙ্গল হইতে পারে?

দ্বিতীয়, দৈত্যগণের হিংসা-পূর্ণ আচরণ। যদি অসুরগণ অভদ্র আচরণে বৈর-

নির্ঘাতনের উপায় উদ্ভাবন না করিত, তবে কচ সঞ্জীবনী মন্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিতেন কি না ঘোরতর সন্দেহ-স্থল, সুতরাং দৈত্যগণেরও ভাবী পরাজয়ের পথ এত সহজে পরিষ্কৃত হইত না। অসদুপায়ে স্বার্থসিদ্ধি করিতে গেলে শেষে যে বিপদে পড়িতে হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ, এবং দৈত্যগণের আচরণ তাহাই চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছে। আমাদের দেশে যে স্থানেই যাও, প্রায় সকল স্থানেই দেখিবে দানবীয় আচরণের অভাব নাই। ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়!

তৃতীয় বা শেষ, কচের (১) কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক গুরু-ভক্তি, (২) অধ্যবসায়, (৩) সত্যপ্রিয়তা, এবং (৪) ইন্দ্রিয়-সংযম। যখন আচার্য্য কচকে গোচারণে নিয়োজিত করিলেন, তখন কচ অবিষাদিত মনে গুরুর আদেশ প্রতিপালনে নিযুক্ত হইলেন। তিনি জানেন, উপাধ্যায় শিষ্যকে যখন যে কার্য্য করিতে অনুমতি দিবেন, শিষ্যের তাহাই কর্ত্তব্য; সর্ব্বদা গুরুর বশবর্ত্তী থাকা গুরুভক্তির প্রধান লক্ষণ; বিশেষতঃ কচ অবিরত ভৃত্যের ন্যায় দেবযানীর পরিচর্য্যা করিয়াছেন, দেবযানীর মনস্তুষ্টি সম্পাদন তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যের একাঙ্গ-বিশেষ। আচার্য্যের গোচারণ এবং দেবযানীর পরিচর্য্যা কচের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ঐকান্তিক গুরু-ভক্তি এবং নিরভিমানিতার সুন্দর পরিচায়ক। যখন দৈত্যগণ একবার কচকে নিহত করিয়াছিল, তাহার পরেও যে কচ প্রাণ-ভয়ে পলায়ন করেন নাই, ইহাই তাঁহার অধ্যবসায়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আচার্য্য কচকে সঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষা দিয়া যখন আপন উদর চিরিয়া তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিলেন, তখন কচ ইচ্ছা করিলে শুক্রাচার্য্যকে পুনর্জ্জীবিত না করিয়াও স্বদেশে প্রতিগমন করিতে পারিতেন; তাহা হইলে দৈত্য-সৈন্যগণ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে একবার প্রাণ হারাইলে আর পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইত না, এবং দৈত্যগণের পরাজয় নিশ্চিত হইত। কিন্তু যদিও তিনি জানিতেন যে, শুক্রাচার্য্য পুনর্জ্জীবিত হইলে দৈত্য-সৈন্যগণ পূর্ব্বের মত অক্ষয় থাকিবে, দেবাসুরের যুদ্ধ চিরকালস্থায়ী হইবে, তথাপি তিনি সত্য লঙ্ঘন হইবে বলিয়া অধ্যাপককে পুনর্জ্জীবিত করিতে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই। ইহা তাঁহার সত্য-প্রিয়তার বিশেষ প্রমাণ। দেবযানীই কচের জিতেন্দ্রিয়তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; যদি দেবযানী এই আখ্যায়িকাতে সংশ্লিষ্ট না থাকিতেন, তবে কচের চরিত্র সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইত কি না সন্দেহ। যখন দেবযানী কচকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন বলিয়া জানাইলেন, তখনও কচ দেবযানীর প্রতি অনুরক্ত হয়েন নাই। তবে কি দেবযানীর প্রতি কচের ভালবাসা ছিল না? অবশ্যই ছিল, কিন্তু কচের মনে যে ভালবাসা পোষিত হইতেছিল, তাহা দাম্পত্য ভালবাসা নহে, তাহা পবিত্র ভ্রাতৃ-স্নেহ। কচ ব্রহ্মচারী; তিনি জানেন, "পরস্ত্রী মাতৃসমা; তাঁহার মনে কখনও কুভাব উপজাত হয় না; তিনি ইন্দ্রিয়ের দাস নহেন—ইন্দ্রিয়ের স্বামী।' যদি তাহা না হইত, তবে কি তিনি দেবযানীর প্রলোভন-বাক্যে অচল অটল থাকিতে পারিতেন? তবে

কি তাঁহার আশা সফল হইত? তবে কি তিনি দৈত্যগণের মরণ-বারণ পরমৌষধি হরণ করিয়া অক্ষত শরীরে সুরলোকে পুনর্গমন করিতে পারিতেন? হয়ত শুক্রাচার্য্যের কোপে বৃষপর্ব্ব-পুরেই তাঁহার জীবন-নাটকের যবনিকা-পতন হইত। দেবযানীকে উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি আচার্য্য হইতে বরলাভ করিয়া সানন্দমনে দেশে যাইতে পারিয়াছিলেন।

আজ আমরা যে কচকে লক্ষ্য করিয়া এতগুলি কথা লিখিলাম, তেমন কচ কি এখন আর জন্মে না,— জন্মে বই কি। অহোরাত্র শত শত কচ জন্মিতেছে, কিন্তু প্রকৃত যত্নের অভাবে কীট-দষ্ট কুসুম-কোরকের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে! যদি আমরা উপযুক্ত যত্ন করিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই কচকে লাভ করিতে পারিব, তবে নিশ্চয়ই নবজাত কচ সঞ্জীবনী মন্ত্র-দ্বারা আমাদিগকে দ্বিগুণতর বলীয়ান্ করিতে পারিবে। যিনি সুযত্ন করিতে পরিয়াছেন, তাহারই ঘরে পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় কচ বিরাজ করিতেছে। আর যিনি যত্ন করেন নাই, তাঁহার ঘরে কচ ভাদ্র মাসের চতুর্থীর শশধরের ন্যায় বিরাজিত আছে—অনবরত অজস্র কলঙ্ক রাশিতে বিভূষিত হইয়া পিতামাতার গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। যত্নের ত্রুটি হইতেছে বলাতে হয়ত অনেক পিতামাতা আমাদিগের পানে রোষকষায়িত লোচনে তাকাইবেন আর বলিবেন, "আমরাতো রীতিমত ছেলেগুলিকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতেছি এবং যখন যাহা আবশ্যক হয় তাহাই অবিরোধে যোগাইতেছি।" কিন্তু ইহাতেই কি প্রকৃত যত্নের শেষ হইল? ইহাতেই কি আপনাদের কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইল? পিতা সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না; তাঁহার দেখা উচিত, তিনি কি ছেলেটিকে শার্দ্দূল-কবলে নিক্ষেপ করিলেন, না যথার্থ শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। যিনি শিক্ষকের হাতে দিতে পারিবেন, তিনি কচ লাভ করিতে পারিবেন। আর যিনি প্রথমে বঞ্চিত হইয়াছেন, তিনিই নষ্টচন্দ্র কোলে করিয়াছেন। আজকাল অনেকস্থলে ছাত্রদের দুর্নামের কথা শুনা যায় বটে, কিন্তু সে জন্য আমরা ছাত্রগণকে সম্পূর্ণ দায়ী করিতে চাহি না। আমাদের মতে অভিভাবক এবং শিক্ষকগণই তজ্জন্য বিশিষ্টরূপে দায়ী। যদি তাঁহারা ছাত্রদিগকে সর্ব্বদা সৎসঙ্গে এবং সৎপথে পরিচালিত করেন, তবে আর সোণার পুতুলে তাম্র মিশ্রিত হয় না।

যিনি ইন্দ্রিয়কে স্ব-বশে রাখিতে পারিবেন না, তিনিই দেবযানীর মত অপমানিত ও পতিত হইবেন— সন্দেহ নাই।

কাশীরাম দাস।

প্রায় দুইশত ত্রিশ বৎসর অতীত হইল বর্দ্ধমানের পূর্ব্বাংশে ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্গত সিঙ্গীগ্রামে বঙ্গভাষার পদ্য মহাভারত অনুবাদক, ৺কাশীরাম দাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

"সিঙ্গী" এই নামটী মহাভারতে "সিদ্ধি" বলিয়া লিখিত আছে। আমাদের বিবেচনায় এইটি প্রথম মুদ্রাঙ্কনের ভ্রম। কারণ "সিদ্ধি" ও "সিঙ্গি" বা "সিঙ্গী" এই দুইটী শব্দের শেষ বর্ণ "ঙ্গি" ও "দ্ধি" তে হস্তাক্ষরে বিশেষ প্রভেদ নাই, একারণ বোধ হয় হস্ত-লিপি দেখিয়া প্রথম মুদ্রাঙ্কন-সময়ে এরূপ লিপিপ্রমাদ ঘটিয়াছে; বস্তুতঃ এই নামটি "সিদ্ধি" নহে, "সিঙ্গী।" এই গ্রাম এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। যেখানে কাশীরামের বাটী ছিল, সেই স্থানে এখন রতনচন্দ্র নামে একজন কায়স্থ বাস করিতেছেন। এই গ্রামের পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে "কেশে পুকুর" নামে কাশীরামের খ্যাত একটি পুষ্করিণী এখনও আছে। এই গ্রাম কাঁটোয়ার পূর্ব্ব দক্ষিণে চারি ক্রোশ ব্যবধান।

কবিচরিত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, হুগলী জেলার অধীন আন্দ্রাণী নামক পরগণা কাশীরামের জন্মস্থান। কিন্তু উক্ত স্থানে কোথাও সিদ্ধি নামক গ্রাম নাই। উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা আরও লিখিয়াছেন যে, অজয় নদের তীরে মুর্শীদাবাদ জেলার অধীন ইন্দ্রাণী নামে যে গ্রাম আছে, তাহাই কাশীরামের জন্মস্থান। গ্রাম আছে বটে, কিন্তু তথায় ইন্দ্রাণী পরগণা নাই। কাশীরাম পরিচয় দিয়াছেন;—

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিদ্ধিগ্রাম।" অতএব উল্লিখিত দুইটি স্থানের কোনটিই কাশীরামের জন্মস্থান নহে। ফলতঃ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ইন্দ্রাণী পরগণায় সিঙ্গীগ্রাম যে কাশীরাম দাসের জন্ম স্থান, ইহাই বিশ্বাস যোগ্য। কাশীরামের বিষয় বিশেষরূপে কিছুই জানিবার উপায় নাই। তবে তাঁহার লিখিত গ্রন্থে তাঁহার নিজ-দত্ত পরিচয় এবং জনশ্রুতিতে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই লইয়া আমাদের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। তিনি তাঁহার গ্রন্থে পরিচয় দিয়াছেন, সিঙ্গীগ্রামে প্রিয়াকর দেব (দাস) নামক জনৈক কায়স্থ বাস করিতেন, তাঁহার পুত্র সুধাকর দেব দাস, সুধাকরের পুত্র কমলাকান্ত দেব, তাঁহার চারিপুত্র হইয়াছিল, প্রথম কৃষ্ণদাস, দ্বিতীয় দেবরাজ, তৃতীয় কাশীরাম দাস এবং চতুর্থ গদাধর;—

"কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গীগ্রামে॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥"

"সেবি কৃষ্ণপদাম্বুজ, কহে কৃষ্ণ দাসানুজ,
কৃষ্ণপদে থাকে যেন মন।"

"মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
বিরচিল কাশীদাস দেবরাজানুজ॥"

"কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ॥"

ইত্যাদি—

ইনি অনেক স্থানে কাশীরাম দাস এবং

অনেক স্থানে কাশীরাম দেব উল্লেখ করিয়া পরিচয় দিয়াছেন। দাস সকল কায়স্থেই কহিতে পারে, যেমন ব্রাহ্মণ দ্বিজ বলিয়া ভনিতার অগ্রে লেখেন, কায়স্থও "দাস" শব্দ সেইরূপ ব্যবহার করিতে পারে, বোধ হয় কাশীরামও সেই মত "দাস" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, উপাধি দেব শব্দ ব্যবহার করেন নাই।

কাশীদাস, কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কন হইতে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে কবিতা রচনা করিয়াছেন। ইঁহার রচনা নানাবিধ ভাবে পরিপূর্ণ এবং পয়ারাদি ছন্দোবন্ধে অনেক উন্নত, তাহার কারণ, কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কনের সময় অপেক্ষা এই সময়ে বাঙ্গালা ভাষা অনেক সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিল। ভাষার উন্নত অবস্থায় লেখকগণ অলঙ্কারাদি প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হন, সুতরাং তাঁহাদিগকে মনোমত ভাব প্রকাশের জন্য শব্দালঙ্কারাদি অনুসন্ধান করিতে হয় না, দৃষ্টিপাত করিলেই ঐ সকল আবশ্যকীয় বস্তু প্রাপ্ত হন। ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যাইতে পারে যে, কাশীরাম হইতে বাঙ্গালা কাব্যের উন্নতির পথ প্রসারিত হইয়াছে।

সিঙ্গী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহাতে, এবং কাশীর রচনা দর্শনে বোধ হয় তিনি সংস্কৃত জানিতেন না, কিন্তু পার্শি জানিতেন। কথকের মুখে এবং সিঙ্গী গ্রামের ভূপতি তর্ক পঞ্চাননের নিকট মূল মহাভারত শ্রবণ করিয়া তিনি বাঙ্গালা মহাভারত রচনা করেন। একথার প্রমাণ আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে, কারণ ব্যাসকৃত মহাভারতের সহিত ইহার অনেক স্থানে অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং অনেক স্থানে তিনি ব্যাসকে অতিক্রমও করিয়াছেন। শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান আদি কয়েকটি বিষয় তাঁহার কল্পনা-শক্তির পরিচয়ের স্থল এবং সংস্কৃত না জানারও একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ; কারণ, যদি তিনি সংস্কৃতজ্ঞ হইতেন, তাহা হইলে সংস্কৃত মহাভারতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহার মূল অতিক্রম করায় কেহ কেহ কহেন, এইরূপে তিনি স্বীয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। কারণ এই সকল তাঁহার কাব্য শ্রুতিকটু বা অসংলগ্ন না হইয়া বরং শ্রবণরঞ্জন হইয়াছে। তিনি যে সংস্কৃত জানিতেন না তাহা ও তাঁহার গ্রন্থপাঠে জানা যায়, যথা;—

"শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।"

এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, কাশীরামের মাতা একদা সংস্কৃত মহাভারত শ্রবণ করেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, পুত্র কাশীরামকে উহার ব্যাখ্যা করিয়া দিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, কাশীরাম ভূপতি তর্ক পঞ্চাননের নিকট হইতে উহার বাঙ্গালা অনুবাদ শ্রবণ করতঃ পদ্যে রচনা করিয়া প্রতিদিন জননীকে শুনাইতেন। মাতার এই অনুরোধই কাশীরাম "কাশীরাম" নামে চিরবিখ্যাত হইবার কারণ।

কেহ কেহ বলেন যে, আদি, সভা, বন এবং বিরাট পর্ব্বের কিছু দূর রচনা করিয়া কাশীরাম দাস কাল-কবলে কবলিত হয়েন,

এবং তাঁহার মৃত্যুর সময় তাঁহার জামাতাকে ঐ মহাগ্রন্থের সমাপ্তির ভার দিয়া যান; তাহার প্রমাণ—

"আদি সভা বন বিরাটের কত দূর।
ইহা রচি কাশীরাম গেলা স্বর্গপুর॥"

এ কথার সত্যাসত্য সম্বন্ধে প্রমাণ দেওয়া বড় একটা সহজ কথা নহে। অনেকে বলেন মহাভারতের সকল পর্ব্বের লেখার সামঞ্জস্য নাই, প্রথম তিন পর্ব্বের রচনার যেরূপ গাম্ভীর্য্য ও উন্নত কবিত্ব আছে, অন্যান্য পর্ব্বে সেরূপ নাই, তাহা হইতে অপরিপক্ক লোকের রচনা বলিয়া বোধ হয়। এ জন্য মহাভারত এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু এত বড় কাব্যে যে ভাবের সামঞ্জস্য থাকিবে না, তাহার বিচিত্র কি? এই বিস্তৃত মহাকাব্য দুই এক দিবসের রচিত নহে; সুতরাং ভাবের সামঞ্জস্য রাখাও সহজ কথা নহে। দ্বিতীয়তঃ যদি অবশিষ্ট ভাগ মহাভারত কাশীরামের জামাতার রচিত হইত, তবে তিনি কোন না কোন স্থলে আপনার নামোল্লেখ করিয়া যাইতেন। কাশীরাম তাঁহার জামাতাকে ভারতের শেষ অংশ রচনা করিতে বলিয়াছিলেন, এমন আদেশ করিয়া যান নাই যে তাঁহার নিজের নামে ভনিতা দিবে, নিজের নামে দিবে না। ইহাতেই বোধ হয় সমুদায় মহাভারত কাশীরামের রচিত। [illegible] গৌরবে কাশীরাম ভিন্ন আর কেহ অংশী [illegible] যদি থাকে, তাহা আমাদের বুদ্ধির [illegible]। কেহ কেহ বলেন কাশীরাম এই [illegible] মহাভারত রচনার [illegible] কাশী[illegible] [illegible] কাশী ত্রিপুরের উপর স্থাপিত, এই জন্য উহাকে ঐ স্থলে স্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কাশীরামের একটি মাত্র কন্যা ছিল, তাহার কোথায় ও কাহার সহিত বিবাহ হইয়াছিল, এবং তাহার কোন সন্তান ছিল কি না, তাহা অবগত হইতে পারি নাই।

কাশীরাম অতিশয় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, এ কারণ তিনি অনেক স্থানে কৃষ্ণকে স্তব করিয়াছেন, এবং বেদব্যাসের প্রতি অতিশয় ভক্তি প্রদর্শন করতঃ নিজের ভনিতা দিয়াছেন;—

"ভারত পঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥"

কাশীরাম কি সর্ব্ব প্রথমেই একবারে মহাগ্রন্থ মহাভারত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এমন সম্ভব নহে। অবশ্য ইঁহার রচিত অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধও ছিল, কালের দীর্ঘতা প্রযুক্ত কিম্বা যত্নের অভাবে, এবং মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার না থাকাতে ঐ সকল একবারে বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে; কেবল মহাভারত অতিশয় বৃহদ্গ্রন্থ ও যত্নের ধন, বলিয়াই রক্ষিত হইয়াছে, ইহাই তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্থায়ী করিবার জন্য হিমালয় পর্ব্বত সদৃশ বিরাজিত থাকিয়া তাঁহার মৃত্যুঞ্জয়তার প্রমাণ দিতেছে।

তাঁহার ভাষা অতিশয় সরল, সহজেই সকলে ভাবার্থ উপলব্ধি করিতে পারে। ইহা আদিরস বিহীন; এজন্য সকল শ্রেণীর লোকের নিকট আদরণীয় ও সর্ব্ব সমক্ষে পাঠ্য। মহাভারত উপদেশ এবং নীতিপূর্ণ, পাঠ করিলে অনেক নীতি শিক্ষা করা যায়। "যাহা নাই ভারতে, তাহা

নাই ভারতে," এ প্রশংসা মহাভারতের পক্ষে অতিরঞ্জিত নহে।

আমরা কাশীরামের জীবনীর উপসংহার করিতে চলিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবনের প্রথমাংশ যেরূপ দুজ্ঞের্য়, উপসংহারও সেইরূপ। তিনি কোথায় কত বয়সে এবং কিরূপে প্রাণত্যাগ করেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তাঁহার তিরোভাব এইরূপ অবগত হইয়াছি। তিনি শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শন বাসনা করিয়া এইরূপ স্থির করেন যে, জীবনের অবশিষ্ট ভাগ শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ধামে বাস করিবেন। এই সংকল্প করিয়া তিনি তাঁহার বসতবাটী মৃত মদন চক্রবর্ত্তীর পূর্ব্বপুরুষের কোন ব্যক্তির নামে দানপত্র লিখিয়া দিয়া যাত্রা করেন। ঐ ব্রাহ্মণ কাশীরামের পুরোহিত ছিলেন। মদন চক্রবর্ত্তী যখন তাঁহার অপর জ্ঞাতিগণ সহ বিষয় বিভাগ করিয়া লয়েন, তখন সিঙ্গীর গোমস্তা ঈশানচন্দ্র বক্সী তাঁহাদের পুরাতন দলিলের মধ্যে ঐ জীর্ণ দানপত্র দেখিয়াছিলেন, উহাতে এগার শত কত সাল লেখা ছিল তাহা এখন কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। ঐ দলিল যে সময় লেখা হইয়াছিল, সেই সময় হইতে প্রায় ৭০।৭২ বৎসর গত হইল। এইরূপে ঐ দানপত্র লিখিয়া পুরোহিতকে বাটী দান করিয়া কাশীরাম উড়িস্যাভিমুখে যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মহেশপুর গ্রামে আসিয়া পীড়িত হয়েন। তথায় তাঁহার কোন আত্মীয়ের ভবনে কিছু দিবস অবস্থিতি করিয়া ঐ রোগে ঐ স্থানেই তাঁহার জীবন-লীলা শেষ হয়। ঐ স্থানে কংসাবতী নদীর তীরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাহিত হয়। তাঁহার বংশে এখন কেহই নাই।

সিঙ্গীতে পবন মোদক নামে এক ব্যক্তি ছিল; তাহার পিতা কাশীরামের হস্তলিখিত মহাভারত দেখিয়া ঐ পুস্তক নকল করিয়াছিল, এবং ঐ মহাভারতের কতকগুলি জীর্ণ পাত ঐ মোদকের গৃহে ছিল। কাশীরাম সম্বন্ধে সিঙ্গীর পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায় অনেক কথা জানিতেন। তাঁহার নিকট লোকে যাহা শুনিয়াছে, তাহাই তাহারা বলিয়া থাকে; ঐ জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়াই এই জীবনী লিখিত হইল।

কয়েক বৎসর হইল বঙ্গবিজেতা প্রণেতা বিখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কাঁটোয়া হইতে সিঙ্গীতে আগমন করিয়া কাশীরামের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অনুসন্ধানের ফল আমরা জানিতে পারি নাই।
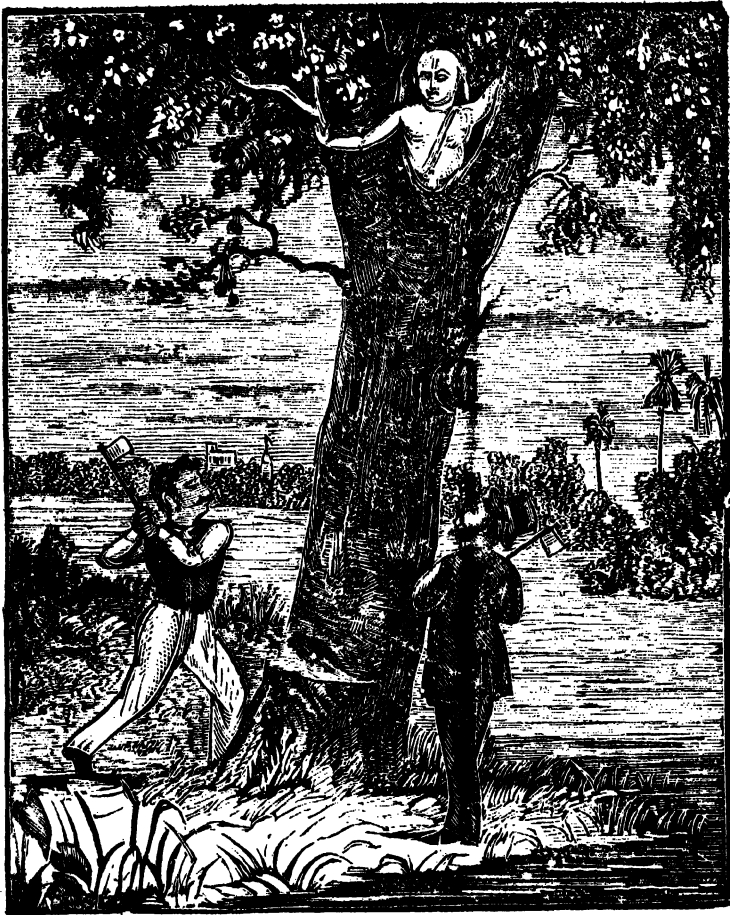
অদ্ভুত জনপদ।

সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দ বহু বৎসর ভারতের নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে হরিদ্বারে উপস্থিত হন। এই মহাতীর্থে যথাশাস্ত্র দেবকার্য্য এবং পিতৃকার্য্য সমাপন করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হয়। তাঁহার শীত গ্রীষ্মে সমান বোধ, তিনি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইতে জানেন না, বৃক্ষের ফল, মূল ও পত্রাদি তাঁহার খাদ্য, তপঃপ্রভাবে হিংস্র জন্তুও তাঁহার বশীভূত হয়, সুতরাং তাদৃশ স্থানে ভ্রমণ করিতে তাঁহার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই, সঙ্গীরও প্রয়োজন নাই। তিনি হরিদ্বার হইতে যাত্রা করিয়া উত্তরাভিমুখে ক্রমে হিমালয় আরোহণ করিতে লাগিলেন।

প্রায় একমাস কাল গিরিরাজের নানারূপ শোভা দর্শন করিতে করিতে সন্ন্যাসী

অনেকদূর অগ্রসর হইলেন, কিন্তু কোথায়, কতদূরে আসিয়াছেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এ সকল বিষয় জানিবার জন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল বটে, কিন্তু হরিদ্বার ছাড়িয়া অবধি মনুষ্যের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ নাই, সুতরাং সে ইচ্ছা বিফল।

অবশেষে একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে হিমালয়ের একটি বিস্তীর্ণ অধিত্যকায় উপস্থিত হইলেন। স্থানটি অতি রমণীয়, তথাপি সন্ন্যাসীর মনে কেমন যেন একটা আশঙ্কা হইতে লাগিল। তাঁহার মনে কেমন একটা অসন্তোষ, কেমন একটা অতৃপ্তি, কেমন একটা নিরানন্দের ভাব উপস্থিত হইল, অথচ তিনি ইহার কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

সন্ন্যাসী একটি বৃক্ষতলে বসিয়া অপ্রসন্ন-চিত্তে ভাবিতেছেন, এমন সময়ে পূর্ব্বদিক্ হইতে একটি মনুষ্যের উচ্চ কথা তিনি শুনিতে পাইলেন। এই নির্জ্জন স্থানে সহসা মনুষ্যের শব্দ শুনিয়া ব্যাপারটা জানিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল, এবং শব্দ লক্ষ করিয়া তিনি পূর্ব্বমুখে চলিলেন।

কিছু দূর যাইয়া দেখিলেন, একটি নির্ম্মল-সলিলা নদীর তীরে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ। সেই একই বৃক্ষে অসংখ্য-প্রকারের ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, অসংখ্য-প্রকারের ফল পাকিয়া রহিয়াছে। গাছের উপরে একটি বৃদ্ধ; তিনি ফুল ও ফল পাড়িতে ছিলেন, এমন সময়ে দুই জন যুবক কুঠার হস্তে আসিয়া সেই গাছটা কাটিতে উপস্থিত। বৃদ্ধ গাছ কাটিতে নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু কুঠারধারী যুবকেরা তাঁহার কথা শুনিতেছেন না, তাই তাঁহাদের মধ্যে ঝগড়া উপস্থিত।

বৃদ্ধ। "এ গাছটা কাটিও না, তোমাদের ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বলিতেছি। ইহার অসংখ্য ফল ফুল হইতেছে বটে, কিন্তু চারা একটিও হয় না। যুগ যুগান্তর হইতে এই একটি গাছই রহিয়াছে; ইহাকে কাটিয়া ফেলিলে একই গাছে এ রকম অনন্ত প্রকারের ফল ফুল আর পাওয়া যাইবে না।"

যুবকদ্বয়। "এই একটা আগাছায় অনেকটা জমি যুড়িয়া রহিয়াছে, জমিটা কোন কাযে লাগিতেছে না। আমরা পয়সা খরচ করিয়া 'সুনীতি' এবং 'সভ্যতা' নামে দুই রকম শস্যের বীজ বিদেশ হইতে আনাইয়াছি, এই গাছ কাটিয়া এখানে তাহার চাষ করিব।"

বৃদ্ধ। "এই গাছের ফল খাইলে মানুষ অমর হইতে পারে। তোমাদের শস্য খাইলে কি কেহ অমর হইবে?"

যুবকদ্বয়। "এ গাছের ফল খাইলে বুদ্ধি মোটা হয়—যেমন তোমার হইয়াছে। এ রকম মোটা বুদ্ধি লইয়া অমর হইয়া লাভ কি? সূক্ষ্ম বুদ্ধি লইয়া যদি একদণ্ড বাঁচিতে পাই, সেও ভাল।" এই বলিয়া কুঠারধারী পুরুষেরা গাছ কাটিতে লাগিলেন, বৃদ্ধ নামিবার অবসর পাইলেন না—অথবা নামিতে ইচ্ছা করিলেন না, তিনি গাছের উপরেই রহিলেন।

সন্ন্যাসী কুতূহল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আশ্চর্য্য গাছের নাম কি?" যুবকেরা বলিলেন, "ইহা পাহাড়ের একটা আগাছা, ইহার নাম কেহ জানে না।" কিন্তু বৃদ্ধ চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "ইহার নাম—

কল্পতরু।"

উপদেশ মালা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২২

লোকে যত শান্তি চায়, শান্তি তত দূরে যায়;
শান্তি কারো বশীভূত নয়।
সেই শান্তি করে ভোগ, নাই যার শোক রোগ;
বিভু-পদে মতি যার রয়॥
যদি নর শান্তি চাও, শোক তাপ ভুলে যাও;
বিভু-পদে স্থির কর মতি।
একমনে সযতনে ডাক বিভু সনাতনে;
শান্তিদাতা সেই বিশ্বপতি॥

২৩

যদিও সুরূপ তুমি বিধির কৃপায়।
করিও না ঘৃণা তবু কুরূপ জনায়॥
কুরূপ—সুরূপ কভু যদিও না হয়।
সুরূপ—কুরূপ হয় জানিবে নিশ্চয়॥
কুরূপে সুরূপে বল কিবা আসে যায়।
সুগুণ থাকিলে সদা সমাদর পায়॥
সুন্দর কিংশুক ফুল—সৌরভ-বিহীন।
মানবগণের হেয় রবে চিরদিন॥
কোকিল কুরূপ পাখী সুগুণ থাকায়।
বহু সমাদর পায় যথায় তথায়॥

২৪

যেওনা পাপের কাছে সুজন প্রবর।
হলাহল মত পাপ অতি তেজস্কর॥
এক বিন্দু দেহে পাপ করিলে প্রবেশ।
কলুষিত করি মন, করে আয়ু শেষ॥
অতএব সাবধান হইবে সুজন।
পাপ-কাল-কূট কভু ক'র না সেবন॥
একমাত্র অনুতাপ আছে প্রতীকার।
যদি থাকে পাপ—তার করহে সংহার॥

২৫

নিশ্চিত ত্যজিয়া যেই অনিশ্চিতে ধায়।
লোভেতে পড়িয়া সেই উভয়ি হারায়॥
তার সম মূর্খ আর নাহি কোন জন।
ইহার দৃষ্টান্ত বলি শুনহে সুজন॥
একদা কুকুর এক মাংস লয়ে মুখে।
নদীর কিনারা দিয়া যায় মন-সুখে॥
দেখিয়া মাংসের ছায়া জলের মাঝারে।
নির্ব্বোধ কুকুর যায় তাহা ধরিবারে॥
অমনি মুখের মাংস জলেতে পড়িল।
সঙ্গে সঙ্গে মাংসছায়া জলেতে মিশিল॥
স্রোতোমুখে পড়ি মাংস কোথা ভেসে গেল।
অনেক খুঁজিয়া আর শেষে না পাইল॥
অতএব অনিশ্চিতে করিওনা লোভ।
নিশ্চিত হারায়ে শেষে মনে পাবে ক্ষোভ॥

২৬

মিথ্যা কথা যেই বলে তার ফল এই।
সত্য কথা বলিলেও অবিশ্বাসী সেই॥
একবার, দুইবার কিম্বা তিনবার।
মিথ্যাবাদী মিথ্যা বলি পাইবে নিস্তার॥
একবার কিন্তু হায়! ধরা যদি পড়ে।
প্রাণান্তে কথায় তার কেহ নাহি নড়ে॥
হরিহর নামে ছিল জনেক রাখাল।
নিত্য নিত্য মাঠে যেত লইয়া গোপাল॥
'পড়িয়াছে পালে বাঘ দেখহে আমার।'
রাখাল এরূপ বলি, করিত চীৎকার॥
কৃষকেরা হাল ছাড়ি দৌড়িয়া আসিত।
তাহা হেরি হিহি করি রাখাল হাসিত॥
একদা পালেতে বাঘ সত্যই পড়িল।
সে দিন কথায় তার কেহ না নড়িল॥

অবিশ্বাসী রাখালের করুণ রোদন।
শুনিয়া কাহারো হায়! গলিল না মন॥
অবশেষে বাঘ আসি রাখালে গ্রাসিল।
মিথ্যা কথনের ফল হাতে হাতে দিল॥
অতএব শিশুগণ! মনে রেখ সদা।
ভুলিয়াও মিথ্যা কথা বলিও না বদা॥

২৭

বিপদ—পরশমণি—
স্বভাব পরীক্ষা করে।
কেবা মিত্র, কেবা শত্রু,
জানায় বিপন্ন নরে॥
সম্পদে যে সব বন্ধু
যোটে স্বার্থ-সিদ্ধি তরে।
বিপদে পলায় তারা
স্বার্থ হানি হ'লে পরে॥
বিপদে বন্ধুর হিত
প্রাণপণে করে যেই।
প্রকৃত বন্ধুর ন্যায়
ব্যবহার করে সেই॥

২৮

সরস কুসুম পরে
আকুল মধুপ মত।
সম্পন্নের কাছে আসে
কপট বান্ধব যত॥
সম্পদ য'দিন রয়,
বান্ধব ত'দিন থাকে।
সম্পন্নের কাছে ফিরি
খোসামোদ করে তাকে॥
সম্পদ চলিয়া গেলে
বান্ধব যোটে না হায়!
নীরস কুসুম পানে
কোন অলি নাহি ধায়!!!

২৯

লজ্জাবতী লতা সুচিকণ পাতা—
মৃদুল সমীরে দুলে।
নখের পরশে শুকায় শরীর;
সঙ্কুচিত হয় ছুঁলে॥
না জানি উহার সরল হৃদয়—
কতই কোমল হবে।
এমন লতার নাইক আদর
হায়রে! এ ছার ভবে॥
নাই হাব ভাব, নাই বিলাসিতা,
নাই গরবের লেশ।
নাই রূপ-শোভা, তবু মন-লোভা
সরল মধুর বেশ॥
অভিমান হীন, বদন মলিন—
দেখিতে যোগিনী পারা।
একা এক কোণে রয়েছে বসিয়া,
আপনি আপন হারা॥
ঝটিকার বেগ সয় অকাতরে,
হয় না কাতর তত।
দয়া মায়া হীন পাষাণ-হৃদয়
মানুষ পরশে যত॥
শিখলো সকলে বঙ্গের বিধবা,
সুগুণ যে গুলি আছে।
সরল হৃদয়, কোমল পরাণ
অই লতিকার কাছে॥

৩০

গোপাল কলিটি পাতার আড়ালে
খেলে চুপি চুপি আপনার মনে।
হেলিয়া দুলিয়া পাপড়ি খুলিয়া
বিমল সৌরভ বিতরে পবনে॥
অতুল সুষমা, অতুল সৌরভ,
সরস কোমল হৃদয় তার;—
বাঙ্গালী মেয়ের মতন সরল,
অধরে মধুর হাসির ভার।
শত শত কাঁটা চারিদিকে তার;
পাতার আড়ালে শরীর ঢাকা।
ঘুমটা আড়ালে বাঙ্গালী মেয়ের
বাঙ্গালীর ঘরে যেমন থাকা॥
সহজে মধুপ না পারে পশিতে
মধুপান তরে নিকটে তার।
বাঙ্গালীর মেয়ে—বাঙ্গালীর ঘরে—
ছুঁইতে তাহারে ক্ষমতা কার?
হওলো সকলে বাঙ্গালীর মেয়ে,
কোমল গোলাপ কলির মতন।

রূপের আলোকে, গুণের সৌরভে—
কর রঙ্গালয়—নন্দন-কানন ॥

৩১

দিবস যামিনী
ফুলে ফুলে ফুলে
করিয়া ভ্রমণ।
গুণ গুণ স্বরে
করে মধুকর
মধু আহরণ ॥
মৌচাক পুরিয়া
রাখে সুকৌশলে
মধু - সুধাসম।
পান করি যাহা,
পায় নর নারী
রস নিরুপম ॥
অতি ক্ষুদ্র কায়
মৌমাছি নিচয়
পরিশ্রম-বলে।
মধু পূর্ণ করি
মধুর ভাণ্ডার
রাখে সুকৌশলে ॥
একতার বলে
অসাধ্য সাধন
সহজেই হয়।
ইহার প্রমাণ
দেখ বিদ্যমান
মৌমাছি নিচয় ॥
বালক বালিকা,
তোমরা সকলে—
মৌমাছি মতন।
একত্রে মিলিয়া
পরিশ্রমে, কর
জ্ঞান আহরণ ॥
জ্ঞানের ভাণ্ডার
রচিয়া কৌশলে
মৌমাছি সমান—
সুধাসম জ্ঞান
বিলাও অপরে,
নিজে করি পান ॥

৩২

মৌচাকের কাছে একটি ভ্রমর
বলিল আসিয়া গুণ গুণ স্বরে।
একবিন্দু মধু কর মোরে দান—
উপস্থিত আমি কৃতাঞ্জলি করে ॥
দিন দুই তিন খাইনাই মধু;
ক্ষুধার্ত্ত বড়ই হইয়াছি এবে।
না পারি উড়িতে, না পারি খুঁজিতে,
কি হবে উপায় নাহি পাই ভেবে ॥
শীতের সময় এবে উপস্থিত ;
সরস কুসুম ফুটে না এখন।
একটুকু মধু না পাই কোথায়,
দিন দুই তিন খুঁজিনু কানন ॥
কি হবে উপায় অভাগা আমার ;
নিরুপায় আমি নিতান্ত এখন।
দানশীল বলি বিদিত ভূতলে
তোমরা সকলে মধুমক্ষিগণ ॥
কর উপকার মৌমাছি নিচয়,
পর-উপকারে তোমাদের প্রাণ।
ক্ষুধায় কাতর আমি নিরুপায়,—
একবিন্দু মধু কর মোরে দান ॥
করুণ হৃদয় মৌমাছি নিচয়,
শুনি ভ্রমরের কাতর বচন,
অমৃত সমান মধু করি দান,
উপদেশ ছলে বলিল তখন।
আমোদে প্রমোদে সুখের শরত—
না করি সঞ্চয়—কাটায় যে জন,
মধুর অভাবে, শীতের সময়
অন্যের দ্বারস্থ হইবে সে জন।
ভ্রমর হইতে শিক্ষা কর সবে—
বালক বালিকা—এই উপদেশ।
যৌবন-সময়ে করিবে সঞ্চয়,
নতুবা, বার্দ্ধক্যে পাবে বহু ক্লেশ ॥

সমাপ্ত ॥

ভাগ।] মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র। [১০ম, ১১শ, ১২শ, সংখ্যা।]

(১২৯৬)

শিক্ষা-পরিচর

শিক্ষাবিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ,।

সূচী।

কলিকাতা

৯২ নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট ; বরাট প্রেসে

শ্রীকিশোরীমোহন সেন দ্বারা মুদ্রিত

এবং

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গ্রাহকের জ্ঞাতব্য।

১। এই পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৷৵০ এক টাকা দশ আনা। পাঁচ বা ততোধিক গ্রাহক একত্রে লইলে প্রত্যেকের ১৷৵০ এক টাকা ছয় আনা লাগিবে। মূল্য পরে লইবার নিয়ম নাই। কিন্তু পত্রিকা পাইলেই মূল্য পাঠাইয়া দিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া কোন শিক্ষক পত্র লিখিলে তাঁহার নিকট পত্রিকা প্রেরিত হইবে। ইচ্ছা করিলে তিনি নিজের ছাত্র বা ছাত্রীর জন্যও এইরূপ পত্র লিখিতে পারেন, কিন্তু ইহার মূল্যের জন্য তিনিই দায়ী থাকিবেন।

২। গ্রাহকগণ চিঠিপত্র, প্রশ্নোত্তর বা মূল্য পাঠাইতে নিজ নামের সঙ্গে নিজ নিজ নম্বরের উল্লেখ করিবেন, এবং তিনি শিক্ষক বা ছাত্র হইলে তাহাও লিখিবেন।

৩। চিঠিপত্র, প্রবন্ধ ও মূল্যাদি সমস্তই সম্পাদকের নামে পুঁঠিয়া, "রাজসাহী" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। কলিকাতার গ্রাহকগণ বরাট প্রেসে শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে রসিদ লইয়া তাঁহাকে মূল্য দিতে পারেন।

৪। কেহ বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ পত্র লিখিয়া নিয়মাদি জানিবেন।

৫। গ্রাহকগণ স্ব স্ব নাম, ধাম ও নম্বর স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন।

৬। কাহারও কিছু জানিবার থাকিলে রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে পত্র লিখিবেন।

৭। প্রকাশার্থ বা পুরস্কারের জন্য যিনিই যে কোন প্রবন্ধ লিখিবেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক ভাল কালি কলম দিয়া ভাল কাগজের কেবল এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

পুরস্কারের প্রবন্ধ।

[প্রবন্ধ লেখকগণ অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিবেন না। এবিষয়ে তাঁহাদের সততার উপরেই নির্ভর করা যাইতেছে।]

শিক্ষকদিগের জন্য ... ... শিষ্টতা।
ছাত্রদিগের জন্য ... ... একতা।
মহিলাদিগের জন্য ... ... লজ্জা।

শিক্ষা-পরিচরের বার্ষিক পুরস্কারের প্রবন্ধ।

শিক্ষক ও সাধারণ গ্রাহকদিগের জন্য ... "নরনারীর সর্ব্ববাদী সম্মত কর্ত্তব্য নির্ণয়।"
ছাত্রের জন্য ... ... "চরিত্র সুগঠনের সহজ উপায়।"
মহিলার জন্য ... ... "রমণীর বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের সদ্ব্যবহার ও আদর্শস্থল।"

শিক্ষা-পরিচর।

১ম ভাগ। } মাঘ ১২৯৬ সাল। { ১০ম সংখ্যা।

রমণীর গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য।

রমণীর পক্ষে গৃহই অতি প্রশস্ত কর্ম্ম-ক্ষেত্র। ভাল জীবন লইয়া প্রবেশ করিতে পারিলে এইখানেই চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। চতুরাশ্রমের মধ্যে গৃহাশ্রমকে মুনিগণ সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সেই সর্ব্বোত্তম আশ্রমের রমণীই শোভা সম্পদ্ ও পুরুষার্থ-সিদ্ধির মূল। গৃহে অতুল ধন-সম্পত্তি সত্ত্বেও রমণী বিহনে তাহা শ্মশান সম নিরানন্দের স্থান বলিয়া প্রতীত হয়। সমস্ত ধনরত্নের মধ্য হইতে এক রমণী-রত্ন লও, সেই সকল ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া থাকিবে। এই জন্যই উক্ত আছে।

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ
গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্
পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥"

সেই গৃহ গৃহই নহে, যাহাতে গৃহিণী নাই। গৃহিণী থাকিলেই তাহাকে গৃহ বলা যায়। যে হেতু পুরুষ গৃহিণী-সহ-যোগেই সমস্ত পুরুষার্থ সম্ভোগ করেন।

বাস্তবিক গৃহিণীই গৃহের দেবতা ও অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী। এই সাধুজন-প্রশংসিতা লক্ষ্মীরূপা রমণীর কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে বসিয়া আমি দেখিতে পাই, নারী সর্ব্বাংশেই পুরুষের অধীনা ও একান্ত আশ্রিতা। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় আছে—

"রক্ষেৎ কন্যাং পিতা, বিন্নাং
পতিঃ, পুত্রাস্তু বার্দ্ধকে।
অভাবে জ্ঞাতয়স্তেষাং
স্বাতন্ত্র্যং ন কচিৎ স্ত্রিয়ঃ॥"

বাল্যকালে কন্যাকে পিতা রক্ষা করি-বেন, যৌবনে স্বামী এবং বার্দ্ধক্যে পুত্র রক্ষা করিবে। আর পিতা, স্বামী কিম্বা পুত্র, ইহাদের মধ্যে কেহই বর্ত্তমান না থাকিলে তাঁহাদের জ্ঞাতিবর্গ রক্ষা করিবেন। স্ত্রীদিগের স্বাতন্ত্র্য কিছুতেই নাই। বাল্য, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য, এই তিন অবস্থাতেই নারী পিতা, ভর্ত্তা এবং পুত্রের অধীন

থাকিবে। এই অধীনতার যে কি শোভা, তাহা হীনমতি লোকদিগের বিবেচ্য নহে। ইহা রমণীগণের উৎসাহজনক বাক্য বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমি

"নান্নে তৃষ্ণা জলে তৃষ্ণা
সাধ্বীনাং স্বামিনা বিনা"

এই সকল রমণী-প্রকৃতির মর্ম্মোদ্ধৃত সত্য-বাক্যই মনে করি। প্রকৃত পক্ষে অধীনতাতেই এই জাতির পরম শোভা ও গৌরব। আমি রমণী-কুলের এই গৌরব রক্ষা করিয়াই তাহার গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য নিরূপণ করিব।

রমণী-জীবনের আংশিক বিভাগ শাস্ত্রে এইরূপ আছে,—

"আষোড়শাদ্ভবেদ্বালা,
তরুণী ত্রিংশতা মতা।
পঞ্চ পঞ্চাশতং যাবৎ
প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা ততঃ পরম্॥"

নারী ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বালিকা, তৎপর ত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত তরুণী, তৎপর পঞ্চপঞ্চাশৎ পর্য্যন্ত প্রৌঢ়া, তাহার পরেই বৃদ্ধা। এই বিভাগানুসারে আমি রমণীর জীবন তিনভাগে বিভক্ত দেখিতে পাই। প্রথমটি পূজ্যপাদ পিতার সন্নিধানে থাকিবারই উপযুক্ত। ইহা আত্ম-শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা। যদিও ইহাতে পিতার অধীনতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা নিজেরই প্রভূত মঙ্গলের হেতু। পিতার নিয়োগ বা আদেশ পালন করিতে করিতেই রমণীর কর্ম্মপটুতা অভ্যাস হয়, এবং চরমে তিনি প্রকৃত গৃহাশ্রমে (অর্থাৎ বিবাহিত জীবনে) প্রবিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিতে সক্ষম হন। নারীর পক্ষে ইহাই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। এই খানে কঠিন ইন্দ্রিয়-সংযম বা আত্ম-নিগ্রহ নাই। অথচ জীবনে অপূর্ব্ব পবিত্রতা শিক্ষা হয়। কুসুম-কলিতে যেমন তাহার উপকারের জন্যই শিশির-বিন্দু পতিত হয়, সেইরূপ পিতৃ-স্নেহ-রূপ মহোপকারী পদার্থও অহর্নিশ, বালিকার উপর সিঞ্চিত হইয়া থাকে। বালিকা এই খানে অধীন থাকিয়া যে সুখ ও আনন্দ প্রাপ্ত হন, তাহা বুঝি বা স্বর্গেও দুর্লভ। এই বাল্য-জীবনে পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি ও সহোদর-সহোদরার প্রতি একান্ত স্নেহ রাখা রমণীর কর্ত্তব্য। সংক্ষেপে, পিতা ও মাতার আদেশ-পালন ও সহোদরদিগের প্রতি স্নেহ করাই এই সময়ের একমাত্র কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম। অনেকের বাল্য-জীবনে ইহা স্বাভাবিক বলিয়াই প্রতীত হয়। মহাভারতে আছে, কুন্তী পিতার নিয়োগে নিত্য অতিথি-সেবা করিতেন। ইহা কেমন একটি সুন্দর আদর্শ! রমণী-শ্রেষ্ঠা শকুন্তলাও এইরূপ পিতা কণ্বের আশ্রমে থাকিয়া নিয়ত অতিথি-সৎকার ও আবশ্যকমত পিতার সমস্ত আদেশ পালন করিতেন।

ভর্ত্তৃ-সন্নিধানে রমণীর দ্বিতীয়াশ্রম। এইখানেই রমণীর প্রকৃত শুভাশুভ অনেক পরিলক্ষিত হয়। এই আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া যিনি সুন্দর জীবন ও নারীপণা দেখাইতে পারেন, তিনিই নারী-কুলে ধন্যা। তিনি দেবী, মানুষী, বা রাক্ষসী, এইখানেই তাহার পরিচয়। দেবত্ব চাহিলে কঠিন নিগ্রহ ও স্বার্থত্যাগ আবশ্যক। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ও শকুন্তলা, ঘোরতর বিড়ম্বনা সম্ভোগ করিয়াই এক এক জন

দেবী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যাঁহার দুঃখ নাই, যিনি একদিনও অগ্নিতে পরীক্ষিতা হন নাই, তাঁহার জীবনের মূল্যও অতি অল্প। আমরা সীতা ও শকুন্তলাকে বাল্মীকি ও ভগবান্ কাশ্যপের আশ্রমে নির্ব্বাসিত অবস্থাতেই, অতি মনোজ্ঞ নারীকুল-ধন্যা বলিয়া নিরীক্ষণ করি। এবং সাবিত্রী ও দময়ন্তীকেও বনমধ্যে বিপন্নাবস্থাতেই অতি সুন্দরী দেখি। সকলেই বিপদে পড়িয়া সম্পদ লাভ করিয়াছেন, কিন্তু এত নিগ্রহ বা উত্তাপ সহ্য করিতে অতি অল্প লোকেই সক্ষম হয়। অধিকাংশ নারী রম্য হর্ম্ম্যে থাকিয়া সুখ-সেব্য বস্তু সম্ভোগ করিয়াই আপ্যায়িতা, এবং সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়াই আমোদিতা। ইহারা ভাগ্যবতী হইলেও মানুষী। আর যাহারা ধর্ম্মকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, এবং আত্ম-সুখে সর্ব্বস্ব করিয়া যথেচ্ছ আচরণ করিতেছে, তাহারা বিলাসিনী ভোগবতী রাক্ষসী। আমরা সংসারের লোক, সংসারের চিত্রই অনুক্ষণ দেখি, সুতরাং সুখ-দুঃখ মিশ্রিত মধ্যমাবস্থাই অধিক ভালবাসি। অধিক উপরে আরোহণ করা যেমন কষ্টকর, নীচে নামাও তেমনি ঘৃণাজনক মনে করি। এই নিমিত্ত মধ্যমাবস্থায় গৃহে থাকিয়া গৃহ-ধর্ম্ম সম্পাদন করাই উত্তম বিবেচিত হয়, এবং তাহাই লক্ষ্য করিয়া সংক্ষেপে গার্হস্থ্য-কর্ত্তব্য এস্থলে বর্ণন করিব।

যৌবনে স্বামি-সেবা ও গৃহিণীপণাই রমণীর প্রধান কর্ত্তব্য। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রগাঢ় প্রেম অকপট ভক্তি ও বিশ্বাস, এবং অবিচলিত শ্রদ্ধা থাকার একান্ত প্রয়োজন। এই কয়েকটি না থাকিলে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে বিষম বিষময় অনর্থ ঘটিয়া থাকে। স্বামী রমণীর দেবতা, স্বামি-সেবা দ্বারা রমণীগণ ইহপরকালে পরমশ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হয়েন। স্ত্রীর কর্ম্ম সম্বন্ধে বিষ্ণুসংহিতায় এইরূপ আছে :—

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো
ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যত্তু
তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥
পত্যৌ জীবতি যা যোষিৎ
উপবাস-ব্রতং চরেৎ।
আয়ুঃ সা হরতে ভর্ত্তুঃ
নরকঞ্চৈব গচ্ছতি ॥
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী
ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্য পুত্রাপি
যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥"

স্ত্রীদিগের যজ্ঞ, ব্রত বা উপবাসাদি নাই। পতি-সেবা দ্বারাই তিনি স্বর্গে পূজনীয়া হয়েন। পতি জীবিত থাকিতে যিনি উপবাসাদি ব্রত আচরণ করেন, তিনি ভর্ত্তার আয়ুঃ হরণ করেন, এবং স্বয়ং নরকে গমন করেন। স্বামীর মৃত্যু হইলে সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। তাহাতে তিনি অপুত্রা হইলেও ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গে গমন করেন।

স্বামী রমণীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন মনে করিতে হইবে। সংসারে রমণীর জীবনই স্বামীর জন্য। দেবতাকে যে ভাবে দেখা উচিত, রমণীগণ স্বামীকেও সেই ভাবে দেখিবেন। প্রত্যহ স্ত্রী অকপটে ভক্তি করিবেন; সেই ভক্তির সঙ্গে

একান্ত সরলতা থাকা চাই। স্ত্রী স্বামীর অধীন সত্য বটে, কিন্তু ভয়ে সেই অধীনতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে,—স্নেহে ও প্রেমে তিনি পতির অধীনা হইবেন। তিনি স্বামীর দাসী নহেন, অথচ স্বামি-সেবাই তাঁহার নিত্যকর্ম্ম হইবে। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর কি প্রাণমাখা সম্বন্ধ, তাহা নিম্নের শ্লোকটিতে প্রকাশ পাইতেছে,—

"ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা
সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসীবাদিষ্টকার্য্যেষু
ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ ॥"

ছায়ার ন্যায় স্ত্রী স্বামীর অনুগতা হইবেন, হিতকর্ম্মে সখীর ন্যায় ও আদিষ্ট-কার্য্যে দাসীর ন্যায় হইবেন। স্বামীর সুখে স্ত্রীর সুখ এবং স্বামীর দুঃখে স্ত্রীর দুঃখ। যে সংসারে ভার্য্যা ভর্ত্তার প্রতি ও ভর্ত্তা ভার্য্যার প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট, সেই সংসারে দেবতারাও প্রসন্ন। এ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় এইরূপ আছে,—

"সুভিক্ষং কৃষকে নিত্যং
নিত্যং সুখমরোগিণি।
ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ প্রিয়া যস্য
তস্য নিত্যোৎসবং গৃহং ॥"

দ্বিতীয় গৃহকর্ম্ম। প্রত্যেক গৃহিণীরই স্বহস্তে সর্ব্বদা গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করা উচিত। গৃহিণীর কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে বহ্নিপুরাণে এইরূপ আছে,—

"সা শুদ্ধা প্রাতরুত্থায়
নমস্কৃত্য পতিং সুরং।
প্রাঙ্গনে মণ্ডনং দদ্যাৎ
গোময়েন জলেন বা ॥
গৃহ কৃত্যানি কৃত্বা চ
স্নাত্বা গত্বা গৃহং সতী।
সুরং বিপ্রং পতিং নত্বা
পূজয়েদ্‌গৃহদেবতাং ॥
গৃহকৃত্যে সুনির্ব্বৃত্তে
ভোজয়িত্বা পতিং সতী।
অতিথীন্ পূজয়িত্বা চ
স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে সুখং সতী ॥"

পত্নী প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে দেবতা এবং পতিকে নমস্কার করতঃ প্রাঙ্গনে গোময়-মণ্ডন প্রদান করিবেন। তদনন্তর গৃহকৃত্য সমাপন করিয়া স্নানপূর্ব্বক গৃহে গমন করতঃ দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং পতিকে নমস্কার করিয়া গৃহদেব অন্যান্য গুরুজনদিগকেও সম্মান প্রদর্শন করিবেন। তৎপর গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া, পতি ও অতিথির সেবা করিয়া নিজে ভোজন করিবেন।

গোময়-জল সেচনের উদ্দেশ্য অনেকে জানেন না। গোময়ের গুণ বায়ু-পরিস্কারক ও দুর্গন্ধ-নাশক। প্রভাতে এইরূপে গোময় ছিটাইয়া দিলে দূষিত বায়ু পরিস্কৃত এবং দুর্গন্ধ নষ্ট হওয়াতে গৃহস্থগণের শরীর পীড়ায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা কম থাকে।

গৃহস্থের গৃহদ্বার অতিথির জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকা আবশ্যক। হিন্দু অতিথি-সেবার জন্য অতি প্রসিদ্ধ। উপাখ্যানে আছে দাতাকর্ণ অতিথি-সৎকারের জন্য স্বীয় পুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন। এতদূর না করুন, অতিথি গৃহে সমাগত হইলে যথাসাধ্য তাহার পরিচর্য্যা করা

গৃহিণীর কর্ত্তব্য। রমণী-কুলের প্রাচীন নিয়ম বড় পবিত্র ছিল। ভোজ-দুহিতা কুন্তীর বাল্যকালে পিত্রালয়ে থাকিয়া অতিথি-সেবা করিবার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে অতিথি-সংকারের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজন জীবনের উন্নতির প্রবর্ত্তক। অতএব গুরুজনদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান ও ভক্তি রাখা একান্ত আবশ্যক। আর পিতা মাতার ঋণ অপরিশোধ্য হইলেও সাধ্যমত তাহা পরিশোধের চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। দাস-দাসীর প্রতি গৃহিণীর কুব্যবহার করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। তাহাদিগকে সর্ব্বদা মিষ্টবাক্যে পরিচালিত করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য। ভৃত্য বেতনভোগী মাত্র। তাড়না না করিয়া তাহাদিগকে সদ্ব্যবহারে বশীভূত করিলে তাহাদিগের দ্বারা অধিক কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, অথচ তাহাদের হৃদয়েও আঘাত লাগে না। মিষ্ট বাক্যে ভৃত্য দ্বারা অধিক কার্য্য সম্পন্ন হয়, ইহা অনেকে বুঝেন না। ভৃত্যের সহিত সদ্ব্যবহার করিলে যে অধিক ইষ্টের সম্ভাবনা, এ কথা গৃহিণীদিগের যত্নপূর্ব্বক স্মরণ রাখা উচিত।

রন্ধন রমণীগণের গৃহকর্ম্মের মধ্যে একটি প্রধান কর্ম্ম। আজি কালি দেখিতে পাওয়া যায়, রমণীগণ এই সুমহৎ ব্যাপার পাচক ঠাকুর কিম্বা পাচিকা ঠাকুরাণীর হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন। তাহারা অতি অপরিস্কৃতভাবে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিতেছে, আর সেই অপরিস্কৃত অন্ন ব্যঞ্জনই নাক সঙ্কুচিত করিয়া গলার তল করিতেছেন। সে জন্য সময়ে সময়ে কতই না রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়! রন্ধন-নিপুণতা স্ত্রীলোকের একটি প্রধান গুণ, ইহা পরিত্যাগ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

সন্তান-পালন গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যের একটি অতি প্রধান কার্য্য। এই বিষয়টি স্ত্রীলোকমাত্রেরই অতি যত্নের সহিত শিক্ষা করা আবশ্যক, কেন না সন্তানের সমস্ত ভারই মাতার উপর ন্যস্ত থাকে। তাঁহারা এই বিষয়ে সুশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে অজ্ঞানতাবশতঃ সন্তানের হিতকে অহিত ও অহিতকে হিত মনে করিতে পারেন, এবং তাহাতে কত শিশুর জীবন-কুসুম অকালে শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে। পল্লীগ্রামে এরূপ দৃশ্যের অভাব নাই। আজকাল নব্যাগণেও এ সকল কার্য্য দাসদাসীর হস্তে অর্পণ করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রী-শিক্ষার অনেকটা উন্নতি দেখা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, রমণীগণ পুস্তক-পাঠে অথবা গুরুর উপদেশে এই সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহারা ইহা কার্য্যে পরিণত করেন না। অনন্তজীবন ভরিয়া যে স্বামী এবং পুত্রের সেবা করিলে মন তৃপ্ত হয় না, সে কার্য্য আবার অন্য দাস-দাসীর হস্তে অর্পণ করিয়া রমণীগণ কিরূপে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, ইহাই আশ্চর্য্য।

লেখা পড়া শিক্ষাও রমণীর অতি প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য। সাংসারিক আয়ব্যয়ের হিসাব ও বালক-বালিকার বাল্য-

শিক্ষার ভার গৃহিণীর হস্তেই থাকা কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন নিত্য নিয়মিত ধর্ম্ম-চর্য্যার জন্যেও রমণীর নির্দ্দিষ্ট সময়ে অবসর লওয়া কর্ত্তব্য। ধর্ম্মহীন জীবন বড়ই নিকৃষ্ট। ইহাতে সুখ শান্তির বড়ই ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। এই ত গেল দ্বিতীয় অবস্থা।

অতঃপর নারী দুর্ভাগ্যবশতঃ পতিহীনা হইলে তৃতীয় আশ্রমে প্রবেশ করেন। এই অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে পুত্রের হিতাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া পুত্রের মঙ্গল সাধন করাই একান্ত কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় আত্ম-সুখ ও স্বার্থ বিসর্জ্জন করাই নারীর পরমধর্ম্ম। এইখানে নারী বানপ্রস্থ-মুনি-ব্রতাবলম্বন করিয়া যতী-বেশে অবস্থান করিতে যত্ন করিবেন। এই অবস্থায় পতিত হইলে দুর্ভাগ্য মনে না করিয়া সৌভাগ্য মনে করাই বুদ্ধিমতী নারীর কর্ত্তব্য, কিন্তু এইখানে মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না। একান্ত মনে মুনিদিগের ন্যায় সংযত-চিত্তে ধর্ম্মার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়া জীবন যাপন করাই একান্ত কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় পড়িয়া যাহার জীবন উচ্চ ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতে পারিল না, তাহার জীবন কেবলই দুর্গতির জন্য মনে করিতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার দৃষ্টান্তে এই সময়ে যদিও বৈধব্য-মাহাত্ম্য হ্রাস হইয়া ভারতীয় নারী-জীবনের হীনতা প্রদর্শন করিতেছে, তথাপি আমরা আর্য্যসমাজেই আদর্শ-বিধবার অনু-সন্ধান করিয়া থাকি। নারী জীবনের উচ্চ বানপ্রস্থ ধর্ম্মের অপূর্ব্বতা এইখানেই আমরা দেখিতে পাই।

একজন গৃহী পুরুষ হইতে বনাচারী সাধুর জীবন যদি উচ্চতা সম্ভব হয়, তবে মৎস্য-মাংসাশিনী ভোগ-বিলাসিনী নারী হইতে শুদ্ধাচারিণী যতীধর্ম্মাবলম্বিনী একা-হারা ধর্ম্মার্থিনী নারীর ভাগ্যের প্রশংসা কেনই আমরা না করিব? বাস্তবিক ভারতীয় নারীর বৈধব্য-জীবন অতি প্রশংসনীয়। বর্ত্তমান সময়ে নারী জাতির সাধন-ভজনের উচ্চতা যদিও আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু প্রাচীন কালে আত্রেয়ী, গার্গী, অদিতি ও অরুন্ধতী প্রভৃতির বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন। সেই তাপসী রমণীকুলের নাম লইলেও মন পবিত্র হয়। অতএব কুসংস্কার হউক বা যাহাই হউক, আমরা শুদ্ধাচারিণী বিধবা রমণীকুলের ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রশংসাই করিব। বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারিলে রমণীর বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য সকলই অতি সুন্দর, সকলই ধর্ম্মকর্ম্মের উপযুক্ত। (চৈত্র, ১২৯৪)।

৺ মুক্তকেশী দেবী।

আত্ম-জিজ্ঞাসা।

আমি কে?

আমি কে? এই প্রশ্ন না জানি পৃথিবীর কত লোকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছে! যখন আমাদের দৃষ্টি বাহিরের চন্দ্র সূর্য্য তারায়, বৃক্ষ বনস্পতি নদ নদীর মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় তখন সদ্যোজাত শিশুর মত মানবসমাজ বহির্জ্জগতের দৃশ্য লইয়া অবাক হইয়া থাকে, ভিতরের দিকে চাহিবার বা অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু যখনই এই বিচিত্র সৃষ্টি কৌশলময় বিশ্বসংসার-সাগরের জলবুদ্বুদবৎ আপনাদিগের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, স্বপ্নোত্থিত মানুষের মত আপনার দিকে আপনি চাহিয়া, আপন সমস্যায় আপনি বিভোর হইয়া মানব-প্রাণ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠে—আমি কে? এই জন্য এই প্রশ্নটা সকল যুগে সকল দেশেই কখন না কখন উঠিয়াছে এবং সভ্য জগতের মানবচিন্তা-প্রসূত শত শত গ্রন্থরাশি এই এক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কত না চেষ্টা করিয়াছে এবং নিয়তই করিতেছে! অতি পুরাতন অথচ অতি নূতন প্রশ্ন!

মানব-জিজ্ঞাসার একটি প্রধান ধর্ম্ম এই যে, যখন জিজ্ঞাসা আরম্ভ হয়, একটির পর একটি প্রশ্ন আপনা হইতেই প্রাণে জাগিয়া উঠে, মানুষ একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারে না—আনুষঙ্গিক দশটা, শতটা, সহস্রটা প্রশ্ন আসিয়া চিন্তা-সাগরে মানব-প্রাণ ডুবাইয়া দেয়, অবশেষে তাহার কোন কুল কিনারা না পাইয়া তবে জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয়। মানবজিজ্ঞাসার আর একটি ধর্ম্ম এই যে মানুষ কেবল জিজ্ঞাসার জন্যই জিজ্ঞাসা করে না, মনের মত উত্তর পাইবার জন্যই জিজ্ঞাসা করে, যতক্ষণ না সেই মনের মত উত্তরটি পাইতেছে ততক্ষণ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় না। শিশুসন্তানদিগের যখন ঈষদোজ্জ্বল ঊষার তরুণ-কিরণপাতের ন্যায় প্রথম জ্ঞানোন্মেষ হইতে থাকে—কত প্রশ্নই না তাহারা জিজ্ঞাসা করে! সময়ে সময়ে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া পিতামাতা দেখিতে পান যে শিশু এমন একটা প্রশ্ন হয়ত জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিয়াছে যে জগতের সমুদায় নরনারী মিলিয়া আজ পর্য্যন্তও তাহার কোন সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হয় নাই। একটি শিশুর প্রশ্নও যেমন, একটি জাতি বা সমাজের প্রশ্নও সেইরূপ।

মানবজীবনের আরম্ভ জিজ্ঞাসায়—এটা কি, ওটা কি, চাঁদ কেন অত উচ্চে থাকিল, সূর্য্য কেন রাত্রিতে পলায়ন করিল, মেঘ কেন আকাশে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আম কেন বারমাস গাছে ঝুলিতেছে না—এমনতর অদ্ভুত অদ্ভুত কত কথাই আমরা শৈশবে জিজ্ঞাসা করিয়া পিতামাতাকে কত বিব্রত করিতাম, আবার এখন সেই সকল প্রশ্নে

আমাদের সন্তান সন্ততিরা আমাদিগকে বিব্রত করিতেছে! মানবজীবনের কৈশোর বা দ্বিতীয় অবস্থা অন্ধ-বিশ্বাসের অবস্থা। শিশু মাকে জিজ্ঞাসা করিল মেঘ কোথা হইতে বৃষ্টি আনিতেছে? মা বুঝাইলেন যে ঐরাবত গজ শুঁড়ে করিয়া সমুদ্রের জল তুলিয়া দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া দিতেছে। শিশু জিজ্ঞাসা করিল আকাশ অত উচ্চে রহিয়াছে কেন? দিদিমা উত্তর করিলেন যে আকাশ একদিন বুড়ীর পিঠে ঠেকিত, অবশেষে বুড়ীর ঝাঁটার চোটে আকাশ বেচারা অতি সম্মানসূচক দূরস্থানে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বলা বাহুল্য কৈশোরে এইরূপ কত কথা শিশুরা শুনিতেছে এবং বিশ্বাস করিতেছে, কেন না কৈশোরে মানবজীবনের অন্ধ বিশ্বাসের যুগ, মা, দিদিমা অপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য উপদেশ কেহ দিতে পারে বলিয়া তখন ধারণাই হয় না। মানব-জীবনের যৌবন বা তৃতীয়াবস্থা ঘোর তর অবিশ্বাসের অবস্থা। যৌবনে সমুদায় প্রবৃত্তি ভরাভাদ্রের তরঙ্গায়িত পদ্মাপ্রবাহের মত দুকূল ভাসাইয়া উছলিয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি এবং তর্কশক্তিও নাচিয়া উঠে। শৈশবে যে সকল প্রশ্ন করিত, কৈশোরে মা এবং দিদিমার মুখে তাহার যে সকল মীমাংসা শুনিত আর বিশ্বাস করিয়া রাখিত, যৌবনে আসিয়া মানুষ যখন দেখিতে পায় যে তাহাতে কত ভুল, আসল নকলে কত প্রভেদ তখন কৈশোরের অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে যৌবনে অন্ধ অবিশ্বাস আসিয়া উপস্থিত হয়, সে আবার সেই প্রশ্ন তুলিয়া তাহার মীমাংসার জন্য লালায়িত হয়। অবশেষে জীবনের দীর্ঘ পরীক্ষায় বহুদিনের অভিজ্ঞানে যে সত্য যে জ্ঞান যে মীমাংসায় যতটুকু লাভ করে তাহাই বিশ্বাস করিতে করিতে মানবলীলা সম্বরণ করে। মানুষ-জাতিরও শৈশব আছে, কৈশোর আছে, যৌবন আছে, বার্দ্ধক্য আছে—মানবজীবনে যেমন, মানবজাতির জীবনেও সেইরূপ, প্রশ্ন, অন্ধ বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস লইয়া তাহার শৈশব, কৈশোর ও যৌবন পরিপূর্ণ। এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে "আমি কে" এই কথাটা যখন অনেকবার উঠিয়াছে—যখন নানা মুনি নানা মীমাংসা করিয়াছেন তখন আমরা কোন্ সময়ের মীমাংসা গ্রহণ করিব? আগেই বলিয়াছি মনের মত উত্তর না পাইলে মানবজিজ্ঞাসার বিরাম হয় না, সুতরাং সময় এবং ব্যক্তি বা জাতিগত—মীমাংসার দিকে না চাহিয়া আমরা মনের মত উত্তরের জন্যই আলোচনা করিব। বর্ত্তমান যুগ অন্ধ-বিশ্বাসের যুগ নহে, তুমি দিদিমার দোহাই দিয়া একটা মীমাংসার কথা বলিবে আর আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া বিশ্বাসের সঙ্গে তাহাই গলাধঃকরণ করিব —এ আশা বৃথা। তুমি যদি সেকালের বেদ-বেদান্তেরও দোহাই দিয়া বল যে পৃথিবী সমতল ত্রিকোণ ক্ষেত্রবিশেষ, পাঠশালার বালকেরাও তোমার সঙ্গে তর্ক করিতে বসিবে। সুতরাং "আমি কে"? ইহার উত্তরে কোন দেশে কবে কে কি বলিয়াছেন তাহা আলোচনা করিব না— তাহা এখন ইতিহাসগত হইয়া পুস্তকালয় পূর্ণ করুক অথবা নীরবে কীটদষ্ট হউক, তাহাতে আপত্তি নাই।

আমি কে?— কথাটা জিজ্ঞাসা করিবামাত্রই দুইটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়। মনে হয়, আমি যাহাই হই না কেন, হয় তাহা আমার শরীররূপী বা, না হয় শরীরাতিরিক্ত কোন অতীন্দ্রিয় বস্তু। এই দুইটী কথাই প্রধানতঃ বিচার করিবার আবশ্যক হয়। আবার ত বোধ হয় ইহার তৃতীয় আর কোন সিদ্ধান্ত মনে উদিত হয় না। (এ স্থানে একটা নিজের কথা বলিয়া রাখা ভাল—আমি আছি কি নাই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ বা প্রশ্ন আমার মনে হইতেছে না, আবার ত বিশ্বাস যে নিতান্তই আমি আছি, ইহাতে যাঁহার সন্দেহ থাকে তিনি বলিতে পারেন যে আমি যদি না থাকাই প্রমাণ হয় তবে আবার আমি কে? তাহার মীমাংসার জন্য এত মাথা ব্যথা কেন? অবশ্য এইরূপ যাঁহার সন্দেহ তাঁহার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিতেছি না)। যদি ইহাই স্থির হয় তবে ইহার যে কোনটির মীমাংসা করিলেই মূল প্রশ্নের একরূপ মীমাংসা হইতে পারে। তাহার অধিক আলোচনা করিতে পার—ভালই।

আমি আদৌ শরীররূপী জড় কি না এবং তাহা হইতে পারি কি না, তাহারই আলোচনা করা যাউক। আমার শরীর, আমার হাত পা, আবার চোক মুখ নাক কাণ, এই কথা নিত্যই বলিতেছি, এবং নিত্যই শুনিতেছি— এ ত সম্বন্ধকারকের ব্যাপার। আমি হাত, আমি পা এমন কথা কখনও বলি না, কখন শুনিও না। সুতরাং বিচার করিবার পূর্ব্বেই প্রচলিত ব্যবহার দেখিয়াই যেন বোধ হয় যে আমি যাহাই হই না কেন, তাহা শরীর হইতে পৃথক্, এবং তাহাই প্রভু, শরীরটা সেই প্রভুর সম্পত্তিবিশেষ।

আমি শরীর কি না? যদি হই, তবে কি সমগ্র শরীরের নামই আমি, না কোন অংশ বিশেষের নাম আমি? যদি সমগ্র শরীরটার নামই আমি হয়, তবে যাহার সমগ্র শরীর নাই সে আমি বলিবার দাবি করিতে পারে কি না? একটা সুমিষ্ট উদাহরণ দেখ—ছানা চিনি জ্বালে চড়াইয়া পাক করিলে সন্দেশ হয়, অর্থাৎ ছানা চিনি আর উত্তাপ তিনটী ব্যষ্টির সমষ্টি গত অবস্থা বিশেষের নাম সন্দেশ। যদি তাহাই হইল তবে শুধু ছানা বা শুধু চিনি বা নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ সেবন করাইয়া তোমাকে সন্দেশ খাওয়াইলাম বলিলে তুমি সুখী হইবে কি? তবেই দেখ, হাত পা চোক মুখ নাক কাণ, ইহার কোন একটা বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ব্যষ্টিগত ভাবে ত "আমি" বলিতেই পারি না। এই সমুদায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পূর্ণ সমষ্টিগত মানবদেহকে "আমি" বলা যায় কি না আলোচনা করার পূর্ব্বেই মীমাংসা করা উচিত—যাহার সমুদায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমষ্টিময় দেহ নাই। যে অন্ধ, জগতের সর্ব্ব প্রধান আনন্দময় দৃষ্টিজ্ঞান যাহার নাই, সে বেচারা কি তবে "আমি" বলিবার কোন দাবি করিতে পারে না? পাশ্চাত্য কবিগুরু হোমার, মিলটনের কি তবে "আমি" ছিল না? সন্দেশের দৃষ্টান্ত অনুসারে একটির অভাব হইলেই সন্দেশের অভাব হয়, কিন্তু একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অভাব হইলেই কি "আমিত্বের" অভাব হয়? কথাটা খুব

ছোট, কিন্তু কথাটা খুব সহজ নহে। শুধু এই একটা ছোট কথার উপর নির্ভর করিয়াই বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমষ্টিময় মানবদেহকে "আমি" বলিতে পারি না, "আমি" তদতিরিক্ত—অতীন্দ্রিয়!

আমি শরীর না শরীরী? আমি স্বামী না সম্পত্তি? আমি চিন্তাময় জ্ঞানময় না রক্তমাংস অস্থিপঞ্জর মাত্র? বাহিরে বাহিরে দেখিতে গেলে শরীরের উপরই প্রথমে দৃষ্টি পড়ে; শরীরটাকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে হয় এবং আচরণেও তাহার অনেকটা প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কোন কোন কৃষাণ তাহার বলদটাকে এত ভালবাসে যে বলদ ছাড়া তার অন্য অস্তিত্ব আছে বলিয়া সহসা বোধ হয়, না সুতরাং কেবল বাহিরে বাহিরে দেখিয়া বিচার করিলে চলিবে কেন? "আমি-তত্ত্ব" বেশ ভাল করিয়া আলোচনা করিতে গেলে, আমার কি কি গুণ, কি কি ধর্ম্ম, কি কি লক্ষণ তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। আবার হাত-পা-নাক-মুখ-চোক-কাণ-বিশিষ্ট, মেদ-অস্থি-রক্ত-মাংসময়, দ্বিপদ দ্বিহস্ত দ্বিচক্ষু-দ্বিকর্ণ, সার্দ্ধ-ত্রিহস্ত পরিমিত একটা শরীর আছে, ইহা যেমন সত্য; তেমনি আবার আমার জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, চৈতন্য আছে, ভাল মন্দ প্রবৃত্তি আছে, চিন্তাশু কার্য্যের একটা স্বাধীনতা আছে—ইহাও তেমনি সত্য। আমি শরীরই হই, আর অতীন্দ্রিয় কোন পদার্থই হই, আমার এই সকল সম্পত্তি, এই সকল লক্ষণ, এই সকল ধর্ম্ম বা গুণ যাহাতে নাই বা থাকিতে পারে না, আমি কখনই তাহা নহি অর্থাৎ সেই পদার্থকে কখনও "আমি" নামে অভিহিত করিতে পারি না।

শরীর কি চিন্তা করিতে পারে? শরীর কি ইচ্ছা করিতে পারে? শরীর কি একস্থানে বসিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে দেশ-দেশান্তর মানস নয়নে বেড়াইয়া আসিতে পারে? শরীর কি স্নেহ-মমতা দয়া-দাক্ষিণ্য বুঝিতে পারে? কথাটা অতি গুরুতর, ইহার কোন সহজ মীমাংসা নাই কি? শরীরকে ত আমি ধোপার গাধার মত নিত্য পরের বোঝা বহিয়া মরিতেই দেখিতেছি। বেচারা চিন্তা করিতে পারে না কিন্তু চিন্তার বোঝা বহিয়া বহিয়া তাহার শীর্ষস্থান ক্লিষ্ট, পরিশুষ্ক ও পীড়াগ্রস্ত হইয়া ক্রমে সমুদায় শরীর শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। শরীর কিছুই ইচ্ছা করিতে পারে না, কিন্তু কলের পুতুলের মত তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাহার যেন ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য খাটিয়া খাটিয়া সারা হইতেছে। আর শরীরের যে নিজের কোন ইচ্ছা নাই, কেবল ধোপার গাধার মত পরের ইচ্ছা সাধনের জন্য পরের আদেশে পরের বোঝা বহিয়া মরে একদিন তরঙ্গায়িত নদী বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে ডুবিতে ডুবিতে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। হাত পা অবশ হইয়া আসিতেছে, বুকের রক্ত জমিবার উপক্রম হইতেছে, শীতে দাঁতে দাঁতে লাগিয়া যাইতেছে, চক্ষু লক্ষ্যশূন্য দৃষ্টিতে ক্রমে আধার দেখিয়া আসিতেছে—আর এক চুলও সাঁত-রাইতে পারি না, শরীর জবাব দিতেছে কিন্তু তবুও কে যেন বলিতেছে "আরও

একটু,” আর বেচারা শরীর নাকফোঁড়া বলদের মত না পারিলেও প্রাণপণ করিয়া সাঁতরাইবার চেষ্টা করিতেছে! বাস্তবিক শরীরের যদি কোন ইচ্ছাই থাকিবে, তবে তাহা শরীরের সঙ্গের সঙ্গী হইবে না কেন? আমার ইচ্ছা আমার সঙ্গের সঙ্গী, যতক্ষণ “আমি” আছি, ততক্ষণ আমার ইচ্ছাকে কে তাড়াইয়া দিতে পারে? তুমি আমাকে অর্থাৎ আমার শরীরকে শৃঙ্খলা-বদ্ধ কারাগারে বাঁধিয়া রাখিতে পার কিন্তু যতক্ষণ “আমি” আছি ততক্ষণ আমার পলায়নের ইচ্ছা কি তুমি নিবারণ করিতে পার? কিন্তু সেই শরীর, সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব সমান ছিল, অথচ আমাদের বৃদ্ধ প্রতিবাসীটী সে দিন যখন মরিয়া গেল, দশজনে মিলিয়া তাহার সেই শরীর যখন বাঁধিয়া লইয়া চলিল, তখন সে হাত আর নড়িল না কেন—সে পদ আর চলিল না কেন? কে বলিবে, যখন তার ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি মুখের উপর মুখ রাখিয়া পাষাণভেদী চিৎকারে, পাড়ার লোকের প্রাণ কাঁদাইয়া দিতেছিল, তখন সে চক্ষে একবিন্দুও জল গড়াইল না কেন? সে কর্ণ একটি আর্ত্তনাদও শুনিল না কেন—সে মুখ একটি কথাও বলিল না কেন? সব ফাঁকি—সব মিথ্যা সন্দেহ, শরীরের নিজের কোন ইচ্ছা নাই। যন্ত্রীর যন্ত্র যাহা, তোমার আমার শরীরও তাহা—বরং তাহা অপেক্ষাও অধম! যন্ত্রী চলিয়া যায়, যন্ত্র ধূলায় পড়িয়া থাকে, যন্ত্রীর বিরহে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খসিয়া পচিয়া গলিয়া যায় না, আবার একজন হাতে তুলিয়া লইলে, সেই চিরাভ্যস্ত চিরমধুর ললিত ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠে!! কিন্তু তুমি আমি যখন শরীর যন্ত্র ধূলায় ফেলিয়া চলিয়া যাইব, আর কি তাহা এমনি করিয়া বাজিবে? আর কেহ আসিয়া সেই ধূলিবিলুণ্ঠিত শরীরযন্ত্র কোলে তুলিয়া লইলে কি তাহা চিরাভ্যস্ত মধুর নিক্কণে ঝঙ্কার দিবে, আর কি সেই পদযুগল চিরাভ্যস্ত প্রমোদ-কাননে বিচরণ করিবে? না আর কি সেই বাহুযুগল চির স্নেহময় সন্তানসন্ততিদিগকে তেমনি আশা এবং প্রেমের আলিঙ্গনে বুকের মধ্যে টানিয়া লইবে? যদি তাহা হইত, কত শরীর-যন্ত্র না আদরের সঙ্গে কুড়াইয়া ধুইয়া মুছিয়া বসনভূষণে সাজাইয়াগুছাইয়া প্রাণের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতাম!! হায়! হায়! শরীর যদি যন্ত্রী হইত, তবে সংসারে শোক-তাপের হাহাকার তুলিবার জন্য কেহ কি মরিয়া যাইত? শরীর যদি যন্ত্রও হইত, তবুও কি তাহাকে একদিনেই সংসারের বুক হইতে এমনি করিয়া লোকে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিত যে সহস্র রোদনে, সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রতিদানে, আকুল প্রাণের সহস্র ব্যগ্রতাতেও সেই মুখ আর একবারও দেখিতে পাইতাম না!! শরীর “আমি” নহে—“আমি” হইতে পারে না। শরীর জড়, তাহাতে সাধারণ জড়ের সাধারণ ধর্ম্ম, সাধারণ গুণ সাধারণ লক্ষণ আছে। তার দৈর্ঘ্য আছে, বিস্তৃতি আছে, ভারত্ব আছে, সুন্দর কুৎসিত বর্ণত্ব আছে রূপ আছে কিন্তু আমি? আমি দীর্ঘ না হ্রস্ব, আমি স্থূল না সূক্ষ্ম, আমি সুন্দর না কুৎসিত? দর্পণে শরীরের প্রতিফলিত

জ্যোতিতে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিয়াছি, নিত্যই দেখিতেছি, যখনই ইচ্ছা করি দেখিতে পারি, কিন্তু "আমি"—আমার "আমিত্বের" প্রতিবিম্ব যে তাহাতে প্রতিফলিত হয় না। "আমি" যাহাই হই তাহা চক্ষু কর্ণের রাজ্যের অতীত দেশে রহিয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ পটু মানববিজ্ঞানের অগ্নি-বিদ্যুতের পরীক্ষারাজ্যের' অতীত স্থানে দাঁড়াইয়া কেবল মানব-জ্ঞানের অন্তঃসারশূন্য মূর্খতা দেখিয়া নিত্যই বলিতেছে "নেতি নেতি"—আমি তাহা নহি, যাহা তুমি মনে করিতেছ, আমি তাহা নহি যাহা বলিয়া তুমি আমার ব্যাখ্যা শুনাইতেছ। আমি রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দে অতীত, বুঝি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয়!! ইহার অধিক আমি আর ভাবিয়া পাই না—ইহার পরই অকূল চিন্তাসাগর, যাহার আদি অন্ত কেবল অনির্ব্বচনীয় কথায় পরিপূর্ণ।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের কর।

রাজ্যের রক্ষণ ও উন্নতি-সাধন, রাজার এই দুইটি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু এই দুই কার্য্যেই প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ কোথা হইতে আসিবে? রাজার বাড়ীতে টাকার গাছ নাই যে রাজা গাছ হইতে টাকা পাড়িবেন আর প্রজার জন্য খরচ করিবেন। প্রজার অর্থেই রাজা অর্থশালী। যে দেশে প্রজার অবস্থা উন্নত, সে দেশে রাজার আর্থিক অবস্থাও ভাল, সুতরাং রাজা প্রজার উন্নতি ও সুখস্বচ্ছন্দের জন্য নানারূপ অনুষ্ঠানে অর্থ ব্যয় করিতে পারেন।

প্রজা রাজাকে যখন যেমন শক্তি সেই পরিমাণে হাতে হাতে টাকাটা দেয় না,—দিতে পারিলেও বোধ হয় সুবিধা হয় না। সুতরাং রাজা নানা প্রকার কররূপে প্রজার নিকট হইতে এই অর্থের সংস্থান করেন;—প্রজা যে দুই চারি পয়সা করিয়া কর দেয়, রাজার হাতে জমিয়া তাহাই কোটী কোটী টাকায় পরিণত হয়।

নানা প্রকারে সমস্ত প্রজার নিকট হইতে এই কর আদায় হইয়া থাকে। ভূমি-কর, আয়-কর, বাণিজ্য-কর প্রভৃতি বিবিধ কর আছে। এই করগুলি এমন কৌশলে স্থাপিত যে কোন প্রজাকে ফাঁক যাইতে দেওয়া হয় না। যে সারাদিন ভিক্ষা করিয়া দিনান্তে একবার শুদ্ধ লবণ দিয়া ভাত খায়, তাহাকেও রাজকর দিতে হয়—লবণ খাইলেই রাজকর দেওয়া হইল। নিরক্ষর দরিদ্র মূল্য দিয়া লবণ কিনিল, এইমাত্র জানে; কিন্তু এই সঙ্গে যে রাজা কৌশল করিয়া তাহার নিকট হইতে কর লইলেন, সে তাহা কেমন করিয়া জানিবে? সত্য বটে লবণের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে, কিন্তু ধান চাউলের মূল্য কি কমি-বেশী হয় না? আবার যখন লবণের ফসল

ভাল হইবে, তখন মূল্যও কমিবে, এই তাহার প্রবোধ।

সকল দেশে সকলকেই রাজকর দিতে হয়, তবে কোন দেশে অল্প, কোন দেশে অধিক। সচরাচর উন্নতির অল্পাধিক্যে এই করের অল্পাধিক্য ঘটিয়া থাকে। করে করে আমাদের দেশ উৎসন্ন হইল বলিয়া আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি, কিন্তু ইংলণ্ডের প্রজাকে আমাদের দশগুণ রাজ-কর দিতে হয়, একথা শুনিলে হয়ত অনেকে অবাক্ হইবেন। কিন্তু অবাক্ হইবার কোন কারণ নাই; আয় অনুসারে ব্যয় করিতে কষ্ট কি? ইংলণ্ডের প্রজা যদি এক দিকে আমাদিগের দশগুণ কর দেয়, তবে অন্যদিকে আবার তাহার আয় আমাদিগের অপেক্ষা বিশগুণ, সুতরাং গড়ের উপর ইংলণ্ডের প্রজার অবস্থা আমাদের অপেক্ষা উন্নত—আমাদের অপেক্ষা সুখের। আমাদিগের আয় যদি বেশী হইত, আমরা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না; আয় নাই, সুতরাং রাজকর যাহা দিতেছি, তাহাই অসহ্য।

কিন্তু আয়ের বৃদ্ধি কিরূপে হইবে? শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য, এই দুইটি মানব-জীবনের মূলধন। শিক্ষা না হইলে আয়ের প্রশস্ত উপায় জানা যায় না, আবার সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া না থাকিলে সে শিক্ষাও কোন কাযে লাগে না। সুতরাং দেশের অবস্থা উন্নত করিতে হইলে, প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে অবাধে শিক্ষালাভ করিতে পারে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে সুস্থদেহে দীর্ঘজীবী হইতে পারে, সর্ব্বাগ্রে তাহারই বিধান করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট প্রজার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য, যত্ন করিতেছেন, কিন্তু সে জন্য অর্থব্যয় করিতে পারিতেছেন না, কাযেই ইচ্ছার অনুরূপ ফল লাভ হইতেছে না। ব্রহ্ম-গ্রাসে অগ্নি-মান্দ্য জন্মাইয়া, তিব্বতের গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিয়া, আফ্‌গান-সর্পকে দুগ্ধদ্বারা পোষণ করিয়া, এবং রুষ-ভল্লুকের ভয়ে ভীত হইয়া আমাদের গবর্ণমেণ্ট যেরূপ অর্থব্যয় করিতেছেন, ভারতবাসীর শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যদি তাহার এক চতুর্থাংশ অর্থ ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে বুঝি ভারত আজ স্বর্গ হইয়া যাইত! কিন্তু ইংরাজ যতদিন ভারতকে পর বলিয়া ভাবিবেন, যতদিন ইংলণ্ডের স্বার্থ হইতে ভারতের স্বার্থকে পৃথক্ বলিয়া বিবেচনা করিবেন, ততদিন দুরাকাঙ্ক্ষা, ভয় এবং সন্দেহ ছাড়িয়া ভারতের আভ্যন্তরিক উন্নতির জন্য সমগ্র শক্তির প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

না পারিলে আমাদের অদৃষ্ট মন্দ! কিন্তু দেশের যাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছেন, অধিবাসীর শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যই দেশের উন্নতির মূল, একথা যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা কি এ সম্বন্ধে যত্ন করিয়া কিছু করিতে পারেন না? তাঁহারা যত্ন করিতেছেন না, একথা বলি না; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তাঁহাদের যত্ন তেমন সফল হইতেছে না। কেমন করিয়া সফল হইবে? সকলের চেষ্টাকে সমবেত করিতে না পারিলে তাঁহারা সাধারণের শিক্ষার ব্যয়-ভার বহন করেন, এমন সাধ্য তাঁহাদের

কোথায়? গ্রামে একটি স্কুল বা পাঠশালা স্থাপনের জন্য যাঁহারা একবার চাঁদার খাতা হাতে লইয়া বাহির হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন ব্যাপারটা কত কঠিন। আমোদ, প্রমোদ, নাচ, তামাসাতে যাহারা অনায়াসে সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকে, গ্রামের বালকদিগের শিক্ষার জন্য মাসিক দুইটি টাকা তাহারা অপব্যয় মনে করে? এরূপ অবস্থায় যাঁহারা একবার পড়িয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই ভাবিয়াছেন,—"হায়! যদি আমার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে এমন শুভ কার্য্যে অর্থব্যয় করিতে সকলকে বাধ্য করিতাম!" গ্রামে মান্ধাতার আমলের একটি পচা পুষ্করিণী আছে, তাহার বাষ্পে বারমাস গ্রামটি আচ্ছন্ন, অধিবাসিগণ জ্বরে জড়িত! গ্রামে একটি রাস্তার অভাবে বৎসরের ছয়মাস জলকাদা ভাঙ্গিয়া জ্বর কাশে ভুগিতে হয়। দশ জনে মিলিয়া অপরাহ্নে নির্ম্মল বায়ু সেবনের উপযুক্ত একটি স্থান আছে,—কিন্তু সেখানে যাইয়া দাঁড়াইবার উপায় নাই, মলমূত্রে তাহা আবৃত। যাঁহারা এ সকলের অনিষ্টকারিতা বুঝিলেন, তাঁহারা হয়ত সংস্কারের প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু যাঁহারা বিধাতার কৃপায় অর্থ-সম্পন্ন—সুতরাং গণ্য মান্য, তাঁহারা প্রস্তাবটি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। বল দেখি, এ অবস্থায় মনের ভাবটা কেমন হয়?

মানুষের যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, আবার মানুষের স্বাধীনতাও একটি বহুমূল্য অধিকার; সুতরাং এ উভয়কেই সম্মান করিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে। কিন্তু যেখানে স্বাধীনতা মঙ্গলের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, সেখানে তাহার অনাদর না করিলে চলে কৈ? বালকের রোগ হইয়াছে; যদি সে ইচ্ছা করিয়া ঔষধ খায়, তবেত বড়ই ভাল; কিন্তু যদি সে ঔষধ খাইবে না বলিয়া বসিয়া থাকে, তবে কি তাহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে হইবে না? সভ্যসমাজের স্বাধীন মত আত্ম-হিতের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না। যে সমাজ আত্ম-হিতের বিরোধী হয়; গবর্ণমেণ্ট চিরদিনই তাহাকে আত্মহিতে বাধ্য করেন।

সৌভাগ্যক্রমে বেলি সাহেব বঙ্গদেশের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা, আর কটন সাহেব তাঁহার মন্ত্রী, তাই শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বঙ্গদেশে একটি কর স্থাপিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। ইউরোপের সুসভ্য দেশ-সমূহে এইরূপ কোন না কোন বিধান আছে; ভারতবর্ষের বাঙ্গালায় সর্ব্ব প্রথমে এই ব্যবস্থা প্রচলিত হইতে চলিল, তাই আমরা সৌভাগ্য মনে করিতেছি। শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এই ব্যবস্থা বিস্তৃত হইবে, এই আমাদের বিশ্বাস। এই হিতকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বঙ্গদেশ প্রস্তুত হইয়াছে কিনা, এখন তাহারই পরীক্ষা উপস্থিত।

দুর্ভিক্ষ-করের অপব্যবহার করিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রজার নিকট অবিশ্বাস ভাজন হইয়াছেন, ইহা বড়ই দুঃখের কথা। প্রজার হিতের জন্য কর আদায় করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রজার হিতেই ব্যয় করিবেন,

লোকে একথা আর সহজে বিশ্বাস করিতে চায় না, তাই কোন প্রকার করের কথা শুনিলেই শিহরিয়া উঠে। এই অভিনব সঙ্কল্পের প্রস্তাব শুনিবামাত্র বঙ্গদেশের সমস্ত সংবাদপত্র তাহার প্রতিবাদ করিতেছে,—একমাত্র "সঞ্জীবনী" ব্যতীত আর কেহ ইহার সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া আমাদের স্মরণ হয় না। গরল হউক আর অমৃত হউক আমরা যাহাই খাইব, তাহার জন্যই মূল্য দিতে হইবে। যদি অনিচ্ছায় পয়সা দিয়া, অনিচ্ছায় গরল কিনিয়া খাইতে পারি; তবে কি ইচ্ছা করিয়া অমৃতের জন্য পয়সাটা দিতে পারি না? ব্রহ্মদেশের অপহরণের জন্য যদি আয়-কর দিতে পারিতেছি, তবে আমাদের সন্তান-সন্ততি শিক্ষিত হইয়া সুস্থদেহে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কি কিছু দিতে পারি না?

ইচ্ছায় না পারি, গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে পারিতে হইবে। এদেশে আইন কানুন জারি করিতে গবর্ণমেণ্ট প্রজার আপত্তিতে বড় একটা কর্ণপাত করেন না; সুতরাং শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোনরূপ কর-স্থাপন করিতে যদি গবর্ণমেণ্টের সঙ্কল্প হইয়া থাকে, তবে তাহার বিরুদ্ধে চীৎকার করা বৃথা। আমরা শুনিয়াছি, এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট নিজ কর্ম্মচারিদিগেরই মতামত সংগ্রহ করিতেছেন, সাধারণকে কোন কথা এপর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করেন নাই। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট প্রজার মতামতের উপর কতকটা নির্ভর করিতেছেন। আমাদের বিবেচনায়, এরূপ করের বিরুদ্ধে চীৎকার না করিয়া, যাহাতে কর-টির উদ্দেশ্য সফল হয়, যাহাতে তাহার অপব্যবহার না হয়, যাহাতে করদাতৃগণ গবর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ হইয়া নির্বাচন-নিয়মে আপন আপন হিতের জন্য সংগৃহীত করের নিয়োগ করিতে পারে, তজ্জন্য পরামর্শ দেওয়া এবং প্রার্থনা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

কিন্তু করের প্রস্তাবেই একটা ভয়ানক সমস্যা উপস্থিত,—কাহার নিকট হইতে কর আদায় হইবে? জমিদারদিগের উপরে করস্থাপিত হইবার দুইটি গুরুতর আপত্তি আছে। জমিদারেরা যদি শিক্ষার জন্য কর দিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে তাঁহাদের যত্নে ও অর্থে দেশে যে উচ্চ শিক্ষার উন্নতি হইতেছে, তাহা রুদ্ধ হইয়া যাইবে,—অন্ততঃ, তাহার গতি মন্দ হইয়া আসিবে। তাঁহারা স্বেচ্ছায় যাহা করিতেছেন, তাহাতে বাধ্যবাধকতা জন্মিলে আর সে ইচ্ছা থাকিবে না। উচ্চশিক্ষার গোড়া হইতে দেশ-হিতৈষী জমিদারেরা হাত গুটাইলে গবর্ণমেণ্ট কি তাহা রক্ষা করিবেন? গবর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষার বিরোধী নহেন, একথা আমরা পুনঃ পুনঃ শুনিতেছি, কিন্তু আচরণে তাহার বিপরীত ফল দেখিতেছি, সুতরাং এই কর-স্থাপন দ্বারা, প্রকারান্তরে উচ্চশিক্ষার ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিয়া আমরা ভীত হইতেছি। আর এক আপত্তি এই;—জমিদারদিগের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের চিরস্থায়ী একটা বন্দোবস্ত আছে, তদনুসারে তাঁহাদের উপযুক্ত জমির রাজস্ব আর বৃদ্ধি হইতে পারে না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালার অবস্থোন্নতির এই একটা প্রধান

কারণ। যদি গবর্ণমেণ্ট যখন তখন নানা প্রয়োজনে, জমিদারদিগের উপরে কর বসাইতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপকারিতা কোথায় রহিল, আর তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞাই বা কেমন করিয়া বজায় থাকিল ? জমিদারের অবস্থা বিপন্ন হইলে লোকে জমিদার হওয়া বিড়ম্বনা মনে করিতে পারে।

জমিদারশ্রেণীকে ছাড়িয়া দিলে মধ্য-বিত্ত শ্রেণী। কিন্তু এই শ্রেণীর অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়, বিশেষ আয়-করের চাপটা সম্পূর্ণরূপে এই শ্রেণীর উপরেই পড়িয়াছে। মধ্য-বিত্ত লোকদিগের শিক্ষাই প্রধান জীবনোপায়, সুতরাং অনেকে কায়-ক্লেশে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত অর্থই সন্তানের শিক্ষায় নিয়োজিত করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের উপরে শিক্ষা-কর স্থাপন করা অতিরিক্ত—অনাবশ্যক অত্যাচার মাত্র।

নিম্ন-শ্রেণীর দরিদ্রের সন্তান অনেক গুলি আছে বটে, কিন্তু সে সন্তানকে উপযুক্ত পরিমাণে অন্নই দিতে পারে না, শিক্ষার জন্য কর দিবে কোথা হইতে ?

মাননীয় ছোট লাট বাহাদুর এবং তাঁহার মন্ত্রী মহোদয় এই সকল আপত্তি নিরূপণ করিয়া, এই সকল অনিষ্ট দূরে রাখিয়া যদি সাধারণের সম্মত কোন উপায় বাহির করিতে পারেন, তবেই তাঁহাদের বাহাদুরি বলিতে হইবে। নতুবা ঈশ্বর ক্ষমতা দিয়াছেন বলিয়া সাধারণ-মতের বিরুদ্ধে একটা নূতন অত্যাচারের সৃষ্টি করাতে কিছুমাত্র বাহদুরি নাই। আর একটি কথা। আমরা শুনিতেছি প্রস্তাবিত করের ইতি কর্ত্তব্যতা-সম্বন্ধে ছোট লাট বাহাদুর রাজ-কর্ম্মচারিদিগের মত সংগ্রহ করিতেছেন। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন। কিন্তু যদি মহানুভব বেলি সাহেবের শাসন-সময়ে সাধারণের মত এইরূপে উপেক্ষিত হয়, তবে তাহাদের আশা আর কাহার সময়ে পূর্ণ হইবে ?

স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে কোন কর স্থাপন করিবার আপাতত তেমন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমাদের বোধ হয় না! আহার্য্য, পানীয় এবং বায়ু যাহাতে বিশুদ্ধ থাকে, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া সহর ও মফস্বলের জন্য একটা বিধি প্রবর্ত্তিত করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

উতঙ্ক।

উপাধ্যায় আয়োদধৌম্যের তৃতীয় শিষ্য বেদ স্বালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর তাঁহার তিন শিষ্য হইল। তন্মধ্যে উতঙ্ক সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। এস্থলে আমরা কেবল উতঙ্কের আখ্যায়িকাই বিবৃত করিব। বেদ গুরু-গৃহে বাসকালে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ

করিয়াছেন। গুরু-গৃহে বাস করা যে অতীব কঠিন কার্য্য, তাহা তিনি বিশদ-রূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন, অতএব তিনি শিষ্যদিগকে কোন বিশেষ কষ্ট-সাধ্য কার্য্য সম্পাদন করিতে আদেশ করিতেন না। একদা বেদ যাজন-কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিবার সময় প্রিয় শিষ্য উতঙ্ককে আহ্লাদ পূর্ব্বক কহিলেন ;—"বৎস উতঙ্ক! আমি কার্য্যব্যপদেশে স্থানান্তরে যাত্রা করিতেছি, আমার বাসনা এই, আমার অনুপস্থিতি কালে তুমি আমার গৃহের সমস্ত অভাব পূরণ করিবে।"

গুরু-ভক্ত উতঙ্ক গুরুর আদেশানুসারে নানাবিধ কার্য্য সুসম্পাদন করতঃ উৎফুল্ল-চিত্তে গুরু-গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর এক দিবস গুরু বেদের গৃহস্থিত স্ত্রীগণ একত্রে সমবেত হইয়া উতঙ্ককে ডাকিয়া কহিলেন:—"উতঙ্ক! তোমার গুরুপত্নী ঋতুমতী হইয়াছেন, তোমার উপাধ্যায়ও ঘরে নাই, যাহাতে তাঁহার (তোমার উপাধ্যায়িনীর) ঋতু বন্ধ না হয় তৎপ্রতিবিধান কর। কারণ তিনি অতিশয় বিষণ্ণা হইয়াছেন।" উতঙ্ক স্ত্রীগণের এবম্বিধ বাক্য আকর্ণন করিয়া বড় মর্ম্মপীড়া পাইলেন এবং স্ত্রীগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আপনারা পরস্ত্রী হইয়া আমার প্রতি এরূপ শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করিলেন, ইহাতে কি আপনাদের অনুমাত্র ব্রীড়া বোধ হইল না? তিনি পরস্ত্রী, বিশেষতঃ গুরুপত্নী, তাহাতে আপনারাও অবগত আছেন যে, মাতা সপ্তবিধ, জননী, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী, ধরণী, রাজপত্নী, গাভী এবং ধাত্রী। তিনি আদৌ ব্রাহ্মণী, দ্বিতীয়তঃ গুরুপত্নী, সুতরাং শাস্ত্রানুসারে দুই প্রকারেই মাতৃ-পদ-বাচ্যা, এমতাবস্থায় আমাকে যে দুষ্কর্ম্ম সাধন জন্য প্রবৃত্তি দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহাতে কি আপনাদিগকে পাপ-পঙ্কে কলুষিত হইতে হইবে না? যাহা হউক আমি সে জন্য আপনাদিগকে কোন অভিসম্পাত করিতেছি না, কিন্তু আমি প্রাণসত্ত্বে কদাপি একার্য্য করিতে পারিব না, এবং আমার অধ্যাপকও আমাকে দুষ্কর্ম্ম করিতে আদেশ করিয়া যান নাই।"

যথোপযুক্ত সময়ে অধ্যাপক আলয়ে প্রতিগমন করিয়া সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হইলেন, এবং পরে উতঙ্ককে কহিলেন, "প্রিয়তম বৎস! তুমি যে সাধুপথে থাকিয়া আমার আজ্ঞা যথাবিধি প্রতিপালন করিয়াছ, এজন্য আমি তোমার প্রতি সবিশেষ প্রীত হইয়াছি; এখন বল তোমার কি প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব? আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি আলয়ে গমন কর, আমার আশীর্ব্বাদে তুমি সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ হইবে।" উপাধ্যায়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া উতঙ্ক কহিল ;—"গুরো! আমি আপনার কি প্রত্যুপকার করিব? কথিত আছে, যিনি বিদ্যাদান করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ না করেন, এবং যিনি ধর্ম্মতঃ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া দক্ষিণা প্রদান না করেন, এতদুভয়ের মধ্যে একজন মৃত হয়েন এবং পরস্পর বিদ্বেষ ভাব অবলম্বন করেন। অতএব আপনার আদেশ হইলে আমি দক্ষিণা আহরণে যত্নবান্ হইব।" উপাধ্যায় কহি-

লেন,—"বৎস! কিয়দ্দিন অপেক্ষা কর, আমি পরে বলিব।"

এদিকে বেদপত্নী উতঙ্কের নিকট দুষ্টা-ভিপ্রায় সাধন করিতে গিয়া ভগ্ন-মনোরথ হওয়াতে আহিতুণ্ডিকের পেটিকাস্থিত কাল বিষধরীর ন্যায় রাগে ও ক্ষোভে ম্রিয়মানা হইয়া উতঙ্ককে বিপদে ফেলিবার সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। যখন তিনি শুনিতে পাইলেন উতঙ্ক গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তখন তাঁহার আনন্দ সীমা অতিক্রম করিয়া প্রাবৃট্ কালের জল-স্রোতের ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি সোৎসুক মনে নিজ পতি বেদকে কহিলেন, "উতঙ্ক যখন গুরু-দক্ষিণা দিতে প্রস্তুত হইবে, তখন আমি তাহার নিকট দক্ষিণা প্রার্থনা করিব।"

কিয়দ্দিন পরে উতঙ্ক পুনরায় ধীমান্ বেদকে কহিলেন; "পিতঃ! আজ্ঞা করুন, কিরূপ দক্ষিণা দিলে আপনি তুষ্টিলাভ করিবেন, আমি সেইরূপ ধন আহরণ করি।" এই কথা শুনিয়া বেদ কহিলেন,— "বৎস! তুমি পুনঃ পুনঃ আমাকে দক্ষিণা প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিতেছ, অতএব বলিতেছি, তুমি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমার উপাধ্যায়িনীকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি যে ধন প্রার্থনা করিবেন তাহাই আহরণ করিবে।" এতদনন্তর গুরুভক্ত উতঙ্ক উপাধ্যায়িনী-সমীপে যাইয়া বলিলেন, "ভগবতি! অধ্যাপক আমাকে আলয়ে প্রতিগমন করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহাতে আমি গুরু-দক্ষিণা দিতে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার পর তিনি বলিয়াছেন যে, আপনি গুরুদক্ষিণারূপে যাহা চাহিবেন তা-হাই আহরণ করিতে হইবেক।" উতঙ্কের বাক্য শ্রবণ করিয়া বেদপত্নী কহিলেন, "রাজ-পুরুষ পৌষ্যের স্ত্রীর কর্ণে যে দুইটি কুণ্ডল শোভিতেছে, তাহা আমাকে আনিয়া দেও, আগামী চতুর্থ দিবসে পুণ্যকনামা ব্রতোৎসব হইবে, সে দিবস আমি ঐ যুগল কুণ্ডলদ্বারা সজ্জিতা হইয়া ব্রাহ্মণ-গণকে পরিবেশন করিব। যদি এই কার্য্য করিতে পার, তবে শ্রেয়ঃ হইবে, তদন্যথা তোমার সদ্গতি হইবে না।" উতঙ্ক অধ্যাপক-ভার্য্যার বাক্য শ্রবণানন্তর গুরুকে প্রণাম করিয়া পৌষ্য নৃপতীর রাজধানীতে গমন করিলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, এক বিরাট পুরুষ এক বৃহৎকায় বৃষভে আরো-হণ করিয়া যাইতেছেন। সেই পুরুষ উতঙ্ককে দেখিবামাত্র কহিলেন "বৎস! তুমি এই বৃষভের পুরীষ ভক্ষণ কর, তোমার অভিষ্ট সুসিদ্ধ হইবে।" উতঙ্ক বলিলেন "আমি অর্থলাভ লালসার বশবর্ত্তী হইয়া কখনও হেয় কার্য্য করিতে পারিব না।" তখন সেই পুরুষবর আবার কহিলেন;— "বাছা! তুমি ভীত হইতেছ কেন? তুমি বৃষভের পুরীষ ভক্ষণ কর, ইহাতে তোমার নিন্দা হইবে না, তোমার গুরুও একবার ইহার পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন।" সরল-হৃদয় গুরুভক্ত উতঙ্ক যখন শুনিলেন তাঁহার অধ্যাপক পূর্ব্বে একবার ইহার মল ভক্ষণ করিয়াছেন, তখন তিনি অম্লান চিত্তে পুঙ্গব-পুরীষ ভক্ষণ করিলেন, এবং তথা হইতে অবিশ্রাম চলিয়া পৌষ্য নৃপ-তির রাজ-ভবনে উপনীত হইলেন। নর-

পতি পৌষ্য জ্ঞান-বিশারদ উতঙ্ককে দেখিবা-মাত্র অতি যত্ন সহকারে অতিথি সৎকার করিলেন; এবং উতঙ্কের প্রার্থনা মতে স্বীয় ভার্য্যার শ্রবণ যুগল হইতে পরিহিত কুণ্ডলদ্বয় উন্মোচন করিয়া দান করিলেন। আর বলিয়া দিলেন "পথে সাবধানে থাকিবেন, নাগশ্রেষ্ঠ তক্ষক সর্ব্বদা ইহার জন্য লালায়িত আছে; যেন বঞ্চনা-ক্রমে আপনা হইতে ইহা হরণ করিতে না পারে।"

উতঙ্ক ঈপ্সিত ফললাভ করিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে গুরুর আলয়ে প্রতিগমন করিতেছিলেন, পথে তক্ষক ভাক্ত সন্ন্যাসীর বেশে সরল হৃদয় ব্রাহ্মণ হইতে কুণ্ডল হরণ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল। উতঙ্ক হতাশ হইয়া বহুক্লেশে পাতালে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এমন কি, গুরুপত্নীর কোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অশ্বের গুহ্যদেশে ফুৎকার পর্য্যন্ত দিতে লজ্জা বা ঘৃণা বোধ করেন নাই। অবশেষে ইন্দ্র ও অগ্নির সহায়তায় কুণ্ডলদ্বয় পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া গুরুর আলয়ে আসিলেন, এবং গুরু ও গুরুপত্নীকে প্রণাম করিয়া সমস্ত বিবৃত করিলেন।

গুরু বেদ উতঙ্কের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন "বৎস! তুমি সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে থাকিয়া গুরুকুলে বাস করিতে পারিয়াছ বলিয়াই এত বিপদ অতিক্রম করিয়া আসিতে পারিয়াছ; যদি তোমার শরীরে পাপের লেশমাত্রও থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তুমি এ বিপন্নদশা হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইতে না। তুমি অবশ্য অবগত হইয়াছ যে পাপস্পর্শী মানব কখনও পৌষ্য নরপতির ভার্য্যার দর্শন পায় না, তুমি দাঁড়াইয়া আচমন করিয়াছিলে বলিয়া প্রথমতঃ পৌষ্য ভার্য্যার সাক্ষাৎ পাও নাই, পরে রীতিমত আচমন করিয়া কৃত-কার্য্য হইয়াছ। প্রিয়তম, যদি তুমি আমার পুরস্ত্রীগণের প্ররোচনায় প্রণোদিত হইয়া গুরুপত্নী গমন করিতে, তবে কখনও এত সুকৃতি লাভ করিতে পারিতে না, হয়তঃ ব্রহ্মশাপে অকালে প্রাণ হারাইতে, অথবা নিশ্চয়ই তোমাকে দেবরাজ ইন্দ্র ও নিশাপতি চন্দ্রের ন্যায় দুরপনেয় কলঙ্ক ভার স্কন্ধে লইয়া চিরকাল অতিকষ্টে অতিবাহিত করিতে হইত। তুমিই ব্রহ্মচর্য্যব্রতের যথার্থ সম্মান রক্ষা করিতে পারিয়াছ, সুতরাং যতদিন বিদ্যা, জ্ঞান ও চরিত্রের আদর থাকিবে, ততদিন সুসভ্য সমাজে তোমার আখ্যায়িকা অতি সমাদরে শিক্ষনীয় বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হইবে। বৎস! তুমি যে বৃষভের পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছিলে, তাহা বাস্তবিক গো-মল নহে, ঐ বৃষভ ছদ্মবেশী নাগরাজ ঐরাবত, পুরীষ অমৃত, আরোহী পুরুষ ইন্দ্র, এবং নাগলোকে যে অশ্বের গুহ্যে ফুৎকার প্রদান করিয়াছিলে, ইহাও অশ্ব নহে, ইনি অগ্নি। দেখ উতঙ্ক! যদি তুমি সংযতেন্দ্রিয় হইতে না পারিতে, তবে কি দেবরাজ ইন্দ্র তোমাকে অমৃত ভক্ষণ করাইতেন? না যখন তুমি পাতালে প্রবেশ করিবার জন্য বিবরদ্বার নখর দ্বারা প্রশস্ত করিতেছিলে, তখন তিনি স্বীয় বজ্রদ্বারা সেই দ্বার প্রশস্ত করিয়া দিতেন? আর

অগ্নিই কি অশ্বরূপে পাতালে প্রবেশ করিয়া তোমার মহদুপকার সংসাধিত করিতেন, আবার আপন পৃষ্ঠে করিয়া তোমাকে নরলোকে আনিয়া দিতেন? যদিও তাঁহারা সকলেই আমার পরম আত্মীয় ও হিতৈষী, তথাপি কেবল তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যজ্ঞান, সরলতা এবং গুরু-ভক্তির গুণেই তোমাকে এত কৃপা করিয়াছেন। প্রাণাধিক! আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, এখন স্বালয়ে প্রতিগমন কর, এবং পরম সুখে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতে থাক।" উতঙ্ক, গুরুকে যথাবিধি প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতি-শিক্ষা।

নীতি-শিক্ষার অভাবে উপাধিধারী শিক্ষিত যুবকদের এবং স্কুল ও কলেজস্থ বালকদিগের মধ্যে অনেকেই দুর্নীতি-পরায়ণ হইয়া উঠিতেছে। এই দুর্নীতি-পরায়ণতা নীতি-বিহীন বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর কুফল। ইহার জন্য, দেশের বহুতর অনিষ্ট হইতেছে—একথা গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং বিশ্বাস করিয়াছেন; এবং বিশ্বাস করিয়া, ইহার প্রতীকার চেষ্টা করিতেছেন। যে সকল স্কুল ও কলেজস্থ বালক কিছু দিন পরে সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা হইবে, এবং যাহাদের উপরে ভাবী বংশের গৌরব, অগৌরব—উন্নতি, অবনতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে—তাহাদের সাধ্য; এবং যে সকল শিক্ষিত যুবক ভবিষ্যৎ বংশের পরিচালক, এবং বর্ত্তমান বংশের নেতা না হইলেও সহস্র সহস্র নর নারীর এইরূপ হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, তাহাদের মধ্যে অনেকেই যদ্যপি চরিত্র-বিহীন হয়, তাহা অপেক্ষা গুরুতর ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে? শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু এম. এ, বি. এ, পাশ করা নহে; চরিত্রের উন্নতি ও শিক্ষার আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য মনে করিতে হইবে। তুমি শিক্ষিত হইলে, তুমি এম. এ, বি. এ, পাশ করিলে, গবর্ণমেণ্টের নিকটে পরিচিত হইলে, বিদ্বান্ বুদ্ধিবান্ সুতরাং চরিত্রবান্ বলিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে হাকিম হইলে —অথবা, চাকরী স্বীকার না করিয়া উকিল মোক্তার ডাক্তার বা এডিটার, কিম্বা অন্য কোন প্রকার স্বাধীন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দেশের মধ্যে গণ্য মান্য হইলে,—শত সহস্র নর-নারী উপকারের প্রত্যাশায় তোমার মুখপানে চাহিয়া রহিল, এবং প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার দীর্ঘ-জীবন প্রার্থনা করিতে লাগিল;—যদ্যপি তুমি চরিত্রবান্ না হও, আপন পদ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে না জান, অন্যের সুখ দুঃখের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যদ্যপি তুমি স্বার্থসাধনে ব্যগ্র হও, সবল হইয়া দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার কর, এবং বিদ্যা বুদ্ধি ও ধনবলে বলী হইয়া ছলে বলে কলে কৌশলে অন্যের সর্ব্বস্বাপহরণ করিতে কুণ্ঠিত না হও, তাহা হইলে

তোমার দ্বারা জগতের যত অপকার সম্ভবপর, এত অপকার অশিক্ষিতের দ্বারা কদাপি সম্ভবপর নহে। হে শিক্ষিতগণ! বল দেখি, দেশে যত অন্যায় মোকদ্দমা হইতেছে, এবং নিত্য নূতন লোমহর্ষণ কাণ্ড তোমাদের চক্ষের উপরে দিবানিশি ঘটিতেছে, তাহাতে তোমাদের দোষ অধিক, না নিরন্ন কৃষকগণের বা নিরক্ষর জমিদারগণের দোষ অধিক? আমি বলি, তোমাদের দোষ অধিক। তোমরা বিচারক হও, উকিল মোক্তার বা ডাক্তার হও, অথবা, চাকরী বা কোন প্রকার স্বাধীন ব্যবসায়ের দ্বারা বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ বা বণিক্ হও,—তোমরা যদ্যপি আপন আপন হিতাহিত বিবেচনার বিরুদ্ধে কার্য্য না কর, অন্যের অনিষ্ট না করিয়া নিঃস্বার্থ পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইয়া দুর্ব্বল, সরল-হৃদয়, প্রপীড়িত ব্যক্তির সহায়তা করিয়া, সবল, কুটিল-স্বভাব অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হও, তাহা হইলে দেশের দুরবস্থা অনেক পরিমাণে দূর হইবে, ইহা আমাদের স্থির বিশ্বাস। হে শিক্ষিতগণ! তোমাদের চরিত্র অগ্রে সংশোধিত হওয়া আবশ্যক; যেহেতু, তোমাদের দ্বারা জগতের যত অপকারের সম্ভাবনা, নিরন্ন কৃষকগণের বা নিরক্ষর জমিদারগণের দ্বারা তত অপকারের সম্ভাবনা নাই।

সুখের বিষয়, বালকদিগের দুর্নীতিপরায়ণতা নিবারণের জন্য সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে একটি মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, এবং নীতিপূর্ণ পাঠ্য পুস্তক প্রস্তুত করণের, ও স্থানে স্থানে শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য ট্রেনিঙ্ স্কুল সংস্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। ইহাতে অনেক সুফল হইবার সম্ভাবনা। এতদিন পরে, স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট যে শিক্ষা সংস্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া শিক্ষা সংস্কারে মনযোগ দিয়াছেন—এজন্য গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের নিকটে ধন্যবাদার্হ। বর্ত্তমান্ নীতি-বিহীনতা যে বর্ত্তমান্ শিক্ষাপ্রণালীর কুফল, ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু, যে সূত্র অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহা আমাদের নিকটে তত সমিচীন বলিয়া বোধ হইতেছে না। স্বীকার করি, যেরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার আরম্ভ করিয়াছেন, তদপেক্ষা প্রশস্ততর উপায় অবলম্বন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব পর নহে। নীতিপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক স্কুল বা কলেজে প্রচলিত হইলে বালক ও যুবকগণের চরিত্রের যে কিছু উন্নতি হইবে, এবিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। আজ কাল যেরূপ পাঠ্য পুস্তক স্কুল বা কলেজে প্রচলিত আছে, তাহাদের একখানাও বোধ করি নীতি-বিহীন নহে। 'মিথ্যা কথা বলা বড় দোষ' প্রভৃতি নীতি-বাক্য আমরা বালক কাল হইতে পড়িয়া আসিতেছি, তাহাতে আমরা বেশী কিছু নীতি-পরায়ণ হইয়াছি কি? বুঝিতেছি—জানিতেছি মিথ্যা কহা বড় দোষ, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছি কৈ? শিক্ষা করা এক কথা, কার্য্যে পরিণত করা অন্য কথা। পুস্তকে পড়িয়াই হউক, অথবা অন্যের নিকটে

শুনিয়াই হউক, আমি সহস্র নীতিবাক্য মুখে আওড়াইতেছি—নীতিপূর্ণ বক্তৃতায় দিগন্ত বিকম্পিত করিতেছি। তাহাতে ফল কি? আমার সহিত ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে তুমি আমাকে কতই নীতি-পরায়ণ বলিয়া জানিতেছ; কিন্তু একদণ্ড আমার সহিত ব্যবহার কর, তোমার ভ্রম দূর হইবে—বুঝিবে আমার ন্যায় পাষণ্ড, অকাল কুষ্মাণ্ড ভণ্ড নীতি-বিহীন পশু ত্রিজগতে আর নাই। বলা বাহুল্য, আমার ন্যায় বিষকুম্ভপয়োমুখ, ভণ্ড-তপস্বীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য ট্রেনিঙ্ স্কুল সংস্থাপন সম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করা অন্যায়, যেহেতু ইহার ফলাফল কতদূর কি হইবে তাহা আমরা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না, শিক্ষকের চরিত্রের উপরে ছাত্রের চরিত্র অনেকটা নির্ভর করে, ইহা আমরা স্বীকার করি। সুতরাং শিক্ষকের চরিত্র যদ্যপি উন্নত হয়, তাহা হইলে ছাত্রের চরিত্রও কতকটা উন্নত হইবে, ইহা আমাদের বিশ্বাস। নীতি অপেক্ষা দৃষ্টান্তের ফলোপধায়কতা অধিক বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু, ট্রেনিঙ্ স্কুল সংস্থাপন দ্বারা শিক্ষক প্রস্তুত করণের ফলোপধায়কতা কতদূর কি হইবে, তাহার ফল না দেখিলে তৎসম্বন্ধে আমরা বেশি কিছু বলিতে পারি না। যাহা হউক, যে উদ্দেশ্যে ট্রেনিঙ্ স্কুল সংস্থাপনের এবং বর্ত্তমান পাঠ্য পুস্তক পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন ধরণের পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুতকরণ ও নির্ব্বাচনের বন্দোবস্ত হইতেছে, সে উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সুসিদ্ধ হইলেও আমরা যারপর নাই সুখী হইব।

কি কারণে আমাদের দেশে নীতি-পরায়ণতার অভাব দিন দিন অধিকতর পরিলক্ষিত হইতেছে, এবিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই, আমাদের দেশে যেরূপ দরিদ্রতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, দরিদ্রতার অবশ্যম্ভাবী ফল—স্বার্থপরতা এবং নীতি-বিহীনতাও তৎ সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। দরিদ্র হইলে, পেটে ভাত না থাকিলে লোকের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। সুতরাং, শিক্ষিতই হউক, আর অশিক্ষিতই হউক, তাহারা দারিদ্র্যের বিষম যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ছলে বলে কৌশলে—যে প্রকারেই হউক—অর্থোপার্জ্জন করিবে, এবং সম্ভব হইলে, ভবিষ্যতের জন্য অর্থসঞ্চয় করিয়া রাখিবে, তাহাতে অন্যের যদ্যপি অনিষ্ট হয়, তাহাতেও ক্ষতি মনে করিবে না। ইহলোকে যদ্যপি ভাল ভাবে দিন কাটান যায়, পর-লোকে কার কি হইবে, কে জানে? এইরূপ বিশ্বাস আজিকালিকার শিক্ষিত অশিক্ষিত অনেকেরই। তুমি তাহাদের নিকটে ধর্ম্মকথা বল, তোমার কথায় তাহারা কর্ণপাতও করিবে না। যদ্যপি অর্থাগমের কথা বল, তাহা হইলে তাহারা বন্ধুভাবে তোমাকে আলিঙ্গন করিবে। অর্থাভাবের সঙ্গে সঙ্গে অর্থলিপ্সা এবং স্বার্থপরতা দিন দিন বাড়িতেছে। এই অর্থলিপ্সা এবং স্বার্থপরতা অনেকটা পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফল। অর্থলিপ্সা এবং

স্বার্থপরতার বৃদ্ধির সহিত দেশের দুরবস্থাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। একান্নভুক্ত পরিবার প্রণালী ইউরোপ ও আমেরিকায় নাই। পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশ হইতেও ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য, ইংরাজ রাজত্ব আমাদের দেশে স্থায়ী হইলে একান্নভুক্ত পরিবার প্রণালী আমাদের দেশ হইতেও উঠিয়া যাইবে। একান্নভুক্ত পরিবার প্রণালীর দোষ-গুণ এস্থলে বিচার্য্য নহে। তবে, এই কথা এস্থলে উল্লেখ করা অসঙ্গত নহে যে, একান্নভুক্ত পরিবার প্রণালীর অন্য উপকার থাকুক বা না থাকুক একটি উপকার আছে—সেটি নিঃস্বার্থপরতা শিক্ষা, যে নিঃস্বার্থপরতার অভাবে বর্ত্তমান সমাজের এত দুর্দ্দশা। তুমি নিঃস্বার্থভাবে আমার জন্য না খাট, আমিও নিঃস্বার্থভাবে অবশ্যই তোমার জন্য খাটিব না, ইহা প্রাকৃতিক নিয়মের অবশ্যম্ভাবী ফল। তুমি আমাকে অন্ন বস্ত্র দিয়া প্রতিপালন করিলে, আমি হয়ত শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা, অথবা, অন্য কোন প্রকারে তোমার উপকার করিব। তুমি অর্থদ্বারা দশ জন লোক রাখিয়া যাহা না করাইবে, আমি একা তাহাই করিব। আমাকে অন্ন বস্ত্র দিয়া প্রতিপালন করিতে তোমার ক্ষতি কি? যদি বল "আমি তোমাকে প্রতিপালন করায় তুমি উপার্জ্জন করিতে চাহিতেছ না, ইহাতে অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে।" ইহার উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, যে উপার্জ্জন করিতে ক্ষমবান্ হয়, সে কখনই অন্যের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে চাহে না। স্বাধীনতা সকল জীব জন্তুই ইচ্ছা করে, মানুষ যদি ইচ্ছা না করে, তবে অন্য কথা। আর এক কথা, আমি যদ্যপি উপার্জ্জন না করিয়া তোমার গলগ্রহ হইয়া তোমার অন্ন-ধ্বংস করি, তাহা হইলে তুমি ক্ষমবান্—তুমি নিঃস্বার্থভাবে আমার জন্য দ্বিগুণ পরিশ্রম কর না কেন? যদি বল "আমি তোমার জন্য দ্বিগুণ পরিশ্রম করিব কেন—তোমার জীবিকা-নির্ব্বাহ আমি করিব কেন? তুমি তোমার-জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে না পারিলে—তুমিই কষ্ট পাইবে, তাহাতে আমার ক্ষতি কি?" এই কথা নিতান্ত স্বার্থপরের কথা; এই স্বার্থপরতার জন্যই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইতেছে। ইহার ফল শুভ কি অশুভ তাহা আমরা বলিতে চাহি না, পাঠকবর্গ নিজে নিজে বিবেচনা করুন। একান্নভুক্ত পরিবার প্রণালীর আর একটি শুভ ফল আছে—তুমি একা পরিশ্রম করিয়া যাহা না করিবে, দশ জনে মিলিয়া পরিশ্রম করিলে, অনায়াসে অল্প সময়ে অধিক ফল পাইবে। সুতরাং, অর্থাগমেরও অধিক সুবিধা হইবে, সন্দেহ নাই। অর্থাগমের পন্থা প্রাপ্ত হইলে দুর্নীতি-পরায়ণতার অনেক লাঘব হইবে, ইহা আমাদের বিশ্বাস। আজ কাল যেরূপ সময় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে পরিশ্রম-কাতর হইলে চলিবে না। পরিবারের সকলেই প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে হইবে, তবে সামান্যভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা সম্ভবপর হইবে। পূর্ব্বে অল্প পরিশ্রমে যাহা হইত, এখন দ্বিগুণ চতুর্গুণ পরিশ্রমেও তাহা হইতেছে না। জনসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত, আয়

অপেক্ষা ব্যয়ের বৃদ্ধির সহিত শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রমের বৃদ্ধি হইতেছে—লোকের কষ্ট দিন দিন বাড়িতেছে, ঘরে ঘরে হাহাকার উপস্থিত হইয়াছে। একবার শস্য না জন্মিলেই দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলে বিলাসিতা দিন দিন বাড়িতেছে,—দিনান্তে যাহার অন্ন যোটে না,—তাহারও পোষাক দেখিলে লাখ টাকার জমিদার বলিয়া বোধ হয়। অর্থ নাই, অথচ বিলাসিতা আছে; পাঁচ টাকা বেতন পাই, অথচ দশ টাকা খরচ করিতে হয়; পূর্ব্বে দুই টাকায় যে জিনিস পাওয়া যাইত, আজ চারি টাকায় সে জিনিস পাওয়া যায় না, অথচ সে জিনিসের প্রয়োজন পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল আজিও সেইরূপই আছে; ইহার উপায় কি? লাভের মধ্যে, পূর্ব্বে দোল দুর্গোৎসব করা হইত, ব্যাপার বিষয়ে দশ টাকা খরচ করা হইত, সর্ব্বদেবময় অতিথি আসিলে তাহাকে ফিরান হইত না, ফকির ফাকরা আসিলে তাহাদিগকে ভিক্ষা দেওয়া হইত, দশ পাঁচ জন শিক্ষার্থীকে বাসায় স্থান দেওয়া হইত, তাহাতেও সুখস্বচ্ছন্দে জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত; আজ সে অতিরিক্ত খরচগুলি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, তবু দিন যাওয়া ভার হইয়াছে! পূর্ব্বে নিঃস্বার্থ পরোপকার ভারতবাসীর মুখ্য ব্রত ছিল,—আজ স্বার্থপরতা ভারতবাসীর মুখ্য ব্রত হইয়াও দিন যায় না—ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! প্রাত্যহিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যদ্যপি কিছু কিছু সঞ্চয় না হয়, তবে ভাবী দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। এই ভাবী দুঃখ নিবারণের জন্য, অথবা প্রাত্যহিক ব্যয় সংকুলনের জন্য, যাহাদের প্রাত্যহিক আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক তাহাদের প্রাত্যহিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে বা কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইলে কোন্ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে? অবশ্যই জুয়াচুরি, বাটপাড়ি ভিন্ন গত্যন্তর নাই। অবশ্যই এস্থলে এ কথা বুঝিতে হইবে যে, যাহারা দরিদ্র, তাহারাই জুয়াচোর বা বাটপাড়; যেহেতু দরিদ্রের মধ্যেও এরূপ দু চারি জন পাওয়া যায়, যাহারা নিঃস্বার্থ-পরোপকার-ব্রতে দীক্ষিত, যাহারা অর্থের জন্য লালায়িত না হইয়া দরিদ্রাবস্থাতেই সন্তুষ্ট। দেশের অর্থাভাবের সঙ্গে সঙ্গে জুয়াচুরি বাটপাড়ি প্রভৃতি অর্থাগমের অসদুপায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে,—হাজার নীতিশিক্ষাই দাও, অথবা চরিত্র গঠনের উপায়ই স্থির কর, কিছুতেই এই দুর্নীতি-পরায়ণতার স্রোত বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হইবে না। তবে নীতিশিক্ষার ফল কিছু যে না হইবে, বা নীতিশিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে,—এ কথা আমরা বলিতেছি না। নীতিশিক্ষার ফলোপধায়কতা অবশ্যই আমরা স্বীকার করি; তবে অল্প আর অধিক, এই মাত্র প্রভেদ। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত যুবকেরা নীতি-পরায়ণ হইবে, ইহা অবশ্য বাঞ্ছনীয়; এবং শিক্ষিত যুবকেরা নীতি-পরায়ণ হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে, এবং দুর্নীতির স্রোতঃ তাহাদের দ্বারা ক্রমে ক্রমে দেশ হইতে বিলুপ্ত হইবে ইহাও আমরা আশা করি। সুতরাং, কি উপায়ে শিক্ষিত যুবকদিগের চরিত্র শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হইবে, তদ্বিষয়ে চেষ্টা ও চিন্তা করা দেশ-হিতৈষী মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

ক্রমশঃ।

শিক্ষা-পরিচর।

১ম ভাগ। | ফাল্গুন ১২৯৬ সাল। | ১১শ সংখ্যা।

অদ্ভুত জনপদ।

সন্ন্যাসী এই ব্যাপার দেখিয়া চমকিত হইলেন। আজন্ম যে কল্পতরুর কথা শুনিয়াছেন, আজ তাহা দর্শন করিয়া হিমালয়-ভ্রমণ সার্থক বোধ করিলেন, কিন্তু এমন সুন্দর ও উপকারী গাছটি কাটিয়া ফেলিতেছে দেখিয়া তাঁহার কষ্টের সীমা থাকিল না। যুবক দুইটি কোন্ দেশীয় বা কোন্ জাতীয়, তাহাও তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। একটির আকৃতি, প্রকৃতি, ভাষা এবং পরিচ্ছদ সমস্তই তাঁহার নিকট অভিনব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই যুবক কুঠার দিয়া গাছ কাটিতে যাইতেছিল, কিন্তু বৃদ্ধের কথা শুনিয়া এবং গাছের অপূর্ব্ব ফল ফুল দেখিয়া যেন মোহিত হইয়া গেল,—কুঠার হস্তেই রহিল, যুবক অবাক্ হইয়া গাছের দিকে চাহিয়া রহিল। অপর যুবকের ভাষা এবং আকৃতি সন্ন্যাসীর স্বদেশীয়ের মত বোধ হইল, কিন্তু পরিচ্ছদ এবং প্রকৃতি দেখিয়া তাঁহার সে বিশ্বাসে সন্দেহ জন্মিল। এই যুবকের কুঠার সজোরে ঘন ঘন বৃক্ষ-মূলে আঘাত করিতে লাগিল,—বৃদ্ধের কথায় তাহার কর্ণপাত নাই, বৃক্ষের শোভায় তাহার দৃক্-পাত নাই!

সন্ন্যাসীর মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, হিমালয়-ভ্রমণের বাসনা তাঁহার বিলুপ্ত হইল, তিনি যে পথে এইস্থানে আসিয়াছিলেন, সেই পথে ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই শুনিতে পাইলেন, কে যেন পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে 'সন্ন্যাসী ঠাকুর' বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে। সন্ন্যাসী পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, একটি লোক ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তাঁহার দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে, আর তাঁহাকে দাঁড়াইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। লোকটির অবস্থা দেখিয়া সন্ন্যাসী কতকটা আশ্বস্ত হইলেন, ভয় যেন অনেকটা কমিয়া গেল। ক্রমে লোকটি নিকটবর্ত্তী হইয়া সন্ন্যাসীকে বলিল, "আমি আপনাকে দেখিতে পাই-

যাই আপনার নিকটে আসিতে ছিলাম, কিন্তু আপনি ফিরিয়া চলিলেন দেখিয়া অগত্যা আমাকে দৌড়িতে হইয়াছে, তাই বড় শ্রান্ত হইয়াছি।" ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "বাপু হে! আমি এ স্থানের রীতিনীতি দেখিয়া বড় ভীত হইয়াছি, তাই যে পথে আসিয়াছিলাম, সেই পথে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। বহুদিন পরে কয়েকটি লোকের দেখা পাইয়া মনে করিলাম এ নির্জন স্থানে তাহাদের সঙ্গে দুইটা কথা বলিয়া সুখী হই, কিন্তু তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া আমার সে ইচ্ছা বিলুপ্ত হইয়াছে। দেখিতেছ, এমন যে সুন্দর গাছটা, তাই কাটিতেছে, আর বলিতেছে কি না এই আগাছাটা কাটিয়া ফেলিয়া ঐ স্থানে শস্য বুনিবে। স্থানের গুণ যে কি, তাহাতে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার ত চেহারাটি বেশ সাম্য বোধ হইতেছে, কিন্তু তোমার ভিতরে যে কি আছে, তাইবা কেমন করিয়া বলিব!"
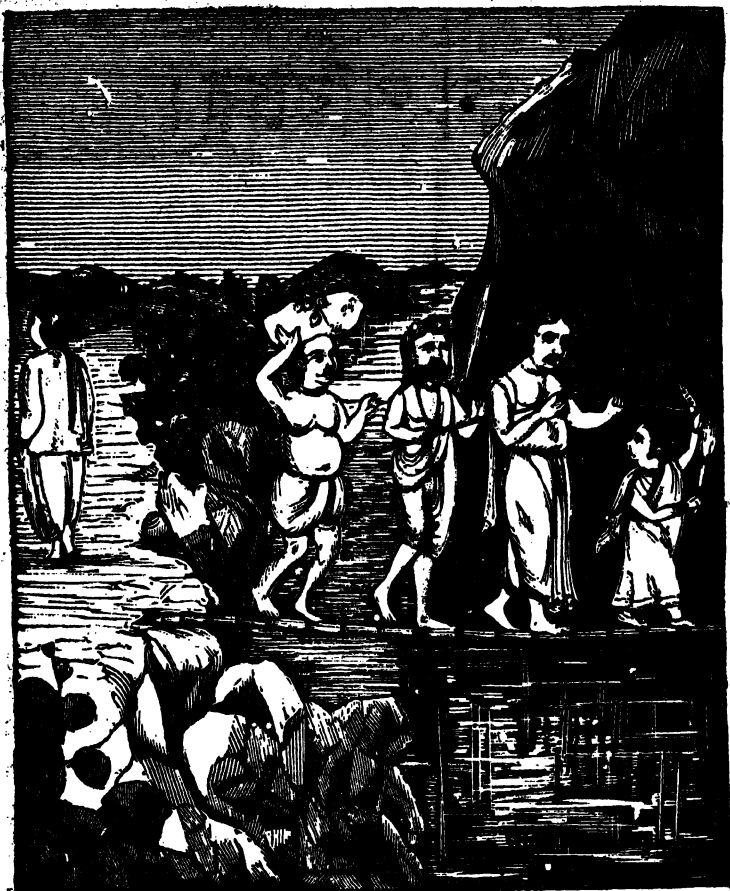
আগন্তুক ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,

—"ইহাদিগের আচরণে পবিত্রাত্মাদিগের মনে এইরূপ বিরক্তিই জন্মিয়া থাকে, কিন্তু আপনি ইহাতে ভীত হইবেন না। এই ভূমির নাম কল্পভূমি, আর এই বৃক্ষের নাম কল্পতরু, এই ভূমিতে এই বৃক্ষ ব্যতীত আর কিছু জন্মে না। কতকাল হইতে এই বৃক্ষ এইখানে জন্মিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর হইল একদল লোক এই গাছ কাটিয়া একরূপ শস্যের চাষ করিয়াছিল, কিন্তু সে শস্যের বীজ অঙ্কুরিত না হইয়াই মরিয়া গেল, আবার ঐ স্থানে পূর্ব্বের ন্যায় আর একটি কল্পতরু জন্মিয়া উঠিল। প্রায় আট শত বৎসর অতীত হইল আর একবার এই গাছ কাটিবার যত্ন হইয়াছিল। যাহারা গাছ কাটিতে আসিয়াছিল, শুনিয়াছি তাহাদের নাকি প্রতিজ্ঞাইছিল যে পৃথিবীতে আর প্রাচীন গাছ থাকিতেই দিবে না, এমন কি, অনেক দেশের গাছ কাটিয়া না কি সেই সকল দেশকে তাহারা মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছিল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কল্পতরুর স্পর্শেই নাকি তাহাদের কুঠার ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল, তাই তাহারা গাছটি কাটিতে পারে নাই। আবার শতাধিক বর্ষ হইল এই গাছ কাটিয়া ফেলিবার যত্ন হইতেছে, কিন্তু পিতা মহাশয় বলিয়াছেন, এ গাছ কেহ কাটিতে পারিবে কি না সন্দেহ; কাটিলেও এখানে অন্য কিছু জন্মিবে না, কালে আবার এই গাছই জন্মিবে।"

কথাগুলি শুনিয়া ব্রহ্মানন্দ আশ্বস্ত হইলেন, এবং ব্যগ্রতার সহিত আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাপু! তোমার পিতার নাম কি?" আগন্তুক বলিলেন,—"আমার পিতার নাম বিবেক, এবং মাতার নাম প্রজ্ঞা।"

সন্ন্যাসী। "তোমার নামটি কি?"

আগন্তুক। "আমার নাম ধৈর্য্য।"

সন্ন্যাসী। "একবার তোমার পিতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পার?"

আগন্তুক। "তা পারি বই কি, আপনি যদি দেবপুরে যান, তবে অবশ্যই আমার পিতামাতার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হইবে।"

সন্ন্যাসী। "দেবপুর কোথায়—কত দূরে?"

আগন্তুক। "অধিক দূরে নয়, কিন্তু পার্ব্বত্য পথ বলিয়া তথায় যাইতে কয়েক দিন লাগে।"

সন্ন্যাসী। "আমাকে কি সেই দেবপুরে একবার লইয়া যাইতে পার?"

আগন্তুক। "আমাদের কার্য্যই এই, অনুগ্রহ করিয়া গেলেই লইয়া যাইতে পারি। আমরা কয়েকটি ভাই ভগিনী এখানে থাকিয়া দেবপুরের পাণ্ডার আজ্ঞাক্রমে তথায় গমনেচ্ছু যাত্রিদিগকে লইয়া যাই।"

সন্ন্যাসী। "দেবপুরের পাণ্ডার নাম কি?"

আগন্তুক। "তাঁহার নাম ধর্ম্মরাজ; আর তথাকার দেবতার নাম অনন্তদেব।"

আগন্তুকের পরিচয় পাইয়া সন্ন্যাসীর মনে আর হর্ষের সীমা রহিল না। তিনি

ক্ষুণ্ণচিত্তে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ এরূপ সংসর্গ পাইয়া, এবং একটি অশ্রুতপূর্ব্ব তীর্থের সংবাদ জানিয়া পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসীর নিকটে আসিবার সময়ে ধৈর্য্যের বন জঙ্গল বোধ ছিল না, তাঁহার এক পায়ে তিনটি কাঁটা ফুটিয়াছে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচয়ের কথা শেষ হইয়া গেলে তিনি বসিয়া একটি একটি করিয়া ক্রমে তিনটি কাঁটাই খুলিলেন। সেই কাঁটা এবং তাহাদের ক্ষতস্থান হইতে নির্গত রক্তের ধারা দেখিয়া সন্ন্যাসী কষ্টে কিঞ্চিৎ কাতর হইলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ধৈর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার মুখে কণামাত্র কষ্ট বা বিষাদের চিহ্ন নাই। এজন্য তিনি ধৈর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ধৈর্য্য হাসিয়া বলিলেন,—"এই কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে আমাকে নিয়ত বেড়াইয়া যাত্রী সংগ্রহ করিতে হয়, কণ্টকের ভয় করিলে বা কণ্টকের ক্ষত জন্য কাতর হইলে এ কায চলে না। কিন্তু বাস্তবিক আমাকে কণ্টকবিদ্ধ হইতে দেখিয়া আপনার যেমন কষ্ট হইতেছে, আমার তেমন কিছুই হয় নাই। আমাদের পাণ্ডা মহারাজের মিষ্ট বাক্যই এ সকল পরিশ্রমের প্রধান পুরস্কার। তিনি যখন কথা বলেন, তখন বোধ হয় যেন অমৃত বর্ষণ হইতেছে। সেই অতুল পুরুষের বলে জগতে আমাদের অসাধ্য কিছুই নাই। আমরা যতই যন্ত্রণা পাই না কেন, একবার তাঁহার কথা শুনিলে সমস্ত ভুলিয়া যাই; আমাদের শরীরে যতই ক্ষত হউক না কেন, তিনি একবার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলে সে সমস্ত মিশাইয়া যায়।"

ধৈর্য্যের এই সকল কথা শুনিয়া, এমন তীর্থ, এমন পাণ্ডা, এমন দেবতাকে দেখিবার জন্য ব্রহ্মানন্দের কৌতূহল শতগুণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া গন্তব্য পথে চলিবার জন্য ধৈর্য্যকে অনুরোধ করিলেন। ধৈর্য্য ক্ষত স্থানের বেদনার জন্য খুঁড়াইয়া খুঁড়াইয়া অগ্রগামী হইলেন, পশ্চাতে ব্রহ্মানন্দ তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

নানারূপ কথাবার্ত্তায় দুই জনে বহুক্ষণ চলিলেন। বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে একটি নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। নদী অত্যন্ত গভীর, এবং তাহার বেগ অত্যন্ত প্রখর, সে বেগের নিকটে একগাছি তৃণও যেমন, একটি মত্ত হস্তীও সেইরূপ। সন্ন্যাসী নদী দেখিয়া চকিত-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ নদীর নাম কি?" ধৈর্য্য উত্তর করিলেন,—"ইহার নাম প্রবৃত্তি। দেবপুরে যাইতে হইলে এই নদী উত্তীর্ণ না হইয়া যাইবার উপায় নাই। এই স্থানেই এ নদী সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিসর, এ জন্য আমাদের পাণ্ডা মহারাজ এখানে যাত্রিদিগের সুবিধার জন্য একটি সেতু করিয়া দিয়াছেন। এই স্থান ছাড়িয়া গেলে এই নদী পার হইবার আর উপায় নাই; কারণ, বিনা সেতুতে এ নদী পার হওয়া যায় না, আর এই একটি ছাড়া ইহার উপরে দ্বিতীয় সেতুও নাই।"

ধৈর্য্যের কথাগুলি শুনিয়া সন্ন্যাসীর মনে যেন কেমন কেমন বোধ হইতে

লাগিল। নদীর উপরে তিনি একটি সেতুও দেখিলেন বটে, কিন্তু তাহা একটি মাত্র বংশ দ্বারা নির্ম্মিত। তাহার উপরে উভয় তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত একগাছি অবলম্ব-রজ্জুও আছে বটে, কিন্তু তাহা এতই সূক্ষ্ম যে একটি অঙ্গুলীর ভারও সহিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক, নিশ্চয় জানিবার জন্য আবার তিনি ধৈর্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এ ক্ষীণ সেতু ভিন্ন দেবপুরে যাইবার অন্য পথ নাই? সেতুর অবস্থা দেখিয়া কিন্তু তোমার কথা আমার নিকট প্রহেলিকার মত বোধ হইতেছে।"

ধৈর্য্য বলিলেন,—"আপনি কিছু চিন্তা করিবেন না, আপনাকে নদী পার করিবার ভার আমাদের উপরেই আছে, আপনাকে সে জন্য কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হইবে না। আমার আর একজন ভাই এবং এক জন ভগিনী আছেন, তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছি, তাহারা আসিলেই আপনাকে পর পারে লইয়া যাইব।"

ধৈর্য্যের সঙ্গে সন্ন্যাসীর এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে দেখা গেল একটি বাবু আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত; কিন্তু তিনি তথায় অপেক্ষা না করিয়া বরাবর প্রশস্ত পরিষ্কৃত পথে চির-পরিচিতের ন্যায় চলিতে লাগিলেন। কেবল ধৈর্য্য ও সন্ন্যাসীর আলাপ শুনিয়া একবার ঈষদ্ হাসিয়া বলিলেন,—"কি হে, তোমরা কি দেবপুরের যাত্রী? দেবপুরে যাইবার ইচ্ছা থাকিলে আমার সঙ্গে আসিতে পার। যদিও আমি আরে কখনও সেখানে যাই নাই বটে, তথাপি আমার বিশ্বস্ত পথ-প্রদর্শক পশ্চাৎ আসিতেছে; তবে বিশেষ এমন পরিষ্কার রাজপথ থাকিতে ভয়ে জড়সড় হইয়া মূর্খের মত বসিয়া ভাবিতেছ কেন?" এই বলিয়া বাবুটি প্রশস্ত পথে চলিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে একটি বালিকা এবং একটি যুবা আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। বালিকার মুখে একটি স্বর্গীয় হাসি যেন সর্ব্বদা লাগিয়াই রহিয়াছে; তাঁহার এক হাতে একটি মশাল অনবরত জ্বলিতেছে, তাহার তেজে দিনরাত্রি ভেদশূন্য; অপর হাতে একটি বাঁশী, মুহুর্মুহুঃ তাহা বাজাইতেছেন। বাঁশীর স্বর শুনিবামাত্র সন্ন্যাসীর যেন ভাবান্তর উপস্থিত হইল,—ক্ষীণ সেতুর সাহায্যে প্রবল-তরঙ্গ নদী যে তিনি পার হইতে পারিবেন, এ কথা কতকটা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তাঁহার মনের ভাব ধৈর্য্যকে জানাইলে ধৈর্য্য বলিলেন,—"ইনি আমাদিগের ভগিনী, ইঁহার নাম আশা। আর এই যুবক আমার সহোদর, ইঁহার নাম বিশ্বাস। বিশ্বাসের চক্ষু দুইটি জন্মাবধিই নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইনি সমস্ত শরীরেই দেখিতে পান। আমাদের যাহা অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখিতে অতি কষ্ট হয়, তিনি নিতান্ত স্থূল পদার্থের ন্যায় তাহা অতি সহজেই দৃষ্টিগোচর করেন। এমন কি, অতি দূরস্থ অন্ধকার গহ্বরেও ইঁহার দৃষ্টির প্রসর রহিয়াছে। ইঁহার হাতে যে একটি যষ্টি দেখিতেছেন, ইহার নাম নির্ভর; এই যষ্টির সাহায্যে বিশ্বাস

অনেক অসাধ্য কায সাধন করিয়া থাকেন।”

সন্ন্যাসী বলিলেন,—“এমন সুন্দর প্রশস্ত পথ থাকিতে এই বিপদ-সঙ্কুল সেতু কেন পার হইতে হইবে, তাহা আমি এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, তোমরা যখন অভয় দিতেছ, তখন তোমাদের কথা মানিয়াই চলিতে হইতেছে।”

ধৈর্য্য উত্তর করিলেন,—“আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। ঐ যে সেতু দেখিতেছেন, উহার নাম দৃঢ়তা, আর ঐ অবলম্ব-রজ্জুর নাম স্বাবলম্বন; এই উভয়ের সাহায্য ভিন্ন এই ভীষণ-বেগবতী প্রবৃত্তি নদী পার হইবার অন্য উপায় নাই। আপনি সেতুর ক্ষীণতা দেখিয়া ইহার দৃঢ়তায় বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু ইহা এতই শক্ত যে, ইহার উপরে গুরুভার পর্ব্বত চাপাইয়া দিলেও ইহা ভাঙ্গিবে না। আর একটা আশ্চর্য্য এই যে, নদীর এ পারে থাকিতে আপনার যেমন ভয় হইতেছে ও পারে গেলে তাহার কিছুই থাকিবে না, নদীটি একবার পার হইতে পারিলেই শত গুণে আপনার সাহস বৃদ্ধি পাইবে। আপনি বাবুটিকে প্রশস্ত পথে যাইতে দেখিয়া, এবং তাঁহার মুখে বিশ্বস্ত পথ-প্রদর্শকের কথা শুনিয়া হয়ত মনে মনে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু সেই পথ-প্রদর্শক কে, আর বাবুর পরিণামই বা কি, তাহা যখন জানিবেন, তখন সমস্ত বুঝিবেন, সন্দেহ দূর হইবে।”

বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিল, এ দিকে ব্রহ্মানন্দ ভিন্ন আর কোন যাত্রী উপস্থিত নাই। তখন আশা হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে বাঁশীটি বাজাইতে বাজাইতে যাইয়া সেতুর উপরে উঠিলেন। আশাকে অগ্রগামিনী হইতে দেখিয়া বিশ্বাসও তাঁহার অনুগামী হইলেন। তখন ধৈর্য্য সকলের কাপড় চোপড় দিয়া একটা মোট বাঁধিয়া মাথায় করিয়া লইলেন, এবং সন্ন্যাসীকে আগে আগে চালাইয়া উভয়ে যাইয়া সেতুতে উঠিলেন। সেতু অতি দৃঢ়, তথাপি ভয়ে সন্ন্যাসীর পা কাঁপিতে লাগিল। তিনি এক হাত দিয়া অবলম্বন রজ্জু ধরিলেন, কিন্তু তাহাতেও ভরসা পাইলেন না; তখন বিশ্বাস তাঁহার হস্তস্থিত যষ্টির এক প্রান্ত বাড়াইয়া দিলেন, সন্ন্যাসী তাহাই ধরিয়া সেতু পার হইতে লাগিলেন।

শিক্ষা-তত্ত্ব-সঙ্কলন।

ইউরোপে শিক্ষা-তত্ত্ব যেরূপ বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচিত হইয়াছে, এরূপ আর কুত্রাপি নহে। অতীত এবং বর্ত্তমান যত বড় বড় লেখক ছিলেন বা আছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই শিক্ষা বিষয়ে কিছু না কিছু লিখিয়াছেন। চিন্তাশীল মহাত্মাগণ গভীর

চিন্তা দ্বারা এই গুরুতর বিষয়ে যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, সাধারণের বোধগম্য ভাষায় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আর বালক বৃদ্ধ সকলে তাহার ফল ভোগ করিতেছে। ইউরোপে বাহুল্যরূপে শিক্ষা-বিস্তারের নানা কারণে বিদ্যমান থাকিতে পারে, কিন্তু শিক্ষা-তত্ত্বের এই প্রকার বৈজ্ঞানিক আলোচনা একটি সামান্য কারণ নহে। অর্দ্ধ-শিক্ষিত বা অল্প-শিক্ষিত শিক্ষক এবং অভিভাবক এই সকল পুস্তক পড়িয়া শিক্ষা-সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব জানিতে পারেন, প্রকৃত শিক্ষা যে কি পদার্থ, তাহা অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারেন; তখন তাঁহারা দেখেন, প্রকৃত পথ-প্রদর্শক কেহ ছিল না বলিয়া তাঁহাদের শিক্ষা হয় নাই। তখন তাঁহারা আক্ষেপ করেন, আর সন্তানদের যাহাতে প্রকৃত শিক্ষা হইতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্ন করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করেন।

পূর্ব্বপুরুষের এই সঙ্কল্প পর পুরুষের বিদ্যোন্নতির মূল। শিক্ষক এবং অভিভাবকের এ সব বিষয়ে বেশ পরিষ্কার জ্ঞান থাকা প্রার্থনীয়। বালক জ্ঞানার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবক তাহার পথ-প্রদর্শক। যিনি পথ-প্রদর্শক, তাঁহাকে চক্ষুষ্মান্ হইতেই হইবে, নতুবা প্রদর্শক এবং প্রদর্শিত উভয়েরই বিপদ।

আমাদের দেশে শিক্ষা-বিষয়ে ওরূপ বৈজ্ঞানিকভাবে লিখিত কোন গ্রন্থ পূর্ব্বাপর প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না,—অন্ততঃ আমরা তাহা জানি না। এই অশেষ হিতকর গ্রন্থগুলি আমাদের মাতৃভাষায় অনুবাদ করিতে পারিলে দেশের একটা অভাব দূর হয়, প্রকৃত মঙ্গল হয়। কিন্তু সে বিষয়ের আশা বড় কম। আমরা সচরাচর ইংরাজী পুস্তকের বঙ্গানুবাদের বিজ্ঞাপন পড়িয়া থাকি বটে, কিন্তু সেগুলি কেবল নবন্যাস উপন্যাস প্রভৃতি সর্ব্বনাশের নমুনা মাত্র; যাহাতে দেশের প্রকৃত হিত হইতে পারে, যে সকল পুস্তক ইংরাজ-অদৃষ্টে যুগান্তর সংঘটন করিয়াছে, বাঙ্গালায় তাহার অনুবাদ কে করিয়াছে? আর অনুবাদ করিলেই বা উপন্যাস মুগ্ধ বঙ্গ-সমাজে কে তাহা পাঠ করিবে?

আমাদের ইচ্ছা হয়, ইউরোপে—অন্ততঃ ইংলণ্ডে—প্রচলিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি মাতৃ-ভাষায় অনুবাদ করি; কিন্তু সেই অর্থ-সাধ্য, শক্তি-সাধ্য, এবং সময়-সাধ্য দুরূহ ব্যাপার আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির আয়ত্ত নহে। ক্ষুদ্র-শক্তির আয়ত্ত যাহা, আমরা পরিচয়ের পাঠকদিগের জন্য তাহাই আরম্ভ করিলাম। এই প্রবন্ধে আমরা ইউরোপীয় শিক্ষা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের গ্রন্থগুলি যতদূর সম্ভব একে একে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

হার্বার্ট স্পেন্সর্।

ইঁহার শিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থ চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত। কিরূপ জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর, এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রথম অধ্যায়ের শেষ হইয়াছে।

মানুষের পোষাকের দৃষ্টান্তটি লইলে দেখা যায়, পরিচ্ছদ-ব্যবহারের পূর্ব্বে অঙ্গসজ্জার রীতি প্রচলিত ছিল। বিবিধ অসভ্যজাতির রীতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে এ বাক্যের সত্যতার অনেক নিদর্শন পাওয়া

যায়? আর আমরা কি? অসভ্য অপেক্ষা অনেক অগ্রসর হইলেও তাহাদিগকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারি নাই। কাপড়খানি পরিয়া আরাম পাইব কি না, তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বে আমরা দেখি কাপড়খানি কেমন দেখায়। ব্যবহার অপেক্ষা সুদৃশ্য-তারই আমরা অধিক আদর করি।

মনোবৃত্তি-সম্বন্ধেও এই কথা। যেমন অতীতকালে, সেইরূপ বর্ত্তমান কালে, লোকে যে বিদ্যার অধিক প্রশংসা করে, আমরা তাহাই ভালবাসি, যাহা আমাদের কাযে লাগে, তাহার তেমন আদর করি না। বালকেরা দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া যে গ্রীক বা লাটিন ভাষা শিক্ষা করে, তাহা পরিণত বয়সে সংসারের কোন কাযেই লাগে না। তবে কষ্ট করিয়া এ বিদ্যা শিখিবার প্রয়োজন কি? উত্তর,—লোকের নিকট বাহবা লইবার জন্য। যে শিক্ষিত হইয়া গ্রীক বা লাটিন জানে না, সে ভদ্রলোকের উপযুক্ত সম্মান পাইবার অযোগ্য।

স্ত্রীজাতির ব্যবহারে ইহার আরও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আদিম অবস্থায় স্ত্রীপুরুষ উভয়েই বাহ্যশোভার পক্ষপাতি ছিল। সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ শিক্ষা এবং পরিচ্ছদ উভয় বিষয়েই সে দোষ অনেকটা পরিহার করিতে পারিয়াছে; কিন্তু স্ত্রীজাতি কোন বিষয়েই বাহ্যশোভার মমতা ততদূর ছাড়াইতে পারে নাই। একদিকে কেশ-বিন্যাস, অলঙ্কারধারণ, বস্ত্রপরিধান এবং বর্ণোৎকর্ষসাধনে যেমন যত্ন, অন্যদিকে, সঙ্গীত, বাদ্য, এবং নৃত্য শিক্ষায়ও সেইরূপ। ভাষা, ইতিহাস প্রভৃতি যাহা শিক্ষা হয়, তাহারও মূল প্রশংসা-লাভের বাসনা।

ব্যবহার অপেক্ষা অলঙ্কারের আদর অধিক হইবার কারণ কি? আবহমান কাল দেখা যাইতেছে, সামাজিক অভাবের নিকট ব্যক্তিগত অভাব উপেক্ষিত হইয়া থাকে;—প্রত্যেক ব্যক্তিকে শাসনে রাখাই যেন সমাজের প্রধান প্রয়োজন। কেবল রাজশাসনই শাসন নহে, নানা প্রকার সামাজিক শাসন রহিয়াছে, নরনারী সর্ব্বদা দুর্ব্বলকে দমন করিতে এবং সবলকে পরিতুষ্ট করিতে যত্ন করিয়া জীবনের প্রধান শক্তিই নষ্ট করেন। যেমন অসভ্যেরা শত্রুকে ভীত করিবার জন্য শরীর চিত্রিত করে, রূপাজীবা অন্যকে মুগ্ধ করিবার জন্য শরীরের সাজ সজ্জা করে, সেইরূপ পণ্ডিতেরাও অন্যের চমৎকার জন্মাইবার জন্য আপন আপন বিদ্যার ব্যবহার করিয়া থাকেন। সর্ব্বতোভাবে আত্ম-শক্তি-বিকাশে আমাদের আগ্রহ নাই; কেমনে অন্যকে চমৎকৃত করিতে পারিব, সেই চিন্তাই আমাদের প্রবল। আমাদের শিক্ষার প্রকৃতিও এইরূপ। কোন্ বিদ্যায় অধিক উপকার, আমরা তাহা দেখি না; কিসে ধন, মান, যশঃ ও প্রশংসা পাইব, তাহারই জন্য আমরা ব্যাকুল।

শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে আজিও যে আমাদের সিদ্ধান্ত স্থির হয় নাই, তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে, কি প্রকার বিদ্যার আপেক্ষিক উপকারিতা কিরূপ, তাহার একটা রীতিমত বিচার আজিও হয়

নাই। এই আপেক্ষিক উপকারিতা নির্ণয় করিবার উপায় কি, তাহা জানা ত দূরের কথা; এরূপ কোন উপায় আদৌ থাকিতে পারে কি না, এবং ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝিবার কোন আবশ্যক আছে কি না, এ চিন্তাটি কাহারও মনে স্থান পায় কি না সন্দেহ। কেহ বই পড়েন, কেহ বক্তৃতা শুনেন; কেহ বালককে নিজের রুচি অনুসারে এক বিষয় শিখিতে দেন, কেহ অন্য বিষয় শিখিতে দেন; কিন্তু কোন্‌টা শিক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা বিচার-সঙ্গতরূপে একবার ভাবিয়াও দেখেন না। কখন কখন শুনিতে পাই এটা ভাল, ওটা ভাল; কিন্তু এটা ওটা শিখিতে যে সময়, পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়, এটা ওটা তাহার উপযুক্ত কি না, অথবা ইহাতে এটা ওটা অপেক্ষা অধিক উপকারী কিছু শিক্ষা করা যাইতে পারে কি না, এ প্রশ্ন হয়ত অনেকের মনে উঠেই না।

কোন বিদ্যার উপকারিতা আছে কি না, তাহা মীমাংসার বিষয় নহে; কোন্ বিদ্যার আপেক্ষিক উপকারিতা কত, তাহাই নির্দ্ধারণের বিষয়। এমন বিষয় নাই, যাহা শিখিয়া রাখিলে কখন কোন না কোন উপকার না পাওয়া যাইতে পারে। দেশের গ্রাম ও নগরগুলি পরস্পরের নিকট হইতে কত দূরবর্ত্তী, তাহা বাল্যকাল হইতে মুখস্থ করিয়া রাখিলে বোধ হয় জীবনে দুই এক সময়ে কাযেও লাগিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া এমন অসার শিক্ষায় কেহ আপন সন্তানকে নিযুক্ত করে না। ফল কথা, সম্ভাবিত ফল ব্যয়িত পরিশ্রমের উপযুক্ত কি না, সর্ব্ব-বিধ শিক্ষাতেই তাহা দ্রষ্টব্য। আমাদের জীবন অতি অল্পস্থায়ী, শিক্ষার সময়টা সুতরাং আরও সঙ্কীর্ণ, তাহারও আবার কাযে কর্ম্মে কত বাদ যায়। অতএব এই অল্প সময়ে যাহাতে অধিক লাভ দাঁড়ায়, এমন বিষয়ই শিক্ষা করা উচিত, খেয়াল-খেয়ালীর বশবর্ত্তী হইয়া যাহা তাহা শিখিয়া এই অমূল্য সময়টা নষ্ট করা উচিত নহে।

অতএব, শিক্ষিতব্য বিষয়-সমূহের মধ্যে কোন্‌টির আপেক্ষিক উপকারিতা কত? শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবে এই প্রশ্নই সর্ব্বপ্রধান, এবং ইহার মীমাংসাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

এই আপেক্ষিক উপকারিতা নির্ণয় করিবার জন্য একটি পরিমাপক চাই; মানবজাতির সুখই সেই পরিমাপক। যিনি যাহাই শিখেন বা শিখান, মানব-জীবনের সুখ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হইয়া তিনি তাহা করিতে পারেন না।

অতএব কিরূপে সম্পূর্ণরূপে বাঁচিয়া থাকা যায়, অর্থাৎ আমাদের শারীরিক এবং মানসিক শক্তি-নিচয়কে কিরূপে স্বার্থে এবং পরার্থে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর উপায়ে নিয়োগ করা যাইতে পারে, তাহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়, এবং তাহাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য *। অতএব সম্পূর্ণরূপে বাঁচিয়া থাকার উপায় কি কি, তাহাই সর্ব্বাগ্রে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, তাহা হইলেই

* পাঠকের প্রতি অনুরোধ, "শিক্ষার উদ্দেশ্য" শীর্ষক প্রবন্ধটি এই সঙ্গে একবার দেখিয়া লইবেন।—শিঃ পঃ সং।

সন্তানের প্রকৃত শিক্ষার পথ পরিষ্কার হইয়া যাইবে। কাযটা কঠিন বটে, কিন্তু ইহার উপকারিতা দেখিতে গেলে যতই কঠিন হউক না কেন, ইহা করা উচিত।

স্পেন্সার সাহেবের মতে মনুষ্য-জীবন কতকগুলি কার্য্যকরী শক্তির সমষ্টি। সেই শক্তিগুলি তিনি পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। (১) আত্ম-রক্ষিণী-শক্তি-নিচয়, (২) অভাবাপসারিণী বা প্রয়োজন-সাধিনী-শক্তি-নিচয়, (৩) বংশ-প্রসারিণী-শক্তি-নিচয়, (৪) সমাজ-রক্ষিণী-শক্তি-নিচয়, এবং (৫) রুচি-তোষিণী-শক্তি-নিচয়।

এই শ্রেণী-বিন্যাসে যেরূপ ক্রমে অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্বেও সেইরূপ ক্রম বুঝিতে হইবে। প্রতিপদে—প্রতি মুহূর্ত্তে অসংখ্য বিপদ উপস্থিত, সর্ব্বদা শরীরটি বাঁচাইয়া চলিতে হইতেছে। অগাধ-বিদ্যাশালী পণ্ডিত যদি শরীর-রক্ষা-সম্বন্ধে সদ্যোজাত বালকের ন্যায় অনভিজ্ঞ হন, তবে ঘরের বাহির হইলেই তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত। পরিশ্রম-দ্বারা অভাব দূর করিয়া জীবন ধারণ করিবার শক্তি দ্বিতীয় স্থানীয়। তাহার পরে পিতৃ-মাতৃ-কর্তব্য—সন্তান-জনন এবং সন্তান-পালন। সমাজ-রক্ষিণী শক্তি চতুর্থ-স্থানীয়,—পরিবার-রক্ষা হইলে তবে ত সমাজের কথা? প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন হইবে, সমাজও সেইরূপ হইবে, যদি সমাজকে ভাল করিতে চাও, তবে আগে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভাল কর। সর্ব্বশেষে রুচি-তোষিণী-শক্তি। আগে আত্মরক্ষা কর, পরিবার পালন কর, সমাজ সংরক্ষণ কর; তাহার পরে রুচি হয় এবং অবসর পাও, তবে গান, বাদ্য, চিত্র এবং কাব্যের আলোচনায় মনোনিবেশ করিও। মানব-শক্তির এই শ্রেণী-বিভাগে আধ্যাত্মিক শক্তি-নিচয়ের কোন উল্লেখ না দেখিয়া আস্তিক পাঠক দুঃখিত হইতে পারেন; এ জন্য তাঁহাকে বলিয়া দিতেছি, স্পেন্সার একজন পাশ্চাত্য অজ্ঞেয়বাদী দার্শনিক, এই কথাটি স্মরণ রাখিবেন।

যাহাতে এই বিবিধ শ্রেণীর শক্তি-নিচয় সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়, সেই শিক্ষাই আদর্শ-শিক্ষা; কিন্তু সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা অসম্ভব, সুতরাং জীবন-ধারণ-সম্বন্ধে উপকারিতার তারতম্য বিবেচনা করিয়া এই সকল শক্তির কর্ষণ আবশ্যক, অথচ কোনটি একেবারে উপেক্ষিত না হয়।

উপকার-ভেদে জ্ঞানকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে যে জ্ঞান উপলব্ধ হয়, তাহা আজিও যেমন, দশ হাজার বৎসর পরেও সেইরূপ, জলের মধ্যে পদার্থের গতি আজি যেরূপ বাধা পাইতেছে, দশ হাজার বৎসর পরেও সেইরূপ বাধা পাইবে। অতএব এই জ্ঞানের উপকারিতা নিরপেক্ষ। যে প্রাচীন ভাষা হইতে আমাদের বর্ত্তমান ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই প্রাচীন ভাষার জ্ঞান তত দিন মাত্র আমাদের উপকারে লাগিবে, যতদিন প্রচলিত ভাষার ব্যবহার থাকিবে। অতএব এরূপ জ্ঞানের উপকারিতাকে সাপেক্ষ বলা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন আর এক শ্রেণীর জ্ঞান আছে, যাহার উপকারিত্ব কেবল লোকের মতামতের উপর নির্ভর করে, এরূপ জ্ঞানের উপকারিতাকে

মতাপেক্ষ বলিলে ক্ষতি নাই। কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে কোন্ রাজা কি রোগে মরিয়াছিলেন, তাহা জানিয়া না রাখিলে ক্ষতি কি? ক্ষতি এই যে তাহা হইলে লোকের নিকটে মর্য্যাদা পাওয়া যায় না! ফলতঃ যে জ্ঞানের উপকারিতা নিরপেক্ষ তাহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর করা উচিত।

আবার প্রত্যেক বিষয়েই শিক্ষার দুইটি উপকারিতা পরিলক্ষিত হয়,—প্রথম জ্ঞান-লাভ, দ্বিতীয় মনোবৃত্তির পরিচালন। প্রকৃত জীবন-ধারণে এ উভয়েরই প্রয়োজন।

সুখের বিষয়, আত্ম-রক্ষার চেষ্টা কাহাকেও শিখাইতে হয় না, প্রকৃতি তাহা আপনা হইতেই শিখাইয়া দেয়। শিশুর ভয় ক্রন্দন প্রভৃতি যাহা দেখিতে পাই, তাহা এই আত্ম-রক্ষার চেষ্টা। ক্রমাগত এইরূপ নানা চেষ্টা দ্বারা শিশু ভাবী জীবনের গুরুতর বিপদ-সমূহের আক্রমণ হইতে বাঁচিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। আমাদিগকে এ জন্য কোন যত্ন করিতে হয় না; কেবল এইমাত্র দেখিতে হইবে, বালকের বিপদ আপদের অভিজ্ঞতা-লাভের পথে যেন বাধা না পড়ে। যাহারা বালককে শ্রম-সাধ্য খেলা বা লম্ফঝম্পে প্রবৃত্ত হইতে দেখিলেই বাধা দেয়; তাহারা বড় নির্ব্বোধ।

কিন্তু কেবল আকস্মিক আঘাত হইতে আত্ম-রক্ষা করিলেই প্রচুর হইল না। মন্দ অভ্যাস এবং শারীরিক-নিয়ম-লঙ্ঘন-জনিত রোগাদিতেও মৃত্যু হইয়া থাকে, কেবল শীঘ্র আর বিলম্ব এইমাত্র প্রভেদ। অতএব আত্ম-রক্ষার জন্য এ সকল বিষয়ের জ্ঞানও নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

কিন্তু এসকল বিষয়েও প্রকৃতি আমাদিগকে অনেক সাহায্য করিয়া থাকে। ক্ষুৎপিপাসা উপস্থিত হইলেই আমাদের বুঝা উচিত, শরীরে কোন বিশেষ অভাব উপস্থিত হইয়াছে। যদি আমরা প্রকৃতির সঙ্কেত বুঝিয়া চলিতে পারি,—যদি বিনা ক্ষুধায় আহার এবং বিনা পিপাসায় পান না করি, তাহা হইলে শারীর-যন্ত্র অকর্ম্মণ্য হইবার অতি অল্পই সম্ভাবনা থাকে।

অকালে বার্দ্ধক্য এবং বার্দ্ধক্যে অসুস্থতা শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল। বৃদ্ধকালেও সুস্থ এবং সবল আছে, এমন লোক আমরা কখন কখন দেখিতে পাই বটে, কিন্তু রোগে জীর্ণ শীর্ণ মনুষ্য আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই দেখিয়া থাকি। জিজ্ঞাসা কর, দেখিবে সেই রোগের মূলে কোন না কোন শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘন রহিয়াছে। কেহ বাত-জ্বরে শরীরের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অনাবৃত দেহে ছিল, তাই হৃদ্রোগে ভুগিতেছে। কেহ অতিরিক্ত অধ্যয়ন করিতেছিল, তাই জন্মের মত চক্ষু খাইয়াছে, ইত্যাদি। ইহার ফল কেবল যন্ত্রণা, অবসাদ, বিমর্ষতা, অর্থনাশ এবং সময়-ক্ষয় নহে;—অসুস্থ ব্যক্তির কর্ত্তব্যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়; অনেক কার্য সে করিতে পারে না; যাহা পারে, তাহাও অতি কষ্টের সহিত। রোগে মানুষকে কোপন-স্বভাব করিয়া তুলে, তাহাতে সন্তান-পালনের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হয়, সামাজিকতা

হয় থাকেই না, আমোদ প্রমোদেও অপ্রীতি হইয়া উঠে। নিজের এবং পিতৃ-লোকের শারীরিক-নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল-স্বরূপ ব্যাধি প্রাকৃতরূপে জীবন ধারণে বাধা জন্মায়। যে জীবনে হিত এবং সুখ সাধিত হইবার কথা, রোগে তাহাকে দুঃখের বোঝা করিয়া তুলে। —অস্বাস্থ্যে আয়ুরও অল্পতা ঘটে। যদি একবার একটি রোগ বা অসুখ জন্মে, তবে আবার আমরা ঠিক পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া পাই না—একটুকু ক্ষতি থাকিয়াই যায়। প্রকৃতির খাতায় এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষতি একটি একটি করিয়া জমা হইতে থাকে; পরে দেখা যায় অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষতি একত্র হইয়া বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছে,—জীবনের দীর্ঘতা অনেক কমিয়া গিয়াছে। মানুষ যত দিন বাঁচিতে পারে, আর সচরাচর যত দিন বাঁচিয়া থাকে, তাহার প্রভেদ বিস্তর; তাহার উপরে রোগজনিত ক্ষতি। এই সকল হিসাব করিলে দেখা যাইবে, জীবনের অর্দ্ধাংশই অপব্যয়িত হইয়া থাকে।

অতএব যে জ্ঞান স্বাস্থ্য-নাশে বাধা দিয়া জীবন-রক্ষার সহায়তা করে, তাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এ কথা বলি না যে স্বাস্থ্য-জ্ঞান থাকিলেই এ অনিষ্ট একেবারে দূর হইবে। সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থায় মানুষ অনেক সময়ে বাধ্য হইয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ করে, আবার কখন বর্ত্তমান সুখের জন্য ভাবী মঙ্গলে অবহেলা করে। কিন্তু ইহা বলা যায় যে প্রকৃত জ্ঞান প্রকৃত উপায়ে শিক্ষা দিলে অনেক উপকারের সম্ভাবনা। বিশেষতঃ স্বাস্থ্য-জ্ঞান না জন্মিলে যখন স্বাস্থ্য-রক্ষা অসম্ভব, তখন স্বাস্থ্য-জ্ঞান লাভ করাই সর্ব্বাগ্রে উচিত। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্বাস্থ্য এবং তদানুষঙ্গিক মানসিক স্ফূর্ত্তিই যখন সুখের প্রধান উপকরণ, তখন স্বাস্থ্য-বিষয়ক জ্ঞান আর কিছু অপেক্ষা অল্প উপকারী নহে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান জন্মিতে পারে, এই পরিমাণে শারীর-বিদ্যা শিক্ষার একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় যে এ কথাটা আবার বলিবার অপেক্ষা করে! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইহার আবার সমর্থনের প্রয়োজন হয়! কিন্তু অনেকের নিকট ইহা উপহাসের কথা। যাঁহারা কোন প্রাচীন ভাষায় একটি শব্দ অশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে লজ্জিত হন, তাঁহারা শরীর-সম্বন্ধে কোন তত্ত্ব রাখেন না, একথা বলিতে কিছুমাত্র লজ্জিত হন না।

স্বচ্ছন্দে জীবিকা-লাভের উপায় যে জীবন-রক্ষার সহায়তা করে, এসম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই; বাস্তবিক সাধারণ লোকে জীবিকাকেই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করে। কিন্তু জীবিকার প্রয়োজন সর্ব্ববাদি-সম্মত হইলেও তদ্বিষয়ে কিরূপ শিক্ষা হওয়া উচিত, এ কথা অতি অল্প লোকেই চিন্তা করিয়া থাকেন।

অতি অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া সকলেই কোন না কোন জিনিস উৎপন্ন করিতেছে, প্রস্তুত করিতেছে, বা বিলি-ব্যবস্থা করিতেছে। কিন্তু এসকল বিষয়ে দক্ষতা কিসের উপরে নির্ভর করে? অবশ্য এই দক্ষতা ঐ সকল জিনিসের প্রকৃতি-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার উপরে, অর্থাৎ বিজ্ঞানের উপরে নির্ভর

করে। অতএব এই বিজ্ঞানই সভ্যতার মূল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিজ্ঞানে এখনও লোকের অবজ্ঞা রহিয়াছে। সকল কার্য্যেই বিজ্ঞানের কিরূপ প্রয়োজন, একটুকু চিন্তা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

যাহারা বাণিজ্য করে, ভাবী লাভ লোকসান নির্দ্ধারণ করিবার পক্ষে তাহাদের ন্যায়-শাস্ত্রে জ্ঞান থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। ক্রয় বিক্রয়, জমা খরচ প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় বিষয়ে অঙ্ক-শাস্ত্র বা পাটীগণিত কাযে লাগিতেছে। পাড়াগাঁয়ের সূত্রধর হইতে আরম্ভ করিয়া জাহাজ, লৌহবর্ত্ম, দুর্গ প্রভৃতি নির্ম্মাণকারী ইঞ্জিনিয়ার পর্য্যন্ত সকলেই (জ্ঞাতসারে হউক আর অজ্ঞাতসারে হউক) জ্যামিতি-শাস্ত্রের আশ্রয় লইয়া থাকেন। যন্ত্র-বিদ্যার উপরে আধুনিক শিল্পোন্নতি নির্ভর করিতেছে। আহার পরিধেয়, লেখা পড়া, গমনাগমন, আমদানি রপ্তানি প্রভৃতি সমস্তই এখন যন্ত্রের সাহায্যে চলিতেছে এবং যন্ত্রদ্বারা উন্নতি লাভ করিতেছে। এক দেশ অন্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য্য হইলে যখন সেই দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির সুনিপুণ কার্য্যকুশল হওয়া দরকার, তখন দেখা যাইতেছে যে, যন্ত্র-বিজ্ঞানই শেষটা জাতীয় ভাগ্য নির্ণয় করিবে। পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা এবং ভূবিদ্যা প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের কত কাযে লাগিতেছে এবং কত উপকার করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কৃষি, পশু-পালন, জীবন-ধারণ প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় কার্য্য জীবন-বিজ্ঞানের উপরে নির্ভর করিতেছে। তৎপরে সমাজ-বিজ্ঞান। টাকার বাজার এবং দ্রব্যের বাজার জানিবার জন্য যাহারা উৎসুক, জিনিসের উৎপত্তি, কাটতি এবং দর সম্বন্ধে নির্ভুল অভিজ্ঞতা যাহাদের ভাগ্যোন্নতির একমাত্র উপায়, সমাজ-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে তাহাদের উদাসীন থাকিলে চলে না।

অতএব দেখা যাইতেছে, সমাজে কোন জিনিসের উৎপাদন, বিনিময় বা সম্প্রসারণ —যিনি যাহাই করুন, কৃতকার্য্য হইতে হইলে তাঁহাকে বিজ্ঞান-সম্মত পথে চলিতে হইবে। হয়ত তিনি যে বিজ্ঞান-মতে চলিতেছেন, এ বিষয়ে তাঁহার বোধ না থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার কৃতকার্য্যতা বিজ্ঞানের উপরেই নির্ভর করে। কোন ব্যবসায়-শিক্ষা বলিতে, সেই ব্যবসায়-সম্বন্ধে বিজ্ঞান-সম্মত কথাগুলি জানিয়া লওয়া, ইহাই আমরা বুঝি। কিন্তু মোটামুটি কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা জানিয়া রাখা, আর সেই বিজ্ঞানে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করা, এ উভয়ের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক; এজন্য বিজ্ঞানে অধিকার থাকাই বিশেষ বাঞ্ছনীয়। নিজ নিজ ব্যবসায় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে যে বিজ্ঞান-বোধ থাকার প্রয়োজন নাই, এমন নহে। দেশে একটা সমেতাংশ কারবার খুলিল দেখিয়া তুমি যত্নোপার্জ্জিত টাকা দিয়া অনেকগুলি অংশ কিনিলে; কিন্তু আরম্ভেতেই কারবারটি ভাঙ্গিয়া গেল, লাভের পরিবর্ত্তে লোকসান দাঁড়াইল, হয়ত তুমি সর্ব্বস্বান্ত হইলে। যদি তোমার বিজ্ঞানে অধিকার থাকিত, তাহা হইলে এ কারবার যে লোকসান দিয়া অচিরেই ভাঙ্গিয়া যাইবে, একথা আগেই বলিয়া দিতে

পারিতেছে। দিনে দিনে জিনিসের উৎপাদন-প্রণালী বিজ্ঞান-সম্মত হইয়া উঠিতেছে, আবার দিনে দিনে সমেতাংশ কারবারের সংখ্যাও বাড়িতেছে, সুতরাং প্রত্যেকের পক্ষেই বিজ্ঞানে অধিকারের প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।

স্পেন্সর বলেন, ইংলণ্ডের বিদ্যালয়-সমূহে নিত্য-প্রয়োজনীয় বিষয়ের কিছুই শিক্ষা হয় না; যে শিক্ষার গুণে ইংলণ্ড এত উন্নত হইয়াছে, ইংলণ্ডের লোকেরা বিদ্যালয়ের বাহিরে সে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রাজার ভাগ্যে যে সুখ ঘটিত না, প্রাকৃতিক নিয়মের অভিজ্ঞতা লাভ হওয়াতে আজ সে সুখ সামান্য কৃষকেও ভোগ করিতেছে। বিদ্যালয়ে যাহা শিক্ষা হয়, তাহার উপরে আর কিছু কেহ যদি শিক্ষা না করিত, তাহা হইলে ইংলণ্ডের অবস্থা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেমন ছিল, আজিও সেইরূপ থাকিত। ইংলণ্ডের শিক্ষা-সম্বন্ধে যদি ইহা সত্য হয়, তবে ভারতবর্ষের শিক্ষা-সম্বন্ধে এ সকল কথা আরও কত অধিক পরিমাণে খাটিতে পারে, তাহা সুবোধ পাঠক বিচার করিবেন। প্রভেদ এই, ইংলণ্ডবাসী বিদ্যালয়ের বাহিরে যাইয়া অধীত অপদার্থ বিদ্যার সঙ্গে পদার্থ সংযোগ করেন, আর আমরা বিদ্যালয়ে অপদার্থ যাহা সংগ্রহ করি, বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া তাহাও ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকি।

আর পরে বংশ-প্রসারিণী শক্তি-নিচয়ের কথা। বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যালয়ে অধীত পুস্তক এবং পরীক্ষার প্রশ্নাবলী যদি ভূগা-কারে পড়িয়া থাকে, আর ভাবীকালের কোন পুরাতত্ত্ববিৎ যদি সেইগুলি পরীক্ষা করিতে বসেন, তাহা হইলে হয়ত তিনি বলিবেন;—"এই সকল পুস্তক অবশ্যই তাহাদের কৌমার্য্য-ব্রতাবলম্বিগণ পড়িত। আমি দেখিতেছি তাহারা অনেক বিষয় শিক্ষা করিত, এবং এজন্য প্রাচীন ও বিদেশীয় ভাষা অধ্যয়ন করিত; ইহাতে বোধ হয় তাহাদের নিজের ভাষায় পড়িবার উপযুক্ত কিছু ছিল না। কিন্তু শিশু-পালন-সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ দেখিতেছি না। এত গুরুতর বিষয়টা উপেক্ষা করিবে, তাহারা এমন নির্ব্বোধ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। অতএব নিশ্চয়ই এগুলি তাহাদের কোন মঠবাসী কুমারদিগের পাঠ্য-পুস্তক।" এই ব্যঙ্গের মধ্যে কেমন গুরুতর সত্য নিহিত!

সকলেই জানেন, সন্তানের জীবন-মৃত্যু পিতামাতার আচরণের উপরই নির্ভর করে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যাহারা দুই দিন পরে পিতামাতা হইবে, তাহারা সন্তান-পালন-সম্বন্ধে কিছুই শিক্ষা পায় না। অশিক্ষিতাধাত্রী এবং কুসংস্কারাপন্না বৃদ্ধা দিদিমা ই কি একটি ভাবী বংশের উপযুক্ত পালয়িত্রী এবং শিক্ষয়িত্রী? যদি কেহ আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিতে না শিখিয়া বাণিজ্য করিতে যায়, অথবা শারীর-তত্ত্ব না জানিয়া রোগীকে অস্ত্র করিতে যায়, তবে তাহাকে আমরা পাগল বলি; কিন্তু যাহারা সন্তান-পালন না শিখিয়া সন্তান উৎপাদন করিতে যায়, তাহাদের কথাটা আমরা একবার ভাবিও না।

হয়ত দশ হাজার বালক মরিয়া গেল, এক লক্ষ রুগ্নদেহে বাঁচিয়া রহিল, আবার দশলক্ষ যেমন হওয়া উচিত তেমন সুস্থ ও সবল হইতে পারিল না; এখন ভাবিয়া দেখ, শারীরিক নিয়মে অনভিজ্ঞ পিতামাতা সন্তানের কি সর্ব্বনাশ করিতেছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বালকের আহার পরিচ্ছদে তাহার ভাবী জীবনের সুখ দুঃখের সূত্রপাত হইতেছে; এ সকল সম্বন্ধে একটি নিয়ম যদি ভাল থাকে, তবে কুড়িটি মন্দ নিয়ম রহিয়াছে, সুতরাং ক্ষতির ভাগ অত্যন্ত অধিক। ঘোর শীতের মধ্যে বালককে অপর্য্যাপ্ত বস্ত্রে আবৃত করিয়া খেলায় ছাড়িয়া দিলে তাহার নানা প্রকার অনিষ্ট হইতে পারে, নানা প্রকারে তাহার জীবনের সুখ ও সৌভাগ্য বিনষ্ট হইতে পারে। তাহাদিগকে অপুষ্টিকর বা অপরিবর্ত্তিত খাদ্য দিতে থাক, তাহারা শারীরিক শক্তি হইতে বঞ্চিত হইবে। তাহাদিগকে দৌড় ধাপ করিয়া খেলিতে দিও না, তাহারা উপযুক্ত স্বাস্থ্য এবং বল পাইবে না। সন্তান রুগ্ন এবং দুর্ব্বল হইলে কারণ-নির্দ্দেশে অসমর্থ পিতামাতা মনে করেন ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সময়ে সময়ে রোগ ও দুর্ব্বলতা বংশানুক্রমিক হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই সকল দুঃখ যন্ত্রণা কুনিয়মের ফল। অভিভাবকেরা সন্তানের শাসন-ভার হাতে লইয়াছেন বটে, কিন্তু অজ্ঞতা বশতঃ কিসে কি হয় তাহা বিচার করিতে পারেন না, সুতরাং সন্তানের শরীরে তাহার নিজের ও ভাবী বংশের রোগ এবং অকাল-মৃত্যুর বীজ বপন করেন।

নীতি-শিক্ষা-সম্বন্ধেও এইরূপ দুর্দ্দশা। বালকের মা কিছুদিন পূর্ব্বে বিদ্যালয়ে ছিলেন (এখানে ইংলণ্ডের কথা হইতেছে,—সর্ব্বত্রই ইংলণ্ডের কথা বুঝিতে হইবে; কিন্তু প্রায় কথাই আমাদের সঙ্গে মিলিয়া যায়)। মা বিদ্যালয়ে ছিলেন, সেখানে নাম, তারিখ আর শব্দার্থ মুখস্থ করিয়াই সময়টা কাটাইয়াছেন; নিজের বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচালনা করেন নাই, বালকের মনোবৃত্তি কিরূপে বিকশিত হয় তাহাও জানেন নাই। তাহার পরে কিছুদিন গান-বাদ্য শিখিয়া, উপন্যাস পড়িয়া, এবং নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া কাটাইয়াছেন, মাতৃ-কর্ত্তব্য-পালনের উপযুক্ত কিছুই শিক্ষা হয় নাই। কিন্তু এখন দেখ, অতি বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও যে সন্তান-পালন ভাল করিয়া জানেন না, তিনি সেই সন্তানের পালয়িত্রী। বালকের মনোবৃত্তির প্রকৃতি, তাহার বিকাশ ও কার্য্য, অথবা ভাল মন্দ কিছুই তিনি জানেন না। এ অবস্থার ফল দুর্দ্দশা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? মনোবৃত্তির প্রকৃতি এবং তাহার কার্য্য-কারণ-জ্ঞান না থাকাতে সন্তানের যত অনিষ্ট হয়, শাসন একেবারে পরিত্যাগ করিলে বোধ হয় তত অনিষ্ট হয় না। যে কার্য্যে বালকের প্রবৃত্তি এবং উপকার, মাতা অজ্ঞতাবশতঃ তাহাতে বাধা দিয়া বালকের অনিষ্ট ও নিজের কোপনতা বৃদ্ধি করেন, সন্তানের বিরক্তি-ভাজন হন। যাহা তিনি ভাল মনে করেন, তাহা বালককে ভয় দেখাইয়া, পুরস্কার দিয়া, অথবা প্রশংসার লোভ জন্মাইয়া করাইয়া লন; কিন্তু বালক যে কি ভাবিয়া কায করে তাহা ত

বুঝিতে পারেন না, কাযেই প্রস্তাবের পরিণতে তাহার মনে ভয়, বঞ্চনা এবং স্বার্থপরতার পোষণ করেন। সত্য কথা না বলিলে মারিবার ভয় দেখান, অথচ মারেন না, এইরূপে সন্তানকে মিথ্যা বলা শিক্ষা দেন। আত্ম-সংযমের উপদেশ দেন বটে, কিন্তু দণ্ডে দণ্ডে নিষ্কারণে শিশুদিগের প্রতি ক্রোধোক্তি করিয়া তাহার বিপরীত শিক্ষা দান করেন। খেলা-ভূমিতে বা সংসারে, সকল অবস্থাতেই সুখ বা দুঃখ কৃতকর্ম্মেরই ফল, এই কথাটা বুঝাইয়া দেওয়া যে শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ, এ বিষয়ে তাঁহার বোধই নাই। নাই শিশু-পালন-সম্বন্ধে অধীত-বিদ্যা, নাই তাহার মনোবৃত্তির গতি-নির্দ্ধারণে সামর্থ্য, এ অবস্থায় শাসন কেবল ক্রোধ-সম্ভূত, অসঙ্গত, অনিষ্টকর মাত্র। জাতি-গত-নীতির আদর্শ আছে মানব-প্রকৃতির বল অসাধারণ, তাই রক্ষা, নতুবা এরূপ শাসনে সর্ব্বনাশ হইত।

নৈতিক-বৃত্তি-সম্বন্ধে যেমন, বুদ্ধি-বৃত্তির উপরেও সেইরূপ অত্যাচার হয়। যদি বল বুদ্ধি-বৃত্তি কোন বিশেষ নিয়মের অধীন, যদি বল বালকের বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ বিনা-নিয়মে সম্পাদিত হয় না, তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, এই সকল নিয়মের পরিজ্ঞান ব্যতীত শিক্ষা অসম্ভব। যে মনোবৃত্তির প্রসর পরিজ্ঞাত নহে, সে সেই প্রসরকে নিয়মিত করিবে, ইহা সম্ভাবনার অতীত। অতএব মনোবিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ পিতা মাতা এবং শিক্ষকেরা যে শিক্ষা দিতেছেন, ভাবিয়া দেখ প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে তাহার কত প্রভেদ। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর বিষয় এবং পন্থা উভয়ই দোষাবহ। অনুচিত বিষয় অনুচিত উপায়ে এবং অনুচিত পর্য্যায়ে জোর করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। যে সঙ্কীর্ণ মতানুসারে পুস্তক-লব্ধ বিদ্যাই শিক্ষা, তদ্দ্বারা চালিত পিতামাতা অতি শৈশবে বালকের হাতে প্রথম পাঠ দিয়া তাহার অনিষ্ট করেন। যেখানে প্রত্যক্ষে জ্ঞান-লাভের সম্ভাবনা নাই, সেইখানেই পুস্তকের প্রয়োজন; পুস্তকের জ্ঞান—যেন পরের চক্ষে দেখা শিক্ষকেরা কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ বিষয় শিখাইতেই ব্যগ্র। বাল্যকালের স্বভাব-দত্ত শিক্ষার যে কি মর্ম্ম তাহা বুঝিতে না পারিয়া, বালকের অবিশ্রান্ত অনুসন্ধিৎসা ও পর্য্যবেক্ষার কি কি উপকার, তাহা না বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা দুর্ব্বোধ অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে বালকের চিন্তা এবং চক্ষুকে ব্যাপৃত করিয়া রাখেন। বাড়ী, ঘর, রাস্তা, ঘাটে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার জ্ঞান-লাভ শেষ হইলে তবে বালকের চক্ষের সম্মুখে নূতন জ্ঞানের পথ খুলিতে হইবে; তাহার এই সকল জ্ঞান যে পরিমাণে পরিষ্কার হইবে, সেই পরিমাণে পুস্তক-গত জ্ঞান উপলব্ধি করিতে সে সক্ষম হইবে। পুস্তক-গত-জ্ঞান-শিক্ষা এক দিকে অতি শৈশবে আরম্ভ হয়, অপর দিকে মনোবৃত্তি-বিকাশ-নিয়মের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া শিক্ষা-কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে থাকে। সহজ আয়ত্ত করিয়া কঠিনের দিকে অগ্রসর হওয়াই মনোবৃত্তির পক্ষে স্বাভাবিক; কিন্তু এ কথার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া ব্যাকরণ

প্রকৃতি যে সকল কঠিন বিষয়ের শিক্ষা পরে আরম্ভ হওয়া উচিত, তাহার শিক্ষা আগেই আরম্ভ হয়। ভূগোল শাস্ত্রটা—সমাজ-বিজ্ঞানের একটি পরিশিষ্ট বিশেষ, বালকেরা ইহাতে কিছুমাত্র আমোদ বা উপকার পায় না, অথচ ইহাই আগে শিক্ষা দেওয়া হয়; আবার যে প্রাকৃতিক ভূগোলে বালকের বুদ্ধি প্রবেশ করে ও আমোদ পায়, তাহা শেষের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। সকল বিষয়েই এইরূপ। আগে দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন বিষয় বুঝাইয়া তাহার পরে সূত্র মুখস্থ করিলেই সুবিধা এবং উপকার হয়, কিন্তু ব্যবহার ইহার ঠিক বিপরীত। তাহার পরে মুখস্থ করিবার ঘোর অনিষ্টকরী রীতি। মনকে বলপূর্ব্বক পুস্তকে নিবদ্ধ রাখাতে বুঝিবার শক্তি নিস্তেজ হয়; বুদ্ধির অগম্য বিষয় শিক্ষা দেওয়াতে মনের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়; নিয়ত পরের উপলব্ধ বিষয় মুখস্থ করাতে বুদ্ধি-বৃত্তির চালনা রহিত হয়; এবং অকর্ত্তব্য পরিমাণে, মনোবৃত্তিকে নিগ্রহ করা হয়; এ জন্য অতি অল্প-সংখ্যক লোকের মানসিক শক্তি প্রকৃতরূপে কার্য্যক্ষম হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই পুস্তকের সঙ্গে সংস্রব মিটিয়া যায়, যে সকল বিষয় মুখস্থ হইয়াছিল, উপযুক্ত শৃঙ্খলা এবং পরিপাকের অভাবে তাহা স্মৃতি হইতে সরিয়া পড়ে, যাহা কিছু থাকিয়া যায়, তাহাকেও কাযে লাগাইবার অভ্যাস না থাকাতে তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, স্বাধীন চিন্তা অথবা তথ্যান্বেষণের ক্ষমতামাত্রও থাকে না। যাহা গৌণ-কল্প, তাহারই শিক্ষা হয়, মুখ্য-কল্প বিষয় গুলি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়া থাকে।

এইরূপে বালকদিগের শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক শিক্ষায় ভয়ানক ত্রুটি লক্ষিত হইতেছে। পিতামাতার অজ্ঞতাই ইহার একমাত্র কারণ। সামান্য কাযেও শিক্ষানবিশী না করিলে চলে না, তবে কি মানুষের শরীর এবং মনের বিকাশ-সাধন এতই সহজ যে তাহার জন্য প্রস্তুত হইবার কোন প্রয়োজন নাই? ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী যে পিতা অনুচিত শাসনদ্বারা পুত্রকে অবাধ্য এবং বিপন্ন করিয়া নিজে অসুখী হইয়াছেন, তিনি হয়ত বুঝিতে পারেন যে, গ্রীক্ ভাষা অবহেলা করিয়াও যদি তিনি কিছু চরিত্র বিজ্ঞান শিখিতেন, তাহা হইলে অধিক উপকার হইত। পুত্র শোকার্ত্তা জননী যদি চিকিৎসকের নিকট জানিতে পারেন যে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমই তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর কারণ, তাহা হইলে তাঁহার লাটিন ভাষার ব্যুৎপত্তি তাঁহাকে শোক ও অনুতাপের সময়ে অতি অল্পই সান্ত্বনা দিবে।

অতএব দেখা যাইতেছে, বংশ-প্রসারিণী-শক্তি-নিচয়ের প্রকৃত পরিচালনার পক্ষে জৈবনিক নিয়মের পরিজ্ঞান থাকার প্রয়োজন। উচিতরূপে সন্তান পালন করিতে হইলে শারীর-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের অন্ততঃ মোটামুটি জ্ঞানটা থাকা চাই। অনেকে এ কথায় হাসিয়া বলিবেন, পিতামাতার পক্ষে এসকল কঠিন বিদ্যা শিক্ষা করিয়া লওয়া অসম্ভব। ঐ সকল বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ-ব্যুৎপত্তি-লাভ অসম্ভব হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয়

মূল-সূত্রগুলি, বুঝিয়া হউক বা না বুঝিয়া হউক, জানিয়া রাখা সহজ, এবং তাহাই যথেষ্ট। যাহা হউক, ইহা অবিসম্বাদিত যে, বালকদিগের শরীর ও মনের বিকাশ কতকগুলি নিয়মের বশবর্ত্তী; এই সকল নিয়ম যদি পিতা মাতা একেবারেই অগ্রাহ্য করেন, তবে সন্তানের মৃত্যু অনিবার্য্য; যদি অধিক পরিমাণে এই সকল নিয়ম রক্ষিত না হয়, তবে শরীর এবং মনের ঘোর অভাব থাকিয়া যায়; যদি সেই সকল নিয়ম সম্পূর্ণরূপে পরিরক্ষিত হয়, তাহা হইলেই কেবল সন্তান সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে। অতএব বিচার করিয়া দেখ, যাহারা এক দিন না এক দিন পিতা-মাতা হইবে, তাহাদের পক্ষে এই সকল নিয়ম জানিয়া রাখা উচিত কি না।

ইংলণ্ডে যে বয়সে কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ, ভারতে সে বয়সে তিনি পুত্রবতী। ভারত-রমণী স্বামি-সেবা, গুরুভক্তি এবং অপত্যস্নেহে অদ্বিতীয়া হইলেও শারীর-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানে তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ভারতবাসীর শারীরিক এবং মানসিক শক্তি-বিষয়ে জাতীয় অধোনতির ইহা একটি মুখ্য কারণ কি না, ভারত-হিতৈষী মাত্রেরই তাহা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। রমণীর কথা ছাড়িয়া দিয়া পুরুষের কথা ভাবিলেও হতাশ হইতে হয়। যাঁহারা উচ্চ-শিক্ষার অভিমান করেন, তাঁহাদের মধ্যেও শারীর-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের অধ্যয়ন ইচ্ছাধীন, সুতরাং অনেকেই পসন্দ করেন না!

মহাজন-বাক্য।

"তুলসী! যব জগমে আয়ো
জগো হসে তোম্ রোয়্।
আয়্সে করনি কর্ চলো কি
তোম্ হসো জগো রোয়॥"

এই বিচিত্র সংসার-রহস্য দেখিয়া এক দিন তুলসীদাস উল্লিখিত কবিতায় নীতি-তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছিলেন। বহু দিন হইতে তুলসীদাসের বীণা নীরব হইয়াছে, কিন্তু আজিও সেই মধুর ঝঙ্কার নিত্য নব-রাগে প্রাণের মধ্যে নিত্য নূতন ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া দিতেছে। আমরা যে দিন এই যন্ত্রণাময় সংসারে জন্মগ্রহণ করিলাম, সে দিনের কথা কেহই বলিতে পারি না; কোথা হইতে আসিলাম, কেমন করিয়া আসিলাম, কেনই বা এই সুখদুঃখের বিচিত্র লীলাভূমি সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, ইহার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারি না—তাহা আমাদের নিকট চিরদিনই অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত! কিন্তু সংসারের যে সকল নরনারী আমাদের সাক্ষাতে জন্মিতেছে, মরিতেছে, তাহাদের জন্ম মৃত্যু দেখিয়া এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, মানুষ

ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথমেই ক্রন্দন করে। এই ক্রন্দন কাহারও জীবনে সঙ্গের সঙ্গী হয়, কেহ বা জন্মিবামাত্র ক্রন্দন করিলেও হাসিতে হাসিতে জীবন কাটাইয়া, হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। তুলসী বলিতেছেন, তুমি যে দিন ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র প্রসব যন্ত্রণায় কাঁদিতেছিলে, তখন এই পৃথিবীর বন্ধুবান্ধবেরা তোমাকে ভূমিষ্ঠ হইতে দেখিয়া আনন্দে হাসিয়া উঠিয়াছিল, তোমার ক্রন্দনে কেহই কর্ণপাত করে নাই; অতএব তুমি এমনি করিয়া জীবন কাটাইতে যত্ন কর, যেন মরিবার সময়ে বন্ধুবান্ধবেরাই কাঁদে, আর তুমি হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইতে পার। জন্মিয়া সকলেই কাঁদে, হাসিতে হাসিতে কয় জন মরে? যাহাতে হাসিতে হাসিতে মরিতে পারি, তাহার জন্য কাহার না ইচ্ছা হয়; কিন্তু শুধু ইচ্ছায় যদি কার্য্য হইত, তবে কত ইচ্ছাই না জীবনে করিতেছি, কত ইচ্ছাই না জলবুদ্বুদের মত বিলীন হইতেছে। শুধু ইচ্ছায় কিছু হয় না, ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য চাই। ইচ্ছা করিলেই ধনী হওয়া যায় না, কার্য্য করিলেও অনেক সময়ে ইচ্ছানুরূপ জ্ঞানী হওয়া যায় না, কিন্তু জীবনগত ইচ্ছা ও ইচ্ছাগত কার্য্য থাকিলে সাধুজীবন লাভ করিতে পারা যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সাধুজীবন লাভ করিতে পারিলেই হাসিতে হাসিতে মরিতে পারা যায়—ইহলোক ও পরলোকে শুভগতি প্রাপ্তি হয়।

"সবকি ঘট্‌মে হরি হেঁয়্
পহছানৃতো নহি কোই।
নাভিকে সুগন্ধ মৃগ নহি জানত
ঢুঁড়ৎ ব্যাকুল হোই॥"

পরমেশ্বর কোথায়? কেহ বলেন তিনি স্বর্গে কেহ বলেন তিনি বৈকুণ্ঠে, কেহ বলেন তিনি তীর্থ বিশেষে। যেমন কস্তুরি মৃগ আপন নাভির সৌরভে আকুল হইয়া কোথা হইতে গন্ধ আসিতেছে তাহাই খুঁজিয়া খুঁজিয়া বন ভ্রমণ করে, অথচ সুগন্ধ তাহারই নাভিমূলে; তেমনি আমরাও ভ্রান্ত হইয়া জগতে অন্বেষণ করি কোথায় ঈশ্বর, কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগের প্রাণে!

"দুখ্ পাওয়ে তো হরি ভজে
সুখে না ভজে কোই।
সুখ্‌মে যো হরি ভজে
দুখ্ কাঁহাসে হোই॥"

মানুষ যখন দারুণ দুঃখে নিপীড়িত হয়, সংসারের মুখ যখন বিষন্ন ও মলিন দেখিয়া মানুষের আকুল প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, সেই দুঃখের দিনে অনেক নাস্তিকও পরমেশ্বরের নাম লয়, পরমেশ্বরের জন্য ব্যাকুল হয়। কিন্তু সুখের দিনে কয়জন হরিনাম স্মরণ করিতে চায়? যদি সুখের দিনে হরি ভজিতাম, তবে কি দুঃখের দিন আসিতে পারিত? নিত্য পরমেশ্বরের নাম যাহার জীবনের জপমালা হয়, তাহার প্রাণে কখনও দুঃখ আসিতে পারে না, ঈশ্বর রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু; সেই অমৃতরস পান করিলে দুঃখ-বিষে আর প্রাণকে আক্রমণ করিতে পারে না!

"সুখ্‌মে বাজ পড়ুঁ
দুখ্‌মে বলিহারি যাই।
অ্যায়সে দুখ্ আওয়ে যো
ঘড়ি ঘড়ি হরিনাম সোঁয়াই॥"

সুখে আমাদিগকে অধঃপাতের পথে লইয়া যায়, সুখের মাথায় বজ্রাঘাত হউক। দুঃখই আমাদের প্রকৃত বন্ধু, দুঃখেরই বলিহারি যাই! দুঃখে না পড়িলে বিদ্যা হয় না, দুঃখে না পড়িলে হরিনামে মতি হয় না, দুঃখে না পড়িলে জীবনের যথার্থ মূল্য কেহ বুঝে না! এমন দুঃখ আসুক যেন দুঃখের তাড়নায় নিশিদিন হরিনাম প্রাণের মধ্যে জাগরিত থাকে।

সরস্বতী-পূজা।

ছোট ছোট ক'টী ভাই
আছি সবে উপবাসী,—
পূজিব মায়েরে আজি—
প্রসাদের অভিলাষী।

সরল হৃদয় রূপ
শ্বেত শতদল'পরে
তোমারে মা সরস্বতি
বসাইতে ভালবাসি!

আনন্দের সুচন্দন,
ভক্তির ত্রিপত্র আর,
প্রস্ফুট প্রীতির সতি!
এনেছি প্রসূন-রাশি!

শ্রদ্ধার তুলসী তুলি',
তৃপ্তির পবিত্র-বারি;
আশার নৈবিদ্য আনি'
সাজায়েছি সারি সারি!

তোমার চরণ-তলে
দীনতা-আসন পাতি,
তাহাতে বসিব সবে
উৎসাহ-প্রদীপ্ত ভাতি!

তৃপ্তি-পূত সবে করি,
মনোমত উপচারে,
পূজিব তোমারে দেবি!
একমনে বারে বারে!

মানসের কথাগুলি
মন্ত্ররূপে মনে মনে
অন্তর-যামিনী তোমা'
বলিব গো সংগোপনে!

আশার নৈবিদ্য যত
নিবেদিব শ্রীচরণে;—
ভখিব প্রসাদ শেষে
লভিবারে বিদ্যা-ধনে।

মিশাইয়া ভক্তি প্রীতি
শ্রদ্ধা-তৃপ্তি হর্ষ আর
অঞ্জলি বাঁধিয়া করে
দিব পদে উপহার!

বলিব সকলে মিলি'
"নমো নমঃ সরস্বতি!
ও পদ কমলে যেন
ভক্ত-ভৃঙ্গগণে রতি।"

সুবাক্য-ভাণ্ডার।

যত্নে উপদেশ-বাক্য করিবে সঞ্চয়,
ভাল কথা কাযে লাগে সকল সময়।

জগতে বন্ধুতা বটে অমূল্য রতন,
বর্ব্বর হেলায় কিন্তু হারায় সে ধন।

প্রকৃত মহত্ত্বে শোভে জীবন যাহার,
বংশের গৌরবে কিবা যায় আসে তার।

দেখিয়া পরের গুণ হিংসে নীচ জন,
সাধুজন করে সেই গুণানুকরণ।

যত্ন করি সরলতা দেখায় যে জন,
তীব্র কপটতা তার প্রকৃত ভূষণ।

প্রশংসা করিতে লাভ যার ইচ্ছা হয়,
অহঙ্কারে পূর্ণ তার হৃদয় নিশ্চয়।

সদ্‌গ্রন্থ দু চারিখানে সার-শিক্ষা হয়,
রাশি রাশি গ্রন্থচয়ে কিবা ফলোদয়?

সমস্ত শাস্ত্রের সার পেয়েছে সে জন,
যে জন বুঝেছে নিজ-কর্ত্তব্য-পালন।

আপন নয়ন যদি করহ সরল,
অন্যের নয়নে তবে রবে না গরল।

প্রহরা ছাড়িয়া যদি প্রহরী ঘুমায়,
চতুর চোরের তাতে লোভ বেড়ে যায়।

স্বচ্ছন্দে যাহাতে চলে, সে ধনেই সুখ,
বিপুল বিত্তের সঙ্গে অনিবার্য্য দুখ।

দুরাকাঙ্ক্ষা আগে করে হিসাবেতে ভুল,
কোন কাযে শেষে তার হয় না প্রতুল।

মানুষের খ্যাতি যদি ভাঙ্গে একবার,
কদাচিৎ তবে তার ঘটে প্রতিকার।

অত্যন্ত চতুর জন যদি ধরা পড়ে,
নির্ব্বোধ বলিয়া লোকে উপহাসে তারে।

বরং মিশাও বিষ শোণিতের সনে,
রোপিও না ভ্রান্তি তবু মানুষের মনে।

সুন্দর দেহের সঙ্গে জীবন নির্ম্মল,
সুন্দর আলেখ্যে যেন রঙ সমুজ্জ্বল।

যে জীবনে পড়িয়াছে দুঃখরূপ সার,
সে জীবন অনুকূল-ক্ষেত্র সাধুতার।

ক্রোধ আর ক্ষিপ্রতার প্রাধান্য যথায়,
সাধু উপদেশ তথা স্থান নাহি পায়।

সাধুতা নম্রতা শিখ, হও মিতাচারী,
বিশ্বাস যে করে, হও প্রণয়ী তাহারি।

সাহসেতে দুর্দ্দৈবের কর প্রতিকার,
জ্ঞান বিনা ক্রোধকালে কি ঔষধ আর।

বিশ্বাস-ভাজন যদি হয় বন্ধু জন,
বিপদে সে রক্ষা করে দুর্গের মতন।

মিষ্টবাক্যে তোষামোদ করে যেই জন,
শত্রু হ'তে খল সেই অত্যন্ত ভীষণ।

আপনি আপন কথা লঙ্ঘে যেই জন,
অপরকে অবিশ্বাস শিখায় সে জন।

মহান্ সঙ্কল্প হ'লে জীবনে প্রবল,
হৃদয়ে সাহস বাড়ে, হাতে বাড়ে বল।

দরিদ্রতা করে বটে অনেকে বিনাশ,
বিভবেও অনেকের করে সর্ব্বনাশ।

সন্তোষ যাহার চিত্তে বিদ্যমান আছে,
সুখভোগ আজ্ঞাবহ সদা তার কাছে।

ইচ্ছায় দুঃখের বোঝা যে করে বহন,
জগতে বলিষ্ঠ কেবা তাহার মতন?

সংগ্রামে দুঃখেরে যেই করে পরাজয়,
জগতে মহিমা তার অতুল নিশ্চয়।

শ্রেষ্ঠ বলি আপনারে যে জন দেখায়,
তার সঙ্গে থাকি কেহ সুখ নাহি পায়।

অল্পজ্ঞানী যদি তর্ক করিবারে যায়,
বাজি রাখে সে নির্ব্বোধ কথায় কথায়।

বিশ্রাম-লাভের তরে কায উপেক্ষিলে,
কোন্ কাল সুপ্রতুল হয় ধরাতলে?

বাঁচিয়া থাকিতে হয় যশোনাশ যার,
অচিরে উপজে তার যন্ত্রণা অপার।

শিল্পকার্য্যে যেই জন না জানে কৌশল,
নিয়ত যন্ত্রের নিন্দা করে সে কেবল।

প্রকাণ্ড যে শিলাখণ্ড গড়াইয়া যায়,
একটি শৈবাল নাহি লাগে তার গায়।

পোষাকে অত্যন্ত যত্ন দেখিবে যাহার,
বুঝিবে গলদ আছে বুদ্ধিতে তাহার।

জ্ঞানহীন জ্ঞানী বলে দিলে পরিচয়,
জ্ঞান উপার্জ্জনে তার বড় বিঘ্ন হয়।

মূল্যবান্ যদি কিছু সস্তায় বিকায়,
না ভাবিয়া না চিন্তিয়া কিনিবে না তায়।

অসঙ্গত আশা হৃদে যে করে পোষণ,
নিশ্চয় জাগ্রত থাকি সে দেখে স্বপন।

পর-ধন-দানে যদি জন্মে অধিকার,
কৃপণ হইতে তবে সাধ হয় কার?

যৌবনে আলস্যে যেই সময় কাটায়,
বার্দ্ধক্যে অভাব তার কে বল ঘুচায়?

পরীক্ষায় যতদিন সুযোগ না হয়,
কে আপন কেবা পর কে জানে নিশ্চয়?

দুর্ব্বাক্যের সঙ্গে মিষ্ট-বাক্য-বিনিময়,—
ক্ষতি কিছু নাই, কিন্তু লাভ অতিশয়।

অসংযত ক্রোধ যেন অশিক্ষিত ঘোড়া,
আরোহী লইয়া করে যথা তথা ওড়া।

সংসারে বিশ্বস্ত বন্ধু রহিয়াছে যার,
জীবনের মহৌষধ হাতে আছে তার।

দুরাকাঙ্ক্ষা যদি স্থান পায় শত্রু-মনে,
হইবে সে জ্বালাতন তাহারি দংশনে।

বিবেচনা না করিয়া কর নির্ব্বাচন,
দীর্ঘকাল অনুতাপে হইবে দাহন।

মানুষের ক্রোধ জীর্ণ দেয়ালের প্রায়,
পরের উপরে পড়ি ভাঙ্গে আপনায়।

অপরাধ বুঝিয়াছে বিবেক যাহার,
পরের ভৎর্সনে নাই প্রয়োজন তার।

নির্ম্মল বিবেক যার দোষ-শূন্য রয়,
পরের তর্জ্জনে কেন সে করিবে ভয়?

আপনি হইলে মন্দ, বংশে কিবা করে,
কলঙ্ক উজ্জ্বল হয় শাদার উপরে।

সুপথে থাকিয়া কর সাধু ব্যবসায়,
না পাইলে পিতৃ-ধন কিবা আসে যায়।

দীর্ঘকাল ভোগাইয়া কর যদি দান,
অনুগ্রহ নহে সে ত বিক্রয়-সমান।

ভৃত্য যদি ভাল হয় নিজ আচরণে,
মণিব আপনি ভাল হয় তার গুণে।

স্বাভাবিক-লজ্জা-বোধ নাই যার মনে,
সম্মান কি সাধুতা সে বুঝিবে কেমনে?

নীচ যেই বিদ্যা, বুদ্ধি, কিম্বা আচরণে,
কদাচ না বন্ধুতা করিবে তার সনে।

সতত প্রসন্ন থাকে যাহার অন্তর,
আপনি আকৃতি তার হয় মনোহর।

শোকাকুল রহিয়াছে যাহার হৃদয়,
তার মনে কষ্ট-দান উচিত না হয়।

বুদ্ধির অল্পতা বটে ক্রোধের কারণ,
অনুতাপ কিন্তু তার চরম লক্ষণ।

যৌবনেতে পরিশ্রমী হয় যেই জন,
বৃদ্ধকালে কষ্ট তার হয় না কখন।

আগে নিজ অর্থবল পরিমাণ কর,
তার পরে কর দান যখন যা পার।

করিবে যেমন যত্নে অপরকে দান,
আপনি করিবে লাভ তেমনি সম্মান।

মন যার পরিপূর্ণ সতত কুভাবে,
সদর্থ কথার সেই কদর্থ করিবে।

সাধু সজ্জনের চিত্ত শান্ত সুনির্ম্মল,
নির্ব্বাত তড়াগে যেন বারি অচঞ্চল।

অপরাধ জাগে সদা বিবেকে যাহার,
মুহূর্ত্তেক শান্তি-লাভ ঘটে না তাহার।

জাতীয়-সঙ্গীত।

ভারত সন্তান!
হ'য়ে এক প্রাণ
কর অবসান
ভারত দুখ।

সুজলা সুফলা,
মলয় শীতলা,
উজল শ্যামলা
ভারত-মুখ॥

চণ্ডাল ব্রাহ্মণ,
খ্রীষ্টান, যবন,
হ'য়ে এক মন
তোমরা সবে।

জাতীয় জীবন
করিয়া গঠন
বন্ধুর মতন
মিলিয়া র'বে॥

একের তনয়—
কেহ পর নয়,—
জানিবে নিশ্চয়
ভারতবাসি!

ভাই ভাই মিলে
জননীর কোলে
থাকিবে সকলে
আনন্দে ভাসি॥

এই আর্য্য-স্থান
জননী সমান
ভারত সন্তান!
ভাবিবে মনে।

একতার তারে
বদ্ধ পরস্পরে
র'বে ঘরে ঘরে
সবার সনে॥

বিবাদ ভুলিয়া,
হাসিয়া খেলিয়া
সকলে মিলিয়া
থাকিবে ভবে।

জগত সংসার
তোমার আমার
এক পরিবার
জানিবে সবে॥

বল সমস্বরে
প্রফুল্ল অন্তরে,
মোরা ঘরে ঘরে
মিলিত রব।

ভাই ভাই ভাই,
আত্মীয় সবাই,
দ্বেষ হিংসা নাই
সুখের ভব॥

তোমার আমার—
জগত সংসার,
এক পরিবার
আমরা সবে।

ভাই ভগ্নী সনে,
আনন্দিত মনে—
খেলিতে কজনে
এসেছি ভবে॥

নন্দন কানন
এ ভব ভবন;—
হেন রম্য বন
কোথায় আছে?

খেলা শেষ যবে,
যাব মোরা সবে
ত্যজিয়া এ ভবে
পিতার কাছে।

আমাদের পিতা
জগতের পিতা,
জ্ঞান-মুক্তি-দাতা
পুরুষ-প্রধান।

এস ভক্তি-ভরে
মিলি নারী নরে
কর সমস্বরে
তাঁর গুণ গান॥

শিক্ষা-পরিচর।

১ম ভাগ।	চৈত্র, ১২৯৬ সাল।	১২শ সংখ্যা।

পৃথিবীতে স্বর্গীয়াংশ।

এই প্রস্তাবনার প্রারম্ভে আমরা দেখাইব, স্বর্গ কি, আর পৃথিবীই বা কি; আর এই দুয়ের আভ্যন্তরিক সম্বন্ধই বা কতটুক। পৃথিবী বলিতে আমরা বুঝি, নানা প্রকার ধাতুদ্রব্য ও মৃত্তিকাতে গড়ান একটি প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড, যাহার উপরে সূর্য্য হইতে আলোক আসিতেছে, চন্দ্রমণ্ডল হইতে সুধাময় কিরণ ঝরিয়া পড়িতেছে, বনরাজী পুষ্পিত হইয়া সৌরভ ও সৌন্দর্য্যে সৃষ্টির অপূর্ব্বতা সম্পাদন করিতেছে, বন ও উপবন ফলিত হইয়া জীবকুলের সৌভাগ্য বর্দ্ধন করিতেছে, কলকণ্ঠ-বিহঙ্গ মধুর স্বরে কূজন করিয়া ভাবের সঞ্জীবতা উৎপাদন করিতেছে, মধুপায়ী ভ্রমর সুমিষ্ট গুঞ্জন করিয়া সৃষ্টির মাধুর্য্য বিস্তার করিতেছে, পবন এই সমস্তেরই বার্ত্তা লইয়া সৃষ্টির উপর নৃত্য করিতেছে, নদনদীগুলি ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া নাচিতে নাচিতে অগাধ সমুদ্রে যাইয়া পড়িতেছে, এবং মেঘ উপরে উঠিয়া হাসিতে হাসিতে সুধা বর্ষণ করিতেছে; আর যেখানে ক্ষুধার শান্তির জন্য প্রচুর অন্ন, পিপাসায় পরিতৃপ্তির জন্য উত্তম পানীয়, এবং রোগের উপশম নিমিত্ত অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রস্তুত আছে। এর উপরে আরও খুঁজিয়া তত্ত্ব লইতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, এই এক পৃথিবীর সঙ্গে বহু দূরবর্ত্তী কত অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রের যোগাযোগ অনুস্যূত রহিয়াছে। সেই সমস্ত দূরতম রাজ্য হইতে ও অনুক্ষণ বিবিধ শক্তি ও সাহায্য আসিয়া ইহার উপর কার্য্য করিয়া যাইতেছে। অবশ্য সেই গোপনীয় সাহায্য ও লুক্কায়িত শক্তি সম্পূর্ণরূপে পরিচয় করিয়া লইবার এখনও আমাদের সময় আইসে নাই, ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টির সূক্ষ্ম জ্যোতিষী গণনা বা অব্যক্ততত্ত্বের আবিষ্কার হইতে এখনও অনেক বাকী আছে। বাস্তবিক সেই সমস্ত দূরগত তত্ত্বের কার্য্যকারণ নির্ভেদ করিয়া প্রকৃত মর্ম্ম নিষ্কাশন করিতে আরও অনেক বিদ্যা বুদ্ধির নিয়োগ আবশ্যক। যাহা হউক তথাপি বিজ্ঞান এপর্য্যন্ত

আমাদের ভাণ্ডারে যে সমস্ত তত্ত্ব আনিয়া উপস্থিত করিতেছে, তাহা অতীব আশা-প্রদ এবং মানবীয় অনন্ত উন্নতির পরিচায়ক। সেই ভাবী উন্নতি ও ভবিষ্যৎ সম্পদের তুলনায় যদিও আমরা এখন পর্য্যন্ত জ্ঞান-ঐশ্বর্য্যের পাদদেশেই দণ্ডায়মান রহিয়াছি, তথাপি ইহাই অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, এই সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া একদিন এই পৃথিবীতে অতি অতুল সম্পদ ও অতি সুমহৎ সৌভাগ্য আসিবে। সেই ভাবী ও অনাবিষ্কৃত রত্নরাজী অবশ্যই বর্ত্তমানে মানবীয় ধারণার বহির্ভাগে রহিয়াছে, তথাপি স্মরণে সুখদ বলিয়া উল্লেখনীয়। সম্প্রতি মনুষ্যের ধারণাতে যাহা যাহা আসিয়াছে, তদ্দ্বারা আমরা পরিজ্ঞাত হইতেছি, পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টনপূর্ব্বক তাহাতেই আকৃষ্ট হইয়া একটি বায়ুমণ্ডল ও একটি সুনির্দ্দিষ্ট মেঘমণ্ডল রহিয়াছে। উভয়েই পৃথিবীর সেবায় ও পার্থিব উপকার সাধনে নিয়োজিত। এর উপরে তেজঃপুঞ্জ আর একটি সূর্য্যমণ্ডল উত্তাপ সিঞ্চন করিবার জন্য সংস্থাপিত রহিয়াছে। এই তাপ সম্পাত, জল সিঞ্চন ও বাত সঞ্চালন ত্রিবিধ ক্রিয়াই পৃথিবীর জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় ও নিরতিশয় কার্য্যকরী। পৃথিবীর সৃষ্টি-ব্যাপারে তেজ বৈদ্যু পরমাণুতে চৈতন্য উৎপাদন করে। সমীরণ আণবিক শক্তিকে সঞ্চালিত করিয়া প্রাণের কার্য্য করিয়া থাকে। আর জলবিন্দুগুলি সেই বীজীভূত পরমাণুতে মেদ ও মজ্জারূপে সংশ্লিষ্ট হয়। তাহারই বাহ্য বিকাশ—এই সমস্ত সবুজ বন ও বনরাজী, সুগন্ধি ফুল ও সুমিষ্ট ফল, এবং সৃষ্টির পূর্ণ বিকাশ নিখিল জীব জঙ্গম। এই জঙ্গমাত্মক সচেতন জীব সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্যই সর্ব্ব প্রধান ও সর্ব্বোপরি মহিমান্বিত। এই মানবীয় শক্তি সমস্ত বহিঃ প্রকৃতির উপরে যেমন অধিকার বিস্তার করিয়াছে, অন্তর প্রকৃতিতেও তেমনি। ইহার বুদ্ধি ও বিচার সকলের উপরেই যাইয়া কর্তৃত্ব করিতেছে। ইহার বহিঃ প্রকৃতিতে অভিনিবিষ্ট বুদ্ধি ও বিচারের ফল বিজ্ঞান-শাস্ত্র ও অন্তর প্রকৃতিতে অভিনিবেশের ফল দর্শন। বিজ্ঞান যেমন জড়ের প্রকৃতি নির্ভেদ করিয়া বিশ্লেষণ পূর্ব্বক আণবিক ও রাসায়নিক যোগাযোগ দেখাইয়া দিতেছে ও সমস্ত পরিদৃশ্যমান পদার্থের ব্যবহারোপযোগিতা তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিতে প্রস্তুত হইতেছে; তেমনি দর্শনও বিচার ও মীমাংসার সূত্র নির্দ্দেশপূর্ব্বক অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আধ্যাত্মিক যোগাযোগ প্রদর্শন ও অনন্ত জীবনের উপজীব্য পুণ্য ও শান্তিলাভের উপযোগিতা আবিষ্কার করিয়া দিতেছে। আমরা এজন্যই বলি, পৃথিবীর উপর মানব প্রকৃতি সর্ব্বোপরি মহিমান্বিত।

বুঝিতে হইবে, এই সর্ব্বোত্তমা প্রকৃতিই স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যস্থিত যবনিকা। এই মায়াময় পাঞ্চভৌতিক তিরস্করণীরই একদিকে অনন্ত প্রসারিত স্বর্গ ও অপরদিকে জীবের কর্ম্মভূমি বা প্রাথমিক শিক্ষার অত্যুত্তমক্ষেত্র পৃথিবী। যেখানে জ্ঞানই অতি প্রদীপ্ত আলোক, সত্যই অতি অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না, বিমল আনন্দই নিত্য উপ-

জীবিকা, অমরাত্মা দেবকুলই সঙ্গীয় সহচর, এবং শান্তিই জীবনের পরিণতি, তাহা স্বর্গরাজ্য। আর যেখানে অন্ধকার জীবনের প্রবর্ত্তক, দৈব বা পরকীয় অনুগ্রহ রক্ষক, পরকীয় দানই একমাত্র জীবিকা, এবং নশ্বর মনুষ্য সঙ্গীয় সহচর; তাহাই পৃথিবী। এই পৃথিবীতে স্বর্গীয়াংশ কি, এইক্ষণে তাহাই সকলে পরিজ্ঞাত হউন।

আমরা এই কর্ম্মভূমিতে নিপতিত হইয়া যাঁহার কোমল ক্রোড়ে সর্ব্ব প্রথম আশ্রয় প্রাপ্ত হই, এবং যিনি সেই অক্ষম বাল্যজীবনে বিবিধরূপ সাহায্য ও নিয়ত লালন পালনের জন্য পূর্ব্বেই প্রস্তুত থাকেন; সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে, এই সংবাদেই যাঁহার অন্তরে স্নেহ ও বক্ষে দুগ্ধের সঞ্চার হইতে থাকে; যাঁহার দৈহিক গঠন, অন্তরের প্রকৃতি ও জীবনের উদ্দেশ্য অনুভাবিত হইলে একটি দৈব প্রেরিত অমানুষী শক্তি বলিয়া স্বতঃই ভক্তি করিতে প্রবৃত্তি হয়; আর যাঁহার মধ্য দিয়া অখিল-কারণ বিশ্বনিয়ন্তা প্রভুর মঙ্গলময়ী ইচ্ছার স্ফুরণ—এই সুন্দর জীবদেহের সৃষ্টি হইতেছে, নিশ্চয়ই তিনি সেই বিশ্বস্রষ্টার প্রেরিত অভিমত দেবতা। এই মাতৃরূপিণী দেবীর সন্তানবাৎসল্য এবং শিশুর প্রতি প্রেম নিরীক্ষণ ও সাদরে বদন চুম্বন, অবশ্যই আমরা "পৃথিবীতে স্বর্গীয়াংশ" বলিতে পারি। আর এই যে বুভুক্ষিত শিশুর প্রার্থনোন্মুখ বদনে সযত্নে ও বিপুল আগ্রহে স্তন্য প্রদান, ইহাও অবশ্যই আর একটি "পৃথিবীতে স্বর্গীয়াংশ"। বাস্তবিক স্বর্গেরই একটি পবিত্র ইচ্ছা, এখানে মাতার হর্ষ বিস্ফারিত আস্য ও নয়নযুগল দিয়া শিশুর উপর ঝরিয়া পড়িল, এবং সেই স্বর্গের অতি কার্য্যকরী আর একটি জীবন্ত শক্তি এইখানে মাতৃস্তন্যে পরিণত হইয়া শিশুর মুখে ক্ষরিত হইল। যাঁহার শক্তি আছে, তিনি ঐ স্থানে মানব প্রকৃতি বা স্বর্গরাজ্যের এই অপূর্ব্ব তিরস্করণী উঠাইয়া স্বর্গের দৃশ্য অবলোকন করুন। অথবা এই মায়ার ঠিক্ উত্তোলন করিবার প্রয়োজন নাই, আনন্দময়ী মা এই অভিনীত রঙ্গভূমিতে যে যে দৃশ্য স্বর্গরাজ্য হইতে প্রেরণ করেন, সকলে তাহাই নিরীক্ষণ করুন। পরিজ্ঞাত হউন, সেই স্বর্গকন্যা জননীরই সহকারী বা জীবন সহচর আর একটি অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য পূজ্যপাদজনক। যাঁহার হৃদয়-ক্ষরিত অতি সুমহৎ উপাদান লইয়া এই জীবদেহের সৃষ্টি, এবং যিনি ঐকান্তিক যত্ন ও বহুশ্রমোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা নিজ সহধর্ম্মিণীরই সহযোগে সন্তানগণের লালনপালন করিতেছেন ও সন্তানদিগকে জীবনপথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য নিয়ত যত্ন করিতেছেন, তাঁহার সেই ব্যস্ততা, ব্যাকুলতা ও আন্তরিক স্নেহ মমতা অবশ্যই "পৃথিবীতে স্বর্গীয়াংশ"। বাস্তবিক স্বর্গেরই প্রভাব এইখানেও দেবলীলা প্রকাশ করিয়া যাইতেছে। এই সকল তত্ত্বের আরও গভীরতাতে প্রবেশ করিতে হইলে আরও কিঞ্চিৎ অভিনিবিষ্ট হইতে আমি পাঠককে অনুরোধ করি। যে শক্তি হইতে পুষ্পের জন্য রূপ, রস ও গন্ধ আসিতেছে, ফলের রস এবং স্বাদুতা আহৃত হইতেছে, এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের

উপকরণ সংগৃহীত হইতেছে, সেই মহা-ভাণ্ডেরই সুধাসিক্ত উপাদান লইয়া মাতৃ-পিতৃ-ভাব বিরচিত।

পাঠক আরও অবগত হউন, কেবল ইহাতেই ঐহিকতার পর্য্যাপ্তি হয় নাই। পৃথিবীতে স্বর্গীয়াংশ আরও অনেক বিদ্য-মান আছে। ভগবানের এই লীলার ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে সকলই সুন্দর, সকলই স্বর্গী-য়াংশ। পৃথিবীর তাবৎ ফুলের গন্ধ, ফলের মিষ্টতা, চন্দ্রের জ্যোৎস্না, সৌরভবাহী সমী-রণ এবং তৎসঙ্গে সংমিশ্রিত বিহঙ্গ-নিনাদ ও সুমিষ্ট ভ্রমরগুঞ্জন একত্র অনুভাবিত হইলে, তাহা নিশ্চয়ই স্বর্গীয়াংশ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে।

এই তো গেল বাহিরের সংবাদ। পাঠক একবার আত্মগত হইয়া অন্তর্মুখীন হউন, আরও কত স্বর্গীয় বার্ত্তা পাইবেন। শরীরে চৈতন্যের সঞ্চার, প্রাণের সঞ্চালন ও জীবনী-শক্তির প্রভাব চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়, আমার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, সকলই স্বর্গ হইতে আসি-তেছে। ঐশী শক্তি সমুদায় শরীরের সার, প্রাণের বল ও আত্মার যোগবীর্য্য পরিপুষ্ট করিবার জন্য অব্যক্তভাবে সমস্ত উপাদান আহরণ করিয়া আনিয়া দিতেছে। তৎ-সমুদায় পৃথিবীতে সম্পাদিত হইলেও নিশ্চয়ই স্বর্গীয়াংশ। তদ্ভিন্ন জীবনের শুদ্ধতা, স্ত্রীসহবাস, নির্জ্জন চিন্তা বা সর্ব্ব-ত্যাগী হইয়া ঈশ্বর চিন্তন প্রভৃতি এক একটি অতি অপূর্ব্ব স্বর্গীয়াংশ। ব্রহ্মচারী যখন ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শুদ্ধ বেশে গুরুগৃহে বিচরণ করেন ও বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন দ্বারা আত্মার অতি পুষ্টিকর তত্ত্ব-জ্ঞান সংগ্রহ করিতে থাকেন ও ক্রমেই আত্মার চৈতন্য শক্তি সতেজ হইতে থাকে, তদবস্থার সেই পরাবিদ্যা বা সংগৃহীত জ্ঞানরাজী—কে না বলিবে ইহা "পৃথিবীতে স্বর্গীয়াংশ?" দ্বিতীয়তঃ পুরুষ যখন মানব প্রকৃতির অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপ নারীরত্ন গ্রহণ করেন, যখন উভয়ের ধর্ম্ম অর্থ কাম একীভূত হইয়া ঘনীভূত জীবনানন্দে পরিণত হইতে থাকে, যখন উভয়ের শরীরের সার, প্রাণের বল আত্মার গূঢ় চৈতন্য একীভূত হইয়া সন্তান-রূপ একটি নূতন কলেবরে পরিণত হয়, অথবা উভয়েই আনন্দ সহকারে যোগপথে উড়িতে উড়িতে মুক্তির রাজ্যে প্রয়াণ করেন, তখনকার সেই স্বর্গীয় দাম্পত্য বিধান বা বিশুদ্ধ প্রেম-ব্রত নিশ্চয়ই পৃথিবীতে আর একটি স্বর্গীয়াংশ। তৃতীয়তঃ নিবৃত্তি ধর্ম্মে প্রবৃত্ত সংসার-বিরাগী গৃহস্থ যখন শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্মের প্রবেশ করেন, যখন তাঁহার আত্মাতে অনন্ত জীবনের সম্বল ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, শান্তি, সমাধি ও যোগ ধারণা ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতে থাকে, তখন সেই ধর্ম্মময় জীবনের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক অনুষ্ঠান ও প্রত্যেক পাদ-বিক্ষেপই আমি পৃথিবীতে এক একটি স্বর্গীয়াংশ বলিব। আর যখন সাধক পরম-হংসবেশে বিহঙ্গ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চিদাকাশে উড়িতে থাকেন, অথবা যতি-ভিক্ষু হইয়া প্রকৃতির দ্বারে দ্বারে ব্রহ্ম-অন্ন ভিক্ষা করিয়া বেড়ান, যখন তাঁহার আত্মা প্রত্যেক নিমেষেই ব্রহ্মকে সংস্পর্শ করে, ও বিমল ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহার

সেই দেবগণ-লোভনীয় জীবন পৃথিবীতে এক অত্যুত্তম স্বর্গীয়াংশ; ইহাকেই পুণ্য-ময় স্বর্গের জীবন্ত সাক্ষ্য বলিয়া আমি নির্দ্দেশ করিব, যেহেতু ইহাই মানবীয় উত্তমতার চরম দৃশ্য।

মৃত্যুতে আমার লাভ।

(ইংরাজী হইতে অনুবাদ।)

ঈশ্বর। অচল তুমি, তোমায় ধরেছি,—
আত্মা যে মরণ-হীন, তাহাও বুঝেছি—
শোক আর অন্ধকার ঢাকুক আমায়,
চিন্তা আর বিলাপ করুক শান্তি ক্ষয়—
তাহাদের আঘাতে কি হব মৃত প্রায়?
তাহা নহে—চাই তব ছায়া শান্তি ময়—
বিভুর বিমল শান্তি লভিবার তরে
অভিলাষ সুখে পূর্ণ করেছে আমারে।

আরোহণ করি যত সে অচল গায়,
স্বর্গীয় আনন্দে করে বিভোর আমায়—
শীতল সমীর, করি কোমল চুম্বন,
অন্তরে নবীন ভাবে বসন্ত জাগায়,
(ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ অস্পষ্ট যেমন
দীর্ঘ অনুতাপে পাপী দেখিবারে পায়,)
তখন বুঝিতে পারি ভ্রমণের শেষ,
অচিরে করিব লাভ অভীষ্ট সে দেশ।

সে সময়ে যত সুখ, কাহার রসনা
করিবারে পারে আহা তাহার বর্ণনা,
যখন ব্যথিতে শোকে পারে না আমায়।
অনন্তের পরিচ্ছদে করি আবরণ,
একাকী আমারে আর ছাড়িতে না চায়,
পাপের-শৃঙ্খলগুলি খসিলে তখন,
স্বর্গীয় সুখেতে আত্মা হইবে বিভোর,
স্বাধীনতা দিবে মোরে আনন্দ প্রচুর।

আমরা এই পৃথিবীতে যে মানব-দেহ লাভ করিয়াছি, তাহা আত্মার স্বচ্ছ আবরণস্বরূপ। শরীরের সঙ্গে আত্মার এই সম্বন্ধটা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে; কারণ, ইহা কেবলমাত্র যে একটি সত্য তাহা নহে, কিন্তু জীবন-সম্বন্ধে অনেকগুলি গুরুতর মীমাংসা ইহার উপর নির্ভর করিতেছে।

ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন যে মানবাত্মা জড়-জগতের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হউক, তাই তিনি তাহাকে এমন একটি নির্ম্মল পার্থিব আবরণে আবৃত করিলেন যে, তাহার সর্ব্বাংশ আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত। সহজ দৃষ্টির অতীত অতি সূক্ষ্ম একটি স্নায়ু-সমষ্টি সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, আত্মা ইহা দ্বারা শরীরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। যাহাতে আত্মার উন্নতি হয়, এমন সকল ভাব আত্মা শরীরের মধ্য দিয়া বহির্জ্জগৎ হইতে লাভ করিতেছে, বহির্জ্জগতের উপর কার্য্য করিবার জন্য শরীরকে একটি যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে ক্রমে শিক্ষা করিতেছে। যদি এই শরীররূপ আবরণ দ্বিধা হইয়া যায়, যদি এই যন্ত্র বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে শরীরের উপর আত্মার কর্ত্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়, আত্মার নিকটে শরীর অন্যান্য পার্থিব পদার্থের ন্যায় সংস্রব-শূন্য হইয়া পড়ে। শরীরের সঙ্গে আত্মার এই বিচ্ছেদ মৃত্যু নামে অভিহিত।

শরীর আত্মার একটি স্বচ্ছ আবরণ। কি কার্য্যে, কি বিশ্রামে, সকল অবস্থাতেই দৃশ্যমান শরীরের অন্তরালে আত্মার অবস্থিতি আমরা অনুভব করি। শরীর ভালবাসে না অথবা ক্রোধান্বিত হয় না; আত্মাই স্বরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া বজ্র-নির্ঘোষে কথা কহে, অথবা আনন্দ-বিস্ফারিত কটাক্ষে হাস্য প্রকাশ করে; আত্মা যখন লজ্জা বোধ করে, তখনই গণ্ডদেশে রক্তিমা প্রকাশ পায়, আত্মারই সাহস, ভীতি, ইচ্ছা অথবা ক্লেশ এই বহিরাবরণের নানা পরিবর্ত্তনে পরিব্যক্ত হয়। যে কোমল এবং গতিশীল আবরণকে আমরা শরীর বলিয়া থাকি, আত্মা তাহাকে পরিত্যাগ করিলে তাহার কি দশা হয়? তখন শরীর অবসন্ন হয়, পরিত্যক্ত পরিচ্ছদের ন্যায়

পড়িয়া থাকে। প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় শরীর অবশ হইয়া পড়িয়া থাকে, আত্মা যে ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহাকে জীবিত রাখিয়া ছিল, এ কথা তখন যেন আমাদের বিশ্বাসই হয় না।

অন্যের শরীরকে আমরা ভাল বাসি না অথবা ঘৃণা করি না, শরীররূপ আবরণের অন্তরালে যে আত্মা রহিয়াছে, তাহাকেই আমরা ভাল বাসি বা ঘৃণা করি। আত্মার মাধুর্য্যই আমাদিগকে মোহিত করে; আত্মার জ্ঞান অথবা সাধুতাই আমাদের হৃদয়ে সম্ভ্রম জন্মাইয়া দেয়; আত্মার হীনতাই আমাদের মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক করে। মৃত শরীরের প্রতি ভালবাসা অথবা ঘৃণা কিছুই থাকে না, কারণ যাহার সঙ্গে বন্ধুতা বা শত্রুতা ছিল সে চলিয়া গিয়াছে, তাহার পরিত্যক্ত দেহ পার্থিব অন্যান্য জড় পদার্থ হইতে বিভিন্ন বলিয়া তখন আর বোধ হয় না।

একজন অন্যজনের শরীরকে ভালবাসে না, কিন্তু তদবস্থিত আত্মাকেই ভালবাসে, ইহা যেমন স্বাভাবিক, যে শরীরে আত্মা অবস্থিত রহিয়াছে, সেই শরীরকেই প্রত্যেক মনুষ্য ভাল বাসে, ইহাও সেইরূপ স্বাভাবিক। মনুষ্য শরীরকে সুস্থ রাখিতে ও উন্নত করিতে যত্ন করে, কারণ আত্মার পক্ষে একটি উপযুক্ত এবং কর্ম্মকুশল যন্ত্রের দরকার; সে শরীরকে অলঙ্কৃত এবং সুদৃশ্য রাখিতে যত্ন করে, কারণ পূর্ণতা এবং স্বাতন্ত্র্য লাভের জন্য আত্মার যে একটি স্বাভাবিকী আকাঙ্ক্ষা আছে, সংসৃষ্ট পদার্থে তাহা আপনা হইতেই প্রসারিত হয়। আত্মা যখন আপনার হীনতা অনুভব করে, তখন এই পার্থিব আবরণের সৌন্দর্য্য দ্বারা নিজের ত্রুটি ঢাকিয়া রাখিতে চায়। আত্মা নিজের কুৎসিত আকৃতি ঢাকিয়া রাখিবার জন্য অতি সাবধানে এই পরিচ্ছদ দ্বারা আপনাকে আবৃত করে। এইরূপ ব্যক্তিদিগকে আমরা কপটাচারী বলিয়া থাকি।

আত্মা যে মাংসের আবরণে আবৃত থাকে, ইহা ঈশ্বরের অনন্তস্থায়ী একটি নিয়ম। এই জন্যই শরীরের প্রতি আত্মার এত ভালবাসা; এই জন্যই জীবনের প্রতি এরূপে দুর্দ্দমনীয় অনুরাগ।

কিন্তু মৃত্যুটা কি? পার্থিব আবরণের সঙ্গে আত্মার বিচ্ছেদ ভিন্ন মৃত্যু আর কিছুই নহে। এই আবরণটি পরিত্যাগ করিলে তাহার কি অবস্থা হয়? ঈশ্বরের সৃষ্টি হইতে কি ইহা তিরোহিত হয়? তাহা হয় না; ইহা ভস্ম এবং ধূলাতে পরিণত হয়, যে পৃথিবী হইতে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল, সেই পৃথিবীর অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে ইহা মিশিয়া যায়। ইহা সৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যায় না, কিন্তু অন্যান্য প্রয়োজন সাধনের জন্য সৃষ্টির ভিতরেই থাকে। কিন্তু আবরণমুক্ত আত্মার কি দশা হয়? তাহা কি ঈশ্বরের সৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হয়? তাও কি হয়! যখন প্রমাণ হইল যে এই সামান্য দেহটার বিনাশ হয় না, তখন মনুষ্যের উৎকৃষ্টতর যে আত্মা, তাহার বিনাশ কিরূপে সম্ভব-পর? যে আবরণের সাহায্যে আত্মা আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইল দেখিয়া কি বলিতে হইবে যে, আত্মা ঈশ্বরের সৃষ্টি

হইতে বিলুপ্ত হইল ? না, আত্মা রহিয়াছে; কারণ যে পার্থিব আবরণে আত্মা এক সময়ে আবৃত ছিল, তাহা এখনও রহিয়াছে। আত্মা এখনও রহিয়াছে; কারণ ঈশ্বর অস্তিত্বের আদি, তিনি নাস্তিত্ব নহেন। আত্মা রহিয়াছে; কারণ পূর্ণজ্ঞান পরমেশ্বর যে উচ্চ-অভিপ্রায়ে আত্মার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এখন সে জন্য অনুতাপ করিতে পারেন না।

এই পার্থিব আবরণ পরিত্যাগ করা কি এতই কষ্টকর ? সত্য বটে, ঈশ্বর আমাদিগকে জীবনের প্রতি যে ভালবাসা দিয়াছেন, তাহা থাকাতে শরীরের সঙ্গে আত্মার বিচ্ছেদের কথা মনে করিতেই আমাদিগের ভয় হয়, কিন্তু এই স্বাভাবিক ভয়কে পরাস্ত করিবার শক্তি মানবাত্মার আছে। কত মহাত্মাই না ঈশ্বরের জন্য, মাতৃভূমির জন্য, বিশ্বাসের জন্য এবং বন্ধুবান্ধবের জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন ! তাঁহারা মৃত্যু-ভয় অনুভব করেন নাই। কতই না হত-ভাগ্য, দুর্ব্বল, অধঃপতিত ব্যক্তি নৈরাশ্যে পড়িয়া জীবনকে ভার বোধ করিয়াছে এবং অবশেষে ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে।

মুমূর্ষু ব্যক্তিগণ কপটতা করিতে পারে না, সুতরাং তাহাদিগের মুখেরপ্রতি চাহিয়া মনের অবস্থা বুঝিতে পারি। সচরাচর ইহা দেখা যায় যে, কষ্টকর পীড়ায় যাহা-দিগের মৃত্যু হয়, মৃত্যুকালে তাহাদিগের [illegible] আকৃতি এক প্রকার শান্তিময় প্রস-[illegible] [illegible] সময়ে আত্মা [illegible] দেখিয়া বোধ হয় যেন বলিতেছে, "আহা, কি সুখের বিশ্রাম !" ইহা দেখিয়া নিশ্চয়ই বোধ হয়, মৃত্যু-সময়ে আত্মা একটি অতি সুখের অবস্থা অনুভব করে।

যাহারা শরীরকেই সর্ব্বস্ব মনে করে, সুতরাং শরীরের ধ্বংস স্মরণ করিতে কম্পিত হয়, তাহাদিগের কল্পনা মৃত্যুকে অসঙ্গত ভয়ের কারণ করিয়া তুলে। আত্ম-প্রতারণার বশবর্ত্তী হইয়া সময়ে সময়ে তাহারা ইহাও মনে করে যে, মাটির মৃত-দেহ মাটিতে থাকিয়া যন্ত্রণা অনুভব করে; কিন্তু বাস্তবিক যে অনুভব করিত, সে উন্নতলোকে চলিয়া গিয়াছে, আত্মার পরি-ত্যক্ত এই মৃত দেহ অনুভব-শক্তি-বিরহিত মাটি বই আর কিছুই নহে।

জীবনের সঙ্গে দীর্ঘকালের অত্যন্ত সুখের সম্বন্ধ ছাড়িতে, চিরপরিচিত আ-মোদ প্রমোদ হারাইতে, পৃথিবীর বন্ধুদিগের নিকট বিদায় লইতে অবশ্যই কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এস্থলেও মৃত্যুর জন্য আমাদের আক্ষেপ হয় না, যাহা ছাড়িতে হইতেছে তাহার জন্যই আক্ষেপ হয়। যে সকল পার্থিব সম্পদ কিয়দ্দিনের জন্য আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, চিরদিনের জন্য লাভ করি নাই, তাহাদিগের উপরে অযথা অনুরাগ স্থাপন করাতেই আমাদিগকে শোক পাইতে হয়। আত্মার অপূর্ণতা-বশতঃ, প্রকৃত জ্ঞানের অভাব-বশতঃ এই কষ্ট হইয়া থাকে; সকলপ্রকার হীনতাতেই এইরূপ কষ্ট আছে। এমন কি, আত্মীয়-দিগের প্রতি যে আমাদিগের ভালবাসা আছে, তাহাও দোষের কারণ হইতে পারে।

ঈশ্বর আমাদিগের অমুচিত অনুরাগের অনুরোধে, আমাদিগের মতলব বুঝিয়া তাঁহার উন্নত উদ্দেশ্যের পরিবর্ত্তন করিবেন, আমরা কি এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারি? আর এই মৃত্যুর বিচ্ছেদের সঙ্গে অন্যান্য বিচ্ছেদের প্রভেদই বা কি?—নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে বন্ধুবান্ধবের নিকট বিদায় গ্রহণ যেরূপ, ইহাও কি সেইরূপ নহে?

যাহারা এই জীবনে সম্পূর্ণরূপে অথবা অধিক পরিমাণে অমর আত্মার অনাদর করিয়াছে; যাহারা পরলোক-চিন্তা-শূন্য ইতর জন্তুর ন্যায় কেবল শারীরিক সুখ এবং শারীরিক মঙ্গলের জন্যই যত্ন করিয়াছে; যাহারা অধিকতর ধন, সম্মান এবং সুখের জন্য স্বজাতীয়দিগের উপরে অত্যাচার করিয়াছে, অথবা তাহাদিগকে প্রতারিত এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে; আত্মার শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য ইন্দ্রিয় বৃত্তি এবং শৈশব-সংস্কারকে সংযত করা যাহাদিগের নিকট অসম্ভব বোধ হয়, ধর্ম্মের অনুরোধে পার্থিব সুখ বলিদান করাকে যাহারা নির্ব্বোধ মনে করে; যখন ধন্যবাদ পাইবার সম্ভাবনা নাই, অথবা যখন অত্যাচার এবং স্বার্থহানি ব্যতীত আর কিছুরই আশা করা যায় না, তখন পরের উপকারের জন্য কার্য্য করাকে যাহারা চিন্তা-শূন্য ভাবপ্রবণতা মনে করে; মৃত্যু বাস্তবিকই তাহাদিগের ভয় জন্মাইতে পারে।

যাহারা শরীরকে অত্যন্ত ভালবাসে, কেবল শরীরের জন্যই ঈশ্বর তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া যাহারা মনে করে, যাহারা কেবল শরীরের জন্যই বাঁচিয়া থাকে, শরীরের অনুরোধে আর সব নষ্ট করিতে পারে, শরীরের জন্য কত অন্যায় কার্য্য করে, দেহ পরিত্যাগের সময় উপস্থিত হইলে তাহাদিগের ভয় পাইবার কথা। তাহাদিগের যে আত্মা বাল্যে নিষ্পাপ বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারিত, অযত্নে তাহাদের সেই আত্মা হীন, মলিন, দুর্দ্দশাগ্রস্ত, অনুন্নত এবং নানা পাপ-ভারে পরিক্লিষ্ট। তাহারা যেমন বীজবপন করিয়াছিল, সেইরূপ ফললাভ করিতেছে। আত্মার অনন্ত ভবিষ্যতের জন্য তাহারা কখনও বীজ বপন করে নাই।

অসাধু লোক সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যের অবস্থাতেও সময়ে সময়ে আপন কদাচারের কথা মনে করিয়া লজ্জিত না হইয়া থাকিতে পারে না। দুষ্কর্ম্ম করিবার সময়েই তাহার এ কথা মনে হয় যে, সে যাহা করিতেছে, ঈশ্বরের নিকটেই হউক আর মনুষ্যের নিকটেই হউক, তাহার ঔচিত্য সমর্থন করিবার উপায় নাই। কিন্তু আত্মার ন্যায়বোধ থাকিলেও ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে সে পরাস্ত হইয়াছে, দীর্ঘকালের অভ্যাসে ইন্দ্রিয় তাহার উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু শারীরিক বল-ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন ইন্দ্রিয় অবসন্ন হইতে থাকে, যখন আত্ম-প্রতারণার সম্ভাবনা না থাকাতে আত্মা আপনার দুরবস্থা অনুভব করিতে থাকে, তখন সে ব্যক্তির মানসিক অবস্থা কিরূপ হয়? যে পৃথিবীতে সমস্তই হারাইয়াছে, এবং যাহার পরলোকে আশা করিবার কিছুই নাই, ভবিষ্যতের দিকে চক্ষু ফিরাইতে তাহার মনের অবস্থা কিরূপ হয়?

যে ভাগ্যবান্ উন্নতাত্মা নিজের কর্ত্তব্য জানিয়া তাহা সম্পাদন করেন এবং যে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর উচ্চ অভিপ্রায়ে তাঁহার সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার সম্মাননা করেন, সেই ব্যক্তির অবস্থা ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। * * * * * *

মৃত্যুতে তাঁহার লাভ। ইহাতে তাঁহার ক্ষতি কিরূপে হইবে? * * * তিনি জানেন যে, পার্থিব অভাব-মোচনের জন্য যে পৃথিবীকে তিনি কর্ষণ করিয়া থাকেন, সে পৃথিবীতে তিনি চিরদিন থাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন নাই, তিনিই ঈশ্বরের অসীম অনন্ত স্বর্গরাজ্যের অধিবাসী। পৃথিবীর ক্ষণিক অবস্থান তাঁহার চক্ষে গুরুতর বলিয়া বোধ হয় না, অনন্ত জীবনই তাঁহার চক্ষে গুরুতর। এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার পিতৃ-গৃহ, ঈশ্বর তাঁহার পিতা, এবং ব্রহ্মাণ্ড-নিবিষ্ট সকল আত্মাই তাঁহার সহিত ভ্রাতৃ-সম্বন্ধে সম্বন্ধ।

মৃত্যুতে তাঁহার লাভ। কারণ মৃত্যুতে আত্মার কি ক্ষতি হয়? আত্মা ইহার গুরুভার পার্থিব পরিচ্ছদ ফেলিয়া দেয়, পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করে মাত্র; অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিচ্ছদ অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া প্রেমময় ঈশ্বরের নিকট হইতে অধিকতর সুন্দর আর একটি পরিচ্ছদ গ্রহণ করে মাত্র। আত্মা ইহার প্রকৃত অবস্থায় থাকিয়া যায়, ঈশ্বর ইহার সঙ্গে থাকিয়া যান, এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডও যেমন তেমনই থাকিয়া যায়। তবে আত্মা হারায় কি? যে সকল আত্মীয় এবং বন্ধুবান্ধবকে পৃথিবীতে থাকিতে ভালবাসিত, তাহাদিগকেই কি হারায়? না, তাহা নহে; তাহারা এখনও ঈশ্বরের গৃহেই রহিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে এখনও সেই ভ্রাতৃ-সম্বন্ধই রহিয়াছে, কেবল পার্থিব দেহদ্বারা তাহাদিগের সঙ্গে যে সংস্রব ছিল, তাহাই দূর হইয়াছে। প্রেমাস্পদদিগকে আত্মা হারায় নাই। যাহা ঈশ্বরের হস্তে রহিয়াছে, তাহা হারাইতে পারে না।

* * * * এ কথা কি বলা যাইতে পারে যে এই পার্থিব জীবন কুসুমাস্তৃত, ইহাতে কণ্টক নাই? সত্য বটে, শরীর-পরিত্যাগের সঙ্গে অনেক সুখের শেষ হয়, কিন্তু ইহাও সত্য যে, মৃত্যুতে অনেক ভয় এবং শোকের অবসান হয়। আমি আর কখন অশ্রুবর্ষণ করিব না, কারণ দেহ-নির্ম্মুক্ত আত্মার অবস্থা অতি মধুর! এই পার্থিব জীবনে এত কি অবিমিশ্র সুখ আছে যে, ইহা চিরদিন থাকিবার জন্য ইচ্ছা করিব? অতিশয় বৃদ্ধ লোকেরা শান্তির জন্য, দেহ-নাশের জন্য, মুক্তির জন্য, উন্নত লোকে প্রস্থানের জন্য সর্ব্বদা এত ইচ্ছা করে কেন? অতীত জীবন যেরূপে গত হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ জীবন ফিরিয়া পাইবার জন্য সহস্র জনের মধ্যে একজনও ইচ্ছা করে না কেন? অতি অল্পলোকেই জীবনে তেমন সুখ ভোগ করিতে পারিয়াছে, যাহাতে অতীত জীবনকে চিরস্থায়ী দেখিবার জন্য তাহারা ইচ্ছা করিতে পারে; তবে এমন জীবন গেলে প্রকৃতই কি ক্ষতি? যাহারা উৎকৃষ্টতম লোকে যাইবার আশায় বিশ্বাস করিয়া মৃত্যুর হাতে আত্ম সমর্পণ

করিতে পারে, তাহাদের পক্ষে কি ইহা লাভের বিষয় নহে? মৃত্যুর জন্য যে ভয়, তাহাই বা কি? ঐ ভয় বালকের মত ভীরু কল্পনার ভয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। হে আত্মা! যে ঈশ্বর তোমার এক পরিচ্ছদ খুলিয়া লইতেছেন, তিনিই তোমাকে অন্য পরিচ্ছদে ভূষিত করিবেন।

* * * * ধার্ম্মিক ব্যক্তি যখনই পৃথিবী ভুলিয়া ঈশ্বরের চিন্তায় মনোনিবেশ করেন, তখনই তিনি মৃত্যু অনুভব করেন। তাঁহার আত্মা যখনই তাঁহার মৃত আত্মীয়দিগের সঙ্গে আত্মযোগে সম্মিলিত হয়, এবং তাহাদিগের সঙ্গেই আছে বলিয়া অনুভব করে, তখনই তিনি মৃত্যু জানিতে পান। কারণ ঐরূপ পবিত্র সময়ে তাঁহার নিকটে পৃথিবীর অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব উভয়ই সমান। তখন তিনি ঈশ্বরের সম্মুখে, স্বর্গগত আত্মীয়দিগের সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহার দেহ-নির্ম্মুক্ত আত্মার যে অবস্থা হইবে, তখন তাঁহার ঠিক সেই অবস্থা? প্রভেদ এই, তখন নূতন পরিচ্ছদে সাজিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে এবং আত্মীয়দিগের সঙ্গে যোগরক্ষা করিতে তিনি যতদূর কৃতকার্য্য হইবেন, এখন ততদূর হইতে পারেন নাই।

মৃত্যুতে আমার লাভ; কারণ, পৃথিবীতে আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি? সমস্ত মনুষ্যের ন্যায় আমিও অনন্ত কাল বাঁচিব, প্রকৃতি ইহা আমাকে শিক্ষা দিতেছে; অতএব এখানে যতদিন আছি, ততদিনও সেই অনন্তজীবন মনে করিয়াই বাঁচিব, চিরজীবন উচ্চতর এবং উৎকৃষ্টতর জীবনের জন্যই ইচ্ছা করিব। এই উদ্দেশ্যেই আমি আত্মোন্নতির জন্য যত্ন করিব; এই উদ্দেশ্যেই আমি আত্মাকে সদ্‌গুণ-নিচয়ে ভূষিত করিতে প্রয়াস পাইব। * * * অতএব মৃত্যুই আমাকে সেই অভিলষিত অবস্থায় লইয়া যায়। চিরদিন আমি যাহার জন্য যত্ন করিতেছি, কেবল মৃত্যুর মধ্য দিয়াই আমি তাহা লাভ করিতে পারি; আমার যতদূর উন্নতি ঈশ্বরের অভিপ্রেত, কেবল মৃত্যুর মধ্য দিয়াই তাহা সংসাধিত হইতে পারে।

মৃত্যুতেই আমার লাভ। উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পাইবার জন্য আমি অপকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করি; এই বিশ্বরূপ পৈতৃক গৃহে উচ্চতর আসনের জন্য আমি নিম্নতর আসন পরিত্যাগ করি। একটি আনন্দের অবস্থা লাভ করিবার জন্য আমি অপকৃষ্ট সুখের অবস্থা পরিত্যাগ করি;—সামান্য কীট জ্ঞান-বিশিষ্ট মনুষ্য হৃদয়ের আনন্দ যেমন অনুভূত করিতে পারে না, সেইরূপ, সেই উৎকৃষ্টতর আনন্দের অবস্থা যে কি, তাহা আমার সীমা-বিশিষ্ট পার্থিব বৃত্তি-নিচয় ধারণও করিতে পারে না। আমার বর্ত্তমান অবস্থা অভাবময়; কিন্তু আমি যেখানে যাইতেছি, সেখানে কিছুরই অভাব নাই, সেখানে বিন্দু-মাত্র জলে একটি সমুদ্র হইয়া যায়, স্ফুলিঙ্গ-মাত্র অগ্নিতে একটি সূর্য্য হইয়া যায়।

মৃত্যুতে আমার লাভ। অজানিত পথে ভ্রমণ করিতে হইবে বলিয়া আমার আত্মা ভীত হয় কেন? এই পৃথিবীতে আমাকে যে পথে চলিতে হইবে, তাহা কি আমি তদপেক্ষা ভালরূপ জানি? জীবনের প্রত্যেক

ভাবী মুহূর্ত্ত কি আমার নিকট অভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন নহে? ইহার পর মুহূর্ত্তে আমার কি হইবে, তাহা কি আমি জানিতেছি? আমি কোথায় যাইতেছি? না জানিলেও ঐ সকল মুহূর্ত্তে আমি জীবন ধারণ করিতেছি, যখন যে মুহূর্ত্তে প্রবেশ করিতেছি, তখনই তাহা আমার নিকট আলোকিত হইয়া উঠিতেছে।

মৃত্যুর পরে যে মুহূর্ত্ত আসিবে, তাহাও এইরূপ আলোকময় হইবে। সেই অপরিচিত পথে যখন প্রবেশ করিব, তখনই তাহা আমার নিকট পরিচিত হইয়া উঠিবে। তবে সেই পথ মনে করিতে আমি ভয়ে সঙ্কুচিত হইব কেন? আমার মৃত প্রেমাস্পদেরা যে পথে গিয়াছে, ইহা কি সেই পথ নহে? যাহারা চিরদিনই আমার নিকটে আদরের ধন, তাহারা যে পথে গিয়াছে, সে পথে যাইতে আমি আনন্দিত হইব না কেন? যে সকল আত্মীয় অতি দূরে আছেন বলিয়া আমি মনে করিতেছি; যখন আত্মা এই পার্থিব পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিবে, ঠিক সেই সময়েই হয়ত তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইব; তখন হয়ত জানিতে পারিব, তাঁহারা আমার এতই নিকটে ছিলেন যে, এই মাটির শরীর লইয়া তাহা অনুভব করিবার সাধ্য নাই।

সত্য সত্যই মৃত্যুতে আমার লাভ। সকল আত্মার পিতা যিনি, মৃত্যুতে তাঁহার সঙ্গে সংযোগ হয়; যাঁহাদিগের জন্য আত্মা সর্ব্বদা পিপাসিত, সেই স্বর্গগত প্রিয়তমদিগের সঙ্গে মৃত্যু পুনর্ম্মিলিত করিয়া দেয়; যাঁহাদিগের জন্য আজিও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, আজিও আমার চক্ষু অশ্রুবর্ষণ করিতেছে, মৃত্যু তাহাদিগের সঙ্গে মিলাইয়া দেয়। পুনর্ম্মিলন! পুনর্লাভ! নবীভূত জীবন! হে প্রেমাস্পদগণ! ঈশ্বর স্বহস্তে তোমাদিগকে আমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তোমাদিগকে আমার সঙ্গে বাঁধিয়া ছিলেন! আবার তোমাদিগকে পাইব! আবার তোমাদিগকে ভাল বাসিব! আবার তোমাদিগের সঙ্গে অনন্ত জীবনের জন্য সম্মিলিত হইব! এই চিন্তাতে কত আনন্দ! ঈশ্বর আমায় তোমাদিগকে মিলাইয়া দিয়াছেন; ঈশ্বর পূর্ণ প্রেমময়; মৃত্যু যে প্রেম নষ্ট করিতে পারে না, যে প্রেম অদৃশ্য রজ্জুর ন্যায় মরণ-শীল মনুষ্যকে অমরলোকের অধিবাসিদিগের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে, ঈশ্বর সেই প্রেম আমাদিগের মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন! যাহা সৎ, যাহা পবিত্র, ঈশ্বর তাহার ধ্বংস করেন না,—কেন না, ইহা তাঁহার নিজেরই কৃত! আত্মার সঙ্গে আত্মার সংস্রবে যাহা কিছু লাভ হয়, তন্মধ্যে প্রেমই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঈশ্বর নিজে অনন্ত-প্রেমময়, তাই তিনি জগৎকে আত্মাদিগের বাসস্থান করিয়াছেন।

মৃত্যুতে আমার লাভ। এই নিশ্বাসই আমার মৃত্যুশয্যার শেষ নিশ্বাস হউক; সৃষ্টিকর্ত্তার প্রেম, এবং যে সকল প্রেমাস্পদ ব্যক্তি আমার অগ্রগামী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রেম, মুমূর্ষু কালে আমার আত্মাকে ব্যাপৃত রাখুক। যে মহিমাময় রাজ্যে সেই সকল আত্মীয় প্রবেশ করিয়াছেন, শরীর পরিত্যক্ত হইবামাত্র আমার আত্মাও তথায় প্রবেশ করিবে।

* * * * * *

স্ত্রী-শিক্ষা।

এদেশে স্ত্রীলোকের শিক্ষার বিষয় এখনও একটা সমস্যার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। কেহ স্ত্রী-শিক্ষার একান্ত বিরোধী,—কন্যা লেখা পড়া জানে বলিয়া পুত্রের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিলেন না, প্রাচীন শ্রেণীতে এমন লোকও দেখা যায়। কেহ কেহ এ দলের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই দলের অনেকে স্ত্রী-শিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী; এমন কি, স্ত্রী-শিক্ষার অনুরোধে যদি পুরুষ-শিক্ষায় অবহেলা করিতে হয়, তাহাতেও বোধ হয় কেহ কেহ রাজি হইতে পারেন। কিন্তু এই দুই দলই সংখ্যায় ক্ষুদ্র; দেশের অধিকাংশ লোকেরাই স্ত্রী-শিক্ষা-সম্বন্ধে বর্ত্তমান অবস্থা এই যে, তাঁহারা স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কোন যত্ন, আন্দোলন বা চিন্তা করেন না, অথচ তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীন মহিলাগণ নিজের যত্নে কিছু শিখিয়া লইতে পারিলে তাহাতেও বাধা দেন না। তৃতীয় শ্রেণীর এই মৌন ভাব এবং উদাসীনতা স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে অনেকটা অনুকূল বলিতে হইবে। ফলতঃ তাঁহারা প্রতিকূলতা করিতেছেন না বলিয়াই বঙ্গদেশে নানা উপায়ে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার কতক পরিমাণে হইতেছে।

কিন্তু কথাটা চিরদিন একটা সমস্যার বিষয়ই থাকিয়া যায়, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের ক্ষেত্র পবিত্র অন্তঃপুর লইয়া যখন ইহার ব্যাপার, তখন একটা মীমাংসার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। এমন গুরুতর বিষয়ে একটা মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারিলে, একটা স্থিরতর ধারণা অবলম্বন না করিলে বিলক্ষণ অনিষ্টের সম্ভাবনা;—হয়ত আমাদের উদাসীনতার অবসরে এই শিক্ষার স্রোতঃ অলক্ষিত ভাবে এমন এক পথে চালিয়া যাইবে যে, তাহার গতি-পরিবর্ত্তন প্রার্থনীয়, অথচ সে কার্য্য সমাজ-হিতৈষীর সাধ্যাতীত। যথাসময়ে সাবধান হইলে অনেক সামাজিক গতিকে নিয়মিত করা যাইতে পারে, অনেক সামাজিক অনিষ্টকে নিবারণ করা যাইতে পারে।

কিন্তু মীমাংসা এক দলের যত্নে অসম্ভব,—এক ব্যক্তির যত্নে ততোধিক। যাহাতে সকলেরই স্বার্থ আছে, তাহার মীমাংসায় প্রত্যেক ব্যক্তিরই বিচারোন্মুখ চিত্তে যোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু বিষয়টাতে যখন এত মত-ভেদ রহিয়াছে, তখন অমার্জ্জিত-বুদ্ধি বিচারকেরা সকলে যোগ দিলে যে হট্টগোল উপস্থিত হইবে, তাহাতে মীমাংসার অতি অল্পই আশা করিতে পারা যায়। এই শ্রেণীর বিচারকেরা কোন বিষয়ে তর্ক আরম্ভ করিলে সত্যের প্রতি তত লক্ষ্য রাখেন না, নিজ-হৃদয়ের পূর্ব্ব-গঠিত মতকে সমর্থন করিবার জন্যই তাঁহারা ব্যস্ত থাকেন। এরূপে মতসমর্থী বিচার দ্বারা বিভিন্ন মতের একতা সম্পাদন অর্থাৎ মীমাংসার সম্ভাবনা নাই।

মীমাংসার পদ্ধতি স্বতন্ত্র। জ্ঞান, ধর্ম্ম ও চরিত্রে যাঁহারা প্রত্যেক দলের শীর্ষ-স্থানীয়, অথচ সত্যের অনুরোধে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিতে যাঁহারা অভ্যস্ত, সেই

সকল মহাত্মা এই গুরুতর বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে তবে সুফলের আশা করা যাইতে পারে। তাঁহারা সরল ভাষায় সত্য কথা প্রচার করিবেন, আর আপামর সাধারণে হৃদয়ের সহিত তাহা গ্রহণ করিবে, তবেই একটা মীমাংসা হইল বলিয়া মনে করিতে হইবে। দেশের অধিকাংশ লোকই যদি সত্য অপেক্ষা মতেরই অধিক আদর করে, তাহা হইলে এসকল সত্য তাহারা গ্রহণ করিবে কেন? এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে আশঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই। আবর্জ্জনাদ্বারা আবর্জ্জনা দূর হয় না, কিন্তু একটুকু আগুন লাগাইয়া দেও, সমস্ত ভস্ম হইয়া যাইবে। এক প্রকার ভ্রান্ত-মতের প্রভাবে অন্য প্রকার ভ্রান্ত-মতের নিরসন না হইতে পারে, কিন্তু সত্যাগ্নি জ্বালিয়া দেও, দেখিতে দেখিতে ভ্রান্ত-মতের আবর্জ্জনা-রাশি পুড়িয়া যাইবে। সূর্য্য উদিত হইলে অন্ধকার কি থাকিতে পারে? বহির্জ্জগতের যে কথা, এ সম্বন্ধে অন্তর্জ্জগতেরও সেই কথা। যখন দেখিবে সত্য-প্রচারের যত্ন হইতেছে, অথচ সাধারণের হৃদয়ে তাহা প্রভাব বিস্তার করিতেছে না, তখন বুঝিবে, সেই সত্যের সঙ্গে অসত্য কিছু মিশ্রিত রহিয়াছে,—এমন কোন একটা প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, যাহাতে সত্যের সমস্ত শক্তি, সমস্ত তেজ অসত্যকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না।

স্ত্রী-শিক্ষা-সম্বন্ধে অপরাপর সমাজের অগ্রণীগণ অনেক কথা বলিয়াছেন, অনেক কথা বলিতেছেন; কিন্তু যে দুই সমাজ দ্বারা ভারতের অস্থি-মজ্জা গঠিত, সেই হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের দলপতিগণ এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে বলার মত কোন কথাই বলেন নাই,—যেমন করিয়া বলিলে তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিয়া সাধারণ লোকে একটা মীমাংসাতে উপনীত হইতে পারে, তেমন করিয়া কিছুই বলেন নাই।

মৌনাবলম্বন অনেক সময়ে বিজ্ঞতার পরিচায়ক হয় বটে, কিন্তু সকল সময়ে নহে। রাজ-পথে দাঁড়াইয়া থাক, কেহ জিজ্ঞাসা না করিলেও সকলকেই পথ দেখাইয়া দেও, লোকে উপহাস করিবে, অনেকে ভৎর্সনা করিবে। কিন্তু যখন একদল যাত্রী সঙ্কট-স্থলে উপস্থিত হইয়াছে, প্রকৃত পথ জানিতে না পারিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তখনও কি তুমি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিবে? বরং উপযাচক হইয়া কি তখন তাহাদিগকে প্রকৃত পথ বলিয়া দেওয়া উচিত নহে? শ্রদ্ধাবান্ হিন্দু ও মুসলমান এখন পণ্ডিত ও মৌলবীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে,—স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া স্ত্রী-শিক্ষা-সম্বন্ধে তাঁহারা কি বলেন, শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এ অবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য, পণ্ডিতবর্গ ও মৌলবীগণ তাহা করুন। প্রকৃত কাযের সময়ে তাঁহারা উদাসীন থাকিবেন, আবার সমাজ ছত্র-ভঙ্গ হইয়া গেল বলিয়া আক্ষেপ করিবেন, ইহা ভাল দেখায় না। সমাজ ছত্র-ভঙ্গ হইবার নানা কারণ থাকিতে পারে; কিন্তু যে স্থলে তাঁহাদের উদাসীনতাই ইহার কারণ, সে স্থলে সমাজ তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিবে না।

যদি সমাজ-পতিগণ স্ত্রী-শিক্ষা-বিষয়ে

আপন আপন মত ব্যক্ত করেন, তবে আমরা সাগ্রহে তাহা শুনিয়া উপকৃত হইব। কিন্তু যতদিন তাঁহারা কিছু বলিবেন না, ততদিন আমরাও কি নীরব থাকিব? ঘরে আগুন লাগিয়াছে; বোমকল আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া কি যাহার যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিব না? আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধ এইরূপ একটি ক্ষুদ্র চেষ্টা মাত্র।

স্ত্রী-শিক্ষা-সম্বন্ধে কথা উঠিলেই সর্ব্বাগ্রে একটি অতি মোটা প্রশ্ন উপস্থিত হয়; সেই প্রশ্নটি এই,—স্ত্রী-শিক্ষা উচিত কি না? যে ভাষায়, যে ভাবে, যে কৌশলেই প্রশ্নটি উপস্থিত হউক না কেন, ডালপালা বা পোষাক-পরিচ্ছদ বাদ দিয়া কেবল মূল ভাবটা ছাঁকিয়া লইলে প্রশ্নটা এই আকারেই দাঁড়াইবে,—স্ত্রী-শিক্ষা উচিত কি না?

অতি মোটা হইলেও প্রশ্নটি যখন সকলের আগে স্থান পাইয়াছে, তখন সকলের আগেই তাহার সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলিবার পূর্ব্বে প্রশ্নকর্ত্তাকে আমরা কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। আমাদের কথাগুলি এই;—স্ত্রীদিগের আহার করা উচিত কি না? স্ত্রীদিগের পান করা উচিত কি না? স্ত্রীদিগের নিদ্রা যাওয়া উচিত কি না? অথবা এক কথায়, স্ত্রীদিগের বাঁচিয়া থাকা উচিত কি না? এসকল কথা যদি প্রশ্নকর্ত্তার বিচারে "উচিত" হয়, তবে আমরা বলিব, স্ত্রী-শিক্ষাও উচিত। আর এসকল যদি তিনি অনুচিত মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহার কথা আমরা বুঝিতে পারিব না, সুতরাং বাক্যব্যয় নিরর্থক।

কথা কয়টি শুনিয়া হয়ত পাঠক উপহাস করিবেন; বলিবেন,—এ আবার কি রকম কথা হইল? আহার করা আর শিক্ষা করা কি সমান? বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষা নাই, অথচ লক্ষ লক্ষ স্ত্রী বাঁচিয়া রহিয়াছে, কিন্তু আহার না করিয়া কে কয় দিন বাঁচিতে পারে?

কিন্তু একটুকু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, জীব-দেহের পক্ষে আহার পানীয়ের যেরূপ প্রয়োজন, সামাজিক মনুষ্যের পক্ষে শিক্ষারও সেইরূপ প্রয়োজন। প্রাকৃতিক অবস্থায় বিনা শিক্ষায় মানুষের চলিতে পারে কি না ঠিক জানি না; কিন্তু সামাজিক অবস্থায় বিনা শিক্ষায় যে তাহার চলিতে পারে না, এ কথা কতকটা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে। পাঠক বিশ্বাস না করেন, প্রমাণ দিতে রাজি আছি। গৃহে যাইয়া গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করুন কন্যাকে কোনরূপ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে কি না, তাহা হইলেই আমাদের কথার প্রমাণ পাইবেন। কন্যার জন্মদিন হইতে পিতা হয়ত পাত্রের চিন্তায় বিভোর আছেন, কাযেই কন্যার শিক্ষা হইতেছে কি না সে খবর রাখেন না; কিন্তু কন্যার মাতাকে তাহার শিক্ষার জন্য বিলক্ষণ খাটিতে হয়। চুল বাঁধা, পান সাজা, বাটনা বাঁটা, ভাত রান্না—কত বলিব? পিতৃগৃহ বালিকার পক্ষে বিদ্যালয় এবং কারখানা উভয়ই। বালকের ন্যায় বালিকা কেবল পুস্তকগত উপদেশ শুনিয়াই নিশ্চিন্ত নহে; শিক্ষয়িত্রী জননীর মুখে যে উপদেশ শুনিতেছে, বিপুল যত্নে তখনই তাহা কার্য্যে

পরিণত করিতেছে। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্তদিন বালিকার মস্তিষ্ক এবং হস্ত যে ভাবে চলে, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিলে পাঠক বুঝিবেন, বালকের পুস্তকগত বিদ্যা অপেক্ষা বালিকার এই শিক্ষা কত উন্নত, কত স্বাস্থ্যকর, কত হিতকর।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে শিক্ষা সামাজিকের পক্ষে অন্ন-জলের ন্যায় অপরিহার্য্য তাহা উচিত কি না, এ প্রশ্নটা কত মোটা।

তবে, পুরুষেরা যেরূপ শিক্ষা পাইতেছে, বিদ্যালয়ে যেরূপ শিক্ষা হইতেছে, প্রচলিত পাঠ্য পুস্তক যেরূপ শিক্ষা দিতেছে, ইংরাজ জাতি যেরূপ শিক্ষার প্রশংসা করিতেছে ও যে বিষয়ে আদর্শ দেখাইতেছে,—সেইরূপে, সেই আদর্শে ভারতবর্ষীয় মহিলাদিগের শিক্ষা হওয়া উচিত কি না, এ সকল বিষয় অবশ্যই বিচার্য্য, এবং এই বিচারণার উপরেই ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার সুফল বা কুফল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

শরীর-রক্ষার জন্য আহার অবশ্য-কর্ত্তব্য, কোন মূর্খ ইহা অস্বীকার করিবে না। কিন্তু আহার কর্ত্তব্য বলিয়া কি যাহা তাহাই আহার করিতে হইবে? অথবা একরূপ খাদ্য কি সকলের পক্ষেই পথ্য বলিয়া ব্যবস্থা হইবে? নূতন দন্ত উঠিলে বালক যাহা পায় তাহাই খাইতে পারে,—খাইয়া ফেলে; কিন্তু তাহাতে কি বালকের পীড়া হয় না, অথবা পিতামাতা কি তাহার রসনার প্রসরে বাধা দেন না? গো-মাংসাদি বিলাতে ইংরাজের প্রকৃতিতে সহ্য হয়, কিন্তু ভারতে আসিয়া অনেক ইংরাজও অনিষ্টের আশঙ্কায় সে অভ্যাস ছাড়িয়া দেন; কিন্তু যে সকল ভারতবাসী অনুকরণ-প্রবণতায় দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞান-শূন্য হইয়া পানাহার প্রভৃতি বিষয়ে ইংরাজের অনুকরণ করে, তাহাদিগকে কি সে জন্য ভুগিতে হয় না?

নিতান্ত অন্ধ না হইলে বলিতে হইবে, রমণীর শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। এই শিক্ষার পরিমাণ কি হওয়া উচিত, এ প্রশ্নের উত্থাপনও অনাবশ্যক। পিপাসায় জলের পরিমাণ কি হওয়া উচিত; ক্ষুধায় অন্নের পরিমাণ কত হওয়া উচিত, এ বিষয়ের একটা আইন আদালত নাই, প্রকৃতি সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেছে। তবে স্ত্রী-শিক্ষার বিষয় এবং প্রণালী অবশ্য বিচার্য্য; বাস্তবিক কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলের শিক্ষা-সম্বন্ধেই বিষয় এবং প্রণালী-নির্দ্ধারণ সকলের অগ্রস্থান অধিকার করিয়াছে, এবং এই দুই বিষয়ের সঙ্গত অবধারণের উপরেই শিক্ষার ভাবী ফলাফল,—সমাজের ভাবী উন্নতি-অবনতি, প্রত্যেক ব্যক্তির ভাবী সুখ-দুঃখ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

সৌভাগ্যক্রমে স্ত্রী-শিক্ষার প্রকৃত বিষয় এবং প্রকৃষ্ট প্রণালী অবধারণ করিবার পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইয়াছে,—ইংলণ্ড এবং আমেরিকা এ বিষয়ে আমাদিগকে অনেক সাহায্য করিবে। সকল বিষয়েই যাহারা আগে চলে তাহাদের বাহাদুরি অধিক, আর যাহারা পশ্চাতে চলে তাহাদের সুবিধা অধিক। ইংলণ্ড এবং আমেরিকা

আগে চলিতেছেন, বিপদ আপদ যাহা কিছু তাঁহাদিগের উপর দিয়াই যাইতেছে; আমরা দেখিয়া শিখিয়া সাবধান হইয়া চলিতে পারিলে অনেকটা নিরাপদ থাকিবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বে যে বলিলাম ইংলণ্ড এবং আমেরিকা আমাদিগকে সাহায্য করিবে, সেই সাহায্য, সেই উপকার,—তাহাদের বিপদ দেখিয়া আমাদের সাবধান হওয়া; ইহা সামান্য সাহায্য নহে।

সকল দেশেই ভাল মন্দ আছে; আমেরিকা এ নিয়মের বহির্ভূত নহে। কিন্তু আমেরিকার রমণী-সমাজের যেরূপ বিশৃঙ্খলতার সংবাদ সময়ে সময়ে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা যদি শিক্ষার দোষে ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে, সেরূপ শিক্ষা হইতে ভারত-মহিলাকে যতদূরে রাখিতে পারা যায়, ততই ভাল। আমাদিগের দেশে ব্রাহ্মেরাই স্ত্রী-শিক্ষা-বিষয়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য; কিন্তু তাঁহারাও যখন আমেরিকার ঐরূপ বিশৃঙ্খলতা অনুমোদন করেন না, তখন আশা হয়, অদ্য হউক কল্য হউক, এক দিন ভারত-রমণীর শিক্ষার প্রকৃত বিষয় নির্দ্ধারিত হইবে, প্রকৃষ্ট প্রণালী উদ্ভাবিত হইবে—অন্ধভাবে অন্য জাতির অনুকরণ করিয়া ভারত-সমাজ রসাতলে যাইবে না।

অনুকরণের ধর্ম্ম এই, চক্ষে একবার চটক লাগিয়া গেলে অনুকারী ভাল মন্দ আর দেখিতে পায় না, অবিতর্কে অনুকৃত ব্যক্তির সমস্তই অনুকরণ করিতে থাকে। সে চটক ভাঙ্গে কখন?—যখন অনুকৃতের ভর্ৎসনা কর্ণে প্রবেশ করে! কৃষ্ণাঙ্গের সাহেবী সাজে, কৃষ্ণাঙ্গীর বিবিয়ানা সাজে দৃশ্যটি কেমন মধুর হয়, তাহা অনেকেই দেখিয়া চক্ষু-সার্থক করিয়াছেন; কিন্তু দেশী লোকের ঘৃণা-বিদ্রূপ এই অনুকারিদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই—অনুকৃত দেশ হইতে ঘৃণা-বিদ্রূপ না আসিলে ইঁহাদিগের চৈতন্যোদয় হইবার আশা নাই! আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব লাট-পত্নী বেথুন কলেজে বঙ্গ-বালাদিগকে বিলাতী অনুকরণে সজ্জিত দেখিয়া যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সুফল কথঞ্চিৎ ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

এখন আমাদিগকে স্ত্রী-শিক্ষার বিষয় নির্দ্ধারণ এবং প্রণালী উদ্ভাবন করিতে হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে আর একটি কথার আলোচনা অপরিহার্য্য। সেই কথাটি—শিক্ষা, শক্তি, এবং অধিকার—এই তিনের মধ্যে সামঞ্জস্য-রক্ষা। এই জটিল কথাটির মীমাংসা যত পরিষ্কার হইবে, বিষয়-নির্দ্ধারণ এবং প্রণালী-উদ্ভাবন ততই সহজ হইয়া উঠিবে। অতএব শিক্ষা, শক্তি এবং অধিকার, এই তিনের সামঞ্জস্য কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে, আমরা আগে তাহাই আলোচনা করিয়া দেখিব।

(ক্রমশঃ)।

উদ্দালক, উপমন্যু ও বেদ।

অতি প্রাচীনকালে আয়োদ-ধৌম্য নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার তিন জন শিষ্য ছিল। প্রথম আরুণী (ইনি পঞ্চাল দেশ-বাসী), দ্বিতীয় উপমন্যু এবং তৃতীয় বেদ। এক দিবস গুরু আয়োদ-ধৌম্য শিষ্যকে পরীক্ষা করিবার মানসে আরুণীকে কহিলেন "বৎস আরুণি! তুমি আমার ক্ষেত্রের আলি বন্ধন করিতে যাও।" শিষ্য আদেশ প্রাপ্তি মাত্র শস্য-ক্ষেত্রে গমন করিল, কিন্তু আলি বন্ধন করিতে পারিল না। যুবক আরুণী নখ এবং দশন দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া আলি বন্ধন করিতে প্রভূত চেষ্টা করিল, তথাপি জল-বেগ প্রতিহত হইল না। তখন শিষ্য মনে করিল, "হায়! আমার সমস্ত যত্ন ব্যর্থ হইল, এখন উপায় কি? আমি এমনি অপদার্থ যে, গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইলাম না, আমার জীবন-ধারণই বৃথা হইল।" অবশেষে শ্রীমান্ আরুণী জল-প্রবাহ মধ্যে শুইয়া রহিল। জলস্রোতও বন্ধ হইয়া গেল। এদিকে গুরু শিষ্যের প্রত্যাবর্ত্তন সময় অতীত হইলে পর অন্য শিষ্যকে "আরুণী কোথায়?" প্রশ্ন করিলেন। শিষ্য উত্তর করিল, "আরুণী ক্ষেত্রের আলি বন্ধন করিয়া এখন পর্য্যন্ত আশ্রমে প্রত্যাগত হন নাই।" তখন গুরু আয়োদ ধৌম্য সশিষ্যে শস্যক্ষেত্রে যাইয়া প্রিয় শিষ্য আরুণীকে আহ্বান করিলেন। আরুণী গুরু আহ্বান করিতেছেন শুনিয়া আলি হইতে গাত্রোত্থান করিল, এবং গুরুর সাক্ষাতে আগমন পূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে গুরুর চরণ বন্দন করিয়া সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিল। গুরু শিষ্যের ঐকান্তিক গুরু-ভক্তি, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, এবং কষ্টসহিষ্ণুতা দেখিয়া তাহাকে মধুর বচনে কহিলেন "বৎস আরুণি! আর তোমাকে আমার আশ্রমে থাকিয়া ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না; আমার আশীর্ব্বাদে সমস্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্রে এবং বেদে তোমার দিব্য জ্ঞান জন্মিবে। তুমি ক্ষেত্রের আলি ভেদ করিয়া উঠিয়াছ, অতএব অদ্য হইতে তুমি উদ্দালক নামে অভিহিত হইবে, এক্ষণে স্বালয়ে প্রতিগমন কর।" শিষ্য গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পুরঃসর তাহাই করিল।

এখন আবার দ্বিতীয় শিষ্য উপমন্যুর গৃহ গমনের সময় উপস্থিত, অতএব তাহার পরীক্ষা আরম্ভ হইল। গুরু আয়োদ-ধৌম্য উপমন্যুকে গোচারণে নিযুক্ত করিলেন। কতিপয় দিবস পরে একদা গুরু শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস উপমন্যো! তোমার ভিক্ষালব্ধ সমস্তই যথারীতি আমাকে অর্পণ করিয়া থাক, সুতরাং তুমি অনাহারে সারাদিন শীতাতপ সহ্য করিয়া গো চরাইতেছ, তথাপি তোমার কলেবর পূর্ব্বের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট থাকিবার তাৎপর্য্য কি?" শিষ্য কহিল "দেব! আমি প্রথমবারের ভিক্ষা-লব্ধ দ্রব্য আপনার চরণে অর্পণ করিয়া থাকি, দ্বিতীয়বার ভিক্ষা করিয়া

যাহা পাই তদ্দ্বারাই পর্যাপ্ত পরিমাণে আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া থাকে; অতএব আমার শারীরিক কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।” তখন গুরু একটু উগ্রভাবে কহিলেন “বৎস! শিষ্য যতদিন গুরু-গৃহে অবস্থান করে, ততদিন শিষ্যের উপার্জ্জিত ধনে গুরুরই সম্পূর্ণ অধিকার;—তুমি আমার বস্তু আমাকে না বলিয়াই গ্রহণ করিতেছ, বিশেষতঃ দুইবার ভিক্ষা করাতে সাধারণ ভিক্ষা-জীবিগণের অনিষ্ট করিতেছ। তুমি দুইবার করিয়া ভিক্ষা করিলে আর কেহ ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে সম্মত হইবে না। দেখ, তোমার উদর পূর্ত্তির জন্য প্রথমতঃ গুরুস্ব-হরণ, দ্বিতীয়তঃ বহু লোকের অনিষ্টোৎপাদন করিতেছ। ইহাতে বিশদ রূপে দেখা যায় যে, তুমি লোভকে বশীভূত করিতে পার নাই, তুমি নানাবিধ শাস্ত্রে বিজ্ঞ হইয়াও লোভের বশবর্ত্তী রহিয়াছ, ইহা বড়ই লজ্জার কথা! শিষ্য গুরু-বাক্য শ্রবণে স্বকীয় কৃত কার্য্যের জন্য অনুশোচনা করিল এবং আর দুই বার ভিক্ষা করিবে না বলিয়া পুনরায় স্বকার্য্যে প্রস্থান করিল। শিষ্য আবার গোচারণ করিতে যায়, আবার পূর্ব্ব নিয়মানুসারে প্রতি রাত্রিতে গুরুকে প্রণাম করিতে আইসে। আর এক দিন গুরু শিষ্যকে বলিলেন “বৎস! তোমাকে এখনও যে বেশ পূর্ব্ববৎ দেখিতেছি, ইহার কারণ কি?” শিষ্য কহিল “গুরো! এখন আর আমি দুইবার করিয়া ভিক্ষা করি না, তবে গোবৎসগণ মাতৃস্তন্য পান করিলে ইহাদের মুখে যে দুগ্ধ-ফেণ লাগিয়া থাকে, তাহাই অঙ্গুলী দ্বারা মোক্ষণ করতঃ লেহন করি, ইহাতেই পূর্ব্ববৎ রহিয়াছি।” তখন গুরু বলিলেন, “বৎস! গো-বৎসগণের মুখ সংলগ্ন দুগ্ধ-ফেণ ইহারা সময়ান্তরে উদরস্থ করিয়া থাকে, সুতরাং তুমি গো-বৎসগণের আহার্য্য হরণ করিতেছ, এবং আমিও তোমাকে ইহা পান করিতে অনুমতি দেই নাই। আমার অনুজ্ঞা ব্যতিরেকে দুগ্ধ-ফেণ ভক্ষণে তোমার দ্বিবিধ পাপ অর্জ্জিত হইতেছে। বাছা! একবার চিন্তা করিয়া দেখ, তুমি আজও লোভকে পরাজয় করিতে পারিলে না।” শিষ্য তাদৃশ বাক্য শ্রবণে অতীব লজ্জিত হইল, এবং পুনরায় স্বকার্য্য সাধনে চলিয়া গেল। পর দিবস যথাসময়ে শিষ্য আর গুরু সমীপে আসিতে পারিল না, ইহাতে গুরু শিষ্যের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া অতি সত্বরে উপমন্যুর অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। তিনি শিষ্যকে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে তিনি শুনিতে পাইলেন, এক কূপ হইতে শিষ্য উত্তর করিতেছে। আয়োদধৌম্য শব্দ-লক্ষ্য-ক্রমে কূপের নিকটবর্ত্তী হইয়া শিষ্যকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শিষ্য বিনীত ভাবে বলিল “আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করিয়াছিলাম, জঠর জ্বালায় অধীর হইয়া আপনার আদেশ ব্যতীত অর্কপত্র দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিয়াছি বলিয়াই আমার চক্ষু রত্ন হারাইয়াছি। গুরো! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।” তখন গুরু বলিলেন, “বৎস! তুমি দেববৈদ্যকে স্তব কর, অবশ্য তোমার চক্ষু-রত্ন পুনঃ প্রাপ্ত হইবে।” শিষ্য গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাহাই করিল। অশ্বিনী

কুমার-দ্বয় তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়া তথায় উপনীত হইলেন, এবং উপমন্যুকে কহিলেন, "বৎস! আমরা তোমার স্তবে পরিতৃপ্ত হইয়াছি, তোমাকে এই অপূপ দিলাম, ইহা ভক্ষণ কর, তবেই পুনরায় চক্ষুষ্মান হইবে।" উপমন্যু কহিল, "দেব! আমি অন্ধ, গুরু কোথায় আছেন জানি না, আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া কখনও এই পিষ্টক ভক্ষণ করিব না।" দেব-বৈদ্য বলিলেন, "বৎস! তোমার গুরু একবার বিপন্নাবস্থায় আমাদিগকে স্মরণ করিয়াছিল, তাহাকেও আমরা এইরূপ একখণ্ড পিষ্টক দিয়াছিলাম, তাহা সে গুরুকে নিবেদন না করিয়াই ভক্ষণ করিয়াছিল, সুতরাং তুমি তোমার গুরুর কৃতকার্য্যের ন্যায় কার্য্য করিলে, অযশস্বী হইবে না। তুমি এই পিষ্টকখানা খাও।" উপমন্যু কহিল "গুরু যাহাই করিয়া থাকুন না কেন, আমি কখনও গুরুকে নিবেদন না করিয়া ইহা ভক্ষণ করিব না।" তখন দেববৈদ্যদ্বয় কহিলেন "বৎস! তোমার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, এবং গুরুভক্তি দেখিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলাম, আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার চক্ষুর্দ্বয় পুনঃপ্রাপ্ত হও, পরকালে তোমার শ্রেয়ঃ হইবেক।" এই বলিয়া দেববৈদ্য প্রস্থান করিলেন। শিষ্যও আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক গুরুকে প্রণাম করিয়া সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিল। গুরু শিষ্যকে অতি আহ্লাদ সহকারে বলিলেন, "বৎস! তুমি গুরুভক্তির আদর্শস্থল, তুমি যে গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছ, ইহাতে আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি সংসারে প্রবল প্রতিভার সহিত বাস করিবে, এবং তোমার অধীত শাস্ত্র সমুদয় অবিরত তোমার স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিবে। এখন তুমি দেশে প্রতিগমন কর।" শিষ্য পরদিবস গুরুকে প্রণাম করিয়া তাহাই করিল।

যদি আজ পর্য্যন্ত ছাত্রদিগের জন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবশ্য পালনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকিত, তাহা হইলে কি আমাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিত? তাহা হইলে ঘরে ঘরে আরুণী ও উপমন্যু বিরাজ করিয়া সোণার ভারতকে স্বর্গে উন্নীত করিত। কেবল ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের প্রসাদে উপমন্যু দেববৈদ্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। যদি উপমন্যু নিষ্ঠাবান্ কষ্টসহিষ্ণু এবং অধ্যবসায় ও ভক্তিশীল না হইত, যদি গুরুর প্রতি তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা না থাকিত, তবে কি আর চক্ষুলাভ করিতে সমর্থ হইত? কেবল ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অভাবেই আমরা আমাদের ভাবী কালের একমাত্র ভরসাস্থল ছাত্রদিগকে মনোমত আকারে পাইতেছি না।

উপাধ্যায় আয়োদ-ধৌম্য পূর্ব্বোল্লিখিত শিষ্যদ্বয়কে বিদায় দিয়াছেন, এখন তৃতীয় শিষ্য বেদ গুরু-গৃহে রহিলেন। পূর্ব্বে তিনজনে মিলিয়া যে কার্য্য করিতেন, এখন বেদকে একাকী সে সমস্ত কার্য্য সমাপন করিতে হয়, সুতরাং তাঁহার ত্রিগুণ পরিশ্রম করিতে হয়। যদিও অমানুষিক পরিশ্রমে বেদের শারীরিক বল ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতেছিল, তথাপি বেদ, গুরু যখন যে আজ্ঞা করেন, তাহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া, শীতাতপ ক্ষুৎপিপাসাকে জ্ঞান না করিয়া,

অবিবাদিত চিত্তে গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিতে তৎপর হইতেন। এইরূপে বহুকাল গত হইলে উপাধ্যায় তুষ্ট হইয়া বেদকে বিদায় দিলেন। বেদ উৎফুল্ল মনে গুরুকে অভিবাদন করিয়া আলয়ে প্রতিগমন করিলেন।

মন্তব্য।

আমরা ইচ্ছা করিয়াছিলাম বর্ষশেষে লেখকদিগের নাম প্রকাশ করিব; কিন্তু এখন দেখি, তাঁহাদিগের অনেকেই নামের প্রয়াসী নহেন, তাঁহারা সকলেই অন্তরালে থাকিয়া মাতৃ-ভূমির জন্য খাটিতে উৎসুক। সম্পাদক তাঁহাদিগের হস্ত-স্থিত যন্ত্র-বিশেষ, সুতরাং তাঁহাদিগের এ অনুজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য। পাঠকদিগের কৌতূহল আপাতত অপরিতৃপ্ত রহিল, এজন্য সম্পাদক দুঃখিত। পাঠকবর্গ অবশ্য অবগত আছেন, লেখকেরা অর্থগ্রহণ করিয়া সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন; দরিদ্র পরিচর যে অর্থদানে অসমর্থ, এ কথার উল্লেখই নিষ্প্রয়োজন; পরন্তু অনেক লেখক পত্রিকার বার্ষিক মূল্যটি পর্য্যন্ত দিয়াছেন, সম্পাদক তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস পান নাই। বোধ হয় সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে পরিচরের প্রতি লেখকদিগের এই অনুগ্রহ সম্পূর্ণ নূতন। পরিচরের লেখকদিগের অবিমিশ্র নিঃস্বার্থতা সম্বন্ধে ইহার উপরে আর কি প্রমাণ দিব? এখন পাঠকগণ আশীর্ব্বাদ করুন, লেখকদিগের এই উৎসাহ এবং নিঃস্বার্থ পরিশ্রম যেন সফল হয়।

পরিচরের হিতৈষী এবং বিশেষ সাহায্যকারী একজন বন্ধু লিখিয়াছেন;—"বাস্তবিকই কাগজখানি ভাল চলিতেছে। *** একটু একটু করিয়া শিক্ষা-পরিচর বাল্য-দশা ছাড়াইয়া যৌবনে যেন পা দিতেছে—ভাষার ওজন চড়িতেছে, ভাবের গাম্ভীর্য্য বাড়িতেছে, বালকদিগের দন্তপাটী চূর্ণ হইবার মত ভাব ও ভাষা আরম্ভ হইয়াছে। কাগজখানি একদিকে খুব উচ্চদরের মাসিক পত্রের স্থানে দাঁড়াইতে চলিতেছে, কিন্তু ভয়ের কথা এই যে, সেই পরিমাণে ইহা বালক বালিকার অপাঠ্য হইতেছে।" বন্ধুর ভীত হইবার কারণ নাই। শিক্ষা-পরিচর বালক, শিক্ষক, এবং অভিভাবক, সকলেরই কাগজ। শিক্ষা-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকভাবে যে সকল প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে, প্রধানতঃ শিক্ষক এবং অভিভাবকই তাহাদিগের উপযুক্ত পাঠক; তদ্ভিন্ন বালকদিগের যুগপৎ আমোদ ও উপদেশের জন্য এখন যেরূপ প্রবন্ধ থাকিতেছে, চিরদিন সেইরূপই থাকিবে। পত্রিকার আকার ক্ষুদ্র হওয়াতে অবশ্যই কতকটা অসুবিধা হইয়াছে, কিন্তু ইহা আপাতত অনিবার্য্য; কাগজ বড় করিয়া অল্পদিনের

মধ্যে বদ্ধ করা অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তনের কাগজকে দীর্ঘকাল স্থায়ী রাখা আমরা প্রার্থনীয় মনে করি।

নওগাঁ উচ্চশ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধানপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র কাব্য-রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন ;—"আমার মতে ছবির জন্য নিরর্থক অর্থব্যয় না করিয়া অতিরিক্ত অংশে পদ্য-গদ্যময় অধিক পরিমাণে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে সমধিক ফলোপধায়ক হইতে পারে। আর শিক্ষা-পরিচয় বাহির হওয়ায় একটি অভিনব সাহিত্য-প্রস্রবণ আবিষ্কৃত হইল, ইহা অনেকে স্বীকার করিতেছেন ; সুতরাং তদ্বিষয়ে অর্থব্যয়ই ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত বোধ হয়।" পণ্ডিত মহাশয় ছবির প্রস্তাব শুনিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, আশা করি ছবি দেখিয়া তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। শিক্ষা-পরিচয়ের ছবি কেবল বালকদিগের আমোদের জন্য নহে ; আমোদের সঙ্গে সঙ্গে গভীরভাবে হৃদয়-স্পর্শিনী শিক্ষা ইহার উদ্দেশ্য,—ইহাতে বালকের হৃদয় এবং মস্তিষ্ক যুগপৎ পরিচালিত হইবে। তবে এই শিক্ষাতে শিক্ষকের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে,—আশাকরি শিক্ষক মহোদয়গণ বালকদিগকে ছবিগুলি একটুকু যত্ন করিয়া বুঝাইয়া দিবেন।

রাজসাহী জেলার স্কুল-সমূহের ডিপুটি ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন ;—"এই পত্রিকা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। "শিক্ষা-পরিচয়" পাঠে সকলেরই, বিশেষতঃ তরুণ বয়স্ক বালকদের বিশেষ উপকার হইবে। আজ কাল বিদ্যালয়ের বালকদের নীতিশিক্ষার জন্য যেরূপ আন্দোলন হইতেছে, তাহাতে "শিক্ষা-পরিচয়" অনেক অংশে বালকদের সাধুজীবন গঠিত করিবার সাহায্য করিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমার মতে সকল বিদ্যালয়ের বালক বালিকাদের এই পত্রিকা পাঠ করিয়া নিজ নিজ জীবন প্রথম হইতেই সুগঠিত করা উচিত। "শিক্ষা-পরিচয়ের" উন্নতি জন্য শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই সাহায্য করাও উচিত।" উক্ত মহোদয়ের এই কথাগুলি যে বিশেষ মূল্যবান্, তাঁহার এইরূপ মত যে শিক্ষা-পরিচয়ের পক্ষে অত্যন্ত আশাপ্রদ ও গৌরবের কারণ, এ কথা বলা বাহুল্য।

জাতুয়া বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নীলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন ;—"পরিচয়ের উদ্দেশ্য যেমন মহৎ, রচনা তেমনি প্রাঞ্জল, ভাষা মধুর, কাগজ উৎকৃষ্ট এবং ছাপাও বেশ পরিষ্কার। অথচ মূল্যও সুলভ। তাহাতে আবার পুরস্কারের নিয়ম থাকায় পরিচালকের উদারতা ও দেশ-হিতৈষিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। ফলতঃ পরিচয়ের কার্য্য-ভার যে উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত হইয়াছে, তাহার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। যদি বাঙ্গালীর জাতীয় অভাব—একতা ও দৃঢ়তার অভাব না হয়, যদি বাঙ্গালী আত্ম-গৌরব-লাভে পরাঙ্মুখ না হয়, তবে কখনই পরিচয়ের

উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে না।" পণ্ডিত মহাশয়ের উৎসাহ বাক্যে এবং আশীর্ব্বাদে অনুগৃহীত হইলাম।

এতক্ষণ সুখের কথা বলিলাম, পাঠকদিগকে দুইটি দুঃখের বিষয়ও জানাই। অনেকে গ্রাহক হইবার সময়ে লিখিয়াছেন, অনেক পত্রিকা বাহির হইয়াই বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং দুই চারি সংখ্যা বাহির না হইলে বিশ্বাস করা যায় না। এই সকল গ্রাহকের সাধুতা পরীক্ষা করিবার জন্য আমরা প্রথম হইতেই তাঁহাদের নিকট পত্রিকা পাঠাইতেছি; কিন্তু দুঃখের বিষয়, দুই চারি মাসের স্থলে এক বৎসর অতীত হইল, তথাপি বিশ্বাস করিয়া মূল্য পাঠাইবার পথে কি অন্তরাল রহিল, আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা আশা করি এই সকল গ্রাহক অচিরে মূল্য প্রেরণ করিয়া নিজ নিজ সাধুতার পরিচয় দিবেন।

সাধারণ-কার্য্যে পরস্পরকে বিশ্বাস না করিলে চলে না, তবে কে বিশ্বাসের যোগ্য, কে অযোগ্য, ফল না দেখিলে তাহা অবধারণ করা যায় না। আমরা এযাবৎ অবিশ্বাসের কায কিছু করি নাই, সুতরাং পাঠক মহোদয়গণ আমাদের কথায় এখনও অবিশ্বাস করিবেন না, এমন আশা করা যায়। তাঁহাদের অবগতির জন্য আমরা এ স্থলে বলিতেছি, যদি দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত মূল্যের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে পত্রিকা দিতে না পারি, তবে অনুপাত কসিয়া অবশিষ্ট মূল্য ফেরত পাঠাইব। এ পর্য্যন্ত কোন সম্পাদক বোধ হয় এরকম প্রতিশ্রুত হন নাই, আমরা তাহাও করিলাম, ইহার অধিক আমাদের সাধ্য নাই।

ষষ্ঠ সংখ্যা পরিচর আশ্বিনের প্রথমেই বাহির হয়, কিন্তু ছুটি উপলক্ষে অনেকেই পত্রিকা পাইবার পূর্ব্বে স্থান পরিত্যাগ করাতে তাহা পান নাই। কিন্তু যিনিই পত্রিকা পান নাই বলিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহার নিকটে আবার উহা পাঠাইয়াছি। ইহাতে কাহার দোষে কাহার ক্ষতি, পাঠক বিচার করিবেন। তাহার পরে কার্ত্তিক মাসে ছাপাখানার কর্ম্মচারিগণ পীড়িত এবং অনুপস্থিত থাকাতে কার্ত্তিক মাসের কাগজ বাহির করিতে বিলম্ব হইয়া যায়, সেই ত্রুটি-ক্ষালনের জন্য আমরা অগ্রহায়ণ মাসেই পৌষের কাগজও বাহির করিয়াছি। কিন্তু এই কাগজ বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা কতজনের নিকট হইতে কত রকমের পত্র পাইয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। নমুনা স্বরূপ দুই খানি পত্রের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম, কিন্তু লেখকের নাম ধাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে লজ্জিত করিলাম না। অংশটুকু এই;—"আজ কাল বঙ্গদেশে পত্রিকারও অভাব নাই, বিজ্ঞাপনেরও অভাব নাই। আপনি বিজ্ঞাপন দিবার সময় অত্যন্ত ভদ্রতা করিয়া (ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার মত) লিখিয়াছিলেন বলিয়া এবং বিশেষতঃ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলিয়া আপনার কথাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রাহক হইয়াছি এখন যে রীতিমত পত্রিকা পাইতেছি না তাহার কারণও বুঝিতেছি না"। আর একজন লিখিয়াছেন,—"বিলম্ব দেখিয়া অনে-

কেই উদ্বিগ্ন হইয়াছে এবং ঐক্য হইয়া নালিস করিতে ও বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিতে পরামর্শ করে কিন্তু আমি বলায় তাহারা ক্ষান্ত আছে।" অনুগৃহীত হইলাম!! কিন্তু যাঁহারা নালিস করিতে প্রস্তুত, তাঁহারা মূল্যটা দিয়াছেন কি না, এই সঙ্গে সে কথাটি জানাইলে আরও বাধিত হইতাম। যে দিন বঙ্গদেশে মূল্য না দিয়াও সম্পাদকের নামে [illegible] চলিবে, সেই শুভ দিনে বঙ্গীয় [illegible] হিত্যের চরম উন্নতি হইবে। আমরা [illegible] করি, সে দিন অতি নিকটে!

পাঠক দেখিবেন, আমরা মাঘ মাসেই ফাল্গুন ও চৈত্রের কাগজ বাহির করিলাম। দুই একখানি বাদে প্রায় সকল মাসিক পত্রই ন-মাস ছ-মাস পরে বই আগে বাহির হয় না। আমরা তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত পথ ধরিলাম। যদি গ্রাহকেরা ইহাতে সন্তুষ্ট হন, আমরা ভবিষ্যতেও তাঁহাদের সন্তোষের জন্য এরূপ করিতে যত্ন পাইব।

প্রাপ্ত-গ্রন্থ।

বাণ-যুদ্ধ। অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত বাণ-যুদ্ধের পদ্যানুবাদ। শ্রীযদুকৃষ্ণ কাব্যরত্ন কর্তৃক অনুবাদিত। ১১ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই আনা মাত্র।

অনুবাদক বিজ্ঞাপনে বলিতেছেন, "জ্বরাদি রোগোপশমের জন্য বাণ-যুদ্ধ পড়িবার ও শুনিবার ব্যবস্থা আছে। এই হেতু প্রাচীন কালাবধি অদ্যাপি লোকে শান্তির জন্য বাণ-যুদ্ধ পড়িয়া ও শুনিয়া থাকেন; কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, সুতরাং অধিকাংশ লোকই অর্থ বুঝিতে পারেন না। সাধারণে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন,—এই আশয়ে আমি শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত দশম স্কন্ধের অন্তর্নিবিষ্ট বাণ-যুদ্ধের সরল ভাষায় পদ্যাকারে অনুবাদ প্রচার করিলাম।" অনুবাদ সরল এবং বিশদ হইয়াছে।

প্রথম উপদেশ ও দ্বিতীয় উপদেশ। বোয়ালিয়া [illegible] যন্ত্রে মুদ্রিত। ৪০ পৃষ্ঠা। গ্রন্থকারের নাম এবং মূল্যাদির উল্লেখ নাই।

এই গ্রন্থে প্রসিদ্ধ সত্য-সন্ধিৎসু নচিকেতার উপাখ্যান এবং অনেকগুলি সদুপদেশ আছে। ভাষাটি সরল ও মিষ্ট এবং উপদেশগুলি হৃদয়গ্রাহী। ইহা পাঠে যুবক[illegible] উপকার হইতে পারে। নমুনা[illegible] উদ্ধৃত হইল :—

"১১। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সরল শুভবুদ্ধি প্রয়োগ করিলে কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। যে ব্যক্তির ঐরূপ শুভবুদ্ধি আছে তাহাকে সেই মনুষ্য সাধারণতঃ নির্ব্বোধ বলিয়া থাকে। যিনি সুশীল, ধর্ম্মনিষ্ঠ, যাঁহার চিত্ত পবিত্র, যিনি ঈশ্বরকে ভয় করেন, যিনি সদ্বুদ্ধি-সম্পন্ন নিষ্পাপ যত্নশীল, তাঁহাকে সংসারাসক্ত মানব অনেক স্থলে বুদ্ধিমান বলিতে কুণ্ঠিত হয়।

১২। যে বুদ্ধি দ্বারা বেদব্যাসাদি মহর্ষিরা আপনাদের অন্তরে সেই মহান্ সর্ব্বব্যাপী মঙ্গলময় পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন; যে বুদ্ধি দ্বারা মন্বাদি মহর্ষিরা অতি পবিত্র শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া ভূর্লোক এবং দ্যুলোকে তাঁহাদের কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, যে বুদ্ধি দ্বারা ধ্রুব ও প্রহ্লাদ ভক্তবৎসল হরির পদারবিন্দের সৌরভে লুব্ধ হইয়াছিলেন; যে বুদ্ধি দ্বারা রাজশ্রব রাজার তনয় নচিকেতা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি পাইয়াছিলেন; সেই বুদ্ধিই শুভ, নির্ম্মল এবং সকলের শ্রেষ্ঠ। [illegible] বুদ্ধিবলে দেহের শত্রুকে জয় করা যায় এবং স্বর্গের দ্বার মানবের নেত্রপথে পতিত হয়।"